শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

প্রভুপাদ ১০৮ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের
সন্ন্যাস গ্রহণের 'শতবার্ষিকী' প্রকাশন

গৌড়ীয়-প্রবন্ধাবলী

(দ্বিতীয় খণ্ড)
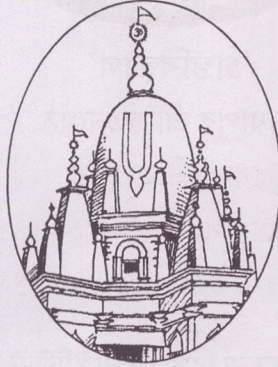
শ্রীচৈতন্যমঠ ও তচ্ছাখা শ্রীগৌড়ীয়মঠসমূহের বর্তমান আচার্য্য
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রজ্ঞান যতি মহারাজ
সম্পাদিত

মায়াপুর শ্রীচৈতন্য মঠ
শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া, পঃ বঃ।

প্রকাশক ঃ
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীভক্তিস্বরূপ সন্ন্যাসী মহারাজ
(সাধারণ সম্পাদক)
মায়াপুর শ্রীচৈতন্য মঠ
শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া, পঃ বঃ।

প্রথম-সংস্করণ
প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের আবির্ভাব তিথি

৫ গোবিন্দ	৫৩১ শ্রীগৌরাব্দ
২২ মাঘ	১৪২৪ বঙ্গাব্দ
৫ ফেব্রুয়ারী	২০১৮ খৃষ্টাব্দ

প্রাপ্তিস্থান

'গ্রন্থবিভাগ'
মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ--শ্রীমায়াপুর
জেলা--নদীয়া, পঃ বঃ। পিনঃ--৭৪১৩১৩
ফোন ঃ- (০৩৪৭২) ২৪৫২১৬

শ্রীচৈতন্য রিসার্চ ইন্‌ষ্টিটিউট
৭০-বি, রাসবিহারী এভিনিউ
কলকাতা-২৬
ফোন ঃ- (০৩৩) ২৪৬৫৭৪০৯

ভিক্ষা – ২০০ টাকা

মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠস্থিত 'সারস্বত প্রেস' কম্পিউটার বিভাগ হইতে মুদ্রিত।

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

নিবেদন

জগদ্‌গুরু প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের সময়ে সাপ্তাহিক বাংলা **'গৌড়ীয়'**-তে বহু তত্ত্বপূর্ণ প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইয়াছিল। ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বিশেষ বিশেষ প্রবন্ধাদি শ্রীমান্ ভক্তিস্বরূপ সন্ন্যাসী মহারাজ নানা সেবাকার্য্যে ব্যস্ত থাকিলেও বহু পরিশ্রম করিয়া সংগ্রহ করিয়াছেন। ওই প্রবন্ধগুলি অত্যন্ত মূল্যবান্। শ্রীচৈতন্যমঠের সেবকগণ এ-বৎসর প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের **'সন্ন্যাস গ্রহণের শতবর্ষ'** উদ্‌যাপন কবিরার সুযোগ পাইয়া ওই প্রবন্ধগুলি একটি গ্রন্থাকারে **"গৌড়ীয় প্রবন্ধাবলী"** (২য় খণ্ড) নামে প্রকাশ করিবার যত্ন লইয়াছেন। আশা করি, পাঠকগণ যত্নের সহিত উহা পাঠ করিয়া পারমার্থিক পথে কিছু আহার্য্য লাভ করিবেন।

আমরা সকল সময়েই গুরু-বৈষ্ণবগণের লিখিত প্রবন্ধাদি মুদ্রিত করিয়া থাকি—যাহাতে আমরা পারমার্থিক পথে অগ্রসর হইতে পারি, সেই যত্নই লইয়া থাকি। যাঁহারা এই প্রবন্ধ প্রকাশ করিবার যত্ন লইয়াছেন, তাঁহারা গুরু-বৈষ্ণবগণের কৃপাশীর্বাদ লাভ করিবেন। শ্রীরামানন্দ দাসাধিকারী, শ্রীবিমল কৃষ্ণ দাসাধিকারী বিশেষ যত্ন সহকারে গ্রন্থটি আমাদের মঠের কম্পিউটারে কম্পোজ করিয়াছেন। —ইহারা সকলেই শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণের আশীর্বাদ লাভ করিয়া ধন্যাতিধন্য হইবেন।

প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী
গোস্বামী ঠাকুরের তিরোভাব তিথি
২০ অগ্রহায়ণ, ৭ ডিসেম্বর, ২০১৭ খৃষ্টাব্দ

—বৈষ্ণবদাসানুদাস
ভক্তিপ্রজ্ঞান যতি
আচার্য্য, মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ

সূচীপত্র

(প্রথমে প্রবন্ধের নাম ও তৎপার্শ্বে পৃষ্ঠাঙ্ক প্রদত্ত হইল)

[১৯৩৪-৩৫ খৃষ্টাব্দ]

[১৯৩৫-৩৭ খৃষ্টাব্দ]

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধারী-জিউ

প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত শ্রীচৈতন্যমঠের অধিষ্ঠাতৃ শ্রীবিগ্রহগণ।
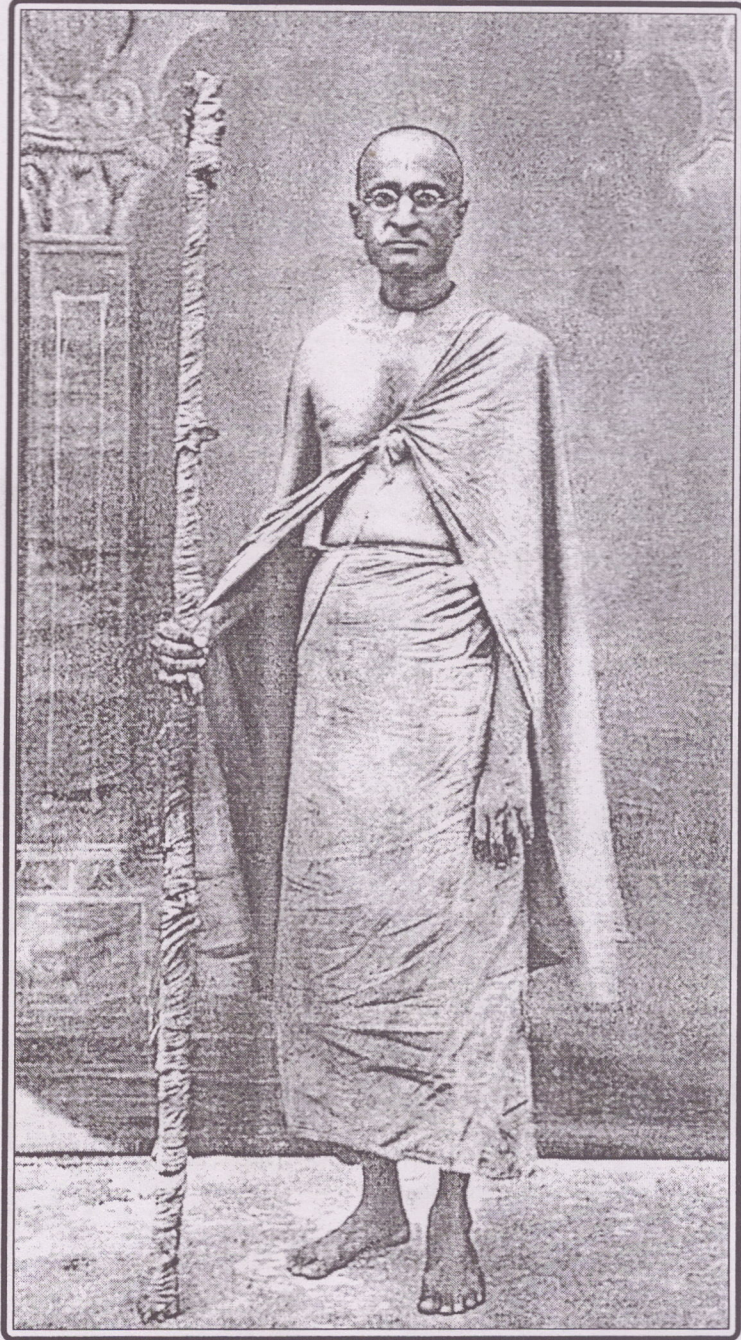
পরিব্রাজকাচার্য্যরূপে প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর
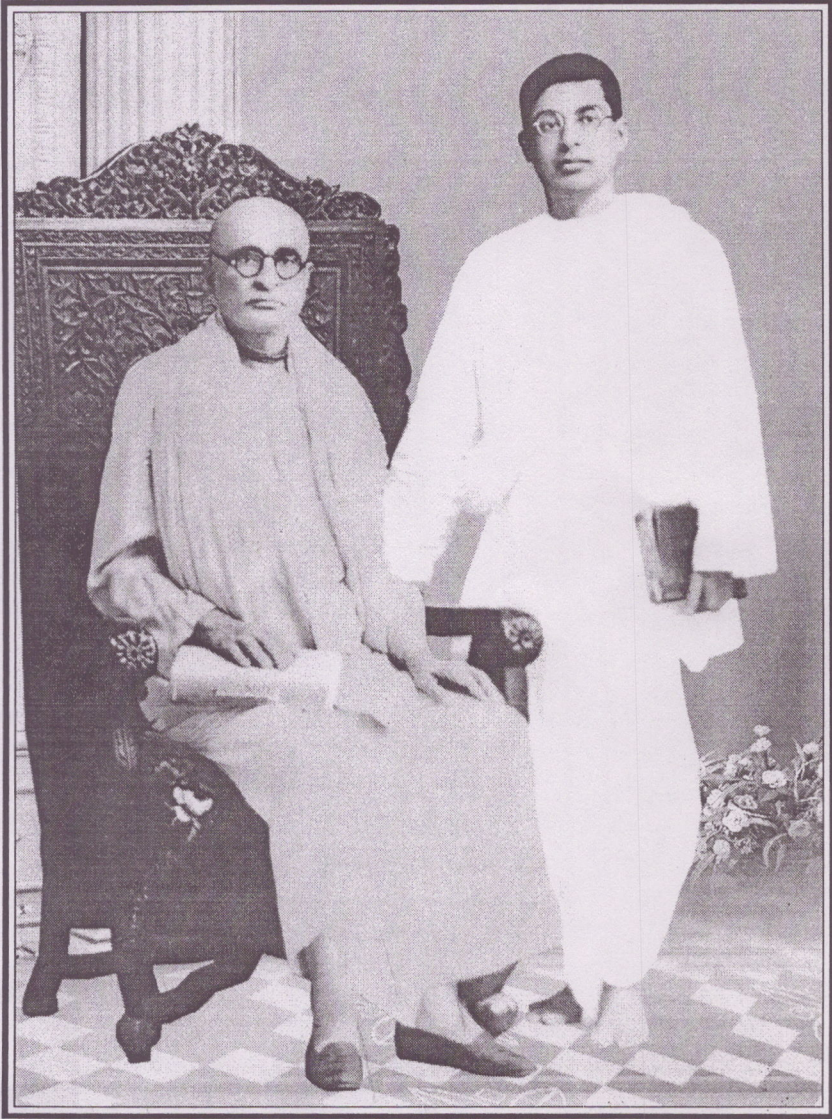
শ্রীমান্ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ* প্রচুর পরিমাণে জয়যুক্ত হউন। তাঁহার সহকারী ব্যক্তিগণ তাঁহার অনুসরণ করিতে পারিলে তাঁহাদেরও প্রচুর মঙ্গল হইবে।

—শ্রীল প্রভুপাদ

* শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভুর সন্ন্যাসী নাম—শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস তীর্থ গোস্বামী মহারাজ।

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয়

[১৯৩৪-৩৫ খৃষ্টাব্দ]

স্ব-পর-মঙ্গল

প্রাণিগণের মধ্যে স্ব-হিত ও পর-হিতের অনুসন্ধান আছে। পরহিতের অনুসন্ধানে স্বীয় পাল্যগণের অনুসন্ধানকেই স্ব-হিতের অন্যতম-জ্ঞানে হিতবিচার লক্ষিত হয়। কেহই হিতের পরিবর্ত্তে অহিত আবাহন করেন না; তবে হিত-বিচারে ভ্রান্তি ও সুষ্ঠু-দর্শনে ভেদ আছে, ইহা বুঝিতে পারেন।

কৃষ্ণসেবা-বিমুখ ভোগ-রাজ্যে স্ব-হিত বা পরহিত ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিতেই পর্য্যবসিত। কিন্তু ইন্দ্রিয়গণের গ্রহণাধিকার ক্ষণ-ভঙ্গুর; ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞানের বিষয়গুলিও চিরস্থায়ী নহে। এজন্য নিত্যানিত্য-বিচাররহিত জনগণ হিত-বিচার-কল্পনায় যাহা স্থির করেন, তাহা ভোগরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। কোন কোন ভুক্তিপ্রবণ সম্প্রদায় ভোগ-রহিত নির্ভোগবাদের বহুমানন করিয়া থাকেন। ইহাদের অপবর্গ-ধারণা পার্থিব ইন্দ্রিয়-চালনার বিপরীতদিকে। অর্থাৎ স্তব্ধ (Indolent) ভোগিকুল বলেন,—এই প্রকার আলস্য ইন্দ্রিয়জ কুভোগের অভিজ্ঞতা হইতে প্রসূত। অতএব ভোগরাজ্যে থাকা-কাল পর্য্যন্ত তাঁহাদের বিচার মুক্ত হইবার বাসনাদি ক্ষণভঙ্গুরতার দিকে প্রতিষ্ঠিত।

ভোগাবদ্ধ দিক্ হইতে ভোগ নিরস্ত হইবার অভিমান যদিও কোন কোন ক্ষেত্রে বলবান্ বলিয়া প্রতীত হয়, তথাপি তাৎকালিক ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞানোত্থ বলিয়া উহা ভোগেরই অপর ভাগ। ইহা ভোগাভাব নামে কথিত। স্ব-মঙ্গল ও পরমঙ্গল-চিন্তায় ভোগিকুল এই প্রকার 'ভোক্তৃ-ভোগ্য-ভোগ'-ভাবত্রয়ের সম্মিলন-ভাব প্রয়াস করেন না। পক্ষান্তরে তাঁহাদের বিচারের দুর্ব্বলতায় ভোগি-সম্প্রদায়ের প্রলোভনীয় পদার্থ-সমূহ নিকটস্থ হইলে উহাদের ভোগ-মোক্ষা-কাঙ্ক্ষা অনবসর লাভ করে। বুভুক্ষার প্রবল বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া জীব অসহিষ্ণু হইয়া পড়েন এবং ভোগকে চিরন্তন সহচর জ্ঞান করেন।

অভক্ত, অন্যাভিলাষী, কর্ম্মফলভোগ-পরায়ণ ও কর্ম্মফল-ত্যাগ-পরায়ণ কুভোগী, সুভোগী ও ভোগাভোগ-রহিত-চেষ্টাপর। কিন্তু ভগবদ্ভক্তগণ এই সকল অনুশীলন কদাপি প্রবৃত্ত হন না। ফলভোগাবরণ ভজনীয়

বস্তু ব্যতীত ইতর বস্তু লাভের ইচ্ছায় এবং ভোগ্যবস্তুর সান্নিধ্যত্যাগ প্রভৃতি উৎকট প্রবৃত্তিমার্গে ধাবমান হইলে অনাত্মবৃত্তির উত্তেজনায় জীবকে ভোগিপথের স্বরূপ বুঝিতে দেয় না।

অভক্তি-রাজ্যের ত্রিবিধ সরণিতে ভ্রাম্যমাণ হইয়া বদ্ধজীব ভজনীয় বস্তুর অনুসন্ধান করেন না। যদিও কেহ কেহ অনুসন্ধান করেন, তথাপি তাঁহারা সৎ-কর্ম্ম-ফলে সুভোগ-লাভের উদ্দেশ্যে ব্যতিরেকভাবে অসৎকর্ম্ম-ত্যাগকেই পুণ্যলাভের সোপান-জ্ঞানে অল্পকাল-স্থায়িসুখভোগের জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়েন। পক্ষান্তরে ভোগলাভের অকিঞ্চিৎকরতা লক্ষ্য করিয়া ভোগাতীত রাজ্যে স্বানুভূতি-চেষ্টা-রহিত হইয়া "গোলে হরিবোল" দিবারজন্য জড়জ্ঞেয়ত্ব ও জড়জ্ঞান পরিহার করিয়াছেন মনে করেন।

শাক্যসিংহের অনুগত সম্প্রদায় অচিন্মাত্রবাদ কেই 'মুক্তি' বলেন, আবার জড়ের দ্বারা আবিষ্কৃত কেবল-চিন্মাত্রবাদে ভোগ নাই, চিন্তা করিয়া নির্ব্বিশেষ কল্পনা করিয়া থাকেন।

বিদ্যাপতি ঠাকুর "হাম পরিণাম নিরাশা" গাহিয়াছেন। তাঁহাকে কেহ কেহ লছিমার গুণমুগ্ধ জানিয়া ভ্রান্ত হন। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের "যঃ কৌমারহরঃ" শ্লোকের অনুসরণ করিয়াছেন, তাঁহারাই শ্রীরূপপাদের "প্রিয়ঃ সোঽয়ং কৃষ্ণঃ" শ্লোকের তাৎপর্য্য অবগত আছেন।

প্রাকৃত-সাহজিক অভক্ত-সম্প্রদায় জড়-ভোগে প্রমত্ত হইয়া কুভোগকেই 'ভক্তি' মনে করেন। সুতরাং শুদ্ধভক্তি হইতে তাঁহাদের মনশ্চাঞ্চল্য ভিন্ন পথে গিয়াছে। ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীল প্রবোধানন্দ "কালঃ কলির্বলিনঃ" শ্লোকটি গান করিয়া 'মিছা' ভক্ত-সম্প্রদায়ের দুর্দ্দমনীয় জড়ভোগ-চেষ্টা রহিত করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতও তারস্বরে অধোক্ষজ বাস্তব বস্তুর অনুশীলনের জন্য অভক্ত অন্যাভিলাষী, সৎকর্ম্মী ও নির্ভেদ ব্রহ্মানুসন্ধিৎসুর চিন্তাস্রোত পরিবর্ত্তিত করিয়াছেন।

অক্ষজ-পদার্থের সেবক-সূত্রে ভোগিসমাজ যে কপট সেবাপ্রবৃত্তি চালনা করেন, উহা 'প্রোজ্ঝিতকৈতব' শব্দে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হইয়াছে। যাঁহারা শ্রীমদ্ভাগবতের ১১শ স্কন্ধের ২৩শ অধ্যায়ের ত্রিদণ্ডিভিক্ষু-গীতি ও হংস-গীতির অনুসরণে শ্রীরূপপাদের উপদেশামৃত পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন যে, মহাজনের পথের অনুসরণ-ব্যতীত ভক্তির সম্ভাবনা নাই। ভক্ত হইবার উপায়-জ্ঞানের অভাবে ভজনীয় বস্তুর বিবেকের তারতম্য-নির্দ্দেশ সম্ভবপর নহে।

তাঁহারা শ্রীমদ্ভাগবতের তন্নিষ্ঠানাম্নী বৃত্তিকেই বেদ প্রতিপাদ্য অভিধেয় বলিয়া জানেন। ভগবৎপ্রেমই 'কৈবল্য' এবং অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দনই বাস্তব বস্তু। তাঁহারা এই সকল ভাগবত কথা বুঝিতে পারেন এবং বুঝিবার ব্যাঘাতসমূহ (যাহা 'অনর্থ' নামে পরিচিত) দুঃসঙ্গ-জ্ঞানে পরিহার করেন।

তাঁহারা মাতা পিতা হইতে লব্ধ প্রাকৃত শরীরের অনিত্যতা, চেতন-রাহিত্য ও নিরানন্দের আবাহন লক্ষ্য করিয়া গুণজাত জগতে ভ্রমণ-পিপাসা নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় বলিয়াই জানেন। বস্তুতঃ ভগবদ্ ভক্তই অন্যাভিলাষিতা, স্বভোগ ও পরভোগ প্রভৃতির অর্থ বুঝিতে পারেন, আর অভক্ত উহা মায়িক-বিচারে সুষ্ঠু দর্শনের বৈক্লব্য মাত্র বুঝিয়া থাকেন।

শ্রীগৌড়ীয় দ্বাদশবর্ষকাল শুদ্ধভক্ত-সমাজের পূর্ণ সেবা করিয়া অনন্তকালের দিকে অগ্রসর হইতেছেন, এইরূপে তাঁহার ত্রয়োদশ বর্ষ-প্রবৃত্তি। আর গৌড়ীয়ানাথ ৪৪৮ বর্ষ ধরিয়া বার্ত্তা বিঘোষিত করিয়া প্রপঞ্চে শ্রীকৃষ্ণকথা নাম-প্রেমরূপে বিতরণ করিতেছেন।

ব্রজের পথে পরিক্রমাকারী গৌড়ীয় সংসার পথের পথিক নহেন; জাগতিক অনুপাদেয়তা, ক্লেশ, পরিচ্ছেদ ধর্ম্মের অবরতা প্রভৃতি ও চতুর্ব্বিধ কাপট্যের দিকে নক্ষত্রবেগে পতিত জীবগণের বেগ রুদ্ধ করিতেছেন। যাহাতে সকল জীবই ব্রজপথের পথিক হন, ব্রজরাজ নন্দ-নন্দনের ও বৃষভানুকুমারীর মিলিত-তনু শ্রীগৌর-সুন্দরের অনুসরণ করেন, তজ্জন্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব কৃষ্ণ-বিষয়ে অকৃত্রিম অমন্দোদয়দয়া পরবশ হইয়া জীব-কুলের নিকট যে বাণী প্রচার করেন, তাহা কি আমাদের বাধির্য্য অপনোদন করিবে না?

কার্ষ্ণ-বিদ্বেষ—গৌড়ীয়-বিদ্বেষ বদ্ধজীবের হৃদয়ে স্বভাবজ ধর্ম্ম; কিন্তু এই স্বভাব হরিজনে নিত্য নহে। তাৎকালিক বলিয়াই উহারা হরিজনকে বা দরিদ্রকে নিম্নশ্রেণীস্থ জানিয়া তাঁহাদের হিত-সাধন করিবার চেষ্টা-মুখে নিজ-আত্ম-চেষ্টার অহিত চেষ্টা জানিয়া ভোগ-লালসায় বুভুক্ষু বা আত্মলালসায় মুমুক্ষু হইয়া পড়িতেছে। ঐ প্রকার মুক্তি অধোক্ষজ 'কৃষ্ণ' শব্দকে শ্রুতিপথে আবাহন করিবার বিরোধী। তজ্জন্য সমগ্র জগতের প্রতি বৈকুণ্ঠ-নাম-গ্রহণই গৌড়ীয়ের একমাত্র পরামর্শ-দান।

পার্থিব গ্রাম্য হিতবাদী ও অপ্রাকৃত হিতবাদী গৌড়ীয়—ইহাদের মধ্যে "আশমান্ জমিন্ ফারাক্"। সুতরাং গ্রাম্য বার্ত্তাবহকে কেহ যেন বৈকুণ্ঠদূতের সহিত সমশ্রেণীস্থ মনে না করেন।

প্রাকৃত সত্যকে অসত্য বলিয়া কেবলাদ্বৈতবাদিগণ স্থির করিয়াছেন; কিন্তু উহাকে নিত্যানিত্যবিবেকিগণ 'অনিত্য' বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। যেহেতু বুভুক্ষা প্রবল থাকা কালে তিক্তরসের প্রাপ্তি-জন্য তদ্‌বিপরীত মুমুক্ষা উদিতা হয়। সুতরাং মুমুক্ষা ধারণায় ভোগের দোষ প্রবেশ করিয়াছে।

কার্ষ্ণ গৌড়ীয় এই ভ্রমপথে বিচরণশীল নহেন জানিয়া সমগ্র মানবজাতি গৌড়ীয়ের বিচার পাঠ করুন এবং গৌড়ীয়মঠের বিচার-প্রণালী ও শ্রৌতবাণীর নিত্য গ্রাহক হউন।

আজ দ্বাদশ-সৌরবর্ষ-পরিমিত এক যুগ কাটিয়া গেল। নিজের অহিত-আকাঙ্ক্ষী জনগণ অহিতকেই 'হিত' বলিয়া বুঝিয়া নিজের প্রকৃত হিতকে বরণ করিলেন না। তাই গৌড়ীয়ের গভীর হৃদয়-বেদনা এই যে, এইরূপ অনর্থময় কার্য্যেই তাঁহাদের জন্ম-জন্মান্তর চলিয়া যাইতেছে, শ্রীগৌরসুন্দরের বাণী তাঁহাদের কর্ণে পৌঁছাইতেছে না! সেই বাণী তাঁহাদের কর্ণে প্রবিষ্টাভাস বলিয়া লক্ষিত হইলেও তাঁহাদের অনর্থ নিবৃত্ত হইতেছে না। কারণ, তাঁহারা গৃহব্রত থাকিতেই দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ, গৃহস্থ হইতে পারেন নাই। গৃহস্থ হইয়া কৃষ্ণ ভজন করিতে না পারায় অধোক্ষজ বস্তু তাঁহাদের বোধগম্য হয় না। তাই শ্রীধাম মায়াপুরে অধোক্ষজ-বিষ্ণুবস্তু তত্ত্বজিজ্ঞাসু ও তত্ত্ববিদ্‌গণের নিত্যকাল আলোচিত এবং নিরন্তর অনুশীলিত হইবার জন্য প্রকাশিত হইয়াছেন।

সম্ভোগ ও বিপ্রলম্ভ

চিন্ত্যবিচারে বিপ্রলম্ভ ও সম্ভোগ অচিন্ত্য বৈকুণ্ঠবিচারের সম্ভোগ ও বিপ্রলম্ভের ন্যায় নহে। তজ্জন্য চিন্ত্য বিপ্রলম্ভ ক্লেশকর এবং অচিন্ত্য বিপ্রলম্ভ পরমানন্দদায়ক। সম্ভোগে বিপ্রলম্ভের কথা শ্রীরায় রামানন্দের মৈথিল গীতের মধ্যে পাওয়া যায় এবং বিপ্রলম্ভে সম্ভোগের কথাও ঐ গীতেই দেখিতে পাওয়া যায়। অমৃত- প্রবাহভাষ্যে উহা উল্লিখিত আছে। সম্ভোগ বিপ্রলম্ভকে 'প্রেমবৈচিত্ত্য' বলে এবং বিপ্রলম্ভে সম্ভোগ—কেবলমাত্র স্মরণাত্মক।

ইহ জগতে জড়শরীরের উপলব্ধিতে সাক্ষাৎকারের পরিবর্ত্তে স্মরণ-জন্য স্ফূর্ত্তির কথা পাওয়া যায়; কিন্তু সাক্ষাৎকার-ব্যাপারটি ইহজগতে দেশ ও কালসাপেক্ষ বলিয়া স্মরণ-মাত্রকেই সম্ভোগ বলা হয়।

শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীরাধা-শ্রীকৃষ্ণ-মিলিততনু অর্থাৎ কৃষ্ণশরীর রাধিকার দ্যুতিমণ্ডিত এবং কৃষ্ণমানস রাধাভাবে সুবলিত বা আরোপিত। রাধাভাব সুবলিত কৃষ্ণই শ্রীমন্মহাপ্রভু, তজ্জন্য তিনি সন্ন্যাসিস্বরূপ অর্থাৎ সম্ভোগবাদের দৃষ্টি হইতে পৃথক্ অবস্থিত হওয়ায় মূর্ত্তিমান বিপ্রলম্ভ।

এই মূর্ত্তবিপ্রলম্ভ-লীলায় তাঁহার সম্ভোগময়ী কৃষ্ণমূর্ত্তির শ্যামবর্ণ রাধিকার চম্পকাভ বর্ণের দ্বারা আবরণ করিয়াছেন। তজ্জন্য এই 'সংন্যাসী'রূপি-কৃষ্ণ অর্থাৎ সম্ভোগ-বাদীর আদিদৃষ্টিতে তাঁহার ত্যক্ত ভোগের আদর্শ পরিদৃষ্ট হয়।

শ্রীরাধিকার গণাবস্থিত স্বরূপোপলব্ধিতে দিব্যসূরি শ্রীরামানন্দ শ্রীগৌরসুন্দরে শ্রীরাধিকা দর্শন করিয়া নিজকে পাল্যসখী-জ্ঞানে অবস্থিত জানিয়া গৌরসুন্দরে রাধা দর্শন করেন এবং রাধালিঙ্গিত শ্যামবর্ণ শ্যামসুন্দর দেখিবারও কোন অভাব পরিদর্শন করেন না।

শ্রীগৌর-রামানন্দ-মিলন চৈঃ চঃ ৮ম পঃ বেশ মনোযোগের সহিত পাঠ করিলে জানিতে পারা যায় যে, রাধাগোবিন্দের নিত্য সেবিকা শ্রীবার্ষভানবীর কৃষ্ণ-সম্ভোগ ও সম্ভোগাতিরিক্ত স্বতন্ত্র অবস্থানে তাঁহার বিপ্রলম্ভ প্রতীতি।

অধিরূঢ় মহাভাবাবস্থায় মহাভাব-স্বরূপিণী আহ্লাদিনী শক্তি বার্ষভানবীই শ্যামসুন্দরের আস্বাদ্যা। পরস্পরের আস্বাদনের দর্শকসূত্রে শ্রীরামানন্দ-দর্শনে সখীভাবের বিচার অবস্থিত। রামানন্দ কিছু আপনাকে বার্ষভানবী জানিতেন না; কিন্তু শ্রীবার্ষভানবীকে তাঁহার সেব্যা বলিয়াই জানিতেন।

শ্রীগৌরাবতারে সম্ভোগকামবিলাসের কথা নাই এবং তাহা হইতে পারে না। প্রেমবিলাসবিবর্ত্ত নাম্নী স্মৃতিই প্রবলা। যখনই সম্ভোগ-ভূমিকায় সেবিকার অবস্থিতি, তখনই রাধাকৃষ্ণের সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যের সম্ভোগ এবং সেই ভূমিকায় অবস্থিত থাকিয়া যে রাধাগোবিন্দের লীলায় প্রবেশ, তাহাতে ঔদার্য্যাবস্থানের ভাব স্মৃতিব্যতীত অন্যরূপ সংমিশ্রিত করিবার অবকাশ নাই।

দেবদাসীর গান-শ্রবণে সাক্ষাৎকার লাভাশায় বার্ষভানবী-ভাব-বিভাবিত গৌরসুন্দরের চেষ্টায় বিপ্রলম্ভের উন্মেষণকারী গোবিন্দের উক্তি আলোচ্য। গৌরনাগরীর অপকৃষ্ট ভাব প্রাকৃত চিন্ত্য জড়জ্ঞানে অবস্থিত;

তাহা প্রাকৃত কামবিলাসবিবর্ত্তের প্রকারভেদ; উহা প্রেমবিলাসবিবর্ত্ত নহে। সখীর রাধাসহ কৃষ্ণমিলন-বিচার শ্রীজগন্নাথ বল্লভে উদাহৃত আছে। তাহাতে সখীর কৃষ্ণসহ নিজ-সম্ভোগকামনা নাই। কামবাসনা-প্রবল প্রাকৃত সাহজিক চিন্তা জড় রস উৎপাদন করিতে পারে, উহাতে বদ্ধজীবের সম্ভোগচিন্তা সম্ভব। উহা মুক্ত জীবের প্রেমবিলাসবিবর্ত্ত শব্দবাচ্য হইতে পারে না। জড় স্মৃতি হইতে জড় সম্ভোগই সম্ভব।

রাধাকৃষ্ণের সম্ভোগ-বিহারে বদ্ধজীবের জড়ভোগাত্মক কামবিলাস ন্যাস্ত হইতে পারে না। তাদৃশী চেষ্টাকে কোন ভক্তই প্রেমবিলাস বলিতে পারেন না। রাধিকার কৃষ্ণ-সম্ভোগ এবং কৃষ্ণের রাধিকা-সম্ভোগ রাধিকার কায়ব্যূহ সখীগণের স্বসুখবাঞ্ছাপর নিত্যধর্ম্মে অবস্থিত নাই। আবার রাধিকার নিত্যা চেষ্টা সখীর দ্বারা কৃষ্ণ-সম্ভোগ এবং কৃষ্ণের দ্বারা সখীসম্ভোগ,—রসতত্ত্বে এই অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-বিচারটি যাঁহারা বুঝিয়া উঠিতে পারেন না, তাঁহারা রাধা কৃষ্ণের স্বরূপজ্ঞানে বিমুখ হইয়া জড়-বৈরস্যের সম্পাদক নলদময়ন্তীর শ্রেণীর বিচারে অপ্রাকৃত তত্ত্বকে ভোগময় প্রাকৃত কামে পরিণত করেন।

অহংগ্রহোপাসক মায়াবাদী জড় বিচারকে বহুমানন করিয়া যে অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মকর্ত্তৃত্বের কামবিলাসবিবর্ত্তে ধাবমান হন, উহাই প্রাকৃত দর্শন বা প্রাকৃতসহজিয়া-বাদ। কিন্তু কৃষ্ণ অধোক্ষজ এবং রাধিকা অধোক্ষজশক্তি-স্বরূপা।

রাসস্থলী-পরিত্যক্ত গোপীর কৃষ্ণতন্ময়তায় যে অধিরূঢ় মহাভাবের কথা কথিত হয়, উহাতে গোপীর বাস্তব নিত্য কৃষ্ণ হইবার অধিকারের কথা স্থাপ্য হয় না। মায়াবাদী অহংগ্রহোপাসকের বিচারে যেরূপ জীব-স্বরূপে ভেদাংশ-বিচার অনাদৃত হয়, তদ্রূপ নহে।

শ্রীদামোদরস্বরূপ, শ্রীরামানন্দ শ্রীরাধাকৃষ্ণমিলিততনু গৌরসুন্দরের কামবিলাস-বর্জ্জিত প্রেষ্ঠজাতীয় হওয়ায় তাঁহাদের চেষ্টায় কামবিলাসের আরোপ না করিয়া স্মরণ-জনিত প্রেমবিলাসের কথা জানিতে হইবে অর্থাৎ বার্ষভানবীর পাল্যদাসীজ্ঞানে ললিতা বিশাখাদি সখীগণ-কর্ত্তৃক যেরূপ রাধাগোবিন্দ সেবিত হন, তদ্রূপ বিচারে স্মরণমাত্রে ঔদার্য্যলীলায় অবস্থান। উহাতে স্ফূর্ত্তি আছে অর্থাৎ উহা বাস্তব সাক্ষাৎ কারেরই স্মৃতিমাত্র।

বস্তুসিদ্ধিলব্ধ বিদেহমুক্ত-দর্শনে দর্শকের অপ্রকটলীলায় অবস্থান। রৈবতক পর্ব্বতে অর্থাৎ গির্নার পর্ব্বতে কৃষ্ণের ব্রজবাসিদর্শন ও স্মরণের বিচার আছে এবং স্যমন্তপঞ্চক হইতে আগত কৃষ্ণের ব্রজবাসীর সহিত বৃন্দাবনে যামুনতটে মিলনে সম্ভোগবিচারে বিচিত্রতা আছে।

যখনই দামোদরস্বরূপ প্রভৃতি আপনাদিগকে ব্রজলীলায় অবস্থিত বিচার করেন, তখন তাঁহারা সম্ভোগ-লীলার স্মৃতি-সরণিতে অবস্থিত থাকেন। আর যে কালে তাঁহাদের গৌরলীলায় দামোদরস্বরূপ প্রভৃতিতে ঔদার্য্যলীলা-বিকাশের কথা, তখনই কীর্ত্তনমুখে স্মরণোদ্দীপনের বিচার জানিতে হইবে। তজ্জন্য শ্রীরামানন্দ গৌরসুন্দরকে প্রথমে সন্ন্যাসিস্বরূপে দর্শন এবং পরে নিজ নিত্য স্বরূপে অবস্থিত হইয়া তাঁহাকে রাধালিঙ্গিত শ্যামসুন্দর দর্শন করিয়াছিলেন।

শ্রীনারায়ণী

শ্রীচৈতন্যদেবের সম্বন্ধে যাঁহারা কিছুমাত্র খবর রাখেন, তাঁহারাই শ্রীচৈতন্যের চরিত্র-লেখক ও শ্রীনিত্যানন্দের সর্ব্বশেষ শিষ্য শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের নাম শ্রবণ করিয়াছেন। আর শ্রীচৈতন্যদেবের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীনিত্যানন্দের নামের ন্যায় ভক্তরাজ শ্রীবাস পণ্ডিতের নামও শুনিয়াছেন। যেরূপ শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের লীলা লিখিয়াছেন, তেমনই গৌড়নৈমিষের আদি কবি ঠাকুর বৃন্দাবন শ্রীচৈতন্যদেবের অতিমর্ত্ত্য-লীলা শ্রীচৈতন্যভাগবতে সুমধুর পদ্যছন্দে গ্রথিত করিয়া 'ব্যাস' নামে খ্যাত হইয়াছেন।

এই অতিমর্ত্ত্যব্যাসঠাকুরকে যিনি গর্ভে ধারণ করিয়াছেন, সেই অপ্রাকৃত রত্নগর্ভা ত্রিলোকবন্দ্যা, পরমপূজনীয়া ব্যাস-জননীই শ্রীনারায়ণী দেবী।

ভক্তরাজ শ্রীবাস পণ্ডিতের ভ্রাতা শ্রীরাম পণ্ডিত, শ্রীপতি ও শ্রীনিধি সকলেই শ্রীচৈতন্যদেবের একান্ত অনুগত ভক্ত ছিলেন। যথার্থ বৈষ্ণব-গৃহস্থের আদর্শ যেন এক একটি মূর্ত্তি ধরিয়া এই চারি ভ্রাতারূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ শ্রীবাস পণ্ডিতের আবির্ভাবস্থান শ্রীহট্ট-প্রদেশ। শ্রীবাস পণ্ডিত ও শ্রীরাম পণ্ডিত শ্রীহট্ট হইতে শ্রীমায়াপুর-নবদ্বীপে আসিয়া বাস করেন, পরে শ্রীপতি ও শ্রীনিধিও গঙ্গাবাসের জন্য আসিয়া শ্রীবাস ও শ্রীরামের সহিত যোগদান করেন। নারায়ণী শ্রীবাস পণ্ডিতের ভ্রাতৃতনয়া বলিয়াই প্রামাণিক গ্রন্থে উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি শ্রীবাসের কোন্ ভ্রাতার কন্যা, তাহার উল্লেখ কোন প্রামাণিক গ্রন্থে পাওয়া যায় না।

নারায়ণী বাল্যকাল হইতেই শ্রীবাসের নবদ্বীপের বাড়ীতে বাস করিতে থাকেন এবং অতি শিশুকালেই শ্রীচৈতন্যদেবের সঙ্কীর্ত্তন-নৃত্য দর্শন ও শ্রবণ করিবার সৌভাগ্য প্রাপ্ত হন। যে ভগবানের উচ্ছিষ্ট প্রসাদ ব্রহ্মাদি দেবতাও বহু তপস্যা করিয়া পাইতে পারেন না, শিশু শ্রীবাস-ভ্রাতৃদুহিতা নারায়ণী তাহা সাক্ষাৎ ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেবের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইতেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু গয়া হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার পর একদিন শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহে গমন পূর্ব্বক শ্রীবাসের নিকট চতুর্ভুজমূর্ত্তি প্রকাশ করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু যে সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর, তদ্বিষয়ে শ্রীবাসের সংশয় দূর করিবার জন্য মহাপ্রভু একটি প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখাইলেন। নিকটের চারি বৎসরের শিশু বালিকা নারায়ণী অবস্থান করিতেছিলেন। বালিকাকে ডাকিয়া মহাপ্রভু বলিলেন,—"নারায়ণী! তুমি একবার কৃষ্ণ বলিয়া কাঁদ দেখি।" এই কথা বলিয়ামাত্র চারি বৎসরের শিশু 'হা কৃষ্ণ' বলিতে বলিতে প্রেমোন্মাদে মত্ত হইয়া এরূপ ক্রন্দন করিতে লাগিলেন যে তাঁহার চোখের জলে সমস্ত গৃহ ভাসিয়া গেল—বালিকা বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া ফেলিলেন। *

---

* চৈঃ ভাঃ মধ্য ২য় ৩২১—৩২৩ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

ইহার পর আর একদিন মহাপ্রভু শ্রীবাসের গৃহে সাতপ্রহরিয়াভাব * প্রকাশ করিয়া যখন বিভিন্ন ভক্তগণকে বিভিন্নভাবে কৃপা করিতেছিলেন, তখন তাঁহার ভোজনের যত কিছু অবশেষ ছিল, সকলই মহাপ্রভু স্বহস্তে শিশু-বালিকা 'পরমপুণ্যবতী' নারায়ণীকে প্রদান করেন। নারায়ণীর সৌভাগ্য দেখিয়া বৈষ্ণবগণ তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ ও 'ধন্য ধন্য' করিতে লাগিলেন। বৈষ্ণবগণ বলিলেন, বালিকা হইয়াও ইহার জীবন ধন্য, শৈশবাবস্থায়ই নারায়ণকে সেবা করিবার সৌভাগ্যলাভ করিয়াছে।

নারায়ণী মহাপ্রভু উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করিলে প্রভু নারায়ণীকে ডাকিয়া বলিলেন—

"— — নারায়ণি!
কৃষ্ণের পরমানন্দে কান্দ দেখিয়া শুনি।।"

মহাপ্রভুর আজ্ঞায় নারায়ণী 'বালিকা-স্বভাবে' কৃষ্ণ বলিয়া কান্দিতে লাগিলেন। নারায়ণী বৈষ্ণবমণ্ডলে গৌরাঙ্গের 'অবশেষ-পাত্রী' বলিয়া আখ্যা প্রাপ্ত হইলেন।

তাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্ষদ কবিকর্ণপূরগোস্বামী জানাইয়াছেন,—নারায়ণী সামান্যা নারী ছিলেন না, তিনি ভগবানের পার্ষদগণের মধ্যে একজন অগ্রগণ্যা। শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলায় যিনি কৃষ্ণের উচ্ছিষ্ট ভোজন করিতেন, তাঁহার নাম ছিল কিলিম্বা; ইনি অম্বিকাদেবীর ভগ্নী। ইনিই শ্রীগৌরাঙ্গের নবদ্বীপ লীলায় শ্রীনারায়ণী।।†

শ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্ষদ মুরারিগুপ্ত তাঁহার কড়চার অষ্টাবিংশ বৎসর পর্য্যন্ত মহাপ্রভুর গৃহস্থলীলা ও নীলাচল-লীলা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ইনি স্বয়ং নিজ চক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া লিখিয়াছেন যে, "শ্রীবাসের ভ্রাতৃকন্যা অতি মধুরলাবণ্যবতী ভাগ্যবতী নারায়ণী। ইনি মাতা-পিতার একমাত্র কন্যা ছিলেন এবং মহাপ্রভুর প্রসাদ সেবা করিয়া প্রেমে ক্রন্দন করিতেন।"

শ্রীচৈতন্যভাগবতে দেখিতে পাওয়া যায়,—শ্রীমন্মহাপ্রভু গয়া হইতে নবদ্বীপে ফিরিবার সময় কানাইর নাটশালায় আসেন এবং নবদ্বীপে আসিয়া তথাকার বিবরণ ভক্তগণের নিকট কীর্ত্তন করেন। ▽ এই সময়ই তিনি শ্রীবাসের গৃহে বালিকা নারায়ণীকে কৃষ্ণনামে ক্রন্দন করান ও তাঁহার অবশেষ-পাত্র প্রদান করেন। কানাইর নাটশালায় শ্রীল প্রভুপাদ যে পাদপীঠ ও স্মৃতিফলক স্থাপন করিয়াছেন, তাহাতে তথায় প্রথমবার

---

* সাড়ে সাতদণ্ডে এক প্রহর, একপ্রহর তিনঘণ্টা, সাতপ্রহরে একুশ ঘণ্টা। মহাপ্রভু একুশঘণ্টা সময় বিষ্ণুর সকল অবতারের সকল আশ্চর্য্যলীলা প্রকাশ করিয়া ভক্তগণকে কৃপা বিতরণ করেন।

—চৈঃ ভাঃ মঃ ৯ম ও ১০ম অঃ দ্রষ্টব্য।

† "অম্বিকায়াঃ স্বসা যাসীন্নাম্না শ্রীলকিলিম্বিকা।
কৃষ্ণোচ্ছিষ্টং প্রভুঞ্জানা সেয়ং নারায়ণী মতা।।"

▽ কানাঞির নাটশালা-নামে একগ্রাম।
গয়া হৈতে আসিতে দেখিলুঁ সেইস্থান।। (চৈঃ ভাঃ মধ্য ২য় ১৭৯)

মহাপ্রভুর আগমনের তারিখ—১৪২৬ শকাব্দ দৃষ্ট হয়। তাহা হইতে এই সময় মহাপ্রভু প্রায় ১৯ বৎসর বয়স প্রকাশ করিয়াছেন। নারায়ণীর বয়স তখন প্রায় ৪ বৎসর। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদও এইরূপই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন,—

"শ্রীমহাপ্রভুর মহাপ্রকাশের পর প্রভু নারায়ণীকে যখন স্বীয় প্রসাদ দান করেন, তখন নারায়ণী চারি বৎসরের বালিকা। সুতরাং তাঁহার (মহাপ্রভুর) অষ্টাদশ বৎসর বয়সের সময় নারায়ণী কেবল চারি বৎসরের বালিকা মাত্র। তাহার ছয় বৎসর পর প্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তখন নারায়ণী দশ বৎসর মাত্র বয়স প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। * * * যে সকল লোকেরা তাঁহাকে শিশুকালে বিধবা থাকা বলিয়া বর্ণন করেন, তাঁহারা যে কোন্ প্রামাণিক গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া সেরূপ কথা বলেন, তাহা আমরা জানি না। এ বিষয়ে প্রবাদগুলিকে বিশেষ সতর্কতার সহিত বিচারাধীন করা উচিত। যদি ঐসকল প্রবাদ শুদ্ধবৈষ্ণবগণের মধ্যে প্রচলিত থাকিত, তাহা হইলে কোন না কোন মহাজনের গ্রন্থে অবশ্য উল্লিখিত হইত। হয় ত' কোন সময়ে কোন দুষ্টমতাবলম্বী ব্যক্তিগণ বৈষ্ণব-সমাজ-গোষ্ঠীর অমঙ্গল-চেষ্টায় ঐ সকল প্রবাদ সৃষ্টি করে। * * * যখন কোন মহাত্মাই ঐ সকল প্রবাদের উল্লেখ করেন না, তখন আমরা সহজেই ঐ সকল প্রবাদকে অনাদর করিতে পারি।

মহাপ্রভুর সন্ন্যাসের পর নারায়ণীর বিবাহ হয়। * * * মাম্‌গাছিতে শ্রীনারায়ণীর সেবা-পাট এখনও প্রত্যক্ষ। শিশুকালে বৃন্দাবনদাস ঠাকুর তদীয় পবিত্র জননীর সঙ্গে মামগাছির ঠাকুরবাড়ীতে বাস করিতেন। সংস্কৃত বিদ্যা তাঁহার সেই গ্রামেই অধীত হয়। * * * মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করার তিন চারি বৎসর পরে ঠাকুরের জন্ম হয় এবং প্রভুর অপ্রকটকালে তাঁহার বয়স বিংশতি বৎসরের অধিক হয় নাই। এই সময় মহাপ্রভুর আদেশে শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু গৌড়দেশে প্রেম-প্রচারে নিযুক্ত ছিলেন। * * * শেষকালে কবিবর বৃন্দাবনদাস মহোদয় শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর সঙ্গ লইয়া পরমানন্দ লাভ করেন।"

শ্রীবাসের গৃহিণী মালিনীদেবীর মামগাছি গ্রামে পিত্রালয় ছিল। শ্রীনারায়ণীদেবীর সেই গ্রামেই বিবাহ হয়। মালিনী শেষ বয়সে স্বীয় পিত্রালয়ে আসিয়া বাস করেন। ঐ বংশেরই কাহারও সহিত নারায়ণীদেবীর বিবাহ হইয়াছিল। ঠাকুরের শিশুকালেই ও শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের সেবা-নিরত হইবার পূর্ব্বেই ঠাকুর শ্রীল বৃন্দাবনের পিতা দেহত্যাগ করায় তাঁহার সম্বন্ধে কোন বিশেষ উল্লেখ প্রামাণিক গ্রন্থসমূহে নাই। ইহাই শুদ্ধ বৈষ্ণবগণের মধ্যে চিরন্তন-রীতি যে, অচ্যুত গোত্র বলিয়া তাঁহারা গুরুর পরিচয়েই আত্ম পরিচয় প্রদান করিয়া থাকেন অথবা মাতা-পিতা ভগবদ্ভক্তি আশ্রয় করিলেই তাঁহাদের পরিচয় প্রদান করেন। শ্রীনারায়ণী দেবী শ্রীচৈতন্য-দেবের একান্ত কৃপাপাত্রী ছিলেন বলিয়াই তাঁহার পরিচয়েই ঠাকুর বৃন্দাবনের পরিচয় সকল প্রামাণিক মহাজন প্রদান করিয়াছেন। ঠাকুরের পিতা হরিসেবায় নিরপেক্ষ ছিলেন বলিয়া স্বয়ং ঠাকুর বৃন্দাবন ও বৈষ্ণব-মহাজনগণ সকলেই তাঁহার নামোল্লেখে নীরব আছেন। তাই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু যখনই ঠাকুর বৃন্দাবনের প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়াছেন, তখনই তৎসঙ্গে নারায়ণীর জয়গান করিয়াছেন,—

নারায়ণী চৈতন্যের উচ্ছিষ্ট ভাজন।
তাঁ'র গর্ভে জন্মিলা শ্রীদাস বৃন্দাবন।।
(চৈঃ চঃ আঃ ৮।৪১)

বিশেষতঃ যখন ঠাকুর বৃন্দাবনের কোন দারপরিগ্রহের কথা শুনিতে পাওয়া যায় না এবং তিনি বিরক্ত বৈষ্ণবগণেরই মধ্যে গণিত হয়, তখন অবৈষ্ণব পিতার নামোল্লেখে তাঁহার পরিচয় প্রদান না করিয়া শ্রীচৈতন্যদেবের একান্ত ভক্ত শ্রীনারায়ণী ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর পরিচয়েই ঠাকুরের যথার্থ পরিচয় হইয়াছে।

অনেকে বলেন,—ঠাকুর বৃন্দাবন ব্রাহ্মণকুলে অবতীর্ণ হইয়াও বরাহপুরাণ হইতে ''রাক্ষসাঃ কলিমাশ্রিত্য'' প্রভৃতি শ্লোক তাঁহার শ্রীচৈতন্যভাগবতে উদ্ধার করায় এবং ঠাকুর হরিদাসপ্রমুখ মহাপ্রভুর ভক্তগণকে বিশেষ সম্মান ও বৈষ্ণবের 'জাতিকুলের নিরর্থকতা' তাঁহার গ্রন্থ-মধ্যে প্রতি পাদন করায় তিনি একশ্রেণীর ''পাষণ্ডী হিন্দু''র অপ্রীতি ভাজন হইয়াছিলেন। তাঁহারাই শ্রীচৈতন্য-পার্ষদ ব্যাসাবতার নারায়ণী-নন্দনকে হেয় করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু লিখিয়াছেন,—

বৃন্দাবনদাস-পদে কোটি নমস্কার।
ঐছে গ্রন্থ করি তিঁহো তারিল সংসার।।
বৃন্দাবনদাস নারায়ণীর নন্দন।
চৈতন্যমঙ্গল যিঁহো করিল রচন।।

সাতাসন মঠ

পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে অনেক প্রাচীন মঠের নাম ও অস্তিত্ব শুনিতে ও দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীবিষ্ণুস্বামী, শ্রীরামানুজ, শ্রীমাধ্ব ও শ্রীনিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের প্রাচীনমঠ অদ্যাপি শ্রীক্ষেত্রে বর্ত্তমান রহিয়াছে। এতদ্ব্যতীত অবৈষ্ণব ও বিদ্ধ-সম্প্রদায়ের অনেক প্রাচীন ও অর্ব্বাচীন মঠও এখানে রহিয়াছে। আচার্য্য শঙ্করের প্রতিষ্ঠিত গোবর্দ্ধন বা ভোগবর্দ্ধন-মঠ, অতিবাড়ী সম্প্রদায়ের সাতলহরী মঠ, উড়িয়ামঠ প্রভৃতিও প্রসিদ্ধ। শ্রীরামানুজ-সম্প্রদায়ের এমারমঠ, উত্তরপার্শ্বমঠ প্রভৃতি বিশেষ বিখ্যাত। শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়েরও প্রাচীন ও আধুনিক ভিন্ন ভিন্ন মঠ আছে। শ্রীসিদ্ধবকুলমঠ, শ্রীরাধাকান্তমঠ, শ্রীগঙ্গামাতামঠ প্রভৃতি শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের মঠ। পুরীতে শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভুর প্রতিষ্ঠিত লুপ্ত মঠের নামও শুনিতে পাওয়া যায়।

সাতাসনমঠ গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের প্রাচীন মঠের অন্যতম। সমুদ্রের উপকূলে শ্রীল ঠাকুর হরিদাসের সমাধির সন্নিকটে ও নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ভজন-কুটীর সংলগ্ন প্রদেশে প্রাচীন সাতাসনমঠ অবস্থিত। শ্রীল স্বরূপ দামোদর গোস্বামী প্রভু ও শ্রীস্বরূপ-রূপানুগবর শ্রীল রঘুনাথ

দাস গোস্বামী প্রভু, পণ্ডিত শ্রীল জগদানন্দ গোস্বামী প্রভু প্রমুখ গৌরপার্ষদগণ এই সাতাসনমঠে অবস্থান করিয়া ভজন করিয়াছিলেন বলিয়া শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ইহার সংলগ্ন প্রদেশে নিজ 'ভজন-কুটী' নির্ম্মাণ করেন। যখন ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর নিজ-পার্ষদগণ-সঙ্গে শ্রীল ঠাকুর হরিদাসের সমাধি প্রদান করিবার জন্য সমুদ্রোপকূলে গমন করেন, তখন তাঁহারা সাতাসনমঠে ও তৎসংলগ্ন প্রদেশে বিশ্রাম ও কীর্ত্তনাদি করিয়াছিলেন। গৌরজন ঠাকুর ভক্তিবিনোদ সপার্ষদ মহাপ্রভুর পদাঙ্করঞ্জিত সেই স্থানেই তাঁহার ভজনস্থান নির্ব্বাচন করিয়াছিলেন। তথায়ই ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর পরবর্ত্তিকালে (বঙ্গাব্দ ১৩২৯, ২৬শে জ্যৈষ্ঠ; ইংরাজী ১৯২২, ৯ই জুন) শ্রীপুরুষোত্তমমঠ স্থাপন করেন।

কিংবদন্তী এই যে, অতিপুরাকালে সপ্তর্ষি শ্রীক্ষেত্রের সমুদ্রতীরে একান্তে ভজন করিবার জন্য পরস্পর সংলগ্নস্থানে সাতটি আসন রচনা করেন। তাহা হইতেই ''সাতাসন মঠে''র নামকরণ হইয়াছে। একদিন মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন সমুদ্রস্নান করিতে অসিয়া দেখেন যে, সাতজন ঋষি সমুদ্রতীরে নির্জ্জন প্রদেশে অবস্থান করিয়া হরিনাম কীর্ত্তন করিতছেন। রাজা ঋষিগণের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে সপ্তর্ষি রাজার বাক্যে মনোযোগ না দিয়া হরিকীর্ত্তন করিতে থাকিলেন।

এদিকে ইন্দ্রদ্যুম্ন সেই রাত্রিতে স্বপ্নে দেখিতে পাইলেন, যেন শ্রীজগন্নাথ রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিতেছেন, তুমি এই সপ্তর্ষিকে ভজনের উপযোগী জমি ও প্রত্যহ মহাপ্রসাদ পাঠাইয়া দিবে। তদনুসারে ইন্দ্রদ্যুম্ন 'জিরাকন্দি' নামক একটি মৌজা এবং সপ্তর্ষির জন্য প্রত্যহ সাত আটকিয়া ও সাত কড়োয়া মহাপ্রসাদান্ন ও ব্যঞ্জনাদি প্রসাদ প্রেরণের ব্যবস্থা করিলেন। সপ্তর্ষি রাজার প্রেরিত সনন্দ ফেরৎ দিয়া বলিলেন, আমদের জমির কোন দরকার নাই, রাজার ইচ্ছা হইলে মহাপ্রসাদ পাঠাইতে পারেন। সপ্তর্ষি নিষ্কিঞ্চন ভজনানন্দী বৈষ্ণব ছিলেন। তাঁহাদের শ্রীবিগ্রহসেবা বা গোষ্ঠিগত ভজনের কোন প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু পরবর্ত্তিকালে যখন সপ্তর্ষিগণের ভজনস্থানে শ্রীবিগ্রহসেবা ও মঠ প্রতিষ্ঠিত হইল, তখন রাজার প্রদত্ত জমিদারী সেবার জন্য গৃহীত হইয়াছিল।

সাতাসনমঠ যখন গৌড়ীয়বৈষ্ণবগণের ভজনস্থানরূপে গৃহীত হইল, তখন বা তাহার পূর্ব্ব হইতেই উহা নিম্নলিখিত সাতটি নামে অভিহিত হইয়াছিল।

১। **'বড় আসন'**—এখানে শ্রীরাধাদামোদর শ্রীবিগ্রহ অবস্থিত ছিলেন, বর্ত্তমানে গিরিধারী-আসনে স্থানান্তরিত হইয়াছেন। কথিত হয়, এখানে শ্রীল স্বরূপদামোদর গোস্বামিপ্রভু ভজন করিতেন।

২। **'কদলী-পট্‌কা-আসন'**—এই স্থানে বর্ত্তমানে কোন শ্রীবিগ্রহ নাই। এইস্থানে প্রসিদ্ধ সিদ্ধমহাত্মা শ্রীল স্বরূপদাস বাবাজী মহারাজ ভজন করিতেন। তাঁহার সম্বন্ধে শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর তাঁহার স্বলিখিত জীবনীতে এইরূপ লিখিয়াছেন,—''মহাত্মা স্বরূপদাস বাবাজী একজন অপূর্ব্ব বৈষ্ণব। সমস্ত দিবসই কুটীরের ভিতর ভজন করিতেন। সন্ধ্যাকালে প্রাঙ্গণে আসিয়া তুলসী প্রণাম দণ্ডবৎ করিয়া নামগান করিতে করিতে নাচিতেন ও কাঁদিতেন। ঐ সময় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে বৈষ্ণবগণ যাইতেন। কেহ কেহ তাঁহাকে

সেই সময় একমুষ্ঠি মহাপ্রসাদ দিতেন। তাঁহার ক্ষুন্নিবৃত্তি পর্য্যন্ত তিনি তাহা স্বীকার করিতেন, অধিক লইতেন না। কেহ কেহ সেই সময় শ্রীচৈতন্যভাগবত ইত্যাদি গ্রন্থ পাঠ করিয়া তাঁহাকে শুনাইতেন। বাবাজী মহাশয় আবার ১০টা রাত্রিতে নিজের কুটীরে যাইয়া ভজন করিতেন, অন্ধকার থাকিতে থাকিতে সমুদ্রতীরে গিয়া হাত মুখ ধোয়া ও স্নান করা সমাপ্ত করিতেন। কোন বৈষ্ণব পাছে তাঁহার কোন কার্য্য করেন, সেই আশঙ্কায় একক সব কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। তাঁহার দুই চক্ষু অন্ধ, কেমন করিয়া রাত্রি থাকিতে সমুদ্রে দৈহিক স্নানাদি করিতেন, তাহা মহাপ্রভুই জানেন। তিনি একজন সিদ্ধপুরুষ ছিলেন, ইহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহার বিষয়-চিন্তা মাত্রই ছিল না। আমি সন্ধ্যার পর কোন কোন দিন তাঁহার চরণ দর্শন করিতে যাইতাম। বড় মিষ্ট বাক্যে তিনি আগন্তুক লোকের সহিত কথোপকথন করিতেন।"—(স্বলিখিত জীবনী ১৪১-১৪২)

শ্রীল স্বরূপদাস বাবাজী মহাশয়ের সম্বন্ধে আমরা আরও শুনিয়াছি যে, অনেক সময় স্থানীয় উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারিবৃন্দ তাঁহার জন্য মহাপ্রসাদ লইয়া আসিলে তিনি বলিতেন,—

'তোমরা আমাকে ইংরাজী মাসের ১লা, ২রা, ৩রা পর্য্যন্ত মহাপ্রসাদ দিবে, ইহার পরে আর দিবে না।' কারণ বাবাজী মহাশয় জানিতেন যে, তাঁহারা মাসের প্রথম মুখে যে অর্থ প্রাপ্ত হন, তাহা তাঁহাদের সদুপায়ে উপার্জ্জিত মাসিক বেতন, কিন্তু পরে যাহা পান, তাহা উৎকোচ বা অসদুপায়ে লব্ধ অশুক্ল-বিত্ত।

এখন 'কদলীপট্‌কা' আসনের ভূমিতে মহাত্মা শ্রীস্বরূপদাস বাবাজী মহাশয়ের সমাধি বর্ত্তমান রহিয়াছে। তিনি যে স্থানে ভজন করিতেন, এখনও সেই স্থানের অস্তিত্ব থাকিলেও দুঃখের বিষয়, সেই স্থানের যথাবিহিত মর্য্যাদা রক্ষিত হয় না—মঠের বর্ত্তমান সেবাইতগণ সেই স্থান অন্যান্য কার্য্যে ব্যবহার করিতেছেন।

৩। **'গিরিধারী আসন'**—এই স্থানে গিরিধারী শ্রীবিগ্রহ বিরাজিত, ইহাই শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত গোস্বামী প্রভুর আসন বা ভজন-স্থান। 'ভক্তিকুটী'র সংলগ্ন পূর্ব্বদিকে এই আসন অবস্থিত।

৪। **'গোঁফা আসন' বা 'গুম্ফা আসন'**—এখানে বৈষ্ণবগণ ভজন করিতেন। ভজনগুহার নাম হইতেই আসনের নামকরণ হইয়াছে।

৫। **'মদনমোহনদেব আসন'**—এই স্থানে শ্রীমদনমোহনদেব বিরাজিত। কেহ কেহ বলেন, এই স্থানেই শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভু ভজন করেন। আবার কেহ কেহ 'গিরিধারী আসন"কেই শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভুর ভজনাসন বলিয়া থাকেন।

৬। **'কৃষ্ণবলরাম আসন'**—এখানে শ্রীকৃষ্ণবলরাম শ্রীবিগ্রহ অবস্থিত। ইহা খঞ্জভগবান্ আচার্য্যের ভজন স্থান।

৭। **'শ্যামসুন্দরদেব আসন'**—এখানে শ্রীশ্যামসুন্দর শ্রীবিগ্রহ অবস্থিত।

গিরিধারী আসনের বর্ত্তমান সেবাইত শ্রীমনোহর দাস সাতাসন মঠের প্রাচীন দলিলপত্র হইতে সংগ্রহ করিয়া আমাদিগকে সাতাসনের সেবাইতগণের যে পরম্পরাটি প্রদান করিয়াছেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল—

প্রথম আসন (বড় আসন)-প্রণালী

১। গৌরচরণ দাস

২। ব্রজকুমার দাস

৩। কুঞ্জমোহন দাস

৪। রাধাচরণ দাস

৫। দামোদর দাস

৬। রাধামোহন দাস

দ্বিতীয় আসন (কদলী পট্‌কা আসন)

১। যুগোলকিশোর দাস

২। সুবলচরণ দাস

৩। ভাগবত দাস

৪। শ্যামদাস

তৃতীয় আসন (গিরিধারী আসন)

১। ব্রজকিশোর দাস

২। ভগৎচরণ দাস

৩। সনাতন দাস

৪। গোবিন্দ দাস

৫। নিমাইচরণ দাস

৬। গৌরাঙ্গ দাস

চতুর্থ আসন (গুম্ফা আসন)

১। রামকৃষ্ণ দাস

২। সীতারাম দাস

৩। হরিবন্ধু দাস

পঞ্চম আসন (শ্যামসুন্দরদেব আসন)

১। মদনমোহন দাস

২। রামচন্দ্র দাস

৩। রাঘবেন্দ্র দাস

৪। নিত্যানন্দ দাস

৫। রাধাচরণ দাস

৬। মোহন দাস

৭। কুঞ্জবিহারী দাস

৮। গোবিন্দ দাস

ষষ্ঠ আসন (শ্যামানন্দী কৃষ্ণবলরাম আসন)

১। বলরাম দাস

২। গৌরাঙ্গ দাস

৩। রঘুনাথ দাস

৪। রামানন্দ দাস

৫। শ্যামচরণ

৬। গদাধর দাস

৭। কৃষ্ণদাস

সপ্তম আসন (আসনের নামোল্লেখ নাই)

১। পদ্মচরণ দাস

২। সদানন্দ দাস

৩। মাধব দাস

৪। মোহন দাস

৫। নরোত্তম দাস

বর্ত্তমানে বড় আসনের সেবাইত কৃষ্ণচরণ দাসের শিষ্য জনার্দ্দন দাস। কদলী পট্‌কা ও গিরিধারী আসনের সেবাইত মনোহর দাস।

দুঃখের বিষয়, যে স্থানে শ্রীল স্বরূপ, শ্রীল রঘুনাথ, শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত এবং পরবর্ত্তিকাল পর্য্যন্ত মহাত্মা শ্রীস্বরূপ দাসের ন্যায় ভজনানন্দী বৈষ্ণবগণ বাস করিতেন, সেই স্থানে নানাপ্রকার অবৈধ আচারও দৃষ্ট হইতেছে।

প্রকাশ সাতাসনের শ্রীবিগ্রহের সেবার জন্য জিরাকন্দি, কন্টিকেরা, বন্ধকেরা প্রভৃতি যে সকল মৌজা ছিল, তাহা সেবাইতগণের পরস্পর বাদ বিসম্বাদ ও ঋণে নীলাম হইয়া গিয়াছে। এখন কাঠোয়ারী মৌজায় ৬৮ একর জমি আছে। শুনা যায়, তাহা লইয়াও নাকি সাতাসনের অন্যতম আসনের বর্ত্তমান সেবাইত উদ্ধব

দাসের সহিত গিরিধারী আসনের মনোহরদাসের মামলা মোকদ্দমা চলিয়াছে। শুনা যায়, পুরীর রাজার কার্য্যালয় হইতে সাতাসনের জন্য প্রত্যহ যে মহাপ্রসাদ ও প্রাত্যহিক ভোগের ব্যবস্থা ছিল, তাহাও নাকি এখন একরূপ স্থগিত হইয়াছে। স্থানীয় কোন সংবাদদাতার বিবরণ অনুসারে প্রকাশ যে, কেবলমাত্র 'মদনমোহনদেব আসন' প্রত্যহ চারি আনা করিয়া রাজসরকার হইতে প্রাপ্ত হন।

সাতাসনের সেবা-পূজার অত্যন্ত বিশৃঙ্খলা ও তথায় নানাপ্রকার অনাচার, অসদাচারের প্রাবল্য দেখিয়া প্রায় ১৯০৯ সালে স্থানীয় সুধীব্যক্তিগণ ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদকে সাতাসনের সেবার ভার অর্পণ করিতে ইচ্ছা করেন এবং তদনুসারে রাধা মোহন দাস, গদাধরদাস, গোবিন্দ দাস, বলরামদাস ও কৃষ্ণচরণ দাস প্রভুপাদকে অর্পণনামা লিখিয়া দেন, কিন্তু কএকজন অবৈধ আচার-সম্পন্ন ব্যক্তির প্ররোচনায় কেহ কেহ নানা প্রকার উদ্বেগজনকব্যাপার আরম্ভ করায় শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অভিপ্রায়ানুসারে সাতাসনের সহিত বৈষয়িক সংস্রব প্রভুপাদ পরিত্যাগ করেন। বর্ত্তমানে সে স্থানে হরিভজনের কোন নাম-গন্ধ নাই। শুনা যায়,সাতাসনের 'গিরিধারী আসনে'র গৌরাঙ্গদাসের চেলা মধুসূদন দাস পতিত হওয়ায় ঘরের পাথর পর্য্যন্ত বিক্রয় করিয়া চলিয়া যায়। গিরিধারীর আসনে অনেকগুলি প্রাচীন গোস্বামী-গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছিল। রঘুনাথ বৈদ্য উড়িষ্যার বিভিন্ন স্থান সম্বন্ধে যে কবিতা রচনা করিয়াছেন, তাহাতে সাতাসন মঠের কিঞ্চিৎ ইতিহাস পাওয়া যায়। এই সাতাসনেই ভারতচন্দ্র রায় কবিগুণাকর পূর্ব্বে বিরক্তের বেষ গ্রহণ পূর্ব্বক বাস করিয়া গৌড়ীয় অলঙ্কার ও রসশাস্ত্রসমূহ আলোচনা করেন। পরবর্ত্তিকালে পুনরায় গার্হস্থ্যাশ্রম স্বীকার পূর্ব্বক প্রথমতঃ মূলাজোড়ের নাগগণের এবং পরে নদীয়ার মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভায় রাজকবিরূপে নিযুক্ত হন।

ধর্ম্ম কি জাতীয় অধঃপতনের হেতু?

আধুনিক জগতের একশ্রেণীর ব্যক্তির প্রবল মত এই যে, ''ধর্ম্মই জাতির অধঃপতনের মূলকারণ; বিশেষতঃ ভাবপ্রবণ বাঙ্গালার কোমল অঙ্গে যে 'বৈষ্ণবধর্ম্ম' গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহা বাঙ্গালী জাতিকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দাসমনোভাব ও মেয়েলীভাবে বিভাবিত করিয়া দিয়াছে।''

আধুনিক যুক্তিবাদিগণের এই যুক্তি ও সিদ্ধান্ত আমরা অনেকেই অকেবারে যেন উপেক্ষা করিতে পারতেছি না। আমরা যাহাকে ধর্ম্ম বলিয়া পরিকল্পনা করিয়াছি, তাহা যে নানাদিক্ দিয়া জাতির অধঃপতনের কারণ, ইহা বাস্তবিকই অস্বীকার করিতে পারা যায় না। রাষ্ট্রীয় জগতের ব্যাপকবিচার ছাড়িয়া দিলেও, আমাদের দৈনন্দিন সামাজিক ইতিহাসের ঘটনায় যে-সকল প্রত্যক্ষ প্রমাণ লক্ষ্য করি, তাহাতেও যুক্তিবাদিগণের ঐ বিচার উড়াইয়া দেওয়া যায় না। সত্য সত্যই ধর্ম্মোন্মত্ততা যখন মানুষকে পাইয়া বসে, তখন তাহাতে কত

কিছুই না প্রহসন অভিনীত হইয়া থাকে। ধর্ম্মের পাগলামীর আবরণে সমাজে কতই না দুর্নীতির তাণ্ডব চলিতেছে। ধর্ম্মের যাদু একবার যাহার ঘাড়ে চাপিয়াছে, সে সামাজিক অপরিহার্য্য কর্ত্তব্যগুলিকেও বিপর্য্যস্ত করিয়া তাহার খেয়ালকেই একাধিপতি করিয়াছে।

অনেক সময় প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্তের মধ্যে দেখিতে পাওয়া গিয়াছে, হয়ত' কোন পিতার একমাত্র উচ্চশিক্ষিত সন্তান কোন নবাগতা অজ্ঞাত-কুলশীলা 'সাধুমা'র পাল্লায় পড়িয়া তাহার সাধারণ বিচার-বুদ্ধিগুলিকেও হারাইয়া ফেলিয়াছে; এমন কি, গ্রাসাচ্ছাদনের একমাত্র সম্বল, বিশেষ লোভনীয় ও লাভবান্ উপজীবিকাকে বিনা বিচারে পরিত্যাগ করিয়া দিয়াছে—একজন অশিক্ষিতা, বিজাতীয়া, ভণ্ডের বাক্‌চাতুর্য্য ও ভাব-চাতুর্য্যের নিকট দাসখত লিখিয়া দিতেছে। আবার হয়ত' কোন কুলবধূ কোন অজ্ঞাতকুলশীল বা জ্ঞাতকুলশীল সাধুবেষি ব্যক্তির ভোজবিদ্যায় উন্মাদিনী হইয়া পরিসেবা—গৃহসেবায় উদাসীন হইয়া পড়িয়াছে। কিছুদিন পরে হয়ত 'সাধুমা'টি পুত্রৈকসর্ব্বস্ব মাতা পিতার সাগরসেঁচা মাণিককে লইয়া উধাও হইয়া পড়িয়াছেন! কুলবধূ ধর্ম্মোন্মত্ততায় কূলে কালি দিয়া ভণ্ডের অনুসরণ করিয়াছে। 'সাধুমা' এর সাধুত্বের পরিচয়ের মধ্যে তিনি হয়ত' দু'টা মনের কথা বলিয়া দিতে পারেন, অথবা না বলিতে পারিলেও ধর্ম্মোন্মত্ততার যাদু আমাদিগকে ঐরূপ একটি অন্ধবিশ্বাস করাইয়া দেয় কিম্বা ঐ 'সাধুমা' দুই চারিটী এমন ক্রিয়া-মুদ্রা দেখাইতে পারেন, এমন ভাবে লোকের মন রাখিয়া বাক্যবিন্যাস করিতে জানেন যে, সহজেই মানুষ তাঁহার ফাঁদে পড়িয়া যায়। আর ঐ সাধুর সাধুত্বের পরিচয়ের মধ্যে হয়ত' দেখিতে পাওয়া যায় যে, তিনি এক মুহূর্ত্তে সমস্ত গৃহকে গোলাপ বা চন্দনের গন্ধে আমোদিত করিয়া দিবার ভোজবিদ্যা জানেন, না হয় কোকিল নিন্দিত কণ্ঠে সুর, লয়, তানের ইন্দ্রজাল বুনিয়া, নানা ভাবকেলির প্রদর্শনী খুলিয়া গোকুল-নাগরের দ্বিতীয় জাল-সংস্করণ রূপে কুলকামিনী বা ইন্দ্রিয়-বিলাসিগণের মন হরণ করিতে পারেন অথবা কামিনীকাঞ্চননিস্পৃহ কোন যোগ-বিভূতি, না হয় ধ্যান-ধারণার কৃত্রিম গাম্ভীর্য্য, সবিকল্প (?) ও নির্ব্বিকল্প (?) সিদ্ধির অভিনয় দেখাইতে জানেন!

এই সকল দেখিয়া শুনিয়া একশ্রেণীর ব্যক্তি ধর্ম্মমাত্রেরই নামগন্ধের প্রতি খড়্গ-হস্ত হইয়া উঠিয়াছেন। তাঁহারা যখনই কোন সামাজিক বা জাতীয় অবনতি বা অসুবিধা লক্ষ্য করিতেছেন, তখনই 'যত দোষ নন্দঘোষ' ন্যায়ানুসারে 'ঘর পোড়া গরুর সিঁদুরে মেঘদর্শনে আতঙ্কের ন্যায় সমস্ত দোষের বোঝা আত্মধর্ম্মের ঘাড়ে চাপাইয়া দিতেছেন। ধর্ম্মের নাম লইয়া যখন লোকে ভণ্ডামি করিতেছে, তখন ধর্ম্মমাত্রই খারাপ, —এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়া পড়িতেছে! ধর্ম্মোন্মত্তের (Fanatic) আনুকরণিক আচার ব্যবহার দেখিয়া তাঁহারা বাস্তব সত্য-ধর্ম্মের প্রতিও বিদ্রোহী হইয়া পড়িয়াছেন। 'সাধুমা'র পাল্লায় পড়িয়া, ভণ্ড সাধুর ভোজবিদ্যায় মুগ্ধ হইয়া ইন্দ্রিয়-লোলুপ ব্যক্তি যেরূপ মাতা, পিতা, ভার্য্যা, দেশ ও জাতির প্রতি উদাসীন হইয়াছিলেন, শ্রীচৈতন্যদেব কিংবা তাঁহার অনুগত ভক্ত-সম্প্রদায়ও সেই ধারার বিচার-যোগ্য আসামী, আমরা এইরূপ ও সিদ্ধান্ত করিয়া ফেলিতেছি।

শুন যায়, বাঙ্গালারই কোন প্রতিথনামা ঐতিহাসিক তাঁহার ইতিহাসের পৃষ্ঠায় লিখিয়া গিয়াছেন,— "Chaitanya was the cause of downfall of Orissa". সূর্য্যবংশের কপিলেন্দ্র ও তাঁহার পুত্র পুরুষোত্তম উড়িষ্যার বিশেষ পরাক্রমশালী রাজা ছিলেন, তাঁহারা তাঁহাদের রাজ্যের সীমা গঙ্গার দক্ষিণতীর হইতে আরম্ভ করিয়া কৃষ্ণার উত্তর তট পর্য্যন্ত বিস্তার করিয়াছিলেন। পুরুষোত্তম দক্ষিণে কাঞ্চি পর্য্যন্ত তাঁহার রাজ্য-সীমা আয়ত করিয়া বিজয়-নগরের রাজধানী পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন। ঐতিহাসিকগণ কেহ কেহ বলেন যে, পুরুষোত্তমদেব বিজয়নগর রাজ্য হইতেই 'সাক্ষীগোপাল' ও জগন্নাথের 'রত্নবেদী সিংহাসন' লইয়া আসিয়াছিলেন। পুরীতে এখন যে জগন্নাথ মন্দিরের ভোগমণ্ডপ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা পুরুষোত্তম দেবেরই নির্ম্মিত। তিনি জনক রাজার মত এদিক্ ওদিক্ দুদিক্ রাখিয়া দুধের বাটী ভোগ করিয়াছিলেন। কিন্তু পুরুষোত্তমের পুত্র রাজা প্রতাপরুদ্র পরিবার-পরিজন, আমত্য-ভৃত্য, রাজ্য-ঐশ্বর্য্য,—যথাসর্ব্বস্বের সহিত শ্রীচৈতন্যদেবের পাল্লায় পড়িয়া ধর্ম্মোন্মত্ত হইয়া পড়ায় বিজয়নগরের বিখ্যাত সম্প্রাট্ কৃষ্ণদেবার্য্য প্রতাপরুদ্রের রাজধানী পুনঃ পুনঃ আক্রমণ করেন ও গোদাবরীর দক্ষিণস্থ যে সকল প্রদেশ প্রতাপরুদ্রের অধিকারে ছিল, তাহা বিজয়নগর রাজ্যের অন্তর্গত করিয়া লন, অবশেষে প্রতাপরুদ্র বিজয়নগর-রাজের হস্তে তাঁহার দুহিতাকে প্রদান করিয়া সন্ধি করিতে বাধ্য হন।

জড়বাদিগণের বিচারে এইরূপ ধর্ম্মোন্মত্ততা (?) কেবল ব্যক্তিগত অধঃপতন নয়, জাতীয় অধঃপতন বা অধীনতার হেতু। এজন্যই বোধ হয় সোভিয়েট রুসিয়া ধর্ম্মের নামগন্ধের প্রতি ঘড়্গহস্ত হইয়া উঠিয়াছে! ধর্ম্মমন্দিরগুলিকে ধূলিসাৎ করিয়া সেখানে অক্ষক্রীড়ার উন্মুক্ত ময়দান প্রস্তুত করিতেছে, অথবা উহাদিগকে ক্লাব হাউস্, রেষ্টুরেন্ট প্রভৃতিতে পরিণত করিতেছে। পুরাতন জাতি যে সকল ভুল করিয়া ফেলিয়াছে, তাহা সংশোধন করিবার জন্য তাহারা নবীন জাতির ভিত্তিকে ধর্ম্মের নামগন্ধহীন করিয়া সুদৃঢ় করিবার চেষ্টা করিতেছে! বালক ও তরুণ-সমাজের নিকট যাহাতে কোন প্রকারে ধর্ম্মের সংস্পর্শ উপস্থিত না হয়, এজন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি হইতে ধর্ম্মালোচনা চিরনির্ব্বাসিত করিবার বন্দোবস্ত হইয়াছে। জার্ম্মেণীর 'নাজি'-আন্দোলনের একাধিপতি প্রেসিডেন্ট চ্যান্সলার হিট্‌লার, ইটালীর মুসোলেনি প্রভৃতির আদর্শেও আজ ন্যূনাধিক একই জাতীয় ভাব ও পারিপার্শ্বিকতার বিস্তার হইতেছে; সকলেই জাতীয় অধঃপতনের জন্য ধর্ম্মকেই ন্যূনাধিক দোষী সাব্যস্ত করিয়াছেন। খৃষ্টের দশ আজ্ঞা (Ten commandments) অথবা ক্রুশবদ্ধ হইয়াও ভগবানের নিকট প্রার্থনা—"Father forgive them, for they know not what they do." (Gospel, St' Luke 23/34.) প্রভৃতি শিক্ষাগুলি রাজনীতিক ও সামাজিক উন্নতির পরিপন্থী।

তাই আমরা 'অধঃপতন' ও 'ধর্ম্ম' বলিতে কি বুঝি আর তাহাদের প্রকৃত স্বরূপই বা কি, তাহার একটা খোলাখুলি আলোচনা সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। জাগতিক প্রত্যেক বিভাগেই কিন্তু অনধিকারচর্চ্চারও একটা সীমা আছে। কিন্তু ধর্ম্মসম্বন্ধে অনধিকারচর্চ্চায় যেন সকলেই অধিকারী! ধর্ম্মকে আমরা অনেকেই ব্যাপক অর্থে

গ্রহণ করি। হয়ত' আমাদেরই ঘরে দ্বারে খঞ্জনী বাজাইয়া কোন তিলক-ফোটা-ধারী 'কৃষ্ণ' (?) 'বিষ্ণু' (?) শব্দের সুবিন্যাসযুক্ত গীত মধুকণ্ঠে গান করিতে করিতে উপস্থিত হইলেন; কিংবা হয়ত' কোন বক্তা তাঁহার বক্তৃতামাধুর্য্যে জনস্রোতকে আকৃষ্ট করিয়া তাহাদিগকে চিত্রার্পিতের ন্যায় অবস্থান করাইলেন, অমনি আমরা তাঁহাদিগকে ধার্ম্মিক ও তাঁহাদের কার্য্যকে 'ধর্ম্ম' বলিয়া 'রায়' দিলাম। আবার কিছুক্ষণ পরে যখন তাঁহাদের চরিত্রের নেপথ্যে অন্য কোনরূপ প্রত্যক্ষ দুর্নীতি, এমন কি, পশুনীতির অভিনয় দেখিলাম, তখনই আমরা ধর্ম্মের উপর খড়্গহস্ত হইয়া বলিলাম—'বৈষ্ণবধর্ম্মই যাবতীয় ব্যভিচারের আশ্রয়-দাতা'! কিন্তু এখানে আমরা লক্ষ্য ও বিচার করিতে ভুলিয়া গিয়াছি যে, যাহাকে মুহূর্ত্তপূর্ব্বে 'ধর্ম্ম' মনে করিয়াছিলাম, তাহা ধর্ম্ম নয়, আমার ইন্দ্রিয়তর্পণের সহিত খাপ খাইয়াছিল বলিয়া—আমার ইন্দ্রিয়ের খিদ্‌মদ্‌গারী করিয়াছিল বলিয়াই তাহাকে ধর্ম্ম বলিয়াছি—আমার ইন্দ্রিয়তর্পণকে ধরিয়া রাখিয়াছিল বলিয়াই উহা ধর্ম্ম! আমরা এইরূপে সুর-তান-লয়-মান বা মনের খেয়াল প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তিগুলিকে যখন ধর্ম্মের আসনে অভিষিক্ত করি, তখন চেতনের স্বাভাবিক বৃত্তির বিকাশকে ধর্ম্মরূপে দেখিতে পাই না। যখন যখনই আমরা নিত্য বাস্তবধর্ম্মের বিদ্রোহী হই, তখনই এইরূপ অধর্ম্মের প্রেতপুরুষকে ধর্ম্মের মুখসে দেখিয়া আমাদের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি ও বিবর্ত্তকে ধর্ম্মের কোঠায় স্থাপন থাকি।

আমাদের অধঃপতনের স্বরূপের বিচারও আমরা জড়ের উন্নতি ও অবনতির নিক্তিতেই ওজন করিয়া থাকি। জড়ের প্রভূতা, জড়ের ভোগ, জড়ের বিলাসকে আদর্শ করিয়া আমাদের উন্নতি ও অবনতির মাত্রায় পরিমাণ করা হয়। সর্ব্বগ্রাসী জড়বাদ সমগ্র মানবজাতির, তথাকথিত সভ্যসমাজের, রাষ্ট্রের, জাতীয়তার শরীরে কতটা বিষাক্ত বীজাণু প্রবেশ করাইয়া দিয়াছে, তাহা নানা প্রত্যক্ষ উদাহরণেও যদি এখনও আমাদের উপলব্ধির বিষয় না হয়, তবে বলা যাইতে পারে যে, এই মানব-জাতির ধ্বংস অনিবার্য্য। সমাজ-শরীরের ভাবী পরিণাম প্রত্যক্ষ করিবার জন্য ইতিহাস আমাদের হাতে যে রঞ্জন-রশ্মি দিয়াছে, তাহাতে এতদিন আমাদের সুপ্তচেতনার বোধনা হওয়া উচিত ছিল।

আমরা আজ স্বাদেশিকতার মন্ত্রে দীক্ষিত বলিয়া গৌরব অনুভব করিতেছি, কিন্তু আমাদের স্বাদেশিকতার আদর্শ বৈদেশিকতার অনুকরণে পরিকল্পিত। প্রকৃত প্রস্তাবে বৈদেশিক জাতি আমাদিগকে কাপড়-চোপড়ে বিদেশী করেন নাই—বিদেশী করিয়াছেন আমাদের অন্তরতম অন্তরকে। কাপড়-চোপড়ে স্বদেশী-বিদেশী সভ্য-ভব্য বা ধার্ম্মিক হওয়া অতি সহজ। ইতিহাস-পাঠকগণ জানেন, যখন প্রাচীন রোমান্‌গণ তাঁহাদের বিজিত বৃটন্ পরিত্যাগ করিয়া সমস্ত তল্‌পী তল্‌পা লইয়া স্বদেশে চলিয়া গিয়াছিলেন, তখনও কিন্তু বৃটনেরা রোমান্‌দিগের প্রভাব ভুলিতে পারেন নাই।

আমরা কাপড়-চোপড়ে ভদ্রলোক হইবার কৃত্রিমতার ন্যায় যদি কেবল কাপড়-চোপড়ে স্বদেশী সাজিয়া অন্তরকে জড়বাদের বৈদেশিকতায় দীক্ষিত করি, তাহা হইলে আমরা কেবল সনাতন আত্মধর্ম্মের প্রতি বিদ্রোহী হইবার জন্যই কৃত্রিম স্বদেশী হইলাম।

জড়বাদ ভারতের নিজস্ব নহে—ভারতের কেন, বিশ্বের কোন চেতন জীবেরই নিজস্ব নহে, তাহা আমাদের নিজস্ব চেতনের উপর বৈদেশিক আক্রমণ মাত্র। এই বৈদেশিক আক্রমণই আমাদের চেতনের অধঃপতনের কারণ। চেতনের অধঃপতন হইলে অর্থাৎ প্রাণ বিনষ্ট হইলে—মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া গেলে সমস্তই অধঃপতিত হইল, বিনষ্ট হইল। এইরূপ বৈদেশিক আক্রমণে অভিভূত হইয়াই আমরা ঠিক উল্টা বুঝিয়া ফেলিয়াছি; মনে করিতেছি, চেতনের বিকাশ—চেতনের বোধ—আত্মার অনুশীলনদ্বারাই আমাদের ব্যষ্টিগত ও সমষ্টি-গত অধঃপতন হইয়াছে। বস্তুতঃ কি ব্যক্তিগত, কি জাতিগত, কি সমাজগত যাবতীয় অধঃপতন একমাত্র আত্মার অনুশীলনের অভাবেই সংঘটিত হইয়া থাকে, ইহা ঐতিহাসিক জীবন্ত নিত্য সত্য।

আপাত-দৃষ্টিতে অভিভূত হইয়া অনেকে বলেন, আত্মার অনুশীলন করিতে গেলেই যখন আমাদিগকে সমাজ বা জাতির উপর নিস্পৃহ বা উদাসীন হইতে হয়, বৈরাগ্যের তুফানের মধ্যে আমাদের জীবন-তরণীকে সঞ্চালিত করিতে হয়, তখন সেখানে কিরূপেই বা সামাজিক ও জাতীয় উন্নতি সম্ভব? যখন কোন ধর্ম্ম-প্রয়াসীর হৃদয়ে ধর্ম্মের নূতন জোয়ার উপস্থিত হয়, তখন সে নবীন উন্মাদনায় প্রথমেই বিবাহের প্রতি বিদ্রোহী হইয়া পড়ে; আবার যাঁহারা বিবাহ করিয়াছেন, তাঁহারাও বিবাহ করাটা অত্যন্ত গর্হিত কার্য্য মনে করিয়া স্ত্রী-পুত্রের প্রতি বিরক্তি পোষণ ও প্রকাশ করেন। এই সময় নবীন যুবকগণের অভিভাবক ও শুভানুধ্যায়িগণ যুক্তি প্রদান করিয়া বলেন—"বিবাহ না করিলে সৃষ্টি রক্ষা হইবে কিরূপে? সৃষ্টি ভগবানের অভীপ্সিত, সৃষ্টিকার্য্যের সহায়ক না হইয়া তাহার প্রতি বিদ্রোহী হইলে তাহা দ্বারা ধর্ম্মাচরণ কিরূপে হইবে?" এজন্য যাঁহারা ধর্ম্ম করিতে গিয়া স্ত্রী, পুত্র, মাতা, পিতার প্রতি উদাসীন হন, তাঁহাদিগের শুভানুধ্যায়িগণ ধর্ম্ম উপদেশ করিয়া বলিয়া থাকেন, "স্ত্রী-নারায়ণ (?), পুত্র-নারায়ণ (?) ও মাতাপিতা-নারায়ণের (?) সেবাই পরমধর্ম্ম। যাহারা তাহাতে উদাসী, তাহারা জাতির অধঃপতনের কারণ।"

শ্রীচৈতন্যদেব পত্নী, মাতা, দেশ ও জাতির প্রতি উদাসীন হইয়া ধর্ম্মের পাগ্‌লামী করিয়াছিলেন বলিয়া তাহাদ্বারা জাতির অধঃপতন হইয়াছে বলিতেই হইবে।

আর একশ্রেণীর ব্যক্তি যুক্তি দেখাইয়া বলেন, যখন ধর্ম্ম করিতে গেলে জড়ের প্রতি উদাসীন হইতে হয়, তখন তাহাদের দ্বারা জাতীয় অভ্যুদয়ের উপাদান সাহিত্য, শিল্প, বিজ্ঞান, দর্শন, রাজনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ের উন্নতিসাধন কি প্রকারে হইবে? পর্ব্বতের গুহায় বসিয়া ধ্যান করিলে কি সাহিত্য, শিল্প, বিজ্ঞানের নূতন নূতন সৃষ্টি আবিষ্কার হইবে? বিলাস পরিত্যাগ করিয়া বৈরাগী সাজিলে কি দেশের ধন-জন-সম্পদ্ কৃষিবাণিজ্য বর্দ্ধিত হইবে? যেখানে "গৃহীত ইব কেশেষু মৃত্যুনা ধর্ম্মমাচরেৎ"—সেখানে ধর্ম্মের দ্বারা জাতীয় অধঃপতন অনিবার্য্য।

জগতে যে সকল শ্মশান-ধার্ম্মিক বা ফল্গুধার্ম্মিকের চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হইতে কল্পিত যুক্তিবাদিগণের ঐরূপ সিদ্ধান্ত অযৌক্তিক নহে। বস্তুতঃ সৃষ্টিরক্ষার ভার মানবজাতি বা প্রাণিজাতিরই গ্রহণ

করিতে হইবে, এইরূপ বিচার করিলে তাহাদের মধ্যেই আবার নানাপ্রকার বিপরীত তিক্ত অভিজ্ঞতা, প্রতিক্রিয়া ও প্রতিযোগিবিচার উপস্থিত হইবে। সৃষ্টি রক্ষা করিবার ভার গ্রহণ করিতে গিয়া আবার সৃষ্টি নিরোধ করিবার চেষ্টায় অনুপ্রাণিত হইতে হইবে; তখন থমাস্ ম্যাল্‌থাসের মতবাদ গ্রহণ করিয়া বলিতে হইবে যে, মানবের জন্ম-সংখ্যা Geometrical progression-এ ও তাহাদের খাদ্যের উৎপত্তির পরিমাণ Arithmetic progression এ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে; সুতরাং হয় positive checks যথা শিশুমৃত্যু, মহামারী, রোগ, দুর্ভিক্ষ, ভূমিকম্প, জলপ্লাবন, যুদ্ধ প্রভৃতি উপায়ের দ্বারা, না হয় preventive checks অর্থাৎ অধিক বয়সে বিবাহ, স্বেচ্ছায় জন্মনিরোধ প্রভৃতি কৃত্রিম উপায়ে সৃষ্টি-ক্রিয়াকে বাধা দিতে হইবে!

বর্ত্তমান বর্ষে আসাম-প্রদেশে ভীষণ জলপ্লাবন, দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি positive check সমূহ প্রবলভাবে প্রাদুর্ভূত থাকিলেও গত ৫ই জুলাই (১৯৩৪) তারিখের শিলং এর সংবাদে প্রকাশ যে, আসাম প্রদেশে সৃষ্টি সংযমনের আবশ্যকতা সম্বন্ধে Assam Legislative council এ একটি বিশেষ প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছিল, তদুত্তরে আসামগভর্ণমেন্ট দেশবাসীর হিতের জন্য ঐরূপ সংযমন প্রচারের কতকটা ভার গ্রহণ করিবেন নাকি জানাইয়াছেন। * (*Amrita Bazar patrika, 6th July 1994, Calcutta Edition.) ১৩ই জুলাই তারিখের ইউনাইটেড প্রেস্ যুক্তপ্রদেশেও এরূপ আন্দোলনের বিষয় প্রচার করিয়াছেন। লক্ষ্ণৌ ডিষ্টিক্ট্ বোর্ডের কর্ত্তৃপক্ষ ও চেয়ারম্যান অঙ্কপাতের দ্বারা তৎপ্রদেশে সংযমের বিশেষ আবশ্যকতার কথা জ্ঞাপন করিয়া বলিয়াছেন—"There is need for birth-control, on which depends economic situation of the Country."

ম্যাল্‌থাসের মতবাদ কেহ কেহ প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছেন যে, ঐ মত কেবল তাঁহার সমসাময়িক কালেই * (*খৃষ্টাব্দ ১৭৬০-১৮৩৪) ম্যাল্‌থাসের সময়) খাটিত। প্রতিবাদকারিগণ বলেন,—ভারতবর্ষ, চীন প্রভৃতির ন্যায় দরিদ্র দেশের পক্ষেই তাঁহার অনুমান সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু গ্রেটবিটেন, জার্ম্মেণী, ইউনাইটেড্ ষ্টেট্স্ অব্ আমেরিকা প্রভৃতি সম্পৎশালী প্রদেশে যেখানে শিক্ষা ও সভ্যতার সমধিক বিস্তার, Factory Act প্রভৃতি আইন ও দেশ বিদেশ হইতে শস্যের আমদানী হইয়া থাকে, বিশেষতঃ যে সময়ে কৃষি-বাণিজ্যের প্রভৃতি উন্নতি সাধিত হইয়াছে, সেই সময়ে ঐ মত খাটিতেই পারে না, কিন্তু Walker ** (** Political Economy by Walker.) প্রভৃতি অর্থনীতিবিদ্‌গণ বলেন যে, ম্যাল্‌থাসের মতসকল সময়ে ও সকল জাতির প্রতিই খাটিবে এবং উহাতে অনেক গভীর সত্য নিহিত রহিয়াছে।

যাহা হউক মানবজাতি ভগবানের সৃষ্টি রক্ষার (?) জন্য ভোগবুদ্ধি-লোলুপ হইয়া যতই পাটোয়ারী বুদ্ধি প্রদর্শন করুন না, তাহাতে জাতীয় উন্নতির পরিবর্ত্তে অধঃপতনকেই অভ্যর্থনা করা হইবে। হরিসেবা-সম্বন্ধ-রহিত হইয়া যাঁহারা সৃষ্টি-রক্ষা বা সৃষ্টি-ধ্বংসের পক্ষপাতী, সেই উভয় শ্রেণীই সমাজ ও জাতিকে ধ্বংসের পথে লইয়া চলিয়াছেন। মানব জাতি অপেক্ষা পশু-পক্ষী-কীট-পতঙ্গ প্রভৃতি নিম্ন প্রাণি জাতির মধ্যে অধিক

পরিমাণে সংখ্যা-বৃদ্ধির প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায়। যদিও সংবাদ পত্রের স্তম্ভে একসঙ্গে পাঁচ বা ততোধিক সন্তান-সন্ততির আবির্ভাবের চিত্র ও বাস্তব বিবরণ * * * (*** ১৫ই জুলাই ১৯৩৪ তারিখের অমৃতবাজার পত্রিকা, ১৭ পৃষ্ঠা।) অনেক সময় প্রকাশিত দেখিতে পাওয়া যায়, তথাপি অতি ক্ষুদ্রকায় নীচ প্রাণীর মধ্যে তদপেক্ষা অনেক অধিক সন্তান প্রজনন ও প্রসবের প্রত্যক্ষ প্রমাণসমূহ দৃষ্ট হয়। কাজেই কেবল সৃষ্টি-প্রক্রিয়া বৃদ্ধি বা নিরোধের দ্বারা জাতীয় উন্নতি-সংরক্ষণের চেষ্টা অযৌক্তিক ও অবাস্তব। তথাকথিত শিক্ষিত, সভ্য, স্বাধীন-জাতিসমূহ সৃষ্টিপ্রক্রিয়ায় যতই উন্নত হউন না কেন, ম্যাল্‌থাসের পরিভাষায় 'Positive checks' যুদ্ধ-বিগ্রহ প্রভৃতি কি তাঁহাদের চেষ্টাকে ব্যর্থ করিয়া দিতেছে না? জন্মনিরোধ আইন বা কৃত্রিম চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে অস্ত্র-নিরোধ-আইন প্রতিষ্ঠিত করিবারও কি প্রয়োজন হইতেছে না? সভ্যতা, শিক্ষা, স্বাধীনতা, জাতীয় উন্নতি প্রভৃতির নামে ইহা কি জাতির অন্তরতম অন্তরে ধ্বংসের রাজযক্ষ্মার বীজাণু সংক্রামিত করিয়া দিতেছে না? সুধীগণ বিচার করিবেন।

শ্রীচৈতন্যদেব বা শ্রীচৈতন্যের শিক্ষায় শিক্ষিত কোন ব্যক্তি কখনও ঐরূপ জাতিধ্বংসকারক কার্য্যে নিযুক্ত হইবার পরামর্শ দেন না। বস্তুতঃ শ্রীচৈতন্যদেব যে বংশ বিস্তার করিয়াছেন, শ্রীচৈতন্যদেবের সেই সকল পুত্রস্থানীয় অচ্যুতগোত্রীয় ব্যক্তিগণ যে বংশবিস্তার ও গোত্রবিস্তার করিতে পারেন, সেরূপ বিস্তার-কার্য্য ধ্বংসোন্মুখ মানবজাতি করিতে পারিবে না। শ্রীচৈতন্যদেবের বংশবিস্তারের বাণী এই— "যারে দেখ তারে কহ কৃষ্ণ-উপদেশ। আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার এই দেশ।।" "গোত্রং নো বর্দ্ধতাম্"— "গোত্র বাড়াউন কৃষ্ণ আমা সবাকার।" তাঁহার বংশের সন্তানগণ সব 'সোনার ছেলে'; তাঁহারা মরণশীল জাতির সৃষ্টিকারী নহেন, তাঁহারা অমর জাতির বিস্তারকারী, তাঁহাদের বংশ 'অচ্যুতবংশ'। কাজেই যাঁহারা হরিভজনকারিগণকে জাতিবিস্তারের পরিপন্থী মনে করিয়া অসংযমী ইন্দ্রিয়-লোলুপ বা কৃত্রিম সংযমী প্রচ্ছন্ন-ইন্দ্রিয়-লোলুপ সম্প্রদায়কে জাতির পৃষ্ঠপোষক মনে করেন, তাঁহারা ভ্রান্ত,—কেবল ভ্রান্ত নয়, তাঁহারাও ধ্বংসের পথের যাত্রী।

বিষ্ণুর সেবক-সম্প্রদায় সমাজের যে বৈজ্ঞানিক ক্রমোন্নতি ও বাস্তব মঙ্গলের পথ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা আর অন্যত্র কুত্রাপি দেখা যায় না। দৈববর্ণাশ্রম-বিধি যাহা বিষ্ণুপাসনা-মূলে প্রতিষ্ঠিত, তাহা সনাতন-ধর্ম্মক্ষেত্র ভারতবর্ষ ব্যতীত এরূপ সুন্দরভাবে আর কোথায়ও নাই। যে সকল জাতির মধ্যে দৈববর্ণাশ্রম-বিধি প্রচলিত নাই বা যাঁহাদের মধ্যে অদৈববর্ণাশ্রমের প্রেত প্রবেশ করিয়াছে, তাহারা ন্যূনাধিক ধ্বংসের পথে অভিসার-ব্রতকেই 'প্রগতি' বলিয়া বরণ করিয়াছেন, ইহা নিছক সত্য। দৈববর্ণাশ্রমধর্ম্ম যোগ্যতামূলক বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ও তাহা পরাৎপর তত্ত্বকে কেন্দ্র করিয়া পরিচালিত, তাই সেরূপ সমাজই জাতীয় উন্নতি বা প্রগতির বৈজ্ঞানিক সোপান।

যাঁহারা বলেন যে, শ্রীচৈতন্যদেব কোন দেশ বা জাতির উন্নতির বিঘ্নকারী ও অধঃপতনের কারণ, তাঁহারা ন্যূনাধিক অধঃপতনের প্রপাতের মধ্যে পতিত হইয়াই ঐরূপ উক্তি করিতেছেন, ইহা হাতে কলমে দেখান

যাইতে পারে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় উদ্ভাসিত হইয়া দবীর খাস ও সাকর মল্লিক যে তদানীন্তন গৌড়ের বাদশাহ হুসেন সাহের প্রধান মন্ত্রিত্ব, কিংবা শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভু 'ইন্দ্রসম ঐশ্বর্য্য, অপ্সরাসম ভার্য্যা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, শ্রীল রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী প্রভু বিবাহ করিতে বিরত হইয়াছিলেন, কিংবা মহারাজ প্রতাপরুদ্র যুদ্ধবিগ্রহাদির প্রতি উদাসীন হইয়াছিলেন, তদ্দ্বারা জাতীয় অধঃপতন না হইয়া কতটা প্রকৃত জাতীয় উন্নতি ও সুসভ্যতার আনুষঙ্গিক পরিপুষ্টি হইয়াছে, তাহা বর্ত্তমান যুগ ও ভাবী যুগের মনীষিগণের ভাবিবার বিষয় হইয়াছে ও হইবে। লোকে বড় রাজকার্য্য প্রভৃতি পাইবার জন্য অবৈধ দক্ষিণা প্রদান করিয়া থাকেন, আবার কেহ কেহ দেশ ও জাতিকে তথাকথিত সুবিধা প্রদানের জন্য প্রতিষ্ঠাশুল্কে কারাবরণ প্রভৃতিও করিয়া থাকেন; কিন্তু সনাতন, সমগ্র মানবজাতির বা জীবজগতের স্বাধীনতার প্রকৃত পথ প্রদর্শনের জন্য কারাবরণ করিয়াছিলেন ও গৌড়ের বাদশাহের প্রধানমন্ত্রিত্ব-পদ পরিত্যাগের জন্য সাত হাজার মুদ্রা উৎকোচ প্রদান করিয়াছিলেন। সনাতনের ব্যবহার হুসেন সাহকেও চমৎকৃত করিয়াছিল।

সম্পদ্, জাগতিক স্বাধীনতা, বিলাস, ভোগ-সংখ্যাবিস্তার প্রভৃতি ব্যাপারে আধুনিক বিভিন্ন পাশ্চাত্য-জাতি আমাদের আদর্শস্থানীয়; কিন্তু তাঁহাদের ঐরূপ জাতীয় অভ্যুদয় ও স্বাধীনতার পরিণাম কি, তাহা কি আমরা প্রত্যক্ষ শত শত দৃষ্টান্ত দেখিয়াও শিক্ষা করিব না? যে জার্ম্মাণ-জাতি বিজ্ঞানে, বাণিজ্যে, সম্পদে, জাতীয়তায়, অর্থনীতি ও রাজনীতিতে, শিক্ষা ও সভ্যতায় অন্যতম শ্রেষ্ঠ জাতি বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন ও হইয়াছেন, সেই দেশ ও সেই জাতির অভ্যুদয়ের পরিণাম কি হইয়াছে, তাহা কি বিগত মহাযুদ্ধ ও তাহার পরবর্ত্তী একযুগের ইতিহাস প্রমাণ করিতেছে না? সেদিন কোন রাজনীতিবিশারদব্যক্তি সে দেশের রক্তনদী-প্রবাহের নিদর্শন-সমূহ লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে, বর্ত্তমান অবস্থায় ঐরূপ দেশ সভ্যশ্রেণীর মধ্যে গণিত হইবে কি? যদিও সে দেশের নায়ক জাতিকে আশার আলেয়া দেখাইতেছেন, তথাপি সেই আলেয়ার অনুসরণ করিয়া জাতি কতটা লাভবান্ হইবেন, তাহাও ইতিহাস প্রমাণ করিয়া দিবে; কিন্তু অনাদিবহির্ম্মুখ নিখিলমানবজাতির উপর অঘটনঘটনপটীয়সীমায়া আবার তাহার যাদুর যবনিকা টানিয়া দিবে। তথাকথিত জাতীয় অভ্যুদয় ও সভ্যতার চরম শিখরে আরোহণ করিয়া আমাদিগকে হয় চরমে যুদ্ধবিগ্রহের জন্য কোমর বাঁধিতে হয়, না হয় অস্ত্রনিরোধ আইনের কোন কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করিতে হয়। একটি মানবের প্রাণ কত মূল্যবান্—একটি মানবকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য কত শত শত ইতরপ্রাণীর প্রাণ নিত্য বিনষ্ট হইতেছে, কিন্তু ঐরূপ সহস্র সহস্র মানবকে একসঙ্গে একমুহূর্ত্তে কিরূপে বিনাশ করা যায়, তাহার কল-কৌশল বা উপায়-উদ্ভাবন যে সভ্যতা, যে বিজ্ঞান যে রাজনীতি, সমাজনীতি বা অর্থনীতি শিক্ষা দিয়া থাকে, তাহার চরম ফল ধ্বংস ব্যতীত আর কি? বাস্তব অকৃত্রিম অহিংস্যনীতির শিক্ষাদাতা শ্রীচৈতন্যদেবের সংস্পর্শে আসিয়া শ্রীপ্রতাপরুদ্র ঐরূপ জগদ্ধ্বংসকারক রাজনীতির আশ্রয় গ্রহণ না করিয়া, সমস্ত রাজনীতিকে শ্রীচৈতন্যের পাদপদ্ম সেবায় নিযুক্ত করিয়া দেশের, সমাজের ও রাষ্ট্রের প্রকৃত উন্নতিই করিয়াছেন। বস্তুতঃ আজ শ্রীচৈতন্যের প্রভাবেই উড়িষ্যার প্রকৃত উন্নতি হইয়াছে। এখনও লোকে উড়িষ্যার কথা শুনিলেই

শ্রীচৈতন্যদেবের স্মৃতিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠেন। উড়িষ্যার প্রকৃত সভ্যতা, শিক্ষা, সাহিত্য, শিল্প প্রভৃতি শ্রীচৈতন্যদেবকে কেন্দ্র করিয়াই অধিকতর উন্নত হইয়াছিল। ধর্ম্মকে নির্ব্বাসিত করিলে উড়িষ্যা বা জগতের কোন দেশ বা জাতির কোন মূল্য নাই। লিঙ্গরাজ ভুবনেশ্বরের মন্দির, অনন্তবাসুদেবের মন্দির, পুরীর শ্রীজগন্নাথের মন্দির প্রভৃতি শিল্পকলা-চাতুর্য্য প্রকাশ করিয়া পাশ্চাত্য সুদক্ষ স্থপতিবিদ্‌গণেরও বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছেন। উৎকল কবি গোবিন্দদেব প্রভৃতি শ্রীচৈতন্যদেবকে অবলম্বন করিয়াই সাহিত্যের শোভা বর্দ্ধন করিয়াছেন। এমন কি, যে অতিবাড়ী জগন্নাথদাস কবিত্ব-প্রতিভায় উৎকলবাসীর চিত্ত-রঞ্জন করিয়াছেন, তিনিও যে কোন ভাবে হউক শ্রীচৈতন্যদেব ও তদনুগত সম্প্রদায়ের সংস্পর্শে ঐ উন্মাদনা লাভ করিয়াছিলেন, ইহা ঐতিহাসিকগণ ও স্বীকার করেন। শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার ভক্তসম্প্রদায়ের প্রভাব উৎকলের নৈতিক উন্নতিকে কতটা বিশুদ্ধ করিয়াছিল, তাহাও সুধীগণ বুঝিতে পারেন। সঙ্কীর্ণ প্রাদেশিকতা বা জাতীয়তার বিচার পারমার্থিকতায় নাই। শ্রীচৈতন্যদেবের সাড়ে তিনজন অন্তরঙ্গ ভক্ত অর্থাৎ রাধিকার গণের মধ্যে আড়াই জনই উৎকলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। রায় রামানন্দ, শিখি-মাহিতি ও তাঁহার ভগ্নী মাধবীদেবী—ইহারাই সেই আড়াই জন। বঙ্গদেশীয় শ্রীল পুরুষোত্তম ভট্টাচার্য্যও নীলাচলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত অবস্থান করিয়া তাঁহার অন্যতম অন্তরঙ্গ দ্বিতীয়-স্বরূপ দামোদর স্বরূপ-নামে খ্যাত হইয়াছিলেন। প্রকৃত প্রস্তাবে শ্রীচৈতন্যদেবের কৃপায়ই পারমার্থ-রাজ্যের চরম কথা উৎকল হইতে প্রচারিত হইয়াছে। যে চরমকথার সন্ধান এখনও বিশ্বের সর্ব্বাপেক্ষা সভ্য ও উন্নত জাতিগণ শুনিবার সুযোগও পান নাই, সেই পরম চরম ধনের খনি শ্রীচৈতন্যদেবই পুরুষোত্তম হইতে সমগ্র পৃথিবীতে স্বয়ং ও ভক্তগণের দ্বারা আবিষ্কার করাইয়াছেন ও করিতেছেন।

শ্রীচৈতন্যদেব উৎকলকে পরম-মঙ্গল-বাণীর পীঠ করিয়াছিলেন বলিয়া কি তিনি জাতীয় অধঃপতনের কারণ হইয়াছেন? তাহা হইলে জাতির ধ্বংসই কি জাতির উন্নতি? মনে করুন, যদি প্রতাপরুদ্র শ্রীচৈতন্যদেবের চরণাশ্রয় না করিতেন, যদি শ্রীচৈতন্যদেব উৎকলে না আসিতেন বা মানবজাতির চরম দুর্ভাগ্যবশতঃ জগতে তাঁহার অবতার না হউক, তাহা হইলেও তাঁহার আবির্ভাবের পূর্ব্বের ও পরের ইতিহাস প্রমাণ করিয়া দিত যে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রবল পরাক্রান্ত নৃপতিগণের , অধিক কি, যে বিজয়নগররাজ প্রতাপরুদ্রকে পরাভূত করিয়াছিলেন, তাঁহারও সোণার লঙ্কা কিছুতেই অক্ষত থাকিত না। কৃষ্ণদেবার্য্যের অধস্তন অচ্যুতার্য্য, রামরাজ প্রভৃতির সময় বিজয়নগরকে অধীনতার রাহু গ্রাস করিয়া বসিল। টালিকোটের যুদ্ধে মুসলমানগণ হিন্দুগণকে পরাভূত করিয়া রামরাজকে নিহত ও বিজয়নগরকে বিনষ্ট করিল, বিজয়নগরের মর্ম্মর-সৌধরাজি ও প্রাসাদ ধূলিসাৎ হইল—হিন্দু-সাম্রাজ্য বা জাতির উন্নতির (?) উদয়গিরিই আবার অস্তাচলে পরিণত হইল—জাগতিক অভ্যুদয়ের গৌরবরবির পরমায়ু কতক্ষণ?

যে পরমার্থকে আশ্রয় করিয়া অম্বরীষ, পৃথু প্রভৃতির ন্যায় সার্ব্বভৌম সম্রাট্ উদিত হইয়াছেন, যে পরমার্থকে আশ্রয় করিয়া দাক্ষিণাত্যের শ্রীমন্দির-গাত্রে শিল্পকলার চাতুর্য্য এখনও মূর্ত্তিমান রহিয়াছে, যে পরমার্থকে

আশ্রয় করিয়া বেদ, শ্রুতি, রামায়ণ, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত সাহিত্যের অভ্যুদয় হইয়াছিল এবং পরবর্ত্তিকালে শ্রীচৈতন্যদেবের পাদপদ্মকে কেন্দ্র করিয়া যে গৌড়ীয়-সাহিত্যরত্নাকরের আবিষ্কার হইয়াছে, যে পরমার্থকেই কেন্দ্র করিয়া নানাপ্রকার রাগরাগিণী বাদ্যযন্ত্রের আবিষ্কার হইয়াছে, সেই পরমার্থই জাতীয় অধঃপতনের কারণ, এই সিদ্ধান্ত অধঃপতিতগণের মুখেই শোভা পায়। তবে একথা ঠিক যে, ঐ সকল বস্তু জীবজগতের ভোগের ইন্ধনরূপে পর্য্যবসিত হইলেই তাহা জাতীয় ধ্বংসের কারণ হইয়া থাকে। হউক না কেন, শত শত বিলাসদ্রব্য, শত শত সুগন্ধি প্রসাধন সামগ্রীর সৃষ্টি, ভগবদ্ভক্তগণ ঐ সকলকে ফল্গুত্যাগীর ন্যায় অদৃশ্য অস্পৃশ্য বলিয়া পরিত্যাগ করেন না, উহাদের যোগ্যতানুসারে উহাদিগকে তাঁহারা কৃষ্ণপাদপদ্মে অঞ্জলি প্রদান করিয়া থাকেন। যাঁহারা গোবিন্দলীলামৃত প্রভৃতি বৈষ্ণব-সাহিত্য পাঠের অধিকারী কিংবা যাঁহারা শ্রীহরি ভক্তিবিলাস প্রভৃতি বৈধ সেবানুশীলনের বিধিসমূহ অবগত আছেন, তাঁহারা জানেন যে, শ্রীরাধা-গোবিন্দের সেবার জন্য ভক্তগণ কত প্রকার বিলাস-দ্রব্য, প্রসাধন-সামগ্রী, মূল্যবান্ বস্ত্র, বিভিন্ন প্রকার পুষ্প, মালিকা প্রভৃতি সংগ্রহ ও চয়ন করিয়া থাকেন।

বর্ত্তমান সভ্যতা, শিক্ষা বা তথাকথিত প্রগতি বা উন্নতি ব্যষ্টি ও সমষ্টি জীবকে ভোক্তা সাজাইয়া জাতিকে ধ্বংসের অভিযানের সৈন্য করিয়াছে—কামের ইন্ধন যোগাইয়া—লোভের টোপ খাওয়াইয়া জাতিকে ইন্দ্রিয়মেধযজ্ঞে আহুতি দিতেছে। এই নরমেধ-যজ্ঞই কি সভ্যতা ও প্রগতির তন্ত্রমন্ত্র-উপাসনা ?

কৃত্রিম ধার্ম্মিক সম্প্রদায়ের বিচারের সহিত অকৈতব পারমার্থিক-সম্প্রদায়ের বিচারকে একাকার করায় ও ঐসকল ধর্ম্মধ্বজিগণের ধর্ম্মের ধারণায় আমাদের মস্তক ভরপুর রাখায় আমরা প্রকৃত সত্যনিরূপণে অসমর্থ হইয়া পড়িয়াছি। পারমার্থিকগণ কৃত্রিম-ধার্ম্মিক-সম্প্রদায়ের ন্যায় জগৎ বা প্রাণিজাতিবিদ্বেষী নহেন আবার তাহাদের বহির্ম্মুখতায় অনুরাগীও নহেন। যে ডিনামাইট মানব জাতির ভোগের পথ পরিষ্কার করিবার পরিবর্ত্তে হরিসেবার বিঘ্নরূপ পাহাড় পর্ব্বত গুলিকে সরাইয়া দেয়—হরিকথা কীর্ত্তনে সুবিধা করিয়া দেয়, যে এয়ারোপ্লেন ভোগযুদ্ধের সহায়ক হইয়া জাতির প্রাণ সংহার করিবার পরিবর্ত্তে হরিকথা-প্রচারের সুযোগ করিয়া দেয়, সেরূপ বিজ্ঞানের অবদানগুলির প্রতি পারমার্থিকগণ বিদ্বেষী হন না। চরমে জাতিধ্বংসকারিণী স্বৈরিণী প্রগতির মুখ ফিরাইয়া উহাকে হরি সেবার আনুকূল্যকারিণী ও আনুষঙ্গিকভাবে সমগ্র প্রাণিজাতির কল্যাণদায়িণী করিতে একমাত্র আত্মধর্ম্মই সমর্থ। আমরা প্রবন্ধান্তরে ঐতিহাসিক প্রত্যক্ষ দ্বারা হাতে কলমে দেখাইব যে, জগতে প্রকৃত আত্মধর্ম্মের কল্যাণেই অতি আনুষঙ্গিকভাবে প্রকৃত জাতীয় উন্নতি সাধিত হইয়াছে; ভোগ বা ত্যাগের বাড়বানল কেবল জাতীয় অধঃপতন নহে, জাতিধ্বংসের কর্ণধার।

বৈকুণ্ঠ ও গুণজাত জগৎ

শ্রীকৃষ্ণের গানে আমরা শুনিতে পাই যে, প্রকৃতির সম্বল গুণত্রয়ের দ্বারাই ক্ষণভঙ্গুর কার্য্যসকল পরিদৃষ্ট হয় এবং সেই কার্য্যের কর্ত্তৃপক্ষ হইবার বাসনাই বদ্ধজীবের অজ্ঞানোত্থ অহঙ্কার। অহঙ্কার-বিমুক্ত জনগণ বৈকুণ্ঠের উপলব্ধি করিয়া তাহাতে অবস্থিত হইলেই গৌণের পরিবর্ত্তে মুখ্য সেবোন্মুখতা লাভ করেন। সেবোন্মুখ জিহ্বাই কৃষ্ণনাম গান করিতে সমর্থ হন। কৃষ্ণনামগানকারিব্যক্তি নাম-প্রভাবে কৃষ্ণরূপ গান করিতে, কৃষ্ণগুণ গান করিতে, কৃষ্ণপরিকরবৈশিষ্ট্যের সহিত কৃষ্ণলীলা স্মৃতি-পথে উদয় করাইয়া নাম গান করিতে থাকেন। এই স্বরূপাবস্থায় অবস্থানই তাঁহার গৌণ প্রতীতি হইতে ন্যূনাধিক অবসর প্রদান করে।

কনিষ্ঠ ভাগবত ক্রমশঃ উন্নত হইয়া দ্বিগুণিত তৃতীয়াংশে গৌণদৃষ্টি করিয়া থাকেন। আবার মধ্যম অধিকার লাভ করিয়া একতৃতীয়াংশে দৃশ্য জগৎকে তৃতীয়াংশ গুণজাত জগৎ জানিতে থাকেন। আর মহাভাগবত-বিচারে উন্নতি লাভ করিয়া গুণজাত জগতের সঙ্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কৃষ্ণস্মরণ-জনিত প্রেম-বিবশ হন। সেই কালে তাঁহার লেহ্যপ্রতীতি বা বহিঃপ্রজ্ঞা ভোগের বিচার আদৌ থাকে না। কর্ম্মফলভোগ-বাসনা একেবারে নির্ম্মুলিত হইলেই স্বরূপাবস্থিতির কোন ব্যাঘাত হয় না। আত্মনিবেদন প্রভাবে শরণাগত ব্যক্তির কৃষ্ণশ্রবণ, কৃষ্ণকীর্ত্তন ও কৃষ্ণস্মরণ নিজস্বভাবের মধ্যেই পরিদৃষ্ট হয়; গুণজাত জগতের অহঙ্কারে অভিনিবিষ্ট না হইয়া অনাত্মপ্রতীতির হস্ত হইতে অবসর লাভ করেন। ইহাই সাধনের সিদ্ধি।

ভাবরাজ্যে অবস্থিতিকালে সেবোন্মুখ জনগণের ষড়্‌রিপুর দাস্য করিতে হয় না বলিয়া তাঁহাতে ক্ষান্তি নামক চিদ্‌গুণ দেখা যায়। তিনি জড়ভোগের বিষয়ে বদ্ধজীবের সেবাকার্য্যে কালক্ষেপ করেন না। কৃষ্ণসেবার উপযোগী বিষয়সমূহই তাঁহার অভ্যর্থনার বিষয় হয়। ভগবদনুগ্রহ লাভ করিয়া তৎকৃপালাভের চেষ্টাই বলবতী হয়। ইতরাভিলাষ ত্যক্ত হইয়া নবনবায়মান উৎসাহ তাঁহার বৈশিষ্ট্য সম্পাদন করে। ভগবানের নাম-রূপ-গুণ-পরিকরবৈশিষ্ট্য ও লীলা গানে তাঁহার রুচি পরিলক্ষিত হয়। প্রাপঞ্চিক ত্রিগুণের অতীত নিত্যানন্দের চিন্ময় গুণ কীর্ত্তন করিতে, স্মৃতিপথে আনিতে ও শ্রবণ করিতে সমধিক ইচ্ছা প্রকাশ করেন। ভগবৎ সংসারের অন্যতম সেবক হইয়া নিত্যকাল স্বরূপে অবস্থিতিই অজাতরতি সাধারণের সহিত তাঁহার পার্থক্য নির্দ্দেশ করে।

গুণজাত জগতে অবস্থিতিকালে গুণের বিচারে সদসদ্‌বিবেক অর্থাৎ নিত্যানিত্যবিবেক, চিদচিদ্‌বিবেক অর্থাৎ মিশ্রামিশ্রচেতনবিবেক ও আনন্দ বিবেকের পরিবর্ত্তে সুখদুঃখবিবেকের ধূম্রসমূহ তাঁহাকে অশ্রু বিসর্জ্জন করায়।

তমোগুণতাড়িত বিকৃত চেতন তাঁহাকে অনেক সময় প্রকৃতিবাদী বা মায়াবাদী করিয়া তুলে। রজোগুণ-তাড়িত হইয়া ক্ষণভঙ্গুর স্বপ্নমনোরথের রচিত রাজ্যে ভ্রমণ করায়। ভগবদ্‌বিস্মৃতি-জন্য অমঙ্গলরাশি আসিয়া

গুণান্তর্গত বদ্ধজীবকে অভিভূত করায়। রজোগুণ-দ্বারা তমঃপরিহারাকাঙ্ক্ষা উদিত হইলে সত্ত্বের আবাহন স্বভাব হইতে আবির্ভূত হয়। সেই সত্ত্বাবির্ভাব প্রবৃত্তিরাজ্য হইতে ক্রমশঃ বদ্ধজীবকে অবসর দেয়। ইহারই চিত্রে 'বৈরাগ্য' শব্দটির আবাহন।

তাদৃশ বৈরাগ্য যদি ভগবৎকথায় প্রবৃত্তি না দেয়, তাহা হইলে ইতর প্রজল্প ও বিতণ্ডা আসিয়া বদ্ধজীবকে পুনরায় দুরন্তপার তমোরাজ্যে ডুবাইয়া দেয়। বিশুদ্ধ সত্ত্ব রজস্তমোগুণদ্বয়ের সঙ্গ পরিত্যাগ করিলে অবিমিশ্র-সত্ত্ব অর্থাৎ বিশুদ্ধ-সত্ত্ব জড়ভোগ রাজ্য হইতে অবসর দিয়া নিগুর্ণভাব অর্থাৎ আপেক্ষিকতাবর্জ্জিত বিচিত্রতার আবাহন করায়। তখনই তিনি গুণজাত জগদ্দর্শন না করিয়া বৈকুণ্ঠ দেখিতে থাকেন।

বৈকুণ্ঠের তুলসীর আঘ্রাণ লাভ করেন। বৈকুণ্ঠের স্রগ্গন্ধ তাঁহাকে কলুষপর্য্যায়ে অবনামিত করিতে পারে না। বৈকুণ্ঠস্পর্শ ঘটিলে শীতোষ্ণাতিশয্যের অপ্রার্থিত অমঙ্গল তাঁহাকে গ্রাস করে না। অভাবরাজ্যের স্বভাব, অনুপাদেয় রাজ্যের প্রলোভন, কুণ্ঠরাজ্যের আবদ্ধতা বৈকুণ্ঠে টানিয়া লইবার দুষ্পিপাসা তাঁহার মস্তিষ্কের উষ্ণতা সাধন করে না। তখন শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তন করিতে করিতে সর্ব্বাত্মস্নপিতভাবের উদয় হয়। কর্ণের দ্বারা শ্রবণ করিবার যোগ্যতা-কাল উপস্থিত হইলে কৃষ্ণকীর্ত্তন শ্রুতিগণ হয়। সেই শ্রুতির পরিচালনা-ক্রমে জড়রূপ-মোহ, জড়গুণাকর্ষণ, জড়-সঙ্গ-লাভ-স্পৃহা, জড়চিন্তা এবং ভোক্তৃত্বের অভিমান থাকে না।

গুণজাত জগতে অবস্থান-কালে জীবের বৈকুণ্ঠের শব্দ, রূপ, গুণ, পরিকর ও ক্রিয়াকলাপ আলোচনার বিষয় হয় না, অনুপাদেয় ব্যাপারে চিত্ত ধাবিত হইতে থাকে। শ্রীবৃন্দাবনের অপূর্ব্ব মধুরিমা বদ্ধজীবের চিত্ত-বিনোদনের বিরোধী হইয়া পড়ে। নিখিল সদ্গুণ, নিখিল চিদ্গুণ ও নিখিল আনন্দগুণের ধারণা দুঃখাবরোধক পরিচ্ছিন্ন সুখ, অসম্পূর্ণ জ্ঞানাভাসের অজ্ঞান এবং কালক্ষোভ্য বিচারে বৈকুণ্ঠানুরাগ বা মুক্তাবস্থার প্রতীতি নহে। সুতরাং গুণজাত জগতের প্রভু হইবার আকাঙ্ক্ষা হইতে বিপরীত দিকে বৈকুণ্ঠ-সেবক হইবার চেষ্টাই উভয়ের তারতম্যবিচারে জীবের পক্ষে পরমশ্রেয়ঃ—এই কথা যিনি বুঝাইয়া দেন, তিনি জড়নির্ব্বিশিষ্ট মায়াবাদ বা মায়িক ভোগরত জনগণের গুণজাত কুণ্ঠার ধ্বংস সাধন করায় তাঁহাকে মহৎ বা 'গুরু' বলা হয়।

আর যিনি জড়াতীত বৃহদভিমানে সেবাবৃত্তিতে অবস্থিত থাকেন, সেই বৈকুণ্ঠভক্ত হইতে পৃথক্ গুণতাড়িত অহঙ্কারী ভোগী কোন মতেই উপাদেয় বিচারে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারেন না।

''শ্রীকৃষ্ণজন্ম বিনা জীবের জীবন বৃথা''

আজ শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী বা জয়ন্তী, আগামী কল্য শ্রীনন্দোৎসব। এই উপলক্ষে শ্রীগৌড়ীয় মঠে আচার্য্যের ইচ্ছানুসারে হরিকীর্ত্তনোৎসব হইতেছে। আচার্য্য জানাইয়াছেন, ''শ্রীকৃষ্ণজন্ম বিনা জীবের জীবন বৃথা''; কিন্তু তাঁহার এই বাণী—আমাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিতেছে না! আমরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইন্দ্রিয়ের ব্যর্থ ও পরিণামে পরমদুঃখর সম্ভোগের পিপাসায় শ্রীকৃষ্ণের এক একটি ক্ষুদ্র নকল সংস্করণ সাজিয়া রহিয়াছি! পরাৎপর-কৃষ্ণের পরিবর্ত্তে অসুর-কৃষ্ণের জন্ম আমাদের অস্মিতাকে গ্রাস করিয়াছে।

সম্ভোগে মত্ত হইয়া আমরা কেহ মনে করিতেছি, কৃষ্ণভজনের প্রয়োজন কি? আমরাই জগতের অদ্বিতীয় ভোক্তার পদবী গ্রহণ করিব। আব্রহ্মস্তম্ব এই ভোক্তার পদবীর জন্যই আকাশ-পাতাল আলোড়ন করিতেছে—ইহাই তাহাদের কর্ম্মের প্রেরণা। কেহ বিষ্ঠার কৃমি হইয়া সেই পদবীর অনুসন্ধিৎসু, কেহ বা মানুষের মধ্যে উচ্চপদ, সম্মান, আভিজাত্য, রূপ, ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি লাভ করিয়া সেই চেষ্টায় ধাবিত। কখনও জার্ম্মেণ কাইসার, কখনও প্রেসিডেন্ট চ্যান্স্লার হিট্লার, কখনও আর কোনও রাষ্ট্র-নেতা, কখনও জাতীয় আন্দোলনের নায়ক, কখনও সমাজ সংস্কারক, কখনও দুস্তের উপকর্ত্তা—পরার্থী, কখনও কবি, সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক প্রত্নতাত্ত্বিক, জড়দার্শনিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংবাদিক, বৈমানিকা কখনও চারণ, কখনও গায়ক, নর্ত্তক, বাদক, কথক, কখনও বা পেটভিখারী, কখনও দুভিক্ষ-পীড়িত, কখনও ভূমিকম্পে, বন্যায় গৃহহীন, স্বজন-হীন, সম্পদ্ হীন, কখনও কৃষক, কখনও শ্রমিক, কখনও ধনিক, কখনও জড়প্রেমিক—কতরূপে আমরা সম্ভোগে মত্ত হইয়া কৃষ্ণজন্মের আবশ্যকতা অস্বীকার করিতেছি।

কৃষ্ণের জন্মের সহিত আমাদের কোন সম্বন্ধই রাখি নাই। আমাদের জন্মমরণমালাই আমাদিগকে পাইয়া বসিয়াছে। আমরা জীব-জন্তু বা মানবের জন্ম ও মৃত্যুর হার গণনা করিতেছি, বন্যা ও দুর্ভিক্ষের সংবাদ লইয়া ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িতেছি, আবার সুখে থাকিবার সময় নানাপ্রকার স্থূল ও সূক্ষ্ম সম্ভোগ-পিপাসায় প্রমত্ত হইয়া উঠিতেছি; আমাদের হৃদয়ে সম্ভোগের অসুর প্রতিমুহূর্ত্তে জন্মগ্রহণ করিতেছে, কৃষ্ণের জন্মে আমাদের প্রয়োজন কি?

বিশুদ্ধসত্ত্ব অর্থাৎ বসুদেবের ন্যায় হৃদয় না হইলে অজ ভগবান্ বাসুদেব আবির্ভূত হন না। আমরা এ সকল কথায় মুহূর্ত্তের জন্য কানও দিই না, কান দেওয়া কোন প্রয়োজনও মনে করি না। শাস্ত্রের শাসন-বাণীগুলিকে শিশুগণের উপযোগী জুজুর ভয় দেখাইবার মেয়েলী ছড়ার মত মনে করি! প্রত্যক্ষ আপদ-বিপদে পতিত হইয়া সাময়িক বিভীষিকায় নিষ্পেষিত হই বটে; কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই 'কুকুরের লেজ বাঁকিয়া যায়'!

কখনও আস্তিকের সজ্জায়, কখনও নৈতিকের সজ্জায়, কখনও নাস্তিকের সজ্জায় কৃষ্ণজন্মকে অস্বীকার করিয়া থাকি। গীতার ''অজোঽপি সন্নব্যায়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্। প্রকৃতিং—স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্ম-মায়য়া।। জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ। ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জ্জুন।।''

(৪।৬, ৯) প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণ-বাণীসমূহের আস্তিক বলিয়া পরিচয় দিয়াও বিকৃত অর্থ করিয়া থাকি—অজের নিত্য জন্মলীলার অপ্রাকৃতত্ত্ব স্বীকার করিতে না পারায় আমাদের আস্তিকত্বের অভিমান যে প্রচ্ছন্ন নাস্তিকত্বে পর্য্যবসিত হইয়া যায়, তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারি না, আস্তিক অভিমান করিয়া সর্ব্বশক্তিমান্ অবিচিন্ত্য-শক্তিযুক্ত স্বরাট্ লীলাপুরুষোত্তমকে আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধির গণ্ডির অন্তর্গত করিতে চাহি। আবার নৈতিক হইয়া বলি,—নীতি-দ্বারা জাগতিক সুবিধাবাদ সংরক্ষিত হয় বলিয়া নীতিই ঈশ্বর—পৃথক্ ঈশ্বরের প্রয়োজন নাই। আবার ঈশ্বর মুখে স্বীকার করিলেও শ্রীকৃষ্ণই যে পরাৎপর স্বয়ংরূপ ভগবান্ তাহা স্বীকার করিলে সাম্প্রদায়িকতা হইয়া যাইবে, সুতরাং বহু তথাকথিত ধার্ম্মিক অর্থাৎ জাগতিক সুবিধাবাদীর সহিত পাংক্তেয় থাকিবার জন্য একমেবাদ্বিতীয়ম্ পরব্রহ্মের পক্ষপাতিত্ব পরিত্যাগ করিলে কোন ক্ষতি-বৃদ্ধি নাই ভাবিয়া লই।

সম্ভোগ-বাদের অসংখ্য আবিলতার ঝোপ-জঙ্গল, উইয়ের ঢিবি, কাঁটা ও ভোগ-বাসনার জন্ম-জন্মান্তরের রুদ্ধ পচা জল প্রভৃতি অপ্রয়োজনীয় বস্তুগুলি সরাইতেই আমাদিগকে সাধুগণের অসংখ্য উপদেশ ও প্ররোচনা প্রদান করিতে হয়। আমাদের বিশুদ্ধসত্ত্বে কৃষ্ণের জন্মশোভার বৈচিত্র্য দেখিবার আর সময় থাকে কই ? কৃষ্ণ জন্মের রাজ্যে কত অফুরন্ত বৈচিত্র্য আছে, কৃষ্ণের স্বারাজ্যে মুক্ত আত্মার কত চমৎকারময়ী স্বাধীনতার পরাকাষ্ঠা আছে, কত সেবানন্দ ব্রহ্মানন্দকেও তিরস্কার করিয়া তাহার মস্তকে নৃত্য করিতেছে, তাহা আর আমাদের দেখিবার সুযোগ হইল কই ? আমরা পশুপক্ষীর, ইতর প্রাণীর সম্ভোগবাদে আত্ম হারাইয়া ফেলিলাম, না হয় সাধুত্ব ও ধার্ম্মিকতা বলিতে পশু-জীবন হইতে সামান্য নিষ্কৃতি লাভকেই মানবজীবনের সার্থকতা মনে করিয়া লইলাম; মানব-জীবনের চরমফল যে কৃষ্ণজন্ম, তাহা শিক্ষা দিবার মত লোক যেরূপ সুবিরল, আমাদের বহির্ম্মুখতার স্তূপ ও তদ্রূপই দুর্লঙ্ঘ্য।

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীবসুদেব- দেবকীর পুত্ররূপে আবির্ভূত হইলেও প্রাকৃত ব্যক্তির ন্যায় চরমধাতু প্রভৃতিতে প্রবিষ্ট হইয়া জন্মগ্রহণ করেন না। সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ বিশুদ্ধসত্ত্ব ও তদ্বৃত্তিরূপা দেবকী-বসুদেবের অপ্রাকৃতসত্ত্বে আবিষ্ট হইয়া জন্ম-লীলা আবিষ্কার করেন। তজ্জন্যই শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।২।১৯) বলা হইয়াছে যে, পূর্ব্বদিক্ যেরূপ আনন্দকর চন্দ্রকে ধারণ করে, তদ্রূপ দেবকী-দেবী বসুদেব কর্ত্তৃক বৈধ-দীক্ষাবিধানে সমর্পিত জগন্মঙ্গল সর্ব্বাংশ-পরিপূর্ণ সর্ব্বমূল-স্বরূপ সর্ব্বসুখনিদান শ্রীহরিকে মনোমধ্যে পুত্ররূপে ধারণ করিয়াছিলেন। বাৎসল্য-প্রেম-হেতুই শ্রীবসুদেব-দেবকীতে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব ঘটিয়াছিল।

শ্রীকৃষ্ণের জন্ম যে প্রাকৃত ব্যক্তির জন্মের ন্যায় নহে, তাহার আর একটি প্রমাণ এই যে, প্রাকৃত জন্মশীল শিশু সর্ব্বতোভাবে দিগ্‌বসন হইয়াই মাতৃকুক্ষি হইতে ভূমিষ্ঠ হয়; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ যখন আবির্ভূত হইলেন, তখন ভাগবতীয় বর্ণনাতে দেখা যায় যে, তিনি চতুর্ভূজ শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধৃক্, কিরীট-কুণ্ডলাদি নানাপ্রকার ভূষণে বিভূষিত, অপরিমিত কেশদামযুক্ত ও পীত-বসন-পরিহিত। প্রাকৃত বালক কখনও মাতৃকুক্ষি হইতে বসনাদি-পরিহিত বা অলঙ্কারাদি-বিভূষিত হইয়া জন্মগ্রহণ করে না। ইহা দ্বারা কৃষ্ণের নাম-রূপের ন্যায় অলঙ্কার-বিভূষণাদিরও নিত্যত্ব ও অপ্রাকৃতত্ব প্রমাণিত হইয়াছে।

শ্রীভগবানের এইরূপ চতুর্ভূজরূপে আবির্ভাবের কারণ শ্রীভগবান্ স্বমুখে জানাইয়াছেন। দ্বিভুজই তাঁহার স্বরূপ, কেবলমাত্র ঐশ্বর্য্যজ্ঞানমিশ্র-বাৎসল্যরসরসিকদ্বয়কে পূর্ব্ব-জন্মের কথা স্মরণ করাইবার জন্যই তিনি চতুর্ভূজরূপ প্রকট করিয়াছিলেন।

যে সময় জীব কৃষ্ণোন্মুখ হন, সেই সময়ই শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার হৃদয়ে আবির্ভূত হন। জীবের তমসাচ্ছন্ন হৃদয়-নিশার মধ্যভাগে বর্ষাকালে শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপায় প্রতিবর্ষে শ্রীকৃষ্ণের উদয় হয়। বর্ষাকালেই হরিশয়ন ও ভাদ্র স্পৃষ্টাষ্টমীর মধ্যরাত্রে তাঁহার প্রকট কাল। 'জয়শ্রী' বৃষভানুনন্দিনী শুক্লাষ্টমী দিবসে মধ্যাহ্নে প্রতিবর্ষে আবির্ভূত হন। কৃষ্ণজন্মদিনের পক্ষান্তে তাঁহার আবির্ভাব দিবস নিত্যকাল বর্ত্তমান আছে। শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব কেবলমাত্র ঐতিহাসিক সত্য নহে—ইহা নিত্য সত্য।

শ্রীকৃষ্ণ ও জয়শ্রী মিলিততনু শ্রীগৌরসুন্দর। তিনি অচৈতন্য জীবের হৃদয়ে কৃষ্ণের আবির্ভাব করাইয়া চৈতন্যদানের জন্য কৃষ্ণ হইয়াও কৃষ্ণের সর্ব্বোত্তম সেবকের ভাব ও কান্তি লইয়া কৃষ্ণের পূর্ণ সম্ভোগের দিনে অর্থাৎ দোলপূর্ণিমাতে আবির্ভূত হন। শ্রীগৌরসুন্দর কৃষ্ণের সম্ভোগ ও কৃষ্ণসেবকের বিপ্রলম্ভময় ভজন শিক্ষা দিবার জন্যই সম্ভোগমূর্ত্তি হইয়াও বিপ্রলম্ভের ভাব ও কান্তি লইয়া আবির্ভূত হইয়াছেন, তাই শ্রীকৃষ্ণজন্মবাসরে গৌড়ীয় আচার্য্যবর শ্রীল দামোদর স্বরূপ প্রভুর অনুগবরের শ্রীচরণপরাগ মস্তকে ধারণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাবের জয়গাথা গানের যোগ্যতা ভিক্ষা করিতেছি—

"যদদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষদি তদপ্যস্য তনুভা য আত্মান্তর্যামী পুরুষ ইতি সোঽস্যাংশবিভবঃ।
ষড়ৈশ্বর্য্যৈঃ পূর্ণো য ইহ স স্বয়ময়ং ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাজ্জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ।।"

সকল ত্যাগ করিয়াও কি ত্যাগ করা যায় না

সকল ত্যাগ করিয়াও যাহা ত্যাগ করা যায় না, তাহা হয় পরমার্থ, না হয় পরম অনর্থ। পরমার্থপিপাসু পরমার্থের জন্য—কৃষ্ণসেবা-লাভের জন্য সমস্ত পরিত্যাগ করেন; কিন্তু পরমার্থ বা কৃষ্ণসেবাকে ঐ সমস্তের অন্তর্গত করেন না, অর্থাৎ যাঁহার জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ, তাঁহাকে ত্যাগ করিতে পারেন না। যাঁহারা সমস্ত ত্যাগ করিতে গিয়া হরিসেবা বা পরমার্থকেও ত্যাগ করিয়া ফেলেন, তাঁহাদিগকে 'মায়াবাদী', 'শূন্যবাদী' প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হয়। সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়াও যে-বস্তু ত্যাগের যোগ্য নহে, তাহাই প্রকৃত পরমার্থ-পদবাচ্য।

অনর্থই ত্যাগের বস্তু। 'অর্থঃ-শব্দের অর্থ—প্রয়োজন; যাহা অপ্রয়োজনীয় বস্তু, তদ্দ্বারা শরীরের পুষ্টি-তুষ্টিরূপ প্রয়োজন সিদ্ধ হয়; কিন্তু খাদ্যের অসারভাগ পুরীষ স্বাস্থ্যের পক্ষে অপ্রয়োজনীয় বলিয়া তাহা পরিত্যাগের বস্তু, তাহা পরিত্যক্ত না হইলে শরীরে গ্লানি উপস্থিত হয়। আত্মশরীর বা চিন্ময় শরীরের পক্ষেও তদ্রূপ প্রয়োজনীয় ও অপ্রয়োজনীয় ব্যাপারসমূহ দেখিতে পাওয়া যায়। যাহা চেতনশরীর বা আত্মার স্বাস্থ্যের

পক্ষে পরম প্রয়োজনীয়, তাহাই পরমার্থ, আর যাহা চেতনশরীরের পক্ষে অপ্রয়োজনীয়, তাহাই অনর্থ। এই অনর্থগুলি মল-মূত্রাদির ন্যায় পরিত্যাগের বস্তু। সকল অনর্থ পরিত্যাগ করিয়াও যে অনর্থটিকে পরিত্যাগ করা যায় না, তাহাই পরম অনর্থ; উহা কি? শাস্ত্র বলেন,—

সর্ব্বত্যাগেঽপ্যহেয়া যাঃ সর্ব্বানর্থভুবশ্চ তে।
সুর্য্যুঃ প্রতিষ্ঠাবিষ্ঠায়া যত্নমস্পর্শনে বরম্।।

(হঃ ভঃ বিঃ ২০শ বিলাস, ৯৮ সংখ্যা)

তাৎপর্য্য—সর্ব্বত্যাগ করিয়াও যাহা ত্যাগ করিতে পারা যায় না, যাহা নিখিল অনর্থের কারণ, তাহা প্রতিষ্ঠাবিষ্ঠা, তাহা যাহাতে স্পর্শ না হয়, তদ্বিষয়ে যত্ন করা উচিত।

কোন কোন মহাজন প্রতিষ্ঠাশাকে শূকরের বিষ্ঠার সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন। বিষ্ঠা অপ্রয়োজনীয় ও পরিত্যাগের বস্তু; কিন্তু তাহা পরিত্যক্ত হইলেও আবার জীববিশেষের প্রয়োজনীয় ও গ্রহণীয় হইয়া দাঁড়ায়। কুক্কুর-শূকরাদি প্রাণী সেই সকল অসার-ভাগকেই প্রয়োজনীয় সারভাগ বলিয়া গ্রহণ করে। প্রতিষ্ঠাশার প্রভাবও ঐরূপ। সকল অনর্থ ত্যাগ করিয়াও ইহাকে ত্যাগ করা যায় না। লোক যখন ধার্ম্মিক হইবার জন্য অগ্রসর হন, তখন ''অর্থমনর্থং ভাবয় নিত্যং'' বলিতে বলিতে অর্থকে ত্যাগ করেন, ''কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ'' বলিতে বলিতে স্ত্রী পুত্রও পরিত্যাগ করিয়া ফেলেন, তথাপি তিনি যে কামিনীকাঞ্চন পরিত্যাগ করিয়া ত্যাগী হইয়াছেন—এই গর্ব্বটি পরিত্যাগ করিতে পারেন না!

জগতে দেখিতে পাওয়া যায়,—যশের আকাঙ্ক্ষায়—সম্মানের লোভে মানুষ কি না করিয়া থাকে। বালক হইতে বৃদ্ধ পর্য্যন্ত যে-কোন মানবের, এমন কি, কোন কোন বিকশিতজ্ঞান পশুর মনস্তত্ত্ব আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, সকলেই যশের লোভে তাহাদের প্রিয়তম প্রাণকেও তুচ্ছ করিতে পারে। ক্ষুদ্র শিশুকে যদি ভাল বলা যায়, গৃহপালিত কুক্কুরাদি ইতর জন্তুকে যদি আদর করা যায়, অমনি তাহাদের দ্বারা অনেক কিছু দুষ্কর কার্য্যও করান' যাইতে পারে। আবার তাহাদিগকেই মন্দ বলিলে তাহারা এরূপ রুষ্ট হইয়া পড়ে যে, তাহাদের দ্বারা অনেক অভাবনীয় লোমহর্ষক ঘটনাও সংঘটিত হইয়া থাকে। যশের লোভে বিদ্যালয়ের ছাত্র জীবন পণ করিয়া অধ্যয়ন করে, সম্মানের লোভে বিশ্ব-সন্তরণ-প্রতিযোগিতা দেখাইতে গিয়া অনেকে সলিল-সমাধি লাভ করে, যশের আকাঙ্ক্ষায় মত্ত হইয়া অনেকে মত্ত সিংহ, ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্র জন্তুর করাল বদনের মধ্যে মস্তক প্রবেশ করাইতেও দ্বিধা বোধ করে না, প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষায় প্রমত্ত হইয়া লোক যুদ্ধ ক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জ্জন করে, গণ-মতের অভিনন্দন পাইবার জন্য লোক প্রবল রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে অভিযান করিয়া কারাবরণ করিয়া থাকে; এমন কি, আধুনিক যে সন্ত্রাসনবাদ এক মহাসমস্যার প্রতীকরূপে উপস্থিত হইয়াছে, তাহার মূলেও রহিয়াছে প্রতিষ্ঠাশার প্রবল প্রেরণা। মানুষ জীবিতাবস্থায় যশের ডালি ভোগ না করিয়াও মৃত্যুর পরে গৌরবলাভের জীবনবীমা করিয়া যাইতে চাহে! প্রতিষ্ঠাশার এইরূপ প্রভাব! কামিনী-কাঞ্চন-স্পৃহার দৌড় বা পরমায়ু মানুষের জীবনকাল পর্য্যন্ত, কিন্তু প্রতিষ্ঠাশা মৃত্যুর পরেও বাঁচিয়া থাকে;

এই জন্যই জাগতিক নীতিবিদ্‌গণ বলেন,—"কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি।" এই নীতিতে প্রলুব্ধ হইয়া মানুষ আত্মবলি দিতে কুণ্ঠিত হয় না। যদিও জীবিতাবস্থায় সেই যশোগৌরব তিনি ভোগ করিতে পারিবেন না, ইহা তিনি বিলক্ষণ জানেন, তথাপি তাঁহার অবর্ত্তমানে ভবিষ্যৎকালে তাঁহার যে যশঃ হইবে, বর্ত্তমানে তাহারই মানসিক ভোগে প্রমত্ত হইয়া তিনি যশঃক্রয় করিবার জন্য মৃত্যু পণ করিয়া থাকেন! এইরূপ প্রেরণায় প্রমত্ত হইয়া কেহ গ্রন্থকর্ত্তা, কেহ সাহিত্যিক, কেহ কবি, কেহ শিল্পী, কেহ বা সমুদ্রের অতলগর্ভের সন্ধানকারী, কেহ বা গৌরীশঙ্কর-শৃঙ্গের অভিযানকারী, কেহ বা উত্তরমেরু-দক্ষিণমেরু-আবিষ্কারকারী, কেহ হিংস্রজন্তুবহুল অরণ্যানীর মধ্যে জীবনপণকারী হইয়া পড়েন।

কেহ কেহ বলিতে পারেন,—প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা অপেক্ষা মানবজাতির উপকারের স্পৃহা বা পরার্থিতাই ঐ সকল অভিযানকারীকে তত্তৎ কার্য্যে প্রণোদিত করিয়াছে। আজ যদি দুঃসাহসিকতায় প্রণোদিত না হইয়া পর্ত্তুগালের নাবিক ভাস্কডিগামা উত্তমাশা-অন্তরীপের পথ আবিষ্কার না করিতেন, ইটালীর নাবিক কলম্বস ভারতবর্ষের পথ অনুসন্ধান করিতে গিয়া আমেরিকা আবিষ্কার না করিতেন, আজ যদি উত্তর মেরুর ও দক্ষিণ মেরুর সন্ধান করিতে গিয়া ন্যান্‌সেন্ (Nansen), পিয়ারী (Peary), স্কট (Scott), রস্ (Ross), স্যাক্‌ল্টন (Shakleton), এমণ্ডসেন (Amundsen) প্রভৃতি অভিযানকারিগণ প্রাণপণ না করিতেন, আজ যদি ভিক্টোরিয়া-জলপ্রপাত, অষ্ট্রিয়ার মরুভূমি-অঞ্চল এবং বিভিন্ন দেশের বন-জঙ্গল, পাহাড়-পর্ব্বত, নদী, হ্রদ, দ্বীপ প্রভৃতি আবিষ্কৃত না হইত, তাহা হইলে মানবের শিক্ষা, সভ্যতা সকলই সঙ্কীর্ণ থাকিয়া যাইত; অতএব যাঁহারা আবিষ্কার-কর্ত্তা বা অভিযানকারী, তাঁহারা যে কেবল প্রতিষ্ঠাশায় তত্তৎকার্য্যে প্রণোদিত হইয়াছেন, ইহা বলা যায় না। হোমিওপ্যাথির আবিষ্কর্ত্তা ডাক্তার সামুয়েল হ্যানিমান নিজের শরীরের উপর কতই না বিষ প্রয়োগ করিয়া ভাবী মানবজাতির উপকারের ধ্যান করিয়া গিয়াছেন; উঁহাকে কি কেবল প্রতিষ্ঠাশা-প্রণোদিত ব্যাপার বলা যাইবে? অধ্যাপক চার্ল্‌স্ ও তাঁহার সহকারী রবার্ট্ যখন হাইড্রোজেন বেলুনে চড়িয়া প্রথম আকাশে উঠিয়া ছিলেন, তখন তিনি জীবন পণ করিয়াই ঐ কার্য্য করিয়া ছিলেন; কিন্তু তখন কে জানিত যে, পরবর্ত্তিকালে এয়ারশিপ্ ও য়্যারোপ্লেন আবিষ্কৃত হইয়া সভ্য-জগতে যুগান্তর উপস্থিত করিবে? বৈজ্ঞানিকগণ জগতের সম্মুখে এক একটি আবিষ্কার প্রকাশিত করিতে গিয়া মার্টারের (Martyr) মত প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছেন! ইঁহাদের চেষ্টাসমূহ কি প্রতিষ্ঠাশা-প্রণোদিত?

আমাদের মস্তিষ্ক জাগতিক সুবিধাবাদের চিন্তায় ভরপুর; সেখানে অন্য কোন সুসূক্ষ্ম চিন্তার তিলধারণেরও স্থান নাই। এই বিরাট্ বহির্ম্মুখ মানবজাতির ধারণায় যাহা পরার্থিতা-প্রণোদিত বলিয়া মনে হয়, তাহার ফল যখন সম্পূর্ণভাবে পরমেশ্বরের উদ্দেশ্যে উদ্দিষ্ট না হয়, তখন তাহাতে যতই পরার্থিতার বাহ্য রূপ-লাবণ্য থাকুক না কেন, তাহা ব্যষ্টি হইতে সমষ্টির সুবিধাবাদে ব্যাপ্ত হইয়া প্রতিষ্ঠাশারই অবগুণ্ঠিত মূর্ত্তি। মানব কখনও আপনাতে সকল বহির্ম্মুখ আমিত্ব গুটাইয়া লইয়া বা সঙ্কীর্ণ করিয়া যশঃ বা সম্মান ভোগ করে, কখনও বা সেই প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষী আমিত্বকে প্রসারিত করিয়া অর্থাৎ কোন বিশেষ জাতি, দেশ, অথবা সমগ্র বিশ্বের সঙ্গে

সাযুজ্য লাভ করাইয়া যশোগৌরবের ভোগ আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকে; বরং আমিত্ব-প্রসারিত শেষোক্ত সম্মানের আকাঙ্ক্ষাটি আরও বিরাট্—আরও ব্যাপক।

সমষ্টি বা জাতির পরার্থিতার প্রতি চেষ্টা না থাকিলে সমষ্টি বা সমগ্র মানবজাতি কোন বিশেষ ব্যক্তিত্বকে একাধিপতি করিয়া কেনই বা প্রতিষ্ঠাশুল্ক প্রদান করিবেন? এখন ঐ পরার্থিতা অহৈতুকী কি না, তাহাই প্রশ্নের বিষয়। যে-সকল সুবৈজ্ঞানিক সুসূক্ষ্ম আত্মবিচারের রঞ্জন-রশ্মিদ্বারা এই পরার্থিতা-প্রতীকের অন্তর দর্শন করিতে পারিয়াছেন, তাঁহারা বলেন,—যে পরার্থিতার ফল পুরুষোত্তমের ভোগ্য না হইয়া জীব বা জাতিবিশেষের ভোগ্য হইয়াছে, সেই পরার্থিতা কখনও অহৈতুকী হইতে পারে না; উহা "গরু মারিয়া জুতা-দান" ন্যায়ে প্রতিষ্ঠিত। ভারতীয় ঋষি ছাগলাদ্য ঘৃতের আবিষ্কারই করুন আর শর্ম্মন্‌দেশের ঋষি হ্যানিমান্ নিজের প্রাণ পণ করিয়া মানব জাতির জন্য নূতন চিকিৎসাবিজ্ঞান অবিষ্কারই করুন, উহা দ্বারা অন্য প্রাণিজাতির পরার্থিতার পরিবর্ত্তে নিষ্ঠুরতা হইয়া পড়িয়াছে। হোমিওপ্যাথির মধ্যেও এমন সকল মূল অরিষ্ট (ক্যান্থারিস্ প্রভৃতি)আছে—যাহা ইতর প্রাণীর প্রাণ কোন না কোন ভাবে ধ্বংস না করিলে সুলভ্য নহে। ভারতীয় আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য চরক, কিম্বা ডাক্তার হ্যানিমান্ কাহারও মানবজাতিকে প্রাণ দিবার বা একটি পিপীলিকা পর্য্যন্ত সৃষ্টি করিবার সামর্থ্যের কথা শুনা যায় না। তাঁহাদের কোন বিশেষ ব্যাধির প্রাবল্য উপশম করিবার ক্ষমতা অনেক ক্ষেত্রে পরিদৃষ্ট হইয়াছে মাত্র; কাজেই যেখানে তাঁহারা পরার্থিতা-প্রণোদিত হইয়া এক জাতির উপকার করিতে গিয়া আর একজাতির ন্যূনাধিক অপকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন, এমন কি অনেক সময় জড়চিকিৎসা-বিজ্ঞান এক মানবের উপকার করিতে গিয়া অপর মানবের রক্তশোষণ—এমন কি প্রাণ হরণ করিতে বাধ্য হয়, সেখানে ঐরূপ সাম্প্রদায়িকতাদুষ্ট পরোপকার-চিকীর্ষা বাহ্যমূর্ত্তিতে 'পরার্থিতা' বলিয়া মনে হইলেও তন্মধ্যে প্রতিষ্ঠাশার গুপ্ত মাদকতা ও প্রেরণা আছে।

আমরা যখন ভূতগ্রস্ত হই, তখন নিজেরা তাহা বুঝিতে পারি না; ইহারই নাম—মায়া। আর্থিক ক্ষেত্র দূরে থাকুক, যখন পরমার্থ-পথের পথিক বলিয়া পরিচয় দিই, তখনও লাভ পূজা-প্রতিষ্ঠাদি অনর্থে অভিভূত হইয়া আমরা আমাদিগকে উহাদের দ্বারা গ্রস্ত বলিয়া বুঝিতে পারি না। কামিনী-কাঞ্চন-ত্যাগী ফল্গুবৈরাগীর নিকট যান, তাহাকে কিছুতেই বুঝাইতে পারিবেন না যে, তিনি সকল ত্যাগ করিয়াও প্রতিষ্ঠাশা ত্যাগ করিতে পারেন না। হয় ত' বৈরাগীর বেশ লইয়াছি, বহির্বাস পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়াছি, ব্রজের (?) বনে বনে মাধুকরী মাগিয়া খাইতেছি, ধাতু-দ্রব্য স্পর্শ করি না, শিষ্য করি না, কুটীর বাঁধি না, কোন স্থানে এক দিবসের অধিক থাকি না—বাহ্যদৃষ্টিতে সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ (!), নিষ্কিঞ্চন (!!); কিন্তু এত ত্যাগ করিয়াও ধাতুদ্রব্য স্পর্শ না করা—শিষ্য করা—কুটীরে বাস না করা প্রভৃতির প্রতিষ্ঠাটি ত্যাগ করিতে পারি নাই। এইজন্যই শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন যে, সকল ত্যাগ করিলেও যাহা ত্যাগ করা যায় না, অথচ যাহা সকল অনর্থের জননী, তাহাই প্রতিষ্ঠাশা।

প্রতিষ্ঠাশার কেরামতই এই যে, ইহা যাহাকে পাইয়া বসে, পিশাচী-গ্রস্তের ন্যায় সে তাহা বুঝিতে পারে না। আর্থিক সাহিত্যিকগণও এজন্য ইহাকে এইরূপভাবে বর্ণনা করিতে বাধ্য হইয়াছেন,—"Last remains of noble Mind"—মহদন্তঃকরণ সমস্ত পরিত্যাগ করিয়াও ইহাকে পরিত্যাগ করিতে পারে না। জাগতিক পরার্থি-সম্প্রদায়ের অন্তর মহৎ—এ বিষয়ে কোন প্রতিবাদ নাই; কিন্তু সেই মহদন্তঃকরণও প্রতিষ্ঠাশার কাছে দাসখৎ না লিখিয়া পারে না।

যাহা পরিত্যাগ করা যায় না, তাহা লইয়া মারামারি করিবার দরকার কি? যখন পরিত্যাগই করা যাইবে না, তখন পরিত্যাগ না করিয়া তাহার সদ্ব্যবহার করিবার কোন উপায় আবিষ্কারের চেষ্টাই সর্ব্বাপেক্ষা বুদ্ধিমানের কার্য্য। কিন্তু এই আবিষ্কার-কার্য্যটি আমাদের নিজের পরিকল্পনা বা মতলব-অনুসারে করিতে গেলে এক বিপদ্ এড়াইয়া আবার আর একটি ভীষণতর বিপদে পড়িতে হইবে। তাই এ বিষয়ে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞগণ যে প্রণালী জানাইয়াছেন, তাহার অনুসরণ করাই শ্রেয়ঃ। পূর্ব্বেই আমরা বলিয়াছি,—সকল ত্যাগ করিলেও যাহা কিছুতেই ত্যাগ করা যায় না, তাহা হয় পরমার্থ,—না হয় অনর্থ। প্রতিষ্ঠাকে পরম অনর্থ না করিয়া পরমার্থে পর্য্যবসিত করিবার কোন উপায় আছে কি না, তাহাই এখন অনুসন্ধানের বিষয়। মহাজনের গীতিতে এই সমস্যার একটি সুন্দর সমাধান আছে,—

জড়ের প্রতিষ্ঠা, শূকরের বিষ্ঠা,
জান না কি তাহা মায়ার বৈভব
বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠা, তা'তে কর নিষ্ঠা,
তাহা না ভজিলে লভিবে রৌরব।।

জড়ের প্রতিষ্ঠাই বিষ্ঠাভোজী শূকরে বিষ্ঠার ন্যায় পরিত্যাগের বস্তু; কিন্তু তাহা হরিবিমুখ জগৎ—যাহাকে শ্রীমদ্ভাগবত বিড়্বরাহ বা গ্রাম্য শূকরের সহিত তুলনা করিয়াছেন, সেই জগতের নিকট পরম লোভনীয় খাদ্য। এই জন্যই তাহাকে মায়ার বৈভব বলা হইয়াছে। মায়িক রাজ্যে এত বড় বৈভব আর কিছুই নাই।

যাঁহারা সকল বস্তুকে হরিসেবার উপকরণ করিতে পারিয়াছেন, সকল ব্যাপারকে পরমার্থ করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট প্রতিষ্ঠাও হরিসেবার উপকরণ বা পরমার্থ হইয়াছে। ইহারই নাম—বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠা, ইহাতেই নিষ্ঠা করিতে হইবে। ইহাতে নিষ্ঠা না থাকিলে কখন ভোগের, কখনও বা নাস্তিকতাময় ত্যাগের পাদগোলক হইয়া পড়িতে হইবে! "আমি হরিসেবকগণের জুতাবরদার,"—এই প্রতিষ্ঠা যাহাদের হৃদয়ে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, যাহারা অন্যান্য অনর্থ-ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে এইরূপ হরিসেবার অনুকূল অভিমানকেও অনর্থের অন্যতম মনে করিয়া ত্যাগ করিবার জন্য প্রস্তুত, তাহারা কখনও সুদৃঢ় শ্রদ্ধার সহিত হরিসেবাকেই একমাত্র প্রয়োজন বলিয়া বরণ করিতে পারে নাই। এজন্য ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর প্রেমকল্পবৃক্ষের মালাকাররূপে বলিয়াছেন,—

অতএব সব ফল দেহ' যারে তারে।
খাইয়া হউক লোক অজর অমরে।।
জগৎ ব্যাপিয়া মোর হ'বে পুণ্যখ্যাতি।
সুখী হইয়া লোকে মোর গাহিবেক কীর্ত্তি।।

(চৈঃ চঃ আ ৯।৩৯-৪০)

আবার শ্রীগৌর-রামানন্দ-সংবাদে শুনিতে পাই,—

কীর্ত্তিগণ মধ্যে জীবের কোন বড় কীর্ত্তি?
'কৃষ্ণভক্ত' বলিয়া যাঁহার হয় খ্যাতি।।

(চৈঃ চঃ ম ৮।২৪৫)

কৃষ্ণের সেবকাভিমানই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যশোগৌরব। বৈষ্ণবের পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রতিষ্ঠা অনুগমন করে বলিয়া তাহাকে অনিত্য বা মায়িক বৈভব মনে করিতে হইবে না—

বৈষ্ণবের পাছে, প্রতিষ্ঠাশা আছে,
তা'ত কভু নহে অনিত্য বৈভব।
সে হরি-সম্বন্ধ, শূন্য মায়াগন্ধ,
তাহা কভু নয় জড়ের বৈভব।।

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীর প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন,—

প্রতিষ্ঠার স্বভাব এই জগতে বিদিত।
যে না বাঞ্ছে, তা'র হয় বিধাতা-নির্ম্মিত।।
প্রতিষ্ঠার ভয়ে পুরী রহে পলাঞা।
কৃষ্ণপ্রেমে প্রতিষ্ঠা চলে সঙ্গে গড়াঞা।।

(চৈঃ চঃ মঃ ৪।১৪৬-১৪৭)

শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরী কৃষ্ণসেবার ছলনায় বা প্রতিষ্ঠা ত্যাগের ছলনায় প্রতিষ্ঠা-আহরণের কোন অন্তর্নিহিত কপট চেষ্টা প্রদর্শন করেন নাই; কাজেই যাঁহারা তাঁহার অনুকরণ করেন, তাঁহারা প্রতিষ্ঠা-ত্যাগের ছলনায় প্রতিষ্ঠা আহরণেরই অভিসন্ধি লইয়া ভাবের ঘরে চুরি করিয়া থাকেন। এইজন্য মহাজন গাহিয়াছেন,—

কীর্ত্তন ছাড়িব, প্রতিষ্ঠা মাখিব,
কি কাজ ঢুঁড়িয়া তাদৃশ গৌরব।

মাধবেন্দ্রপুরী, ভাবঘরে চুরি,
না করিল কভু সদাই জানব।।
তোমার প্রতিষ্ঠা, শূকরের বিষ্ঠা,
তা'র সহ সম কভু না মানব।
মৎসরতাবশে, তুমি জড়রসে,
মজেছ ছাড়িয়া কীর্ত্তনসৌষ্ঠব।।

জড়-প্রতিষ্ঠাশা মৎসরতার জন্মভূমি। পরের উৎকর্ষ বা উন্নতি যাহারা সহ্য করিতে পারে না, তাহারাই মৎসর। অপরের উন্নতি হইলে—অপরের প্রতিষ্ঠা হইলে পাছে নিজের আপেক্ষিক জড়প্রতিষ্ঠার পরিমাণ টুকু ম্লান হইয়া পড়ে, এজন্য আমরা পরের ভাল শুনিতে পারি না। আর্থিক ক্ষেত্র দূরে থাকুক, পারমার্থিকরাজ্যে প্রবেশের অভিনয় করিয়াও অপরের পারমার্থিক উন্নতির কথা শুনিলে কাহারও কাহারও বক্ষে যেন শেল বিদ্ধ হয়। যখনই কাহারও এরূপ চিত্তবৃত্তি উদিত হয়, তখনই জানিতে হইবে,—তাহার হৃদয়ে বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠার লেশমাত্রও উদিত হয় নাই, হৃদয় জড়প্রতিষ্ঠায় আচ্ছন্ন হইয়াছে। কারণ, ভাগবতধর্ম্ম বা বৈষ্ণবধর্ম্ম পরম নির্ম্মৎসর সাধুদিগেরই ধর্ম্ম। যেখানে এক গুরুভ্রাতা, আর এক গুরুভ্রাতার পারমার্থিক উন্নতি কিম্বা হরি-গুরুসেবায় অধিকতর নৈপুণ্যের কথা শুনিয়া প্রফুল্ল হইবার পরিবর্ত্তে ব্যথিত ও ম্লান হইয়া পড়েন, সেখানে জানিতে হইবে জড় প্রতিষ্ঠাশা-পিশাচী ধৃষ্টা শ্বপচরমণী তাঁহার হৃদয় অধিকার কহিয়াছে। তাই মনঃশিক্ষায় শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভু আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন,—

প্রতিষ্ঠাশা ধৃষ্টা শ্বপচরমণী মে হৃদি নটেৎ
কথং সাধু প্রেমা স্পৃশতি শুচিরেতন্ননু মনঃ।
সদা তৎ সেবস্ব প্রভুদয়িতসামন্তমতুলং
যথা তাৎ নিষ্কাশ্য ত্বরি তমিহ তৎ বেশয়তি সঃ।।

শ্রীরাধাষ্টমী

আগামীকল্য শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী-উৎসব। শ্রীরাধা গৌড়ীয়েরই একমাত্র উপাস্য দেবতা—একমাত্র বলিবার কারণ এই যে, গৌড়ীয় না হইলে শ্রীরাধার ভজনের যোগ্যতা-লাভ বা মর্ম্ম-উপলব্ধি কোনওটিই হয় না। গৌড়ীয়া-নাথ এই গূঢ়তম ভজন-রহস্য জগতে অবিষ্কার করিয়াছেন,—

প্রেমা নামাদ্ভূতার্থঃ শ্রবণপথগতঃ কস্য নাম্নাং মহিম্নঃ
কো বেত্তা কস্য বৃন্দাবনবিপিন-মহামাধুরীষু প্রবেশঃ।

কো বা জানাতি রাধাং পরমরসচমৎকারমাধুর্য্যসীমা-

মেকশ্চৈতন্যচন্দ্রঃ পরমকরুণয়া সর্ব্বমাবিশ্চকার।।

(চৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ১০।১৩০)

'প্রেম' নামক পরম পুরুষার্থ কাহারই বা শ্রবণগোচর হইয়াছিল? কেই বা শ্রীনামের মহিমা জানিত? কাহারই বা বৃন্দারণ্যের গহন-মহামাধুরী-কদম্বে প্রবেশ ছিল? কেই বা পরম চমৎকার অধিরূঢ় মহাভাব-মাধুর্য্যের পরাকাষ্ঠা শ্রীবার্ষভানবীকে (উপাস্য-বস্তুরূপে) জানিত? এক শ্রীচৈতন্যচন্দ্রই পরম ঔদার্য্য-লীলা প্রকট করিয়া এই সমস্ত আবিষ্কার করিয়াছেন।

আবিষ্কার ও সৃষ্টি—এক কথা নহে। যাঁহারা সেই পরদেবতার ছায়া মায়ায় অভিভূত,—এরূপ প্রাকৃত সাহিত্যিক, পত্নতাত্ত্বিক, কিংবা ঋিক-প্রত্যয়ান্ত যাবতীয় ঔপাধিক ব্যক্তিগণ শ্রীরাধিকাকে শ্রীচৈতন্যদেব বা তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী কোন কোন পদাবলী-লেখক বা পৌরাণিকের সৃষ্ট ব্যাপার বলিয়া মনে করেন! যদিও কোথায় কোথায় ও প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার-সমূহ উঁহাদের ধারণার সঙ্কীর্ণতাকে খানিকটা প্রশস্ত করিয়া দেয়, তথাপি জন্ম-মৃত্যুর অধীন অস্মিতা অপ্রাকৃতকেও অন্যরূপ ভাবিতে পারে না।

কোন কোন সাহিত্যিক শ্রীরাধিকা-সম্বন্ধে এইরূপ কতকগুলি উক্তি লিখিয়া যেন তাঁহাকে অনেক বাড়াইয়া দিয়াছেন মনে করিয়া ফেলেন। কোন সাহিত্যিক লিখিয়াছেন,—"ভক্তি ও প্রেমের উপকরণ দিয়া শ্রীমতী রাধিকাসুন্দরী সৃষ্ট;—তিনি 'আয়েসা' কি কুন্দনন্দিনী নহেন, তাঁহার বিরহের এক কণিকা কষ্ট বহন করিতে পারে,—তাঁহার সুখের এক লহরী ধারণ করিতে পারে, এরূপ নারী-চিত্র পৃথিবীর কাব্যোদ্যানে নাই।" আবার এই জাতীয় সাহিত্যিকই স্বৈরিণী-লেখনী চালাইয়া লিখিয়া ফেলিয়াছেন—"শ্রীমতী রাধা প্রথমতঃ ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ ও আর ক একখানি সংস্কৃত গ্রন্থ আশ্রয় করিয়া শুভদিনে আর্য্যাবর্ত্তের দেবমণ্ডপে প্রবেশ লাভ করিয়াছিলেন; চিরশ্রদ্ধেয় দেবদেবীগণ প্রকৃতির এই আবরণহীনা নগ্ন সৌন্দর্য্যময়ীর অন্তরালে পড়িয়া গেলেন; সদ্যশ্চুত অনাঘ্রাত মালতী পুষ্পের ন্যায় এই দেবীকে পাইয়া কবি ও ভক্ত আনন্দিত হইল; চিরাধার্য্যা দুর্গা ও কালীর উদ্দেশে আহৃত পুষ্পমালা শ্রীরাধিকার কণ্ঠে দোলাইয়া দিল।"

সাহিত্যিকগণের প্রবীণতার অবগুণ্ঠনে এই সকল অর্ব্বাচীনতার কোলাহলের সমালোচনা পরিস্ফুট করিয়া সাধারণের নিকট প্রকাশ করিতে গেলে অনেক কথা বলিতে হয়। যে গুহ্যতম মহানিধি কাম-ক্রোধাসক্ত জগতের হাটে প্রকাশ না করিয়া সযত্নে গুপ্ত সম্পুটের মধ্যে সংরক্ষিত হইয়াছিল বলিয়া স্থূলবুদ্ধি সাহিত্যিক, পণ্ডিত, মনীষী বা সাধারণ ভক্ত-সম্প্রদায় শ্রীমদ্ভাগবতের মধ্যেও শ্রীরাধিকাকে দর্শন করিবার যোগ্যতা পান নাই, সেই গূঢ়তম বাস্তবতাকে জড়ত্বের বিরাট্ রূপের নিকট কি করিয়া বুঝান যাইতে পারে? স্যর আইজাক নিউটন্ ইংলণ্ডের উল্‌সথ্ রপ্ সহরের কোন বাগানে মাধ্যাকর্ষণশক্তি লক্ষ্য করিয়াছিলেন বলিয়া সেখানেই ঐ শক্তির প্রথম জন্ম, ইহার পূর্ব্বে কেহ সেই শক্তির বাস্তবতা আদৌ জানিতেন না, বা উহার অস্তিত্ব ছিল না,—এরূপ অনুমান জ্ঞানের রাজ্যে যবনিকা-পতনমাত্র। হয় ত' ১৪৯২ খৃষ্টাব্দে কলম্বসকর্ত্তৃক

আমেরিকার আবিষ্কারের বহু পূর্ব্বে এই প্রদেশ অজ্ঞাত ছিল না; কিন্তু সেই বহু পূর্ব্বের প্রমাণ প্রত্নতত্ত্বের সমাধিগর্ভে এখনও হয় ত' সমাহিত হইয়া রহিয়াছে। যে-কাল পর্য্যন্ত মহেঞ্জডারোর সভ্যতা প্রত্নতত্ত্বের সমাধিগর্ভ হইতে আবিষ্কৃত না হইয়াছে, সে-কাল পর্য্যন্ত সকলে ঐরূপ সভ্যতার কথা ভাবিয়া উঠিতে পারে নাই। জড়ের সৃষ্টি-সম্বন্ধেই মানবের জ্ঞানের দৌড় যখন অসম্পূর্ণ, তখন আধুনিক কালের প্রাপ্ত অসম্পূর্ণ উপকরণ এবং অসম্পূর্ণ ইন্দ্রিয় ও কাম-ক্রোধাদির দ্বারা অভিভূত মস্তিষ্ক লইয়া অপ্রাকৃতের সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্ত করা কেবল বিপজ্জনক নহে, সত্যের প্রতি অজ্ঞাত বা জ্ঞাতসারে প্রবল প্রতিহিংসার চেষ্টা।

একদিন আধুনিক প্রাকৃত সাহিত্যিকগণের বর্ত্মপ্রদর্শকগুরু রায় গুণাকর ভারতচন্দ্র শ্রীরাধিকার প্রকৃত স্বরূপ বুঝিতে অসমর্থ হইয়া তাঁহারই ছায়ার মায়ায় অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন! তাই তাঁহাকে অপ্রাকৃত শ্রীরাধা-সেবাসর্ব্বস্ব শ্রীল দাসগোস্বামী প্রভুর ভজনস্থান পুরীর সাতাসনমঠে বিরক্ত-বেষে ভজন করিবার অভিনয় করিয়াও বিরক্তের বেষ পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল এবং তিনি হীরা মালিনী, সোণামুখীর প্রাকৃত সৌন্দর্য্য, কুটনীর বশীকরণবিদ্যা প্রভৃতিকে অপ্রাকৃতের আনুকরণিক ছাঁচে ঢালিয়া কাব্যরস সৃষ্টি করিয়াছিলেন ও তদানীন্তন বঙ্গ-সমাজের ভাষা ও সাহিত্যের খাতে কামের বন্যা প্রবাহিত করিয়া ছিলেন। আমরা রায় গুণাকরের দোষ দিতেছি না, ইহা অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মায়ারই প্রভাব! মায়া প্রবীণ ও নবীন সাহিত্যিক, প্রত্নতাত্ত্বিক ও যাবতীয় ঝিক-প্রত্যয়ান্ত জাগতিকের চক্ষে এই ছানি সৃষ্টি করিয়াছে বলিয়াই আজও অখিলেশ্বরী দুর্গার অংশিনী স্বরূপশক্তি শ্রীরাধিকার অসমোর্দ্ধত্ব সুগোপ্য সম্পুটে সংরক্ষিত হইয়া রহিয়াছে।

সে-দিন (১১ই আগষ্ট, ১৯৩৪) শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীল প্রভুপাদ ইহাই গৌড়ীয়ের যোগ্য পরিভাষা ও সিদ্ধান্তধারার মধ্যে বিশেষ করিয়া জানাইয়াছেন। অপ্রাকৃত গোবর্দ্ধনের সেবা না করিলে গোবর্দ্ধনের নিকটস্থ প্রেমামৃতপ্লাবনক্ষেত্র শ্রীরাধাকুণ্ডের সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা উপলব্ধি হয় না। যাঁহারা প্রাকৃত গোবর্দ্ধনের সেবা করেন অর্থাৎ ('গো' অর্থে ইন্দ্রিয় বা বিদ্যা) কেবল বহির্ম্মুখ ইন্দ্রিয় বৃদ্ধি বা বহির্ম্মুখ ইন্দ্রিয় পরিচালনা করিবার বিদ্যার সংস্কৃতি সাধন করিয়া থাকেন, তাঁহারা শ্রীরাধার ছায়াশক্তি মহামায়ার নিরয়কুণ্ডে নিমজ্জিত হইয়া থাকেন; আর যাঁহারা অপ্রাকৃত গো অর্থাৎ আত্মেন্দ্রিয়ের পরিপুষ্টি বা বিকাশ সাধন করেন, যাঁহারা পরবিদ্যার অনুশীলন করেন, তাঁহারা কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণকেই গোবর্দ্ধন-সেবা বলিয়া জানেন। জড়যুক্তিবাদী অরিষ্টাসুর তাহার শৃঙ্গদ্বারা যখন গোবর্দ্ধনকে আক্রমণ করিয়া নিজ ভোগ বর্দ্ধন করিবার চেষ্টা করে অর্থাৎ যখন পরম আস্তিকতা—শান্ত-দাস্য-সখ্য-বাৎসল্য-মধুর রস-পঞ্চকের বিষয় বাস্তব সত্যকে ধ্বংস করিতে উদ্যত হয়, তখন কৃষ্ণ সেই অরিষ্টাসুরকে নিধন করিয়া সত্যের প্রতিষ্ঠা করেন। অরিষ্টাসুর (বৃষভাসুর) নিহত হইলে প্রৌঢ়া গোপী মদনিকা তৎকার্য্যের পুরস্কাররূপে শ্রীরাধিকা সুন্দরীকে শ্রীকৃষ্ণের হস্তে সমর্পণ করেন। অরিষ্টাসুর বৃষের আকৃতি। গো—যাহা ধর্ম্মাচারীর নিকট ধর্ম্মের প্রতীকরূপে বিবেচিত—যাহা প্রলয়কারী রুদ্রের বাহনরূপে বিদিত, সেইরূপ এক ধর্ম্মের ধ্বজা লইয়া অরিষ্টাসুর যুক্তিবাদিতা প্রদর্শন পূর্ব্বক বাস্তব সত্যকে

আক্রমণ করিতে আসে। কৃষ্ণ এই যুক্তি বাদিতামূলক ধর্ম্মধ্বজিতাকে বিনাশ করেন। সেই বৃষবাহন রুদ্রের মস্তক স্বয়ংরূপ কৃষ্ণের স্বাংশতত্ত্ব বিষ্ণুর পাদপদ্ম-বাহিনী গঙ্গার বাহন, সেই রুদ্র মদনবিজয়ী হইলে যে অপ্রাকৃত মদনমোহনের রাস-বিলাসের তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিবার জন্য গোপী-কৃপা যাচ্ঞা করেন, সেই রাস-নৃত্য সাধারণী ও সমঞ্জসা গোপীগণে পরিবৃত বলিয়া যিনি সেইরূপ রাসস্থলীও পরিত্যাগ করেন, শ্রীকৃষ্ণ সেই একমাত্র সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আনন্দবিধায়িনীর প্রেমে আকৃষ্ট হইয়া তৎপশ্চাৎ পশ্চাৎ অনুগমন করিয়া থাকেন এবং তখন সাধারণী গোপীগণ যাঁহার সম্বন্ধে এইরূপ বলিয়া থাকেন, তিনিই শ্রীমদ্ভাগবতের প্রধানা নায়িকা,—

অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।
যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয়দ্রহঃ।।

(ভাঃ ১০।৩০।২৪)

হে সহচরি, আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ যাঁহাকে নিভৃতে লইয়া গেলেন, তিনিই ঈশ্বর হরিকে অবশ্যই অধিক আরাধনা করিয়াছেন। গূঢ় অর্থ এই যে, তিনি কৃষ্ণকান্তাগণেরও শিরোমণি বলিয়া তাঁহার নাম 'রাধিকা' হইয়াছে। অরিষ্টাসুর বা বৃষভাসুরের নিধন-প্রসঙ্গক্রমেই শ্রীশ্যামকুণ্ড ও শ্রীরাধাকুণ্ডের আবির্ভাবের প্রসঙ্গ শুনিতে পাওয়া যায়। এই শ্রীরাধাকুণ্ডেই শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধিকার যুথের সহিত মধ্যাহ্নকালে রাসবিলাস করিয়া থাকেন। নৈশ-বিলাস অপেক্ষা এই মাধ্যাহ্নিক বিলাসে অধিকতর চমৎকারিতা আছে। এখানে কিন্তু সাধারণী গোপীগণের প্রবেশাধিকার নাই। যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের বংশীরবে আকৃষ্ট হইয়া শ্রীরাধিকার আনুগত্য অপেক্ষা না করিয়াই 'ধীর সমীরে' কৃষ্ণের সহিত রাসক্রীড়া করেন, তাঁহারা রাধাকুণ্ড-তটস্থিত রাসস্থলীতে প্রবেশের অধিকার পান না। চন্দ্রাবলীর এই স্থানে প্রবেশের অধিকার নাই।

রসরাজ শ্রীকৃষ্ণের রাস-নৃত্য নটরাজমূর্ত্তি রুদ্রের তাণ্ডব বা তদনুকরণে প্রাচীন বা আধুনিক-কালে কল্পিত বিভিন্ন দেশীয় নৃত্যের ন্যায় নহে। বস্তুতঃ এই রাসমণ্ডলীতে গোপীশ্বর সদাশিব যে নৃত্য-দীক্ষা লাভ করিয়াছিলেন, তাহা হইতে তদংশভূত রুদ্র তাঁহার নটরাজমূর্ত্তি প্রকাশ করিয়াছে। আমরা বৃহদ্ভাগবতামৃতে দেখিতে পাই,—সঙ্কর্ষণ-সেবক রুদ্র রামনামে বিভোর হইয়া জগদুন্মাদক তাণ্ডব রচনা করিতেছেন। তাঁহার নৃত্যেরই ভোগবর্দ্ধন অনুকরণ করিয়া জগৎ প্রলয়ের অভিসারে চলিয়াছে।

চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, কর্ণামৃত, শ্রীগীতগোবিন্দ প্রভৃতি রস-গ্রন্থে শ্রীরাধিকার যে সেবা-বিলাসের কথা অনর্থমুক্ত ভক্ত সম্প্রদায়ের নিকট প্রকাশিত হইয়াছে, শ্রীরাধার ভাব-কান্তি-মণ্ডিত শ্রীগৌরসুন্দরের অনুগত নিজ-জনগণ তাহা অপেক্ষা অধিকতর সেবা-চমৎকারিতার কথা তত্তৎ গ্রন্থে দর্শন করিতে পারেন; এইজন্যই শ্রীরায় রামানন্দ শ্রীজগন্নাথবল্লভ-নাটক-গীতি রচনা করিয়াছিলেন। শ্রীরূপগোস্বামী প্রভু 'বিদগ্ধমাধব', 'দানকেলিকৌমুদী', 'স্তবমালা' এবং শ্রীরূপানুগবর শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভু 'মুক্তাচরিত', 'স্তবাবলী' ও শ্রীরূপরঘুনাথানুগ শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু 'শ্রীগোবিন্দলীলামৃত' প্রভৃতি অপ্রাকৃত রসগ্রন্থ রচনা

করিয়াছেন। গৌড়ীয়গণের গীতগোবিন্দ, 'কর্ণামৃত', 'বিদ্যাপতি', 'চণ্ডীদাস' পাঠ ও অগৌড়ীয়গণের তত্তৎ গ্রন্থ-পাঠ—আকাশ-পাতাল প্রভেদ—জাগতিক উদাহরণের দ্বারা উহা বুঝাইবার নহে। বর্ণপরিচয় মাত্র লাভ করিয়া শেক্সপীয়ার বা কালিদাস পাঠ অভিজ্ঞ অধ্যাপকের তত্তদ্গ্রন্থপাঠে প্রভেদের উদাহরণও ঐস্থলে অসম্পূর্ণ।

নন্দীশ্বর-পর্ব্বতের দক্ষিণে 'বরসানু' নামে এক গিরিরাজ শোভিত রহিয়াছে। সেই বরসানু-পর্ব্বতের অধিত্যকায় গোপরাজ বৃষভানু সহধর্ম্মিণী কৃত্তিকার সহিত বাস করিয়া শ্রীহরির আরাধনা করিতেছিলেন। ভাদ্রমাসের শুক্লাষ্টমী তিথিতে, বিশাখা-নক্ষত্রে, মধ্যাহ্নকালে, বৃষভানু রাজার গৃহে এক কন্যারত্ন আবির্ভূত হইয়া গৃহ, পুর, দশদিক্ উদ্ভাসিত করিয়া দিলেন। বৃষভানুপুরে গোপরাজ বৃষভানু, রত্নভানু ও সুভানু ভ্রাতৃগণের সঙ্গে আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। মহাভাগ্যবতী কৃত্তিকা চন্দ্রকলিকা-দুহিতার দর্শনে আনন্দে আত্মহারা হইলেন। সুরপুরে ও ব্রজপুরে আনন্দের লহরী প্রবাহিত হইল। এই অপ্রাকৃত কন্যারত্নই বৃষভানু-নন্দিনী শ্রীরাধিকা-নামে খ্যাতা হইলেন।

"তত আরভ্য নন্দস্য ব্রজঃ সর্ব্বসমৃদ্ধিমান্।
হরের্নিবাসাত্মগুণৈ রমাক্রীড়মভূন্নৃপ।।"

(ভাঃ ১০।৫।১৮)

শ্রীহরির নিবাসভূমি নন্দগোকুলে শ্রীনন্দ-নন্দন যাবৎ নিগূঢ়ভাবে বিহার করেন, তাবৎ শ্রীরাধাপ্রমুখা ব্রজরামাগণও নিগূঢ়ভাবে বিহার করিয়া থাকেন।

শ্রীনন্দকুমার যখন প্রকটরূপে বিহার করেন, তখন ব্রজরামা-শিরোমণি শ্রীরাধিকাও তাঁহার কায়ব্যূহ গোপ-রামাগণের সহিত প্রকটরূপে বিহার করিয়া থাকেন।

যাঁহারা মনে করেন,—জগদারাধ্যা দুর্গা ও কালীর উদ্দেশে আহৃত পুষ্পমালা শ্রীরাধিকার কণ্ঠে দোলাইয়া দেওয়া হইয়াছে, যাঁহারা মনে করেন,—ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ আশ্রয় করিয়া শ্রীরাধিকা আর্য্যাবর্ত্তের দেবমণ্ডপে প্রবেশ লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট কেবল প্রত্নতাত্ত্বিক যবনিকাপাতমাত্র হয় নাই, শাস্ত্রীয় সন্ধান হইতেও তাঁহারা বঞ্চিত রহিয়াছেন। যে ভুবনমোহিনী সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়সাধিকা দুর্গাকে ব্রহ্মসংহিতায় গোবিন্দের স্বরূপশক্তি—ভুবনমোহন গোবিন্দের মনোমোহিনী শ্রীরাধার ছায়া-শক্তি বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, সেই স্বরূপশক্তি অংশিনীর নিত্যবিগ্রহ অধোক্ষজ-সেবায় পূর্ণদীক্ষা লাভ না হইলে কিছুতেই বুদ্ধি বা মনীষার হস্তামলক হইতে পারে না। ইহা বন্ধ্যাযুক্তি নহে, সাহিত্যকগণের বুদ্ধি শোধিত হইলে তাঁহারাও এই বাস্তবসত্যের মর্ম্ম উপলব্ধি করিতে পারিবেন। বস্তুতঃ যাঁহাকে লইয়া সাহিত্য—যিনি সাহিত্যের বিগ্রহ, সেই বৃষভানুনন্দিনীকে অনর্থযুক্ত জীব চিনিতে না পারিয়াই ভোগময় সাহিত্যপঙ্কে আত্মপাত বরণ করিতেছেন। তাই অপ্রাকৃত সাহিত্যিকশ্রেষ্ঠ শ্রীরূপানুগবর শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভু গাহিয়াছেন,—

"তস্যা অপাররসসারবিলাসমূর্ত্তে-
রানন্দকন্দপরমাদ্ভুতসৌখ্যলক্ষ্ম্যাঃ।
ব্রহ্মাদিদুর্ল্লভগতের্বৃষভানুজায়ায়াঃ
কৈঙ্কর্য্যমেব মম জন্মনি জন্মনি স্যাৎ।।"

"অপার রসের সার বিলাস-মূরতি।
পরম অদ্ভুত সৌখ্য আনন্দ নির্বৃতি।।
ব্রহ্মাদির সুদুর্ল্লভ বৃষভানুকন্যা।
জন্মে জন্মে তাঁর দাস্যে হই যেন ধন্যা।।"

"হা দেবি কাকুভরগদগদয়াদ্য বাচা
যাচে নিপত্য ভুবি দণ্ডবদুদ্ভটার্ত্তিঃ।
অস্য প্রসাদমবুধস্য জনস্য কৃত্বা
গান্ধর্ব্বিকে তব গণে গণনাং বিধেহি।।"

"বহু দণ্ডবৎ পড়ি বহু আর্ত্তিস্বরে।
কাকুভরে গদগদবচনে যোড়করে।।
প্রার্থনা করি গো দেবি এ অবুধজনে।
তব গণে গণি কৃপা কর অকিঞ্চনে।।"

শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা

ভৌম-বৃন্দাবনের সম্পর্কে শ্রীমাথুরমণ্ডল-পরিক্রমা—একটি অপরিহার্য্য ভজনীয় ব্যাপার। আধ্যক্ষিক-সম্প্রদায়ে পর্য্যটকসূত্রে যে ভ্রমণ, তাহা তাহাদের ইন্দ্রিয়তোষণের জন্য। তদ্দ্বারা ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ পর্য্যন্ত ব্যক্তিগত লাভের সম্ভাবনা। কিন্তু ভগবৎপ্রেম-সংগ্রহ-কার্য্যের জন্য সেবা কিছু ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের অন্তর্ভুক্ত বিষয় নহে। পাপপুণ্যাশ্রিত জনগণ দুর্ভোগের পরিবর্ত্তে অনাত্ম প্রতীতিতে সুভোগ আশা করেন। সেই ভোগি-সম্প্রদায় পরার্থপর অর্থাৎ Altruist নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিবার জন্য প্রয়াস করেন।

মঠমন্দিরাদির প্রয়াস যেকালে সেবাবিমুখচিত্তে উদিত হইয়া অনর্থযুক্ত ভোগিমানবের ইন্দ্রিয়তোষণরূপ প্রয়োজনে নিযুক্ত হয়, সেকালে উহা ভগবৎসেবার প্রতিষেধক মাত্র হইয়া পড়ে।

ব্রজমণ্ডলের পথ-ঘাট পুন্যার্থিগণের সুবিধা প্রদান করিবে—সঙ্গে সঙ্গে বৈশ্যবৃত্তির পরিচালন-দ্বারা সাংসারিক সুফল লাভ ঘটিবে, এই সকল বিচারও পরমার্থবিরোধী; কিন্তু কর্ম্মীর কৃত চেষ্টার ফলে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রাণী মানবের সাধন ভক্তির সাহায্য হইবে—ইহার সর্ব্বোত্তমতা সাধারণের উপলব্ধির বিষয় হয় না।

বৈষ্ণবের সেবার দ্বারাই প্রকৃতপক্ষে জীবের মৎসরতা নিবৃত্ত হয়। অবৈষ্ণবের সেবা-ছলনায় মৎসরতা বৃদ্ধি পাইয়া কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ ও মদ—এই পঞ্চপ্রকার রিপুর হস্তে পতিত হইতে হয়। ভগবদ্ভক্তগণের অনুষ্ঠেয় বৈষ্ণবসেবা মৎসর-স্বভাব-সম্পন্ন কর্ম্মী নরজাতির দ্বারা অনুষ্ঠিত হইলেও জন্মজন্মান্তরে তাদৃশ কর্ম্মিগণ বৈষ্ণবসেবার গৌণফল লাভ করেন।

প্রাকৃত-সাহজিক-সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকেই হরিকথা শ্রবণ করেন—নিজেন্দ্রিয়তর্পণের জন্য হরিলীলা-গানের উৎসাহ দেন, পরন্তু তৎফলে নিজেন্দ্রিয়তর্পণের গন্তব্য স্থানে গিয়া নামিয়া পড়ায় তাঁহাদের হরিকথা শ্রবণকীর্ত্তনের ফললাভ ঘটে না।

শ্রীমদ্ভাগবতে কথিত আছে যে, মুষিকগণ গর্ত্ত খনন করে, কিন্তু সর্পগণ স্বয়ং গর্ত্ত খনন না করিয়া মুষিকের গর্ত্তেই বাসের অধিকার পায়। জড়বৈজ্ঞানিকগণ নিজেদের নশ্বর-ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তির জন্য প্রচুর পরিশ্রম করিয়া থাকেন, কিন্তু বিষ্ণুভক্তগণ জড়োন্নতির জন্য কোনও প্রকার পরিশ্রম না করিয়াও জড়-বৈজ্ঞানিকগণের আবিষ্কৃত দ্রব্যের সদ্ব্যবহার করেন; তজ্জন্যই বুদ্ধিমন্ত জনগণ ভারবাহী ও সারগ্রাহী—এই দ্বিবিধ শ্রেণীতে মানবগণকে বিভক্ত করেন। সারগ্রাহী জনগণের জন্য ভারবাহী তাহার নিজ উদরান্ন সংস্থানের উদ্দেশে যে চেষ্টা করেন, সারগ্রাহী সেই ফলটুকু অবলীলাক্রমে গ্রহণ করিয়া থাকেন।

শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমার পথঘাটগুলি ভাল হইলে এবং তাহাতে মোটর, ঝট্‌কা, টাঙ্গা, বয়েল গাড়ী প্রভৃতি অনায়াসে যাইতে পারিলে ভারবাহী জনগণের অনুষ্ঠিত কার্য্যের দ্বারা সারগ্রাহিগণ অনেক উপকার পাইয়া থাকেন। আবার ভারবাহি-সম্প্রদায় প্রাকৃত-সহজিয়া-সূত্রে সারগ্রাহীদিগের উপর আধিপত্য-বিস্তার-কামনায় নিজ নিজ ভারবহনের ও প্রতিষ্ঠা-কামনার ভাবদ্বয় গোপন করিয়া স্বীয় মহত্ত্ব প্রকাশ করেন। তাঁহাদেরও জন্মজন্মান্তরে ভোগপ্রবৃত্তি শ্লথ হইয়া তত্তদ্‌বিষয়ে দারিদ্র্য আসিয়া উপস্থিত হইলে শুদ্ধভক্তির উপাদেয়তা তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন।

আপাততঃ মথুরার কালেক্টর মিঃ এইচ্‌, এস, রস্‌ মহোদয় রাধাকুণ্ড, গোবর্দ্ধন ও কাম্যবনের ভিতর দিয়া বর্ষাণ পর্য্যন্ত রাস্তাটিকে প্রাদেশিকতার আকারে পরিণত করিতে সদিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। কাম্যবনের বল্লভাচার্য্য সম্প্রদায়ের জনৈক বল্লভ-বংশধর শেঠ ভগুলাল ও পাট্‌না হাইকোর্টের জনৈক বিচারপতি এবং অন্যান্য অনেকেই ইতঃপূর্ব্বে সাহায্য করিয়াছেন। এই কার্য্যের সহায়তা করিলে প্রচুর প্রতিষ্ঠা-লাভ এবং সামাজিক ধনবন্তগণের হরিভজনানন্দী চতুর্ব্বর্গাধিকারী মহতের গৌণভাবে সেবা করিবারও সুযোগলাভ ঘটিবে। যাঁহাদের প্রচুর কনক আছে, তাঁহারা তাঁহাদের কনকসমূহ নিজ নিজ ইন্দ্রিয়তোষণপর কার্য্যে নিযুক্ত না করিয়া বৈষ্ণব-সেবার কার্য্যে বিহিত করিলে অধিকতর সুফল প্রসব করিবে। তজ্জন্যই শুদ্ধবৈষ্ণবসমাজে

মনের প্রতি যে উক্তিটি গীত আছে, তাহাই আমরা এস্থলে পুনরুক্তিমূলে প্রকাশ করিতেছি—

তোমার কনক ভোগের জনক
কনকের দ্বারে সেবহ মাধব।
কামিনীর কাম নহে তব ধাম
তাহার মালিক কেবল যাদব।।
বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠা তা'তে কর নিষ্ঠা
তাহা না ভজিলে লভিবে রৌরব।
অভক্তি-প্রতিষ্ঠা শূকরের বিষ্ঠা
ত্যাগেতে হইবে মুক্ত অকৈতব।।

গিরিশ-পরমেষ্ঠিগণ নরশরীর ধারণ করিয়া গৌরসুন্দরের যে প্রণয় বহন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের তত্তদধিকারের উন্নত অধিকাররূপা যে শুদ্ধভক্তি লাভ করিবার সরণি শ্রীচৈতন্যদেব আলোচনা করিয়াছেন এবং শুদ্ধভক্তগণকে আত্মার বৃত্তিরূপা যে নিজভজনমুদ্রা উপদেশ করিয়াছিলেন, সেগুলি জীবের পরম প্রয়োজনীয় বিষয় হউক।

পক্ষান্তরে নিজ নিজ জমিদারীর মধ্যে রাস্তাঘাটের জন্য টাকা দিয়া নাম খরিদ করিবার প্রস্তাবের সহিত ব্রজমণ্ডল-পরিক্রমার সরণি-নির্ম্মাণকে তুল্য জ্ঞান করিলে উহা জাতীয়তার দুর্গন্ধে পরিণত হইবে এবং মানবগণকে জড়-সুখান্বেষী করিয়া পুনরায় মৎসরতা বর্দ্ধন করিবার যত্ন করাইবে।

যদি কেহ কনককামিনী-প্রতিষ্ঠাশাবিশিষ্ট ব্যক্তির দম্ভবর্দ্ধনের জন্য কাম্যবন হইতে বর্ষাণ (বৃষভানুপুর) পর্য্যন্ত রাস্তা বাঁধাইয়া দেন, তাহা হলিে উপরিকথিত পরমার্থের পথে কন্টক আরোপিত হইবে। যোগ্যপাত্রে দান ও অযোগ্য পাত্রে দান—এতদুভয়ের একফল নহে। কিন্তু সমন্বয়বাদী বলিবেন যে, যোগ্যাযোগ্য পাত্র বিচার না করিয়া দান করা যাউক, তাহাতে গৌণভাবে যোগ্যপাত্রও উক্ত দান লাভ করিবেন।

কিন্তু অঘটনঘটনপটীয়সী মায়া-দেবী জীবগণকে সে সুযোগ দেন না, বরং পরমার্থকে আবরণ করায় তাহারা নিজ ভোগতাৎপর্য্যকেই বহুমানন করিতে শিখে।

শ্রীনারদের জননী স্বীয় পুত্ররত্নকে উচ্ছিষ্ট ভোজন করিতে শিক্ষা দেওয়ায় পরমার্থিগণের উচ্ছিষ্ট-সেবনফলে শ্রীনারদ শুদ্ধবৈষ্ণবসম্প্রদায়ের পূর্ব্বগুরুর পীঠে আরোহণ করিয়াছেন।

পরোপকারেও ধন ব্যয়িত হইতে পারে, আবার পরাপকারেও ধনক্ষয় হইতে পারে। ব্যয়কারকের সাত্ত্বিকী বৃত্তির অভাবে অপাত্রে দানকেই তাঁহাদের বাহাদুরী বলিয়া জ্ঞান করেন; কিন্তু বৈষ্ণবসেবাকে তাঁহারা 'সঙ্কীর্ণতা' বলিয়া জানেন। উহা তাঁহাদের দুর্ভাগ্য।

যাহা হউক, অজ্ঞাত সুকৃতি লাভ করিবার উদ্দেশেও যদি দাম্ভিক জনগণ কোন কারণে বা কোন প্রকারে ভগবানের অনুসন্ধান পান এবং ভগবদ্ভক্তির প্রতি শ্রদ্ধাবিশিষ্ট হন, তাহা হইলে অজ্ঞাত সুকৃতি কোন দিন তাঁহাদেরও মঙ্গল বিধান করিবে।

যোত্রহীন অকিঞ্চন বৈষ্ণবগণ অর্থসাহায্যের দ্বারা পথঘাট-নির্ম্মাণ ও অশ্বত্থ-প্রতিষ্ঠা প্রভৃতির জন্য অর্থ ব্যয় করিতে অসমর্থ; কিন্তু মাটিয়া-বুদ্ধি-বিশিষ্ট ভোগীর হস্তে সঞ্চিত অর্থ ও বৃহৎ অনুষ্ঠান নিহিত থাকায় যেন পরমার্থের অভিজ্ঞান-লাভে কোন ক্ষতি না হয়—ইহাই আমাদের ইচ্ছা।

যথার্হ ও যথেচ্ছবাদ

যথার্হ' শব্দটি অনেকের নিকট অপরিচিত বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু 'গৌড়ীয়' পাঠকের নিকট ইহা অতীব সুপরিচিত বলিয়া আমরা ঐ শব্দটি ব্যবহার করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। 'গৌড়ীয়'-পত্রের প্রচ্ছদপট উন্মোচন করিবামাত্রই প্রথম পৃষ্ঠার ললাটে শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভুর 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু'-ধৃত শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষার যে দুইটি শ্লোক পাঠকমাত্রেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া থাকে, তাহারাই অন্যতম নিম্নলিখিত শ্লোকটিতে 'যথার্হ' শব্দ দেখিতে পাওয় যায়,—

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে।।

(ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ ২।১২৫)

ইহার পদ্যানুবাদ এই—

আসক্তিরহিত সম্বন্ধ-সহিত
বিষয়সমূহ সকলি মাধব।

'যথার্হ' শব্দের অর্থ—যথাযোগ্য। যথাযোগ্য ভোগের নামই—যুক্তবৈরাগ্য। এস্থানে 'ভোগ'-শব্দে জীবের কর্ত্তৃত্বাভিমানে ইন্দ্রিয়তৃপ্তির চেষ্টা বুঝায় না। কেবলমাত্র অপরকে বুঝাইবার জন্য এস্থানে 'ভোগ'-শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে অর্থাৎ অপরের দৃষ্টিতে ইহা ভোগপ্রায় বলিয়া লক্ষিত হইলেও ইহা ভোগ বা ফল্গুত্যাগ নহে, পরন্তু ভগবৎসেবার অনুকূল জীবন-যাপনের জন্য যথাযোগ্য বিষয়-স্বীকার। মদীয় আচার্য্যদেব 'মনঃশিক্ষা-নামক একটি গীতির মধ্যে ইহাই অপর ভাষায় বলিয়াছেন,—

কনক-কামিনী, প্রতিষ্ঠা-বাঘিনী,
ছাড়িয়াছে যারে, সেইত বৈষ্ণব।

সেই অনাসক্ত, সেই শুদ্ধভক্ত,
সংসার তথায় পায় পরাভব।।
যথাযোগ্য ভোগ, নাহি তথা রোগ,
অনাসক্ত সেই, কি আর কহব।
আসক্তিরহিত, সম্বন্ধসহিত,
বিষয়সমূহ সকলি মাধব।।
সে যুক্তবৈরাগ্য, তাহা ত' সৌভাগ্য,
তাহাই জড়েতে হরির বৈভব।

পাঠক, যুক্তবৈরাগ্য বা অনাসক্তির প্রকৃত তাৎপর্য্য শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভুর লিখিত মহাপ্রভুর শিক্ষায় কিরূপভাবে বিবৃত হইয়াছে, তাহা এই সরল কবিতার মধ্যে দেখিতে পাইলেন। আমরা অনেকেই 'অনাসক্তি', 'যুক্তবৈরাগ্য' প্রভৃতি শব্দগুলির দোহাই দিয়া থাকি। কিন্তু আমাদের অন্তর খুজিয়া দেখিলে—আমরা ভাবের ঘরে চুরি না করিয়া অকপটে হৃদয় খুলিয়া বলিলে দেখিতে ও বলিতে বাধ্য হইব যে, আমাদের অনাসক্তি বা যুক্তবৈরাগ্যের দোহাই কেবল ঐ সকল শব্দাড়ম্বরের আশ্রয় লইয়া যথেচ্ছ ভোগ চালাইয়বার অভিসন্ধিমাত্র। ইহারই প্রতিক্রিয়ারূপে একশ্রেণী ধর্ম্মধ্বজিগণের মধ্যে ত্যাগের বহ্বাড়ম্বর দেখিতে পাওয়া যায়। বস্তুতঃ এর উভয়ই কপটতা বা আত্মমঙ্গলের দ্বারে চিরতরে যবনিকা-পাত। অনাসক্তি ও যুক্তবৈরাগ্যের দোহাই দিয়া জড়ভোগের চেষ্টা যেরূপ কপটতা ভোগের প্রতি ক্রোধান্ধ হইয়া ত্যাগের বাহাদুরা দেখাইবার চেষ্টাও তদ্রূপই কপটতা। তাই শুদ্ধভক্তগণ এই দ্বিবিধ কপটতার কোনটির কবলেই পতিত হন না, অথবা যাঁহারা এই দ্বিবিধ কপটতার কবল হইতে উদ্ধারের সন্ধান জানেন, তাঁহারাই শুদ্ধভক্ত অর্থাৎ শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীরূপের শিক্ষার তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন।

অনাসক্তি বা যুক্তবৈরাগ্যের উদাহরণ-স্বরূপ অনেক উপমা ভোগি-সমাজে প্রচারিত ও অভিনন্দিত হইয়াছে। হাতে তেল মাখিয়া কাঁঠাল ভাঙ্গিবার কথা, জলে মাখনের সন্তরণ বা পদ্মপত্রে জলের অসংলগ্নভাবে অবস্থানের দৃষ্টান্ত, সুদক্ষা নটীর মস্তকোপরি পূর্ণকুম্ভ স্থাপন-পূর্ব্বক যথেচ্ছ নৃত্য-কৌশল প্রদর্শন প্রভৃতি অনেক দৃষ্টান্তকে নজির দেখাইয়া ভোগি-সমাজ অন্তরে ভোগ-যজ্ঞের পূর্ণাহুতিময় তাণ্ডব সংরক্ষণ করিবার কৌশল আবিষ্কার করিয়া থাকেন। যখনই সাধু-বৈষ্ণবগণ আমাদিগকে একান্ত হরিপদাশ্রয়ের উপদেশ প্রদান করেন, যখনই তাঁহারা আমাদের নিকট শ্রীমদ্‌ভাগবতের "লব্ধা সুদুর্লভমিদং" শ্লোকটি কীর্ত্তন করেন, যখনই তাঁহারা শ্রীমদ্ভাগবত সপ্তম স্কন্ধের প্রহ্লাদ মহারাজের উপদেশ অনুকীর্ত্তন করিবার জন্য আমাদের নিকট উপস্থিত হন, তখনই আমরা ঐ সকল উপদেশামৃতকে আমাদের ভোগপ্রাণতার পক্ষে বিষবৎ ভাবিয়া যেন তাহার প্রতিষেধকরূপে "হাতে তেল মাখিয়া কাঁঠাল ভাঙ্গিবার" উদাহরণ অর্থাৎ অনাসক্তি বা

যুক্তবৈরাগ্যের দোহাই প্রদান করিতে উদ্যত হই। পুত্র গুরুগৃহে বাস করিয়া হরিসেবা করিবার রুচিবিশিষ্ট হইলে পিতা যুক্তবৈরাগ্যের দোহাইদেন; অশীতিবর্ষ-বয়স্ক বৃদ্ধ পিতাকে বনে গমন করিয়া বা অসদ্‌বিষয়, অসৎসঙ্গ হইতে নিবৃত্ত হইয়া হরিভজনের কথা সাধুগণ উপদেশ প্রদান করিলে তিনিই সেই অনাসক্তি ও যুক্তবৈরাগ্যেরই কবচ-দ্বারা সাধুর উপদেশ হইতে আত্মরক্ষা (?) করিবার উপায় খুঁজিয়া লন। মোটকথা, সকলেই অনাসক্তি ও যুক্তবৈরাগ্যের দোহাই দিবারই পক্ষপাতী বা গ্রাহক; কিন্তু প্রকৃত যুক্তবৈরাগ্য বা অনাসক্তির গ্রাহক যেন আদৌ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

একদিন অপ্রাকৃত পুত্রবাৎসল্যরস-রসিক শ্রীজগন্নাথ মিশ্র স্বপ্নে দেখিতে পান যে, পুত্র নিমাই সন্ন্যাস-বেষ ধারণ করিয়াছেন এবং কৃষ্ণনামে বিভোর হইয়া নৃত্য, কীর্ত্তন ও ক্রন্দন করিতেছেন। এই স্বপ্ন দেখিয়া জগন্নাথ মিশ্র অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন এবং কৃষ্ণের নিকট পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা জানাইয়া বলিলেন,—

"হে গোবিন্দ, নিমাঞি রহুক মোর ঘরে।।
সবে এই বর, কৃষ্ণ, মাগি তোর ঠাঞি।
গৃহস্থ হইয়া ঘরে রহুক নিমাঞি।।"

(চৈঃ ভাঃ আ ৮।৯৩-৯৪)

অপ্রাকৃত বাৎসল্যরসরসিক বসুদেব-দেবকী, কিম্বা দশরথ-কৌশল্যা, অথবা জগন্নাথ-শ্রীশচীদেবীর যে কৃষ্ণের জন্য, শ্রীরামচন্দ্রের জন্য, অথবা ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরের জন্য এই যে একান্ত আসক্তির উদাহরণ-স্বরূপ **"গৃহস্থ হইয়া ঘরে রহুক নিমাঞি"** প্রভৃতি প্রার্থনা, তাহার সহিত এই হেয়, বিকৃত, প্রতিফলিত জৈব-জগতের জড়াসক্তির উদাহরণ এক নহে। অধোক্ষজ পরাৎপর-তত্ত্বের জন্য নির্ম্মল চেতনের যে মোহ, যে আসক্তি, যে কাম, তাহাই প্রেম—তাহাই ভক্তি—তাহাই অনুরাগ—তাহাই সেবা-প্রগাঢ়তা। যেখানে অকৈতবভাবে কৃষ্ণ-সম্বন্ধ বিরাজিত, সেখানে কোন মলিনতা, আবিলতা নাই। এই জন্যই গাহিয়াছেন,—

"আসক্তি রহিত, সম্বন্ধ সহিত
বিষয়সমূহ সকলি মাধব।"

অর্থাৎ যেখানে জড়াসক্তি-রহিত, অথচ কৃষ্ণের সম্বন্ধ সহিত যাবতীয় বিষয়, সেখানে সকলই মাধব অর্থাৎ কৃষ্ণ—সেখানে মায়ার কোন অবকাশ নাই।

যাঁহারা ফল্গুত্যাগী অর্থাৎ যাঁহারা জাগতিক বিষয়ের বিশ্বাস-ঘাতকতায় মর্ম্মাহত হইয়া অতৃপ্তির সহিত, অথবা অত্যন্ত বিরক্তির সহিত বিষয়ের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়াছেন, সেই সকল তথাকথিত ত্যাগি-সম্প্রদায়—মায়াবাদি-সম্প্রদায় ও অনেক সময় অপরকে অনাসক্তির উপদেশ দিয়া থাকেন। বস্তুতঃ তাঁহারা যে অনাসক্তির উপদেশ দেন, তাহা কেবল ব্যতিরেক ভাবপূর্ণ বলিয়া একদেশী অর্থাৎ 'অনাসক্তি'—শব্দের ব্যভিচার কৃত্রিমতা-পরিপূর্ণ। জড়াসক্তি পরিত্যাগরে উপদেশ কৃষ্ণাসক্তিময় না হইলে কেবল নপুংসকের ন্যায় কোন মঙ্গলময়

প্রয়োজন-উৎপাদনে অসমর্থ। মায়াবাদিগণ জড়ের আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া যে বিষয় স্বীকার করিবার উপদেশ দেন, তাহার মধ্যে ব্যতিরেক চিন্তা থাকিলেও অন্বয়ের চিন্তা নাই অর্থাৎ কেবল নিষেধ-মাত্র আছে, কোনও বাস্তব বস্তুর সন্ধান নাই; কারণ বস্তু তাঁহাদের মতে—নির্ব্বিশেষ! বিষয় যদি 'কৃষ্ণ' না হইল—কৃষ্ণসেবার অনুকূল না হইল, আর কৃষ্ণ যদি 'অধোক্ষজ' অর্থাৎ নিত্য না হইলেন, কৃষ্ণের নাম-গুণ-রূপ পারিষদ লীলা যদি জাগতিক বিষয়েরই মত অনিত্য হইল, তাহা হইলে জড়াসক্তি পরিত্যাগ করিয়া অনাসক্তির অভিনয় প্রদর্শন অথবা কৃষ্ণাসক্তির মৌখিকতা—সকলই কপটতাময়। উহার নাম অনাসক্তি নহে, পরন্তু অনাসক্তির ব্যভিচার বা অতীব জড়াসক্তিরই প্রতিক্রিয়া বা প্রচ্ছন্ন মূর্ত্তি।

অতএব প্রাকৃত অনাসক্তি বা যুক্তবৈরাগ্য কি, ইহাই বিবেচ্য। যে মন্ত্রমহৌষধির দ্বারা ভূত ছাড়াইব, উহাই যদি মেকি হয়, বা উহাতেই যদি ভূত আশ্রয় করিয়া থাকে, তাহা হইলে উহা অপেক্ষা অধিক বিপদের কথা আর কিছুই নাই। কিন্তু মায়াদেবী আত্মমঙ্গল-বরণে অনিচ্ছুক আমাদের ন্যায় বদ্ধজীবগণের উপর সেই বিপদটিই অনুক্ষণ সঞ্চারিত করিবার সুযোগ খুঁজিয়া থাকে; তাই যুক্তবৈরাগ্যের দেহাই দিয়াও আমরা অযুক্তবৈরাগী ভোগী হইয়া পড়ি, যথার্হবাদের অনুসন্ধিৎসু বলিয়া পরিচয় দিয়াও অন্তরে যথেচ্ছবাদকেই আলিঙ্গন করি। যুক্তবৈরাগ্যের প্রকৃত মর্ম্মটি কি, তাহা শ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত গোস্বামী প্রভু এইরূপ বলিয়াছেন,—

"যথা যোগ্য" এই শব্দ-দুইটির মর্ম্মার্থ বুঝে লহ।
কপটার্থ লঞা যেন দেহারামী না হ'।।
শুদ্ধভক্তির অনুকূল কর অঙ্গীকার।
শুদ্ধভক্তির প্রতিকূল কর অস্বীকার।।
মর্ম্মার্থ ছাড়িয়া যেবা শব্দ-অর্থ করে।
রসের বশে দেহারামী কপটমার্গ ধরে।।
ভাল খায়, ভাল পরে, করে বহু ধনার্জ্জন।
যোষিৎসঙ্গে রত হঞা ফিরে রাত্রদিন।
ভাল শয্যা অট্টালিকা খোঁজে অর্ব্বাচীন।
দেহযাত্রার উপযোগী নিতান্ত প্রয়োজন।
বিষয় স্বীকার করি কর দেহের রক্ষণ।।
সাত্ত্বিক সেবন কর আসব বর্জ্জন।
সর্ব্বভূতে দয়া করি কর উচ্চ সংকীর্ত্তন।।

দেবসেবা ছল করি বিষয় নাহি কর।
বিষয়েতে রাগ-দ্বেষ সদা পরিহর।।
পরহিংসা, কপটতা, অন্য সনে বৈর।
কভু নাহি কর ভাই! যদি মোর বাক্য ধর।।
বৈষ্ণবে আদর কর প্রসাদাদি দিয়া।
অর্থ নাই দৈন্যবাক্যে তোষ মিনতি করিয়া।।
পরিজন, পরিকর-কৃষ্ণদাস-দাসী।
আত্মসম-পালনে হইবে মিষ্টভাষী।।
স্মরণ-কীর্ত্তন-সেবা সর্ব্বভূতে দয়া।
এই ত' করিবে যুক্ত বৈরাগী হইয়া।।
কৃষ্ণ যদি নাহি দেয় পরিজন-পরিকর।
অথবা দিয়া ত' লয় সর্ব্বসুখের আকর।।
শোক-মোহ ছাড় ভাই নাম কর নিরন্তর।
জগাই বলে, এভাব গৌরের সনে মোর কোঁদল বিস্তর।।

(শ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত-৩য় সংস্করণ ৩০-৩১ পৃঃ)

শুদ্ধভক্তির অনুকূল স্বীকার ও শুদ্ধভক্তির প্রতিকূল অস্বীকার,—ইহাই যুক্তবৈরাগ্যের স্বরূপ-লক্ষণ। কিন্তু এখানেও নিস্তার নাই। কোটিকন্টকরুদ্ধ শুদ্ধভক্তিপথে মায়াদেবী প্রতিপদেই নানা বিপদ ও কন্টকের মোহনমালিকা ছড়াইয়া রাখিয়াছেন। অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার লইয়া আবার নানাপ্রকার কপটতার উদ্ভব হইয়াছে। আমার বহির্ম্মুখ রুচির প্রীতিদায়ক বিষয়কে 'অনুকূল' ও বহির্ম্মুখ রুচির অপ্রীতিকর বিষয়কে 'প্রতিকূল' মনে করিলে আমি যে দেহারামী কপটমার্গী হইয়া যাইব, তাহা 'শ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত'কার বলিয়াছেন। বিশেষতঃ সেইরূপ স্বতন্ত্র-বিচারে কৃষ্ণের না থাকায় অর্থাৎ ''সম্বন্ধ-সহিত'' বাক্যের সহিত বিরোধ উপস্থিত হওয়ায় 'যুক্ত'-শব্দের কোন সার্থকতাই থাকে না। কৃষ্ণের সহিত 'যুক্ত' হইয়া কৃষ্ণের সেবার প্রতিকূল-বিষয়ে যে বৈরাগ্য অর্থাৎ ''কৃষ্ণপ্রীতে ভোগ-ত্যাগ'' বা অসৎসঙ্গ-বর্জ্জন, তাহাই যুক্তবৈরাগ্য।

এখানে আবার আর একটি কপটতার আবির্ভাবের অবসর আছে। কৃষ্ণ যদি আমার ''মনগড়া-কৃষ্ণ'' (?) হয় এবং সেই ''মনগড়া কৃষ্ণের'' (?) অর্থাৎ বস্তুতঃ আমারই ভোগের আদর্শ-প্রতীকের সহিত যুক্ত করিয়া আমি অনুকূল বা প্রতিকূল বিষয় নির্দ্ধারণ করি, তাহা হইলেও উহা যুক্তবৈরাগ্য বা অনাসক্তি হইবে না। এজগতে কৃষ্ণের সহিত যিনি সম্বন্ধ স্থাপন করাইতে পারেন, অযুক্ত জীবকে যিনি কৃষ্ণের সহিত যুক্ত

করাইতে পারেন, যিনি অনুক্ষণ সচ্চিদানন্দ-স্বরূপে অবস্থিত সুতরাং যিনি প্রকৃত সৎ ও অসৎ এর স্বরূপগঞ্জ, তাই যিনি সৎএর সহিত যুক্ত হইয়া অসৎসঙ্গ-বর্জ্জনের উপদেশ করিতে পারেন, সেই শ্রীগুরুপাদপদ্ম যে অপ্রাকৃত কৃষ্ণের সন্ধান দিবেন, সেই কৃষ্ণের সহিত অকপট, অনাবিল, সর্ব্ববিধ ব্যবধান-রহিত সম্বন্ধযুক্ত না হইলে আমাদের ''যুক্তবৈরাগ্য'' হইতে পারে না।

এখানেও বহির্ম্মুখতা মানবকে অন্য প্রকার কু-অভিসন্ধি বা বিবর্ত্তে পাতিত করিতে পারে। স্বীকার করিলাম—শ্রীগুরুপাদপদ্মই আমার সহিত কৃষ্ণের সম্বন্ধ স্থাপন করিবেন, আমাকে প্রকৃত যুক্তবৈরাগ্যের পথ প্রদর্শন করিবেন, কিন্তু আবার সেই বিপদ্। যে ওঝার দ্বারা ভূত ছাড়াইব, সেই ওঝাই যদি ভূতগ্রস্ত হয় এবং ভূতগ্রস্ত ওঝাকেই যদি আমি 'ওঝা' বলিয়া মনে করি, কিম্বা খাঁটি ওঝার কাছে যাইবার অভিনয় করিয়াও যদি কপাল-দোষে তাঁহার নিকট কপটতা করিয়া আমাকে তাঁহার প্রকৃত আশ্রয় হইতে দূরে রাখি, তাহা হইলেও যুক্তবৈরাগ্য সম্ভব হইবে না অর্থাৎ গুরুব্রুব বা গুরুনামধারী অসদ্ ব্যক্তিকে আশ্রয় করিলে যুক্তবৈরাগ্যের মর্ম্ম বুঝিতে পারিব না, আবার কেবল লোক দেখাইবার জন্য বা অন্য কোন উদ্দেশ্যে 'সদ্গুরু-পাদপদ্ম আশ্রয় করিয়াছি' মুখে বলিলেও বা মনে ভাবিলেও যদি নিজের স্বতন্ত্রতার প্রাধান্য স্থাপন করিয়া উহাকেই কার্য্যতঃ গুরু করিয়া ফেলি, তাহা হইলেও যুক্তবৈরাগ্যের মর্ম্ম বুঝিব না, তাহা যথার্হবাদ না হইয়া যথেচ্ছবাদ হইবে অর্থাৎ যথা ইচ্ছা বা স্বতন্ত্রতাই সেখানে আমার উপদেষ্টা, পরিচালক বা নিয়ামক হইয়া পড়িবে। তাই 'যুক্তবৈরাগ'—শব্দ তাঁহার মুখেই শোভা পায়, তিনিই যুক্তবৈরাগ্যকে বরণ করিতে পারেন, তিনিই যুক্তবৈরাগ্যের রহস্য উপলব্ধি করিতে পারেন—যিনি যথেষ্ট সুকৃতিবিভূষিত হইয়া সর্ব্বাগ্রে প্রকৃত সদ্গুরু-পাদপদ্মের স্বতন্ত্রতার সহিত নিজ-স্বতন্ত্রতার ঐকতান সাধন করিয়াছেন।

এখানে আমরা যেন নিরাশ হইয়া না পড়ি, আমার যথেষ্ট সুকৃতি নাই, সুতরাং আমি হাল ছাড়িয়া দিয়া বসিয়া থাকিব,—এইরূপ আলস্য ও জাড্য প্রশ্রয় দিবার উপদেশ এই সময় মায়াদেবী কর্ণে প্রদান করিতে আসিলেও সর্ব্বদাই নিরলসভাবে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, অকপটে প্রকৃত সাধুসঙ্গ ও কৃষ্ণের নিকট প্রকৃত সদ্গুরু-পাদপদ্মে সর্ব্বতোভাবে আত্মসমর্পণের জন্য সকাতর প্রার্থনা জানাইলে, তজ্জন্য সর্ব্বদা সাবহিত না থাকিলে, তজ্জন্য অনুক্ষণ আর্ত্তির হুতাশন হৃদয়ে প্রদীপ্ত না রাখিলে সুকৃতিসঞ্চয়ই বা আমার কিরূপে হইবে? আকস্মিকী সুকৃতির অপেক্ষা করিতে গিয়া জীবনতরণী দুষ্কৃতিতে ভাসাইয়া দিলে মঙ্গল-লাভ সুদূর-পরাহত হইবে।

শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে যুক্তবৈরাগ্যের প্রতিপালক আর একটি নারদীয়পুরাণের সুন্দর শ্লোক দৃষ্ট হয়,—

যাবতা স্যাৎ স্বনির্ব্বাহঃ স্বীকুর্য্যাৎ তাবদর্থবিৎ।
আধিক্যে ন্যূনতায়াঞ্চ চ্যবতে পরমার্থতঃ।।

(ভঃ রঃ সিঃ পঃ বিঃ ২লঃ ৪৯ শ্লোক)

তাৎপর্য্য—যে-পরিমাণ বিষয় স্বীকার করিলে স্বীয় ভক্তি নির্ব্বাহ হইতে পারে, অর্থজ্ঞ পুরুষ সেই পরিমাণ বিষয় স্বীকার করিবেন। ভক্তিনির্ব্বাহের যোগ্য না হইয়া অধিক বা ন্যূন বিষয় স্বীকার করিলে পরমার্থ হইতে বিচ্যুত হইতে হয়।

উক্ত শ্লোকের দুর্গমসঙ্গমনী-টীকায় শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভু 'স্বনির্ব্বাহ' শব্দের অর্থ—"স্ব স্ব ভক্তিনির্ব্বাহ" —এইরূপ করিয়াছেন। অতএব যথাযোগ্য ভোগ বা যুক্ত-বৈরাগ্য-শব্দের দোহাই দিয়া ভক্তিবাধক ভোগের যে প্রচ্ছন্ন পিপাসা মানব-হৃদয়ে দৃষ্ট হয়, তাহা সর্ব্বতোভাবে নিরস্ত হইয়াছে। ভক্তিনির্ব্বাহের যোগ্য বিষয়-স্বীকারের নামই যুক্তবৈরাগ্য, আর অধিক বা কম, অযুক্ত ভোগ বা অযুক্ত ত্যাগ—উভয়ই পরমার্থ হইতে পতন। অযুক্ত ভোগী অধিক ভোগের লালসায় প্রমত্ত, আর অযুক্ত ত্যাগী বিষয়ের ন্যূনতা স্বীকার করিয়া আত্মহত্যা (চেতনবৃত্তি বা সেবাবৃত্তির বিনাশ) করিতে প্রস্তুত। অতএব 'যথার্হ' শব্দের দ্বারা আধিক্য ও ন্যূনতা-রহিত সহিত যুক্ততাই প্রমাণিত হইয়াছে। এ বিষয়ে আমরা বারান্তরে আরও বিস্তৃত আলোচনা করিব।

শেষশায়ী

মথুরা হইতে কোশী প্রায় ২৩ মাইল। কোশী হইতে Irrigation Department-এর যে নহর অর্থাৎ জলখাত চলিয়া গিয়াছে, তাহার ধারে ধারে সোজা চলিয়া গিয়া জলখাতের পুল পার হইয়া পিলু বৃক্ষের বন-পথে কিছুদূরে অগ্রসর হইলেই 'ক্ষীরসমুদ্র' নামক একটি বহু প্রাচীন দীর্ঘিকা ও তাহার তীরে শেষশায়ীর মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব এই শেষশায়ীতে আগমন করিয়াছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু খদির বন হইতে পরে শেষশায়ী গমন করেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে এইস্থানের প্রসঙ্গ এইরূপ উল্লিখিত আছে,—

লীলাস্থল দেখি' তাঁহা, গেলা 'শেষশায়ী'।
'লক্ষ্মী' দেখি' এই শ্লোক পড়েন গোসাঞি।।

"যত্তে সুজাতচরণাম্বুরুহং স্তনেষু
ভীতাঃ শনৈঃ প্রিয় দধীমহি কর্কশেষু।
তেনাটবীমটসি তদ্ব্যথতে ন কিংস্বিৎ
কুর্পাদিভির্ভ্রমতি ধীর্ভবদায়ুষাং নঃ।।"

(ভাঃ ১০।৩১।২০)

গোপীগণ কহিলেন,—হে প্রিয়, তোমার যে সুকোমল চরণকমল আমদের কর্কশস্তনে ধীরে ধীরে ধারণ করি, সেই চরণ দ্বারা তুমি এখন বনভ্রমণ করিতেছ, তাহা সূক্ষ্ম পাষাণের দ্বারা ক্ষত হওয়ায় অবশ্য ব্যথিত হইতেছে। সুতরাং আমাদের জীবনস্বরূপ তুমি, তোমার সম্বন্ধে আমাদের চিত্ত অস্থির হইতেছে।

শেষশায়ী

ভক্তিরত্নাকরের পঞ্চম তরঙ্গেও শ্রীমন্মহাপ্রভুর শেষশায়ী আগমনের প্রসঙ্গ নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুর এইরূপ লিখিয়াছেন,—

এই "শেষশায়ী", ক্ষীরসমুদ্র এথাতে।
কৌতুকে শুইলা কৃষ্ণ অনন্তশয্যাতে।।
এই শেষশায়ী-মূর্ত্তি দর্শন করিতে।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র আইলা এথাতে।।

বিষ্ণুর স্থানে আসিয়া শ্রীচৈতন্যদেব কি জন্য ও কি ভাবে "যত্তে সুজাতচরণাম্বুরুহং" শ্লোক কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাহা উপলব্ধি করিতে পারিবেন না। বস্তুতঃ এই স্থান বলিয়াই তদীয় অন্তরঙ্গ জনগণের নিকট শুনিতে পাইলাম।

আচার্য্য শ্রীরামানুজ যেখানে যেখানে নির্ব্বিশেষ বিচারপর শৈব মন্দির দর্শন করিতেন, সেখানে সেখনেই তিনি শিবপ্রভু সঙ্কর্ষণ বিষ্ণুর শ্রীনৃসিংহবিগ্রহ বা ভুবনমঙ্গলময়ী ঐশ্বর্য্যময়ী উপাসনা প্রচার করিতেন। আবার শ্রীমন্মহাপ্রভু যেখানে যেখানে ঐশ্বর্য্যবিচারপর চতুর্ভুজ মূর্ত্তি দর্শন করিতেন, সেখানে সেখানেই মাধুর্য্যময় বিচার ও মাধুর্য্যবিচারের মধ্যে আবার বিপ্রলম্ভময় বিচার প্রকাশ করিতেন। যাঁহারা পূর্ণতম কৃষ্ণপাদপদ্ম-সেবা হইতে ন্যূনাধিক বঞ্চিত বা দরিদ্র, তাঁহারা ঐশ্বর্য্যের দ্বারা অভিভূত হইয়া চতুর্ভূজমূর্ত্তির উপাসক হন; কিন্তু যাঁহারা সর্ব্বেন্দ্রিয়ে শতকরা শতভাগই স্বরাট্ লীলাপুরুষোত্তমের সেবায় প্রতিষ্ঠিত, ঐশ্বর্য্য তাঁহাদিগের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না—তাঁহারা মাধুর্য্যের অধিকতর সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করেন। আবার সেই মাধুর্য্যের মধ্যে বিপ্রলম্ভের সেবা আরও চমৎকারময়ী। গোপীগণ সর্ব্বত্রই সর্ব্বেন্দ্রিয়দ্বারা কৃষ্ণকে ইন্দ্রিয়তৃপ্তি-প্রদানের জন্য উন্মাদিনী। নিত্য চিরনবযৌবনসম্পন্না ব্রজগোপীগণ বক্ষ পাতিয়া দিয়া কুসুমপেলব কোমল শ্রীকৃষ্ণচরণ-কমলের সেবা করিয়াও মনে করিয়া থাকেন যে, তাঁহাদের বক্ষোরুহ ও বুঝি কৃষ্ণচরণকমলের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি বিধান করিতে পারিল না—কোমল চরণের নিকট কঠোর বলিয়া বোধ হইল! আবার গোপীর অকৃত্রিমদাসী-অভিমানী রূপানুগবর বিচার করেন, তিনি কি করিয়া শ্যামমনোমোহিনীর সেবা করিবেন, তিনি কৃষ্ণপদসেবা অপেক্ষা শ্রীরাধার নিজস্ব পদপল্লব সেবার জন্যই অধিকতর ব্যস্ত। তাই লক্ষ্মীকর্ত্তৃক শেষশায়ীর পদসেবা দর্শন করিয়া তাঁহার নিজেশ্বরী শ্রীরাধার পদপল্লবসেবার লৌল্যই অধিকতর উদ্দীপ্ত হয়।

এই স্থানে একটি প্রাচীন ইষ্টকনির্ম্মিত মন্দিরে ভগবান্ শেষশায়ীর মূর্ত্তি অনন্তশয্যায় শায়িত ও লক্ষ্মীদ্বারা সেবিত হইয়া বিরাজ করিতেছেন। শ্রীমূর্ত্তির বামভাগের নিম্নহস্তে শঙ্খ, ঊর্দ্ধহস্তে চক্র, দক্ষিণ হস্তের ঊর্দ্ধে পদ্ম ও গদা। এই শঙ্খ-চক্র-পদ্ম-গদাধৃক্ শ্রীবিষ্ণুমূর্ত্তি সিদ্ধার্থ-সংহিতায় "শ্রীঅচ্যুতমূর্ত্তি" বলিয়া কথিত হইয়াছেন। শ্রীবিষ্ণুর নাভিপদ্ম হইতে ব্রহ্মার আবির্ভাব হইয়াছে। সেই ব্রহ্মার মূর্ত্তিও তথায় বিরাজিত রহিয়াছেন। মন্দিরের সহিত সংলগ্ন জগমোহন বা নাট্যমন্দির। সেই নাট্যমন্দিরের গাত্রে শেষশায়ী বিষ্ণুর মূর্ত্তি, বিষ্ণুর বিভিন্ন লীলা এবং কোন ভক্ত রাজার শেষশায়ীর প্রতি শ্রদ্ধাভক্তির নিদর্শন স্বরূপ সাষ্টাঙ্গ

দণ্ডবৎ প্রণতির চিত্রাবলী অঙ্কিত রহিয়াছে। চিত্রগুলি প্রাচীন বলিয়াই মনে হইল। গর্ভমন্দিরের পশ্চাদ্‌ভাগে ভোগরন্ধন গৃহ অতীব জীর্ণ-শীর্ণ হইয়া একরূপ অব্যবহার্য্যরূপে পড়িয়া রহিয়াছে। বিশেষতঃ রন্ধন-শালায় কোন দরজা বা কপাট না থাকায় কুক্কুর ও ইতরপ্রাণী যথেচ্ছভাবে সঞ্চরণ করিতেছে। শ্রীল প্রভুপাদ এই স্থান ব্রজমণ্ডল-পরিক্রমার সময়েই সংস্কার করাইতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন। বর্ত্তমান বর্ষে এই স্থানের অধিকতর শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া যাহাতে অচিরেই রন্ধনশালা ও মন্দিরের বিভিন্নস্থানের সুসংস্কার হয়, তজ্জন্য বিশেষ ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন।

শ্রীল প্রভুপাদের একান্ত ইচ্ছা যে, এই স্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পদার্পণের স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ একটি গৌরপাদপীঠ ও তদুপরি একটি মন্দির প্রকাশিত ও রচিত হইয়া পাদপীঠের নিত্যসেবার বন্দোবস্ত হয়। শ্রীল প্রভুপাদ এই পাদপীঠ সংস্থাপনের উপযুক্ত স্থান নির্ব্বাচন করিয়া আসিয়াছেন। শেষশায়ীর শ্রীমন্দিরের ঘেরার মধ্যেই একটি উচ্চ প্রদেশে এই পাদপীঠের শ্রীমন্দির নির্ম্মাণের স্থান নির্ব্বাচিত হইয়াছে।

এখানে ৪০।৪৫ ঘর পাণ্ডা অর্থাৎ শেষশায়ীর গৃহস্থ পূজারি-বংশ বাস করিতেছেন। ইঁহারা সকলেই গৌড়ব্রাহ্মণ। ইঁহারা বলিলেন যে, তাঁহারা সানোড়িয়া ব্রাহ্মণের জল পর্য্যন্ত স্পর্শ করেন না। ইঁহাদের অন্যতম সোহনলাল পাণ্ডা কিছুকাল ছিপিগলিতে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠের অবস্থিতিকালে পূজারির কার্য্য করিয়াছিলেন। সকলেই শ্রীশ্রীল প্রভুপাদকে আচার্য্যোচিত শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করিলেন। শেষশায়ী গ্রামটি অতি ক্ষুদ্র। বালকবালিকা স্ত্রী-পুরুষ-বৃদ্ধ সকল লইয়া গ্রামে মাত্র ৬০।৬৫ জন লোক হইবে। ইহারা সকলেই দরিদ্র ও কৃষিজীবী।

ঠাকুর-সেবার জন্য ৫০০ বিঘা জমি এবং গো-মহিষ প্রভৃতি আছে। পাণ্ডাগণ নিজেদের মধ্যেই শেষশায়ীর সেবাভার বন্টন করিয়া পালা-ক্রমে তাহা সমাধান করিয়া থাকেন। বার মাসের মধ্যে এগার মাস এইরূপ পালাক্রমে পূজা হয়, কার্ত্তিক মাসটিতে সকলেরই পূজা করিবার অধিকার থাকে। পূজারিগণের মধ্যে অনেকেই বর্ত্তমান শ্রীবল্লভ-সম্প্রদায়ের অনুগত বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। কাম্যবনের শ্রীবল্লভ-সম্প্রদায়ের গৃহস্থ-গোস্বামিগণ ইঁহাদের গুরু। কামানের শ্রীযুক্ত দেবকীনন্দন লাল গোসাঞি বর্ত্তমান ইঁহাদের গুরু।

ক্ষীরোদসাগরের যে পারে শেষশায়ীর মন্দির, তাহার বিপরীত দিকে শ্রীবল্লভ-সম্প্রদায়ের অধস্তনগণ বল্লভাচার্য্যের বৈঠক স্থাপন করিয়াছিলেন। তাহাও এখন একরূপ জীর্ণাবস্থা লাভ করিয়াছে।

ক্ষীরোদসমুদ্রটির পরিমাণ পূর্ব্বে বার ক্রোশ ছিল। স্থানীয় পাণ্ডাগণ এইরূপ কিম্বদন্তির উল্লেখ করিয়া থাকেন। যাহা হউক ক্ষীরসমুদ্র পূর্ব্বে যে খুব বিস্তৃত ছিল, তাহা বেশ বুঝা যায়। ক্ষীরসমুদ্রের জল বর্ত্তমানে শৈবাল প্রভৃতির দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে, তথাপি ব্রজমণ্ডলের অন্যান্য বহুকুণ্ড হইতে ইহার জল অনেকাংশে স্বচ্ছ।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আদেশে আমরা সকলেই এই ক্ষীরসমুদ্রের জল মস্তকে ধারণ করিলাম। ক্ষীরসমুদ্রের ক একটি ঘাট পূর্ব্বে বাঁধান হইয়াছিল। কোথাও কোথাও তাহার প্রাচীন ভগ্নাবশেষ কোথায়ও বা আংশিক

অবস্থিতি দেখিতে পাওয়া যায়। শেষশায়ীর প্রাকারের দ্বারদেশে ভুতেশ্বর নামক দ্বারপাল শিব ও ব্রহ্মার মন্দির বিরাজিত। এই ক্ষীরসাগরের তীরে অশ্বিনী বাবু নামক একজন বাঙ্গালী নাকি একটি কূপ সংস্কার করিয়া দিয়াছেন। ইঁহার পূর্ণনাম ও পরিচয় পাণ্ডাগণও দিতে পারিলেন না। ইঁহারা যেমন দরিদ্র তেমন অশিক্ষিত। পূজারী পাণ্ডাগণের মধ্যে কয়েকজন প্রধান সেবাইতের নাম তাঁহারা আমাদিগকে জানাইলেন। (১) প্রবাসী, (২) গণপতি, (৩) সোহনলাল, (৪) গৌরী, (৫) লক্ষ্মী, (৬) ছোট্টম্, (৭) রূপী।

এখানে মাঘ ও কার্ত্তিকমাসে মেলা হইয়া থাকে। এই দেশীয় যাত্রিগণই এই স্থানে বিশেষভাবে আসিয়া থাকেন। গৌড়ীয়গণের বিশেষ যাতায়াত নাই। তাহার কারণ, গৌড়ীয়নামধারিগণ এইস্থানের বিশেষ তাৎপর্য্য জানেন না। শেষশায়ীগ্রাম হাসানপুর থানা ও হোড়েল ডাকঘরের অন্তর্গত।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আনুগত্যে মহামহোপদেশক শ্রীপাদ আচার্য্যত্রিক কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ, মহামহোপদেশক শ্রীপাদ অনন্ত বাসুদেব বিদ্যাভূষণ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন ভক্তিশাস্ত্রী ও শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ সেই ক একদিন শেষশায়ী দর্শনের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন। মথুরা হইতে কোশী পর্য্যন্ত পীট্ দেওয়া সুন্দর রাস্তা। কোশী হইতে Irrigation department এর খালের ধারের রাস্তা পাকা না হইলেও ভাল। তবে তাহা সাধারণ টাঙ্গা বা গাড়ী-চলাচলের রাস্তা নহে। এই স্থান দুর্গমস্থান বলিয়াই হয় ত' অনেকে আসেন না। কোশী হইতে নন্দগাঁও ও বর্ষাণা পর্য্যন্ত একটি নূতন রাস্তা হইতেছে। কোশী হইতে নন্দগ্রাম সাত মাইল ও বর্ষাণা এগার মাইল।

অষ্টকাল-লীলা

স্বরাট্ লীলা-পুরুষোত্তম অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণের লীলা 'প্রকট' ও 'অপ্রকট' ভেদে দুই প্রকার। এই উভয় লীলা একই তত্ত্ব। যখন অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণ নিজস্ব গোলোকধামে বিহার করেন, তখন সেই লীলা 'অপ্রকট-লীলা' নামে কথিত হয়। আর যখন শ্রীকৃষ্ণ স্বেচ্ছায় নিজ অপ্রাকৃতধাম ও স্বগণসহ এই জগতে প্রকটিত হইয়া প্রকট-বিহার করেন, তখন তাহা 'প্রকট-ব্রজলীলা'। তখন গোকুলে গোলোক অবতীর্ণ হন—প্রপঞ্চাতীত ধাম প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়া অবিচিন্ত্যশক্তিপ্রভাবে তাঁহার প্রপঞ্চাতীত স্বরূপ সংরক্ষণ করেন। কাজেই তাহা ঐতিহাসিক খণ্ড স্থান, কাল, পাত্র কিংবা রূপক অথবা আধ্যাত্মিক কোন কল্পনা, আরোপ বা অবাস্তব ভাব মাত্র নহে।

প্রকট-ব্রজলীলা নিত্য ও নৈমিত্তিক ভেদে দুইপ্রকার। কোন নিমিত্তকে আশ্রয় করিয়া শ্রীকৃষ্ণ যে লীলা প্রকাশ করেন, তাহাই নৈমিত্তিকলীলা—যথা পূতনাবধাদি ও দুরপ্রবাসাদি। আর লীলা-পুরুষোত্তম যে লীলা প্রত্যহ বা নিত্য প্রকাশ করেন, তাহাই নিত্যলীলা। ব্রজের অষ্টকালীয় লীলাই নিত্যলীলা। দিবারাত্র অর্থাৎ ২৪ ঘন্টাকে ৮ ভাগে ভাগ করিলে এক এক ভাগে তিন ঘন্টা অর্থাৎ ৭।। দণ্ড বা এক প্রহর করিয়া পড়ে।

এই অষ্টপ্রহর অর্থাৎ চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টা কালই সম্ভোগময় বিগ্রহ অপ্রাকৃত শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অপ্রাকৃত সেবিকা তাঁহার নিজস্ব অনুচরীগণের সহিত যেরূপভাবে সেবা করেন—তাঁহার সহিত মিলিত হন, তাহা অনর্থমুক্ত অর্থাৎ যাঁহাদের প্রাকৃত পুরুষ বা স্ত্রী-অভিমান বিদূরিত হইয়াছে, যাঁহারা জগতের কামনা-বাসনা হইতে পরিমুক্ত হইয়াছেন, যাঁহারা চেতন-রাজ্যের সেবা-সংকল্পে নিত্য প্রতিষ্ঠিত, সেইরূপ জাতমধুররতিগণই অষ্টকাল অপ্রাকৃত কৃষ্ণসেবিকাগণের আনুগত্যে কীর্ত্তনমুখে স্মরণ করিয়া থাকেন। বিষয়ী জীব রুচির সহিত জড়বিষয়ের কথা শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিতে করিতে যেরূপ বিষয়ের অনুধ্যানেই অধিকতর সমাধিগ্রস্ত হয়, কামুক বা কামুকী যেরূপ রুচিবশে কামকথা শ্রবণ-কীর্ত্তন করিতে করিতে সহজেই কামচিন্তায় ও কাম চরিতার্থ করিবার বিবিধ সংকল্পে ভরপুর হইয়া উঠে, তদ্রূপ যাঁহারা জড়বিষয় হইতে মুক্ত হইয়াছেন, যাঁহাদের ভোগের বা জড়ত্যাগের যাবতীয় সংকল্প-বিকল্প বা মনোধর্ম্ম বিদূরিত হইয়াছে, তাঁহারা জড়ভাবনা-পথের পরপারে যে শুদ্ধসত্ত্বোজ্জ্বল কেবল সেবোন্মুখতাময় চিত্তবৃত্তি আছে, তাহাতে রুচির সহিত অপ্রাকৃত কৃষ্ণের বিষয় সদ্‌গুরুর নিকট হইতে শ্রবণ ও অনুক্ষণ তদনুকীর্ত্তন করিতে করিতে অষ্টকালীয় লীলার স্মরণ করিতে পারেন।

অষ্টকাল-লীলা অষ্টকাল বা অষ্টযামে বিভক্ত হইয়াছে ঃ—

নিশান্তঃ প্রাতঃ পূর্ব্বাহ্ণো মধ্যাহ্নশ্চাপরাহ্ণকঃ।
সায়ং প্রদোষরাত্রিশ্চ কালাষ্টৌ চ যথাক্রমম্।।
মধ্যাহ্নৌ যামিনী চোভৌ যন্মুহূর্ত্তোমিতৌ স্মৃতৌ।
ত্রিমুহূর্ত্তমিতো জ্ঞেয়া নিশান্ত প্রমুখাঽপরে।।

অর্থাৎ (১) নিশান্ত (রাত্রের শেষ ছয় দণ্ড *), (২) প্রাতঃকাল (প্রাতে প্রথম ছয় দণ্ড), (৩) পূর্ব্বাহ্ণ (ছয় দণ্ড বেলা হইতে দ্বিপ্রহর দিবস পর্য্যন্ত), (৪) মধ্যাহ্ন (দ্বিপ্রহর দিবস হইতে সাড়ে তিনপ্রহর পর্য্যন্ত), (৫) অপরাহ্ণ (সাড়ে তিনপ্রহর দিবস হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত), (৬) সায়ং (সন্ধ্যার পর ছয় দণ্ড), (৭) প্রদোষ (ছয় দণ্ড রাত্রি হইতে মধ্যরাত্র পর্য্যন্ত) ও (৮) রাত্রি (মধ্যরাত্র হইতে সাড়ে তিনপ্রহর রাত্রি পর্য্যন্ত)। রাত্রিলীলা ও মধাহ্নলীলা ছয় ছয় মুহূর্ত্ত; অন্য সকল লীলাই তিন তিন মুহূর্ত্ত। দুই দণ্ডে এক মুহূর্ত্ত।

সাত্বত পঞ্চরাত্রের অন্যতম 'সনৎকুমার-সংহিতা' ও 'পদ্মপুরাণ' প্রভৃতি গ্রন্থে বর্ণিত এই অষ্টকালীয় লীলার কথা অনর্থমুক্ত অধিকারিগণ শ্রীগুরুর আদেশ-ক্রমে শ্রীগুরুমুখে শ্রবণ করিতে পারেন। শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু অষ্টকালীয় লীলাসম্বন্ধে যে ক একটি শ্লোক গ্রথিত করিয়াছেন, তাহা অবলম্বন করিয়াই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু ত্রয়োবিংশতি সর্গবিশিষ্ট 'শ্রীগোবিন্দলীলামৃত' নামক গ্রন্থ লিখিয়াছেন। এই অষ্টকালীয় লীলা অতীব দুরবগাহ। ইহা কামক্রোধাদির বশীভূত সাহিত্যিক কবি বা বিষয়ী ব্যক্তি দূরে থাকুক, অতীব নির্ম্মল-চরিত্র তপস্বী-জ্ঞানী প্রভৃতিরও অনধিগম্য।

* ২৪ মিনিটে এক দণ্ড, ২।। দণ্ডে ১ ঘণ্টা, ৭।। দণ্ডে একপ্রহরে, ১ প্রহর ৩ ঘণ্টা।

শ্রীরাধা-প্রাণবন্ধোশ্চরণকমলয়োঃ কেশশেষাদ্যগম্যা
যা সাধ্যা প্রেমসেবা ব্রজচরিতপরৈর্গাঢ়লৌল্যৈকলভ্যা।
সা স্যাৎ প্রাপ্তা যয়া তাং প্রথয়িতুমধুনা মানসীমস্য সেবাং
ভাব্যাং রাগাধ্বপান্থৈর্ব্রজমনুচরিতং নৈত্যিকং তস্য নৌমি।।

(১ম সর্গ, ৩য় শ্লোক)

তাৎপর্য্য—শ্রীরাধার প্রাণবন্ধু শ্রীকৃষ্ণের চরণপদ্মের প্রেমসেবা—যাহা, ব্রহ্মা, শিব, অনন্ত-প্রমুখ মহা-পুরুষগণের অজ্ঞেয়া, যাহা ব্রজের রাগাত্মিক ও তদনুগজনের গাঢ় লালসাদ্বারাই একমাত্র লভ্য, অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণের যে প্রাকৃত মানসী সেবা দ্বারা সেই প্রেমসেবা লাভ করা যায়, যে মানসী সেবা শ্রীগুরুর আনুগত্যে ভাবনার পথ অতিক্রান্ত শুদ্ধ-চেতনের ভূমিকায় কীর্ত্তনমুখে অকৃত্রিমভাবে স্মৃতিপথে উদিত হয়, রাগমার্গের পথিকগণের দ্বারা অনুক্ষণ পরিভাবিত সেই নিত্য কৃষ্ণচরিত্র অর্থাৎ প্রাত্যহিক লীলাকে এখন বিশেষভাবে কীর্ত্তন করিবার জন্য নমস্কার করিতেছি।

পাঠক! গোবিন্দলীলামৃতকারের এই উক্তি হইতে দেখিতে পাইলেন, এই অষ্টকালীয় লীলা কি দুরবগাহ বস্তু! অন্যাভিলাষরত, বিষয়বাসনায় সর্ব্বদা ক্লিষ্ট, কামক্রোধাদি দ্বারা অভিভূত, নানা জড়ীয় সংকল্প-বিকল্পের দ্বারা প্রতিহত ব্যক্তিগণের পক্ষে ত' দূরের কথা স্বয়ং অনন্তদেব, শিব, এমন কি ব্রহ্মাপ্রমুখ মহাপুরুষগণের পক্ষেও এই লীলা দুরধিগম্য।

যাঁহারা রাগাত্মিকজনের অনুগ বলিয়া কৃত্রিম অভিমান প্রদর্শন পূর্ব্বক অন্তরে নানাপ্রকার ভোগ ও ত্যাগ বুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত, নানা অনর্থে অভিভূত, তাঁহাদের পক্ষে অষ্টকালীয় লীলা কৃত্রিমভাবে স্মরণ-মনন করিবার অভিনয় ভক্তিদেবীর চরণে অপরাধের যে কতদূর ফল এবং জগজ্জঞ্জালের আদর্শ, তাহা আত্ম-মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী সুধী পাঠকগণ বিচার করিবেন। যাঁহারা এইরূপ গুহ্যতম বস্তুকে—গুহ্যতম ভজনকথাকে যথাতথা যেভাবে সেভাবে ছড়াইবার বা অনুশীলনের নামে ভোগ করিবার চেষ্টা করেন, তাঁহারাই প্রাকৃত-সহজিয়া। কোন দিনই তাঁহাদের কৃষ্ণলীলায় প্রবেশ-লাভ হইবে না। মধুমক্ষিকা যেরূপ স্বচ্ছ কাচভাণ্ডস্থিত মধুর অব্যবহিত স্পর্শ ও আস্বাদন না পাইয়াও কঠিন ও স্বচ্ছ কাচভাণ্ডের উপরে বসিয়াই 'মধুর সংস্পর্শ পাইয়াছি' কল্পনা করে, কৃত্রিম লীলাস্মরণপথের পথিকগণও সেইরূপ আপনিই আপনাকে 'রসে ডগমগ' মনে করিয়া প্রকৃত কৃষ্ণলীলারস হইতে চিরতরে বঞ্চিত থাকে। তাহাদের মৌখিক 'তৃণাদপি সুনীচতা,' 'রাধারাণীর (?) কৃপা যাচ্ঞা' প্রভৃতির অভিনয় কেবল সম্ভোগময়ী চিত্তবৃত্তি হইতে উত্থিত বিকার বিশেষ, তাহা প্রচ্ছন্ন প্রতিষ্ঠাশাময়ী কপটতা, ভক্তিপথের চির-অর্গলস্বরূপ।

একশ্রেণীর প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায় নৈশ লীলা হইতে অষ্টকালীয় লীলা-কীর্ত্তন-স্মরণ আরম্ভ করিয়া থাকেন। কিন্তু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীরূপের বিচার অনুসরণ করিয়া নিশান্তলীলা হইতেই অষ্টকালীয়-লীলার সেবা আরম্ভ করিবার উপদেশ দিয়াছেন। শ্রীকবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে শ্রীল

রূপগোস্বামীপ্রভুর অষ্টকালীয় লীলা-বিষয়ক শ্লোকাবলীর সংক্ষেপ করিয়া একটি শ্লোকে অষ্টকালের কোন্ কোন্ সময় কোন্ কোন্ লীলা অনুস্মৃত হইয়া থাকে, তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন। তাহাতেও নিশান্ত বা কুঞ্জভঙ্গ-লীলা হইতে নিত্যলীলার সেবানুশীলন করিবার কথা আছে।

কুঞ্জাদেগাষ্ঠং নিশান্তে প্রবিশতি কুরুতে দোহনান্নাশনাদ্যাৎ
প্রাতঃ সায়ঞ্চ লীলাং বিহরতি সখিভিঃ সঙ্গবে চারয়ন্ গাঃ।
মধ্যাহ্নে চাথ নক্তং বিলসতি বিপিনে রাধয়াদ্ধা পরাহ্নে
গোষ্ঠং যাতি প্রদোষে রময়তি সুহৃদো যঃ স কৃষ্ণোহবতারঃ।।

যিনি নিশান্তে অর্থাৎ রাত্রি-শেষে প্রেয়সীগণের সহিত কুঞ্জ হইতে গোষ্ঠে অর্থাৎ নন্দগ্রামস্থ নিজগৃহে প্রবেশ করেন, যিনি প্রাতঃকাল ও সায়ংকালে গোদোহন ও ভোজনাদি লীলা করেন, যিনি পূর্ব্বাহ্নে গোচারণ ও সখাগণের সহিত বিহার করেন, যিনি মধ্যাহ্ন ও রাত্রিকালে বনমধ্যে শ্রীরাধার সহিত বিলাস করেন এবং যিনি অপরাহ্ন-কালে গোষ্ঠে গমন ও প্রদোষে অর্থাৎ রজনীমুখে সুহৃদ্‌গণের সহিক ক্রীড়া করিয়া থাকেন, সেই শ্রীকৃষ্ণ আমাদিগকে রক্ষা করুন।

শ্রীগোবিন্দলীলামৃতের প্রথম সর্গে (১) নিশান্তলীলা, দ্বিতীয় হইতে চতুর্থ সর্গ পর্য্যন্ত (২) প্রাতর্লীলা, পঞ্চম হইতে সপ্তম সর্গ পর্য্যন্ত (৩) পূর্ব্বাহ্নলীলা, অষ্টম হইতে অষ্টাদশ সর্গ পর্য্যন্ত (৪) মধাহ্নলীলা, ঊনবিংশ-সর্গে (৫) অপরাহ্নলীলা, বিংশ সর্গে (৬) সায়ংলীলা, একবিংশ সর্গে (৭) প্রদোষলীলা এবং দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ সর্গে (৮) রাত্রিলীলা বর্ণিত হইয়াছে।

এই অষ্টকালীয় নিত্যলীলার প্রত্যেক লীলাতেই শ্রীরাধার অনুচরীগণের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধার মিলনচেষ্টা ভজনবিজ্ঞগণ দর্শন করিতে পারেন। অষ্টকালীয় লীলায় সখীগণের কৃষ্ণ অপেক্ষা শ্রীরাধার সহিতই অধিকতর কার্য্য। শ্রীরাধাকে কৃষ্ণের সহিত মিলন করাইবার জন্যই তাঁহাতের সর্ব্বতোমুখী চেষ্টা। তাঁহারা শ্রীরাধার সেবায়ই ব্যস্ত। শ্রীরাধার সহায়তা করিয়াই তাঁহারা সুখী। নিজেরা কৃষ্ণের সহিত মিলিত হইব বা পৃথগ্‌ভাবে কৃষ্ণদর্শন করিব—এরূপ দুর্ব্বুদ্ধি শ্রীরাধিকার অনুগা গোপীগণের নাই। যখন তাঁহারা নিশান্তে শ্রীরাধা কৃষ্ণের নিদ্রাভঙ্গ করিতেছেন, তখনও তদ্দ্বারা শ্রীরাধারই সুখোৎপাদনে চেষ্টান্বিতা। পাছে শ্রীরাধার সহিত গোপনে কৃষ্ণের মিলন-কথা গুরুজন জানিতে পারিয়া শ্রীরাধাকাকে প্রতিরাত্রে কৃষ্ণের সহিত মিলিত হইতে বাধা প্রদান করে, সেইজন্যই তাঁহারা রাত্রি থাকিতে থাকিতেই শ্রীরাধাকে জাগাইয়া দেন।

প্রাতঃকালে শ্রীকৃষ্ণ গোষ্ঠে গমন করেন, সখীগণও শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইবার জন্য শ্রীরাধাকে সজ্জিত করিয়া দেন এবং গোষ্ঠ হইতে শ্রীকৃষ্ণ আগমন করিয়া যাহা যাহা ভোজন করিবেন, সেই ভোজ্য দ্রব্য রন্ধনের জন্য শ্রীরাধা যশোমতীর অনুরোধে শ্রীরাধার সখীগণের দ্বারাই নন্দগৃহে আনীত হন। তাহাতে শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধার মিলন সংঘটিত হইবে জানিয়াই সখীগণ দূতির কার্য্য ও নানাবিধ সহায়তা করিয়া থাকেন। শ্রীরাধার প্রতি দুর্ব্বাসার বরের ব্যাজে ও নানাছলে কুটিলস্বভাবা জটিলাকে ভুলাইয়া কুন্দলতার

শ্রীরাধিকাকে নন্দগৃহে লইয়া আসা প্রভৃতি ব্যাপার ও ললিতা বিশাখা প্রভৃতি সখীগণের শ্রীরাধার পাককার্য্যে নানাপ্রকার সহায়তা শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধার মিলনেরই বিবিধ চেষ্টা মাত্র।

এইরূপ অষ্টযামের অষ্টলীলা গম্ভীরচিত্তে অনুধাবন করিলে জানা যায়, যিনি শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আরাধিকা, তাঁহার শ্রীকৃষ্ণসেবার সহায়তা করিবার জন্যই সখীগণের একমাত্র চেষ্টা। ইহাই ভক্তিরাজ্যের বিচার। যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সেবক, তাঁহার সর্ব্বতোমুখী সেবা করাই ভক্তির পথ।

শ্রীকৃষ্ণের নিত্যলীলাসমূহ কবিকল্পনা বা আরোপিত চিন্তাবিশেষ নহে। এই কথাটি আধ্যক্ষিক সাহিত্যিক সম্প্রদায় জড়-কামক্রোধে আচ্ছন্না হইয়া অনেক সময়ই বুঝিতে পারেন না। ঔপন্যাসিকের কল্পনা বা কবির স্বপ্নরাজ্যের চিন্তার মত তাঁহারা যেন অষ্টকালীয় লীলাকে মনে না করেন। এইজন্যই ভজনবিজ্ঞগণ এই লীলাকথায় যে, প্রাকৃত ব্যক্তিগণের প্রবেশাধিকার নাই, তাহা জানাইয়াছেন এবং কেশ-শেষাদির অনধিগম্যা এই অপ্রাকৃত লীলা যাহাতে প্রাকৃত চিন্তাচ্ছন্ন ব্যক্তিগণের নিকট কোন প্রকারে প্রকাশিত না হয়, এরূপ শপথ প্রদান করিয়াছেন।

"আপন ভজন-কথা, না কহিবে যথা তথা।"

অষ্টকালীয় লীলা স্মরণানুশীলন একমাত্র রুচিভূমিকায় **জাতমধুররতি** ব্যক্তিগণের দ্বারা শুদ্ধনাম-সংকীর্ত্তন-মুখেই সাধিত হইতে পারে। নিরপরাধে যথেষ্ট নামশ্রবণ ও তদনুকীর্ত্তন করিতে করিতে অকৃত্রিম-ভাবে যে সহজ স্মরণ হয় অর্থাৎ শ্রীনামই যখন **নাম-নাম, নাম-রূপ, নাম-গুণ, নাম-পরিকর ও নাম-লীলা** প্রকাশ করিয়া আপনাকে সম্প্রকাশিত করেন, তখনই স্মরণ সম্ভব হয়। শ্রবণ ব্যতীত কীর্ত্তন-সম্ভব নহে, আবার কীর্ত্তন ব্যতীতও স্মরণ সম্ভব নহে। শ্রবণই কীর্ত্তনরূপে প্রকাশিত, কীর্ত্তনই স্মরণরূপে প্রকটিত; আগে স্মরণ, পরে কীর্ত্তন বা শ্রবণ নহে। আগে শ্রবণ, তৎপরে কীর্ত্তন এবং কীর্ত্তনমুখেই স্মরণ। **'শ্রবণ' পরিত্যাগ করিয়া কীর্ত্তনের অনুশীলন হয় না, কীর্ত্তন পরিত্যাগ করিয়াও স্মরণের অনুশীলন হয় না**। যিনি শ্রবণ করেন, তিনি কীর্ত্তন না করিয়া থাকিতে পারেন না, আবার যিনি কীর্ত্তন করেন, তাঁহার সহজেই কীর্ত্তিত বিষয়ের স্মরণ হয়। আবার যে সকল ব্যক্তি প্রথমেই রূপ-গুণ-লীলার শ্রবণকেই 'শ্রবণ' মনে করেন, সেই সকল প্রাকৃতসাহজিক চিত্ত-বৃত্তি যুক্ত ব্যক্তিগণ কোন দিনই অপ্রাকৃত অষ্টকালীয় লীলাস্মরণে অধিকার লাভ করিতে পারেন না। ভজনবিজ্ঞ সদ্গুরু কখনও প্রথমেই মাটিয়াবুদ্ধিতে রূপ-গুণ-লীলা স্মরণ করাইবার আদর্শ দর্শন করেন না। শ্রীনামশ্রবণ পরিত্যাগ করিয়া পৃথগ্‌ভাবে রূপ-গুণ-লীলা শ্রবণ বা কীর্ত্তন অষ্টকালীয় লীলা-স্মরণানুশীলনের প্রণালী নহে। সদ্গুরুপাদপদ্মে সর্ব্বতোভাবে আত্মসমর্পণ করিয়া অনুক্ষণ অপরাধ-শূন্য নামশ্রবণ ও নামকীর্ত্তন করিতে করিতে অকপট-রুচির সহিত কীর্ত্তিত বিষয়ের যে স্মরণ, তাহাই ক্রমে নাম-নাম শ্রবণ, নাম-রূপ শ্রবণ, নাম-গুণ শ্রবণ, নাম-পরিকর শ্রবণ, নাম-লীলা শ্রবণ; তাহা আবার নাম-নাম কীর্ত্তন, নাম-রূপ কীর্ত্তন, নাম-গুণ কীর্ত্তন, নাম-পরিকর কীর্ত্তন ও নাম-লীলা কীর্ত্তন; তাহা হইতে কীর্ত্তনমুখে নাম-নাম স্মরণ, নাম-রূপ স্মরণ, নাম-গুণ স্মরণ, নাম-পরিকর স্মরণ ও নাম-লীলা স্মরণরূপে

পরিস্ফুট হয়। অতএব আমরা যেন অষ্টকাল-লীলা-স্মরণের কৃত্রিম অনুকরণ করিবার অভিনয় প্রদর্শন করিয়া প্রকৃত ভজন- পথ হইতে বিচ্যুত না হই। **নামসংকীর্ত্তন পরিত্যাগ করিয়া স্মরণের অভিনয় করিলে নামীর সঙ্গলাভ আমাদের দুর্ঘট হইবে।**

অষ্টকাল-লীলা সম্বন্ধে শ্রীরূপগোস্বামী প্রভু যে একাদশটি শ্লোক গ্রথিত করিয়াছেন, তাহা অনুসরণ করিয়া শ্রীরূপানুগবর শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু 'গোবিন্দলীলামৃত', শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর 'সংকল্প-কল্পদ্রুম' ও 'শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃত' প্রভৃতি গ্রন্থ লিখিয়াছেন। ঐ সমস্ত গ্রন্থই সংস্কৃত শ্লোকে রচিত। বঙ্গভাষায় লিখিত 'একান্নপদ' ও শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের নামে প্রচারিত বিবিধ পদ দৃষ্ট হয়। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর পূর্ব্ব মহাজনগণের বিভিন্নপদ যথাস্থানে সংগ্রহ করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টকে অষ্টকালীয় লীলার সহিত সুগুম্ফিত করিয়া 'ভজন-রহস্য' নামক গ্রন্থ ও বঙ্গভাষায় তাহার পদ্যানুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীল রূপপ্রভুর ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর—

> ''আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া।
> ততোঽনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাত্ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ।।
> অথাসক্তিস্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি।
> সাধকানায়রং প্রেম্নঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ।।''

শ্লোক-কথিত (১) শ্রদ্ধা, (২) সাধুসঙ্গে অনর্থ-নিবৃত্তি, (৩) নিষ্ঠার সহিত ভজন-ক্রিয়া, (৪) রুচি, (৬) আসক্তি, (৬) ভাব, (৭) প্রেম-বিপ্রলম্ভ ও (৮) প্রেমভজন-সম্ভোগ এই আটটি ভজনক্রমকে যথাক্রমে অষ্টযামের অষ্টলীলা-কীর্ত্তনস্মরণানুশীলনের সহিত সংযোজিত করিয়াছেন।

প্রথমযাম সাধনে অর্থাৎ নিশান্ত-লীলায় 'শিক্ষাষ্টকের' 'চেতোদর্পণমার্জ্জনং' প্রভৃতি প্রথম শ্লোক, দ্বিতীয়-যাম সাধনে অর্থাৎ প্রাতঃকালীন ভজনে শিক্ষাষ্টকের 'নাম্নামকারি' প্রভৃতি দ্বিতীয় শ্লোক, তৃতীয় যামসাধনে অর্থাৎ পূর্ব্বাহ্নকালীয় ভজনে 'তৃণাদপি সুনীচেন' প্রভৃতি তৃতীয় শ্লোক, চতুর্থযাম সাধনে অর্থাৎ মধ্যাহ্নকালীয় ভজনে 'ন ধনং ন জনং' প্রভৃতি চতুর্থ শ্লোক, পঞ্চম যাম সাধনে অর্থাৎ অপরাহ্নকালীয় ভজনে 'অয়ি নন্দতনুজ কিঙ্করং' প্রভৃতি পঞ্চম শ্লোক, ষষ্ঠযাম সাধনে অর্থাৎ সায়ংকালীয় ভজনে 'নয়নং গলদশ্রুধারয়া' প্রভৃতি ষষ্ঠ শ্লোক, সপ্তম যাম সাধনে অর্থাৎ প্রদোষকালীয় ভজনে 'যুগায়িতং নিমেষেণ' প্রভৃতি সপ্তম শ্লোক, অষ্টমযাম সাধনে অর্থাৎ রাত্রি-লীলায় 'আশ্লিষ্য বা পাদরতাং' প্রভৃতি শিক্ষাষ্টকের অষ্টম শ্লোকের ঐক্যতান প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টকের মধ্যে অষ্টকালীয় লীলাকে সুস্পষ্ট করিয়া চিদ্‌বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে প্রদর্শন করায় শ্রীরূপানুগবর শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর 'পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্' এই গৌরবাণীরই অনুসরণ করিয়াছেন অর্থাৎ শ্রীনামসংকীর্ত্তনমুখেই অষ্টকালীয় লীলার স্মরণানুশীলন সম্ভব, ইহা জানাইয়াছেন। শ্রদ্ধা, সাধুসঙ্গ, অকৃত্রিম নিষ্ঠা, স্বাভাবিকী রুচি, কৃষ্ণাসক্তি উদিত না হইলে মাটিয়া-বুদ্ধি লইয়া কৃত্রিমভাবে লীলাস্মরণ ও ভাবভক্তিতে অবস্থানের অভিনয় শ্রীরূপের শিক্ষায় সর্ব্বতোভাবে

পরিবর্জ্জিত হইয়াছে। এজন্যই আমরা যদি প্রকৃত আত্মমঙ্গলের অভিলাষী হই, তাহা হইলে আমাদের সর্ব্বাগ্রে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ''শিক্ষাষ্টক'' ও শ্রীরূপের ''উপদেশামৃত'' বা ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর সার-সমবেত ''সাধন পথ'' শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিকট শ্রবণ ও অনুশীলন করা কর্ত্তব্য। ''গাছে না উঠিতেই এক কান্দি''—এই নীতির অনুসরণ করিয়া ভজনের অভিনয়ের নামে যেন 'ফাজলামি' করিয়া ভজন-পথ হইতে আমরা চির বঞ্চিত না হই।

শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের একটি উপদেশে জানা যায়,—

''সাধন-স্মরণ-লীলা, তাহাতে না কর হেলা।''

কৃষ্ণ-বিস্মৃত জীবের কৃষ্ণস্মরণ ব্যতীত মঙ্গলের আর উপায় নাই।

''অবিস্মৃতিঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ।
ক্ষিণোত্যভদ্রাণি চ শং তনোতি।
সত্ত্বস্য শুদ্ধিং পরমাত্মভক্তিং
জ্ঞানঞ্চ বিজ্ঞান-বিরাগ-যুক্তম্।।

(ভাঃ ১২।১২।৫৫)

শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মযুগলের অনুক্ষণ স্মৃতি জীবের যাবতীয় অভদ্র অর্থাৎ অমঙ্গল বিনষ্ট করিয়া অশেষ কল্যাণ বিস্তার করে। তাঁহার চরণ-স্মরণে অন্তঃকরণ-শুদ্ধি এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান ও বিরাগ-যুক্ত প্রেমলক্ষণা ভক্তি লাভ হয়।

কৃষ্ণস্মৃতি যখন বৈধ অনুশাসন পরিত্যাগ করিয়া স্বাভাবিক রুচি বা লৌল্য ও আসক্তি হইতে অকৃত্রিম স্থায়ী ভাবভক্তিতে প্রকাশিত হয় এবং যখন সেই ভাব ভক্তি কেবলা মধুর রতিকেই সর্ব্বতোভাবে বরণ করে, তখন যে কৃষ্ণস্মৃতি, তাহাই সর্ব্ববিধ কৃষ্ণস্মৃতির পরাকাষ্ঠা। অষ্টকালীয় লীলাস্মরণ-পদ্ধতিতে জাতমধুররতি ভক্তগণেরই কীর্ত্তনমুখে স্মরণের ভজন প্রণালী বিরত হইয়াছে। ইহাই সর্ব্বোপাধি-বিনির্মুক্ত পরিনির্ম্মল চেতনের সর্ব্বোচ্চ সাধ্য।

অষ্টকালীয় লীলাস্মরণে আর একটি বিষয় বিশেষ জ্ঞাতব্য।

কৃষ্ণং স্মরন্ জনঞ্চাস্য প্রেষ্ঠং নিজসমীহিতম্।
তত্তৎকথারতশ্চাসৌ কুর্য্যাদ্‌বাসং ব্রজে সদা।।
সেবা সাধক রূপেণ সিদ্ধরূপেণ চাত্র হি।
তদ্ভাবলিপ্সুনা কার্য্যা ব্রজলোকানুসারতঃ।।

(ভঃ রঃ সিঃ পূর্ব্ব বিঃ ২।১৫০-১৫১)

বাহ্য, অভ্যন্তর,—ইহার দুই ত' সাধন।
'বাহ্যে' সাধক-দেহে করে শ্রবণ-কীর্ত্তন।।
'মনে' নিজ-সিদ্ধদেহ করিয়া ভাবন।
রাত্রি-দিনে করে ব্রজে কৃষ্ণের সেবন।।
নিজাভীষ্ট কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ পাছে ত' লাগিয়া।
নিরন্তর সেবা করে, অন্তর্ম্মনা হৈঞা।।

(চৈঃ চঃ মধ্য ২২।১৫২-৫৩ ও ১৫৫)

অনেকে উপরি উক্ত বিষয়টি অবধারণ করিতে না পারিয়া মানসী সেবাকে মনোধর্ম্ম বা মনঃকল্পনার সহিত একাকার করিয়া ফেলেন। অপ্রাকৃত মানসী সেবা মনঃ কল্পনা বা মনোধর্ম্ম নহে। মনোধর্ম্মগত কৌতুহলও লৌল্যপদবাচ্য নহে, উহা আত্মেন্দ্রিয়তর্পণ মাত্র। মনোধর্ম্মে 'সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলম্। হৃষীকেণ হৃষীকেশ-সেবনং' সাধিত হয় না। সেখানে সাধকাভিমানীই জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে কার্য্যতঃ হৃষীক অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের ঈশ অর্থাৎ অধিপতি সাজিয়া কল্পনা প্রভাবে লীলা-স্মরণের নামে কৃষ্ণভোগের চেষ্টা করিয়া থাকে। হরিভোগ—হরিসেবা নহে। মনোধর্ম্মও মানসীসেবা নহে। ইহা বিশেষভাবে উপদিষ্ট না হইলে মনঃকল্পনা বা ইন্দ্রিয়ভোগকেই দুষ্ট মন মানসীসেবা বলিয়া বঞ্চনা করিবার চেষ্টা করে। অতএব সাধু সাবধান!!

বেণু ও বপু

'বেণু' শব্দের সরলার্থ বাঁশী ও 'বপু' শব্দের অর্থ শরীর। বেণু বাণীর বাহন বা বাণীময়, আর বপু বস্তুর অস্তিত্বের বাহ্য বাহন বা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের লক্ষ্য স্বরূপ। চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের অতীতরাজ্য হইতেও বেণুর গান কর্ণরন্ধ্রে তাহার সুর পৌঁছাইতে পারে, কিন্তু চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের গোচরীভূত না হইলে বপুর অস্তিত্ব আমরা লক্ষ্য করিতে পারি না।

পার্থিব রাজ্যে বেণু ও বপুর বৈশিষ্ট্য কতকটা এইরূপ ভাবে বিশ্লেষণ করা যাইতে পারে; কিন্তু অপার্থিব গোলোক-রাজ্য হইতে যখন স্বয়ং ভগবদ্বস্তুর বেণু ও বপুর অবতার হয়, তখন আমরা কিভাবে বেণু ও বপুর মাধুর্য্য উপলব্ধি করিবার যোগ্য হইতে পারি, তদ্বিষয়ে বিশেষ আলোচনার প্রয়োজন।

অপ্রাকৃত কৃষ্ণের বেণু সরল বা সোজা; কিন্তু কৃষ্ণের বপু বঙ্কিম, ত্রিভঙ্গিম বা তিন জায়গায় বাঁকা। বেণু কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিয়া হৃদয়কে মথিত করে। অতএব বেণুর অবতার কর্ণাঞ্জলির মধ্যে হয়। জগতেও দেখা যায়—জীব-জগতের মধ্যে যাহা অত্যন্ত ক্রুর বলিয়া বিবেচিত, সেইরূপ কুটিলগতি হিংস্র

সর্পকেও সাধারণ বেণুধ্বনি বশীভূত ও মুগ্ধ করিতে পারে। হয়ত' যে সর্প বপুবিশেষকে দেখিয়া শত্রুজ্ঞানে অহিংসককেও হিংসা করিয়া থাকে, সেই সর্পই সেই ব্যক্তির বেণুধ্বনি শুনিয়া আকৃষ্ট হয়, তাহার পায়ে লুটাইয়া পড়ে ও চিরতরে আত্মসমর্পণ করিয়া থাকে।

প্রাকৃত বপুকে আমরা চক্ষুর সাহায্যে দেখিতে পারি, কিন্তু বিজাতীয় চক্ষুর্দ্বারা অপ্রাকৃতবপুর দর্শন হয় না। মাংসচক্ষু লইয়া কৃষ্ণের বপু দেখা যায় না। এক দেখিতে আর এক দেখিয়া ফেলিতে হয়। কংস, জরাসন্ধ, শিশুপাল, শৃগাল-বাসুদেব প্রভৃতি বহুব্যক্তি কৃষ্ণের বেণু শ্রবণ করিতে না পারিয়া কেবল মাংস-চক্ষু লইয়া কৃষ্ণবপুর আবৃতাবস্থা দর্শন করায় কৃষ্ণের কোটিকন্দর্প-নীরাজিত বপু-মাধুর্য্য দর্শন করিতে পারে নাই। অপ্রাকৃত বপুর আবরণ-স্বরূপ স্থূলত্ব ভাবই উহাদের মাংস-চক্ষুর এক একটি 'ঠুলী' প্রস্তুত করিয়াছিল। কাজেই কেবল বপু দেখিতে গিয়া অনেক সময় স্থূলত্বই আমাদের চক্ষুকে আবরণ করিয়া থাকে।

কৃষ্ণের ন্যায় কৃষ্ণের প্রকাশ-বিগ্রহ শ্রীগুরুপাদপদ্ম, আচার্য্য-পাদপদ্ম বা বৈষ্ণব-পাদপদ্মের বেণু অর্থাৎ বাণী-শ্রবণের পরিবর্ত্তে—তাঁহার বাণীকেই বরণ করিবার পরিবর্ত্তে যদি আমরা কেবল আমাদের মাংস-চক্ষু লইয়া তাঁহাদের বপু দর্শন করি, তাহা হইলে মধ্যপথে স্থূলত্ব বা অস্বচ্ছতা যবনিকার ন্যায় পতিত হইয়া বস্তু-দর্শনে ব্যাঘাত জন্মাইবে। তাই অনেকে সাধু দর্শন করিতে গিয়া মাংস-চক্ষুতে সাধুর স্থূলত্ব অর্থাৎ অসাধুত্বই দর্শন করিয়া আসেন। কারণ, যে পর্য্যন্ত আমরা শ্রবণে সাধুর বাণী বরণ না করিব, সেই পর্য্যন্ত এই চক্ষুর্দ্বারা কখনই সাধুদর্শন হইবে না। সাধুর বপু দর্শন করিতে গিয়া সাধুত্বের আবরক আমার চাক্ষুষজ্ঞানের রচিত স্থূলত্বই দর্শন করিয়া ফেলিব। কৃষ্ণের বপুর ন্যায় সাধু ও গুরুর বপু ও বঙ্কিম অর্থাৎ তাহা সরলভাবে জীবের নিকট আত্মপ্রকাশ করেন না। এজন্যই শ্রীব্যাসদেব ''অর্চ্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধীঃ'' ও শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু '' প্রাকৃতত্বমিহ ভক্তজনস্য পশ্যেৎ'' শ্লোকের দ্বারা আমাদিগকে সাবধান করিয়াছেন। বপু বঙ্কিম বলিয়া আমরা বিষ্ণুর অর্চ্চাবতারে শিলাবুদ্ধি, গুরুতে নর-বুদ্ধি, বৈষ্ণবে জাতি-বুদ্ধি, বিষ্ণুর পাদোদকে জলবুদ্ধি, কিংবা হয়ত গুরু, বৈষ্ণব বা আচার্য্যের নানাপ্রকার বপুগত দোষ কল্পনা করিয়া তাঁহাদিগকে কামী, ক্রোধী, লোভী, প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষী, মাৎসর্য্যপরায়ণ প্রভৃতি কল্পনা করিয়া থাকি! অনেক সময় আচার্য্যের আচরণ—গুরুবৈষ্ণবের ক্রিয়া-মুদ্রা ধারণা করিতে পারি না, বঞ্চিত হইয়া পড়ি।

মাংসচক্ষুতে বপু দেখিতে গিয়া এখনও কতকগুলি সাহিত্যিক ও আধ্যক্ষিক ব্যক্তি শ্রীচৈতন্যদেবকে 'মায়াবাদী', কখনও বা একজন পণ্ডিত, কিংবা অপণ্ডিত বিকৃত চিত্ত বা ভাবপ্রবণ ব্যক্তি মাত্র, কখনও বা ধর্ম্মপ্রচারক কিংবা সমাজ-সংস্কারক মাত্র প্রভৃতি কত কি কল্পনা করিয়া থাকেন! শ্রীচৈতন্যের বাণী শ্রবণ না করিয়া যাঁহারা তাঁহার বপু বা বাহ্যবেশ দেখেন, তাঁহারা শ্রীরায় রামানন্দের নিকট ব্যঙ্গ ও দৈন্যচ্ছলে মহাপ্রভুর ''মায়াবাদী আমি ত' সন্ন্যাসী। ভক্তিতত্ত্ব নাহি জানি মায়াবাদে ভাসি।।''—প্রভৃতি বাক্যে বঞ্চিত হইয়া মহাপ্রভুকে একদণ্ডী মায়াবাদী সন্ন্যাসী কল্পনা করেন। কেন না, তাঁহারা তাঁহাদের মাংসচক্ষুর দ্বারা মহাপ্রভুর বাহ্যবেশ দেখিয়াই বিমোহিত বা বঞ্চিত হইয়াছেন। কেহ বা মহাপ্রভুকে মৃগীরোগাক্রান্ত ব্যক্তি

প্রতিপন্ন করিয়াও চিকিৎসা-পুস্তক লিখিয়া ফেলিয়াছেন। 'গৌরনাগরী' নামক এক প্রকার মনোধর্ম্মিসম্প্রদায় মহাপ্রভুর বপুদর্শনে বঞ্চিত হইয়া কিছুকাল যাবৎ জগতে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। মহাপ্রভুর সরস্বতী, তাঁহার সিদ্ধান্তবাণী তাঁহাদের কর্ণে প্রবেশ করে নাই। যিনি অপ্রাকৃতসৌন্দর্য্যে কাম-কোটি, সেই গৌরসুন্দরকে আবৃত-দর্শনে—মাংসচক্ষুতে দর্শন (?) করিতে গিয়া তাঁহারা ভ্রান্ত হইয়াছেন। রায় রামানন্দ কিন্তু শ্রীমহাপ্রভুকে মায়াবাদী জীব-বিশেষ (!!) রূপে দর্শন করেন নাই, কিংবা সম্ভোগ-বিগ্রহ নাগররূপেও অনুভব করেন নাই। কাঞ্চন-পঞ্চালিকার (স্বর্ণপ্রতিমা শ্রীরাধাঠাকুরাণীর) ভাবকান্তিতে সম্ভোগময় শ্যামবপুর বিভাবিতরূপ অর্থাৎ 'রাধাভাবদ্যুতি-সুবলিত' স্বরূপ দর্শন করিয়াছিলেন। রায় রামানন্দ কৃষ্ণের বেণু নিত্য শ্রবণ করিয়া থাকেন। বেণু-মাধুর্য্য ও বপুমাধুর্য্যে তাঁহার ভেদজ্ঞান নাই। তিনি প্রাকৃত মাংসদৃকের ন্যায় অগ্রে বপু দেখিয়া পরে বেণু-শ্রবণের ছলনা প্রদর্শন করেন নাই। তিনি গৌরসুন্দরকে বলিয়াছিলেন,—

মোর জিহ্বা—বাণীযন্ত্র, তুমি বাণী-ধারী।
তোমার মনে যেই উঠে, তাহাই উচ্চারিত।।

(চৈঃ চঃ মঃ ৮।১৩২)

শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—

চর-স্থাবরয়োঃ সান্দ্র-পরমানন্দমগ্নয়োঃ।
ভবেদ্ধর্ম্ম-বিপর্য্যাসো যস্মিন্ ধ্বনতি মোহনে।।

(শ্রীসঙ্ক্ষেপভাগবতামৃত ৫৩৩)

তাৎপর্য্য—যে মোহন-বেণুর ধ্বনিতে স্থাবর ও জঙ্গম প্রাণিসমূহ পরমানন্দে নিমজ্জিত হয় এবং তাহাদের ধর্ম্মবিপর্য্যাস হইয়া পড়ে অর্থাৎ স্থাবর জঙ্গমের ধর্ম্ম ও জঙ্গম স্থাবরের ধর্ম্ম লাভ করে।

কৃষ্ণের বেণুধ্বনি শ্রবণ করিতে হইলে শ্রীগুরুপাদপদ্মের শ্রৌতবাণীকে সর্ব্বাগ্রে কর্ণ-বিভূষণ করিতে হইবে। শ্রবণ ছাড়িয়া অগ্রেই রূপদর্শনের স্পৃহা উদিত হইলে, আত্মেন্দ্রিয়-তৃপ্তি-কামই বর্দ্ধিত হইয়া থাকে, কোন কালেই কৃষ্ণদর্শন সম্ভব হয় না, কেবল কৃষ্ণমায়া দর্শন হয়। যাহারা শ্রবণের পথ পরিত্যাগ করিয়া রূপ-দর্শনের স্পৃহায় লালায়িত, তাহারাই প্রাকৃত সহজিয়া। এই জন্য শ্রীগুরুদেব সর্ব্বাগ্রে কর্ণে মন্ত্র প্রদান করেন, ইহাই শ্রীগুরুপাদপদ্মের বেণু-ধ্বনি বা বাণী। এই বাণী-মন্ত্রের দ্বারা মাংসচক্ষুর স্থূলত্ব-দর্শন বিদূরিত হইলে চক্ষু যখন দিব্যজ্ঞানাঞ্জনে রঞ্জিত হয়, বস্তুতঃ তখনই শ্রীগুরুপাদপদ্মের অপ্রাকৃত বপুর দর্শন হইয়া থাকে।

আজ একটি নিগূঢ় কথা শ্রীগুরুপাদপদ্মের অন্তরঙ্গ জনগণের নিকট শ্রবণ করিয়া নিজে সতর্ক হইবার জন্য কীর্ত্তন করিতেছি। যাঁহাদের প্রয়োজন, তাঁহারা শুনিয়া রাখিতে পারেন। শ্রীচৈতন্যের সরস্বতী—ভক্তি-সিদ্ধান্তবাণী সরলা, তাহাতে বঞ্চনাবিদ্যা নাই। তাহা শ্রবণ না করিয়া যেন আচার্য্যের বপু দর্শন করিতে ধাবিত না হই। তাহাতে হয়ত বহির্ম্মুখের জন্য অনেক বঞ্চনা-কৌশলও থাকিতে পারে।

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল গৌরকিশোর প্রভুর বাহ্য বপু বা আচরণ মাংসচক্ষুতে দর্শন করিয়া কেহ কেহ তাহা অনুকরণ করিতে গিয়াছিল, তাহাতে কেহ পুরীষত্যাগের স্থানে প্রবেশ করিয়াছিল, কেহ বা শ্মশান হইতে মৃতের পরিত্যক্ত কাপড়-চোপড় আহরণ করিয়া উহার পরিধানকেই শ্রীগৌরকিশোর প্রভুর আনুগত্য মনে করিয়াছিল! কেহ আবার শ্রীল ভক্তিবিনোদ প্রভুর অপ্রাকৃত যুক্তবৈরাগ্যের অনুকরণ করিতে গিয়া ভোগী গৃহব্রত হইয়া পড়িয়াছে। শ্রীল গৌরকিশোর প্রভু বা শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাজনগণ অনেক সময়ে অনেক অন্যাভিলাষীকে সুযোগ প্রদানের জন্য শিষ্যত্ব গ্রহণের অভিনয় বা প্রচুর স্নেহ-সৌজন্য প্রদর্শনের অভিনয়, কিংবা কোন ব্যক্তিবিশেষের প্রশংসাদি করিয়াছেন দেখিয়া অনেকে বঞ্চিত হইয়াছেন ও হইতেছেন। এই সকলই মাংসচক্ষুতে বপুদর্শনের দৃষ্টান্ত; ইহা বেণু-শ্রবণের আদর্শ নহে। শ্রীচৈতন্যের সরস্বতীই শ্রবণ করিতে হইবে। **যেখানে বাণীর সহিত বপুর আদর্শের বিপর্য্যয় বা বিরোধ-প্রতীতি হয়, সেখানে বাণীই অনুসরণীয়া**। যেমন শ্রুতি ও স্মৃতির ও মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইলে শ্রুতিই গরীয়সী, তেমন বাণী ও বপুর মধ্যে অর্থাৎ **ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী ও মাংস চক্ষে দৃষ্ট আদর্শের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইলে সাক্ষাৎ সিদ্ধান্তবাণীই গরীয়সী**। সরস্বতীকে পরিত্যাগ করিয়া কখনও যেমন মাংসচক্ষে দৃষ্ট প্রতিহত অন্যান্য আদর্শে বঞ্চিত না হইতে হয়। ইহার মধ্যে সাধন-পথের বিশেষ নিগূঢ় রক্ষাকবচ নিহিত রহিয়াছে। বাণী-শ্রবণই আমাদের রক্ষা-মাদুলী—মাংসচক্ষের বপু-দর্শন নহে; তাহা হয়ত' অনেক সময়ে পতনের পিচ্ছিল পথ-প্রদর্শকও হইতে পারে। সাধু সাবধান!

সন্দেহ হইতে পারে, "যেমন বপুদর্শনের মধ্যে আধ্যক্ষিকতা বা স্থূলতা আসিয়া পড়ে, তেমন ত' বাণী-শ্রবণের মধ্যেও নানা প্রকার আবরণ উপস্থিত হইতে পারে, সেরূপ স্থলে বাণী-শ্রবণের অভিনয় করিয়াও ত' আমরা বিপথগামী হইতে পারি?" একদিকে এরূপ পূর্ব্বপেক্ষর কতকটা সার্থকতা আছে; কিন্তু বাণীর বৈশিষ্ট্য এই যে, বাণী শ্রবণ করিতে করিতে স্বয়ং বাণীই তাঁহার আবরণ ও প্রতিবন্ধকগুলিকে বিনষ্ট করিয়া দেন; কিন্তু বপু দর্শন (?) করিতে করিতে মাংসচক্ষুর আবরণ নষ্ট হয় না, কেন না মাংসচক্ষু বিজাতীয় বস্তু, অপ্রাকৃত বপু কোন দিনই তাহার নিকট অবতীর্ণ হন না—তাহার গোচরীভূত হন না। কিন্তু বাণী স্বয়ংই আবরণ উন্মোচন করিয়া জীবের নির্ম্মলতা সাধন করে ও প্রতিনিয়তই যোগ্যতা প্রদান করিয়া থকে। বপু যোগ্যব্যক্তির নিকট আত্ম প্রকাশ করে আর বাণী বা মন্ত্র অযোগ্য ব্যক্তিকে যোগ্যতা প্রদান করিয়া নিজের স্বরূপ দেখাইয়া দেয়। বস্তুতঃ অপ্রাকৃতরাজ্যে বাণী ও বপু ভিন্ন নহে, বাণীই জীবকে যোগ্যতা প্রদান করিয়া তাহার বপুময়ী বা বিগ্রহময়ী মূর্ত্তি প্রদর্শন করে। অযোগ্যবস্থায় সেই বিগ্রহময়ী মূর্ত্তির কিছুতেই দর্শন হয় না, এজন্য বপু হইতে বাণী গরীয়সী—এজন্যই স্বয়ং ভগবৎস্বরূপ হইতেও ভগবানের নামকে অধিকতর করুণাময় বলা হইয়াছে।

প্রাকৃত শব্দের বৈশিষ্ট্য এই যে, প্রাকৃত শব্দে বহুত্ব, পরস্পর, স্বগতভেদ, জন্মভঙ্গাদি দোষ এবং বপু, গুণ ও ক্রিয়া হইতে ভেদ নিহিত। প্রাকৃত শব্দ ও প্রাকৃত বপু উভয়েই জড়েন্দ্রিয়-চেষ্টার দ্বারা পরিমেয় ও জন্ম-

মরণশীল অর্থাৎ অনিত্য। অপ্রাকৃত চেতন শব্দ তাঁহার ইচ্ছা ক্রমেই তাঁহার নিরন্তর সেবনপ্রবণ জিহ্বা-ধারায় প্রপন্ন কর্ণেন্দ্রিয়ে অবতীর্ণ হন এবং প্রপন্ন কর্ণেন্দ্রিয়ের দ্বারা নিয়মিত ও শোধিত চক্ষুতে সেই শব্দই স্বীয় অবতীর্ণ বপু প্রকট করেন।

তবে যাহারা বাণী-শ্রবণের অভিনয় করিতে করিতে অসহিষ্ণু হইয়া তাহা পরিত্যাগ করে, যাহারা শ্রীচৈতন্যবাণীর ''কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ''—এই বাণীতে দীক্ষিত না হয়, যাহারা শ্রীচৈতন্যসরস্বতীর নিত্য সেবানুশীলন না করে, তাহার ত' অধঃপতিত হইবেই, তাহাদের কর্ণে নিত্যঅর্গল ও নানা প্রকার মল প্রতিবন্ধকরূপে সমুপস্থিত আছেই; তাহাদের কথা আমাদের আলোচ্য নহে। আমাদের আলোচ্য বিষয় এই যে, নিরন্তর সরল হৃদয়ে বাণীশ্রবণ ও মাংসচক্ষে বপু দর্শনের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইলে কোন্‌টি গ্রহণ করিতে হইবে? সাধুগণ বলেন, বাণীশ্রবণই সেখানে নিয়ামক ও প্রামাণিক হইবে। কেননা, তাহা সরল, বপুর ন্যায় বঙ্কিম নহে।

বাণী বা বেণুর এমনই শক্তি ও মাধুর্য্য যে, তাহা অচেতন প্রায় অর্থাৎ বিলুপ্ত চেতনেরও নিত্যসিদ্ধ চেতন-বৃত্তির উদ্বোধন করিয়া থাকে, আবার কর্ম্ম-চঞ্চলকে নৈষ্কর্ম্ম্য মন্ত্রে (চেতনতার পরাকাষ্ঠা বা সর্ব্বোত্তম অবস্থায়) দীক্ষিত করিয়া থাকে; কিন্তু ভোগবুদ্ধিতে বপুদর্শনের স্থূলত্ব আমাদের ইন্দ্রিয়কে গ্রাস করিলে সেবোন্মুখতার পরিবর্ত্তে ভোগোন্মুখতা বা আত্মেন্দ্রিয়-তৃপ্তি-চেষ্টা আনিয়া দেয়। তাই অন্যাভিলাষিসম্প্রদায় পরমার্থরাজ্যে প্রবেশের অভিনয় করিয়া হরিকথা শ্রবণ অপেক্ষা ভগবদ্দর্শনের (?) অধিক পক্ষপাতী।

কেহ হয়ত গুরুর (?) নিকট গমন করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া বসেন,—''আপনি কি আমাকে ভগবদ্দর্শন করাইতে পারেন?'' এইরূপ প্রশ্নকারীর অন্তর বেণুমাধর্য্যে আকৃষ্ট হইতে পারে নাই। যিনি প্রকৃত প্রস্তাবে নিত্য ভগবদ্বিগ্রহের সেবার জন্য লালায়িত, গুরুদেবের নিকট তাঁহার প্রশ্ন হইবে,—''আপনি আমাকে উপদেশ-দ্বারা শাসিত ও শোধিত করুন। আমাকে চক্ষুদান করুন।'' হরিকথাই সাক্ষাৎ হরি। সেই শ্রীহরিকে প্রথমে কর্ণ দ্বারাই দর্শন করা যায়, কর্ণ দ্বারাই তিনি হৃদয়ে প্রবিষ্ট হন, কর্ণদ্বারাই তিনি প্রতিষ্ঠিত হন। ভগবানের দর্শন কি, ভগবদ্দর্শন করা ভাল কি মন্দ, বিশেষতঃ ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে ভাল না মন্দ, ইহা গুরুদ্বারা শাসিত হইবার পূর্ব্বেই যিনি 'জানিয়া ফেলিয়াছি' মনে করেন, তিনি ত' গুরুর উপর গুরুগিরি করিলেন! ইহা শিষ্যের লক্ষণ নহে—গীতার ''তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া''—বাক্যের আদর্শ নহে, বেদান্তের ''অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা''ও নহে; কি বেদান্ত বা শ্রুতির পথ, কি গীতা বা স্মৃতির পথ, সব্বত্রই দেখা যায়, বাণী-শ্রবণের জন্যই শিষ্যের অভিগমন। শিষ্যের প্রথম দর্শনীয় বিষয় 'বপু' নহে, প্রথম দর্শনীয় বিষয়—বাণী; কর্ণদ্বারা সেই বাণীর দর্শন হয়। প্রথমেই চক্ষুরিন্দ্রিয়ের পরিচালনা নাই। সর্ব্বাগ্রে কর্ণ, কর্ণবেধ-সংস্কারই গুরুর প্রথম কার্য্য। **কর্ণই চক্ষু প্রস্তুত করিবে, বাণীই বপু দেখাইবে।** বাণীই বপুর সন্ধান দেন এবং বপুরূপে প্রকটিত হন। মাংসচক্ষু অপ্রাকৃত বপু দেখিতে পারে না বা দেখাইতে পারে না। যাহারা প্রথমেই ভগবান্‌কে দেখিব, এইরূপ ভোগবুদ্ধিতে পরিচালিত হইয়া নিজের খিদ্‌মৎগার স্বরূপ তথাকথিত গুরুর আশ্রয়-গ্রহণকারী

অর্থাৎ যাহারা গুরুভোগকারী (?), তাহারা তাহাদের মাংসচক্ষুর বিচারে ভূতপ্রেত জাতীয় কোন সত্তা বা ভাব যে গুরু দেখাইতে পারিলেন না, তাঁহাকে ''দুয়ো দেগে দিতে পারিলে না,'' অর্থাৎ যে গুরু আমাকে ভগবদ্বস্তু ভোগ করাইতে পারিলেন না, তিনি গুরুই নহেন মনে করিয়া কেবল হরিকথা-কীর্ত্তনকারী অকৃত্রিম গুরুপাদপদ্মের সন্ধান হইতে অন্যত্র বিচরণ করে। আর যাঁহারা প্রকৃত সত্যানুসন্ধিৎসু, তাঁহারা শ্রীচৈতন্যবাণীই অনুক্ষণ শ্রবণাঞ্জলিতে শ্রবণ করিয়া থাকেন। যেখানে শ্রবণের সহিত দর্শনের বিরোধ উপস্থিত হয়, বাণীর সহিত বপুর বিরোধ উপস্থিত হয়, সেখানে তাঁহারা পুনঃ পুনঃ শ্রবণ বা চৈতন্যসরস্বতীরই আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাই পুনরায় বলি, সাধু সাবধান! সাধু সাবধান!! সাধু সাবধান!!! হে দুষ্টমন, দুষ্ট ইন্দ্রিয়, বাণী-শ্রবণ ও তোমার মাংস চক্ষুতে বপু-দর্শন এই উভয়ের মধ্যে পার্থক্য বা বিরোধ দৃষ্ট হইলে বাণীরই শরণাপন্ন হইও—অপ্রাকৃত সরস্বতীতেই আকৃষ্ট থাকিও—অপ্রাকৃত বেণুধ্বনিই তোমার অনাবৃত আত্মার অভিসারের প্রকৃত দিগ্‌দর্শন করাইবেন—বেণুমাধুর্য্যই তোমাকে তোমার মঙ্গলের প্রগতির দিকে লইয়া যাইবেন—তুমি তোমার সাধনপথে চৈতন্যবাণীকেই তোমার ধ্রুবতারা কর।

শ্রীগৌড়ীয়মঠের বৈশিষ্ট্য

শ্রীগৌড়ীয়মঠের উদ্দেশ্য, প্রচার্য্য-বিষয় বা বৈশিষ্ট্যের কথা জগতে বুঝাইতে হইলে অল্পকথায় বুঝান' যেরূপ সুদুরূহ ব্যাপার, প্রচলিত ভাব-ধারায় বিভাবিত ও অনুপ্রাণিত বিশ্বে তাহা আংশিকভাবে উপলব্ধি করাইবার চেষ্টাও ততোধিক গুরুতর কার্য্য। নিম্নে শ্রীগৌড়ীয়মঠের কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের অসম্পূর্ণভাবে দিগ্‌দর্শন করাইবার চেষ্টা হইল। স্ব-স্বযোগ্যতানুযায়ী এই সকল কথা উপলব্ধির বিষয় হইবে।

১। জগতে যে-সকল প্রতিষ্ঠান আছে, শ্রীগৌড়ীয়মঠ তাহাদের অন্যতম বা তাহাদের প্রতিযোগী কিংবা তাহাদের সহিত প্রতিযোগিতা-মূলক তুলনায় আপনাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া দাবী করে না, কারণ জগতের অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানই ন্যূনাধিক হয় ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষাভিসন্ধি, না হয় ভক্তির নামে মনোধর্ম্মের প্রচারকরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে।

২। শ্রীগৌড়ীয়মঠ অহৈতুকী ভগবদ্ভক্তির অনুশীলনকারী প্রচারক। জগতে অহৈতুকী ভক্তির অনুশীলনের নামে মিছাভক্তির অনুশীলন বা ভক্তির বাহ্যভাণের অনুষ্ঠান-সমূহের যে অভাব আছে, তাহা নহে; সেইরূপ ভক্তির অভিনয় ও তাহার নেপথ্যে অন্যাভিলাষ বা ধর্ম্মার্থকাম-মোক্ষ বাসনার যে তাণ্ডব হইতেছে, তাহা হইতে সুরক্ষিত হইবার জন্যই উহাদের স্বরূপ বিশ্লেষণ পূর্ব্বক শুদ্ধভক্তির দুর্গের পরিখা নির্ম্মাণ করা—শ্রীগৌড়ীয় মঠের একটি বৈশিষ্ট্য।

৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ ভক্তিকে দেহ বা মনের বৃত্তিবিশেষ জ্ঞান করেন না। ভক্তিকে সর্ব্বোপাধি-রহিত কৃষ্ণনিষ্ঠ আত্মার অপ্রতিহতা, অহৈতুকী, স্বাভাবিকী, নিত্যা বৃত্তি বলিয়া উপলব্ধি করেন। অন্যান্য প্রতিষ্ঠান

'ভক্তি' শব্দটি স্বীকার করেন, এমন কি কেহ কেহ ভক্তিকে মৌখিকভাবে চতুর্ব্বর্গ হইতে শ্রেষ্ঠও বলেন; কেহ বা কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদির সহিত ভক্তিকে সমান অর্থাৎ উহাদেরই অন্যতম উপায় বিশেষ মনে করেন; কেহ বা মৌখিকভাবে কর্ম্ম-জ্ঞানাদি হইতে ভক্তির শ্রেষ্ঠত্বও স্বীকার করেন; কিন্তু তাঁহারা সকলেই ভক্তিকে ন্যূনাধিক মনেরই বৃত্তিবিশেষ বলিয়া জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে বরণ করিয়া লন। শ্রীগৌড়ীয়মঠ ভক্তির সহিত অন্যান্য মনোবৃত্তির কোনপ্রকার জোড়া-তালি দিতে বা আপোষ করিতে প্রস্তুত নহেন।

৪। মনোধর্ম্মের গোঁড়ামি ও তিক্ত অভিজ্ঞতার পুত্ররূপে তথাকথিত সমন্বয়বাদ যে 'প্রচ্ছন্ন গোঁড়ামির ধর্ম্ম' বা 'যথেচ্ছ ধর্ম্মবাদ' সৃষ্টি করিয়াছে, সেইরূপ কোন প্রকার গোঁড়ামির প্রচারও শ্রীগৌড়ীয়মঠের বার্ত্তা নহে। অপ্রতিদ্বন্দ্বী বাস্তব সত্যকে 'সত্য' বলিলে, "একমেবাদ্বিতীয়ম্" পরব্রহ্মকে 'অদ্বিতীয়' বলিলে "ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে"—শ্রুতিমন্ত্রানুসারে পরমতত্ত্বকে 'অসমোর্দ্ধ (যাহার সমান বা যাহা হইতে বড় কেহ নাই) বলিলে, পুত্রের একমাত্র পিতাকে 'ইনিই পিতা, অপরে পিতা নহে', সতীর 'ইনিই পতি, অপরে আমার পতি নহে' বলিলে অপরের নিকট বা সাধারণের নিকট ঐসকল ব্যক্তির ঐরূপ উক্তিকে 'গোঁড়ামি' বা 'দাম্ভিকতা' বলিয়া যাহা মনে হয়, তাহা অতত্ত্বজ্ঞতা অর্থাৎ সম্বন্ধ-জ্ঞানের অভাব-বোধক। শ্রীগৌড়ীয় মঠ এই বাস্তব সত্যনিষ্ঠাকে লোকপ্রিয়তা ও জনমতের যূপকাষ্ঠে বলি দিতে প্রস্তুত নহে।

৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বহির্ম্মুখ জনমতের সেবক নহেন, কিন্তু পরমেশ্বরের একান্ত জনগণের অভিমতের সেবক। শ্রীগৌড়ীয়মঠের বিচারে প্রকৃতি-জনমত সত্যের দিঙ্‌নির্ণয়ের কম্পাস নহে, পরন্তু অপ্রাকৃত কৃষ্ণজনমতই সত্যনির্ণয়ের একমাত্র যন্ত্র। প্রকৃতিজনমত-প্রাধান্যের যুগে শ্রীগৌড়ীয় মঠের এই সত্যনিষ্ঠাটি তাঁহাকে স্বতঃই জগতের অন্যান্য প্রতিষ্ঠান হইতে বিশিষ্ট করিয়া রাখিয়াছে।

৬। অনর্থনিবৃত্তি অর্থাৎ এই জগতের অসুবিধা হইতে মুক্তি পর্য্যন্ত ফললাভের কথাই শ্রীগৌড়ীয়মঠের ভাণ্ডারের শেষ কথা নহে। অনর্থনিবৃত্তির পরে অর্থ-প্রবৃত্তি অর্থাৎ জাগতিক সর্ব্ববিধ অসুবিধা যে জন্য দূরে করা, সেই পরম প্রয়োজনের অনুশীলনের জন্য যত্নই শ্রীগৌড়ীয়মঠের মূল উদ্দেশ্য। কৃষ্ণ-প্রীতির প্রস্রবণ উন্মুক্তির জন্য মুক্তির প্রয়োজন। মুক্ত হইয়া কৃষ্ণপ্রীতির অফুরন্ত ও উত্তরোত্তর বর্দ্ধনশীল রাজ্যে প্রবেশ করাই শ্রীগৌড়ীয়মঠের উদ্দেশ্য।

৭। আধ্যক্ষিকতা অর্থাৎ অক্ষ বা চক্ষুরাদি-ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অতীন্দ্রিয়কে মাপিয়া লইবার চেষ্টা জগতের লোকের মেরু-মজ্জার সহিত মিশ্রিত হইয়া রহিয়াছে। সেই অবস্থায়ই তাঁহারা অপ্রাকৃতকে মাপিয়া লইবার পক্ষপাতী। তাঁহারা এই গোঁড়ামি প্রাণান্তেও ছাড়িতে প্রস্তুত নহেন। শ্রীগৌড়ীয়মঠ সমগ্র মানব-জাতির আধ্যক্ষিকতার এই গোঁড়ামির প্রতিবাদকারী। মাংসচক্ষু, মাটিয়াবুদ্ধি নানা ভ্রম-প্রমাদ-পূর্ণ ইন্দ্রিয়ের বিচারবুদ্ধি অপ্রাকৃত রাজ্যে প্রবেশই করিতে পারে না, ইহাই শ্রীগৌড়ীয়মঠ দুন্দুভিনাদে নিয়ত ঘোষণা করিতেছেন।

৮। কখনও পরমেশ্বরে মানবতারোপ (Anthropomorphism), কখনও পরমেশ্বরে জন্তুধর্ম্মারোপ (zoomorphism), কখনও মানব বা জন্তুতে ঈশ্বরত্ব-আরোপ, (Apotheosis) কখনও শ্রীবিগ্রহে

জড়ত্ব-আরোপ, কখনও বা জড়ত্বে শ্রীবিগ্রহত্ব-আরোপ, কখনও বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি, কখনও জাতীয়ত্বে বৈষ্ণবতা -আরোপ প্রভৃতিঅসংখ্য প্রকার আধ্যক্ষিকতার মুর্ত্তি কৃষ্ণবহির্ম্মুখতার জননী হইয়া জগতের চতুর্দ্দিকে সজ্জিত রহিয়াছে। বিভিন্ন ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠান-সমূহ অনেক সময়ই ইহাদিগের সহিত একটা সাময়িক রক্ষা করিয়া লোকপ্রিয়তা অর্জ্জন করিতেছে! কিন্তু আধ্যক্ষিকতার এই বহুরূপিণী মূর্ত্তিগুলির সহিত প্রবল সংগ্রামের অপ্রীতিকর কার্য্যের গুরুভাব গ্রহণ করিয়াছেন—শ্রীগৌড়ীয়মঠ। কারণ বাস্তব সত্যের সেবাই শ্রীগৌড়ীয়মঠের বৈশিষ্ট্য, বহির্ম্মুখ লোকের সেবা নহে।

৯। ধর্ম্মের যে-সকল মূলসূত্র মোটাকথায় ধরা যায়, সাধারণ বুদ্ধিতে (common sense) যাহা ধর্ম্মের মূলসূত্র রূপে পরিগণিত ও পরিকল্পিত হইতে পারে, সাধারণের বিচার, বুদ্ধি, কল্পনা, অনুমান ও ধারণায় যাহা যাহা 'ধর্ম্ম' বলিয়া 'খাপ' খাইতে পারে, সেই সকল ধর্ম্মের কথা—মনোধর্ম্মের কথা শ্রীগৌড়ীয়মঠ প্রচার করেন না বলিয়া সাধারণের নিকট শ্রীগৌড়ীয়মঠের ভাব ও ভাষা অনেক সময় দুর্ব্বোধ্য থাকে। মোট কথা, ভিন্ন ভূমিকা, ভিন্ন চিত্তবৃত্তি, ভিন্ন রাজ্য ও ভিন্ন অভিমান দ্বারা আপনাকে শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে ভিন্ন রাখিয়া কেবল জাগতিক বা তথাকথিত অতিজাগতিক যোগ্যতার দ্বারা শ্রীগৌড়ীয়মঠের বাণীর উপলব্ধি দুঃসাধ্য। অথচ জাগতিক পাণ্ডিত্য ও নানাপ্রকার যোগ্যতার অভাব সত্ত্বেও শ্রীগৌড়ীয় মঠের বাণী অনেকে অত্যাশ্চর্য্যভাবে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন ও পারেন। ইহা দ্বারাই প্রমাণিত হয় যে, কোষ গ্রন্থের কঠিন শব্দগুলি শ্রীগৌড়ীয়মঠের পরিভাষার ভাণ্ডার নহে। ভাগবতের পরিভাষা, ভাগবতের চিত্তবৃত্তি, ভাগবতের ভূমিকা ও সিদ্ধান্তই শ্রীগৌড়ীয় মঠের মূল ভাণ্ডার।

১০। গুরুরও ভ্রম হইতে পারে—এইরূপ অনুমান কিংবা পাছে গুরু ভ্রান্ত হন, এইরূপ আশঙ্কা করিয়া গুরুবাক্য ও শাস্ত্রবাক্যকে স্ব-স্ব বুদ্ধির ছাঁচে গড়িয়া পিটিয়া সংস্কার করিবার চেষ্টা হইতে শ্রীগৌড়ীয়মঠের শ্রীগুরুপাদপদ্মে অভিগমনের চেষ্টা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ব্যাপার। যেখানে দুর্ব্বলতার ছিদ্র আছে, যেখানে গুরুবরণের মধ্যে কোন না কোন প্রকার দুর্ব্বলতা প্রবেশ করিয়াছে, যেখানে অস্বচ্ছ গুরু গুরুত্বের পাট গ্রহণ করিয়াছেন বা যেখানে শিষ্যত্ব ও গুরুত্ব সাময়িক চুক্তি মাত্র, সেখানেই ঐরূপ অনুমান ও আশঙ্কার অবকাশ আছে। গুরুর (?) প্রচারিত সত্যও পাছে আধ্যক্ষিকের পেষণীযন্ত্রের কবলে কবলিত হইয়া ভ্রান্ত বলিয়া প্রমাণিত হইয়া পড়ে, এই আশঙ্কায় শিষ্যাভিমানী ব্যক্তি আধ্যক্ষিক-সম্প্রদায়ের সহিত রফা করিয়া বলিতেছেন, —'তুম্ভি চুপ্, হাম্ভি চুপ্'। শ্রীগৌড়ীয়মঠের উদ্দেশ্য ইহা নহে। যিনি গুরুপাদপদ্ম, তাঁহার প্রচারিত সত্য, তাঁহার বাণী—অভ্রান্ত। যাঁহার কথা ক্ষণজীবী এবং অপেরর দ্বারা আক্রান্ত হইবার ভয়ে ভীত, তিনি গুরু নহেন। বাস্তব শ্রৌত সত্য ও আধ্যক্ষিকতার সহিত কোনই গোঁজামিল নাই,—ইহাই শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচার।

১১। অস্বচ্ছ গুরু অর্থাৎ যিনি শিষ্যের সম্মুখে দাড়াইলে শিষ্য তাঁহার মধ্য দিয়া কৃষ্ণ দেখিতে পারেন না, অর্থাৎ যিনি কৃষ্ণের প্রতিবন্ধকরূপে মধ্যপথে কেবল বঞ্চনা করিবার জন্য কপট বেষে উপস্থিত হন, সেইরূপ

গুরু গ্রহণ করিয়াও বা শিষ্যের কল্পনার দ্বারা সংস্কার ও সৃষ্ট গুরু (?) নাম মাত্রে স্বীকার অথবা গুরুপাদপদ্মকে "ভগবান্" ও "ভক্তের" মধ্যপথে একটা অনাবশ্যক তৃতীয় ব্যাপার বিবেচনা করিয়া তাঁহাকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিয়াও অভীষ্টসিদ্ধি হয়, এইরূপ যে সকল কল্পনা ধর্ম্মের বাজারে প্রচ্ছন্ন বা অপ্রচ্ছন্নভাবে প্রচলিত হইয়াছে, শ্রীগৌড়ীয়মঠ তাহাতে বাধা প্রদান করেন। গুরুপাদপদ্মের বরণ না হইলে এবং সেই গুরুপাদপদ্ম সম্পূর্ণ স্বচ্ছ না হইলে পতিত অনাশ্রিত জীব কখনও ভগবৎপদাশ্রিত হইতে পারে না,—এই সত্যের ঐকান্তিক ভাবে প্রচারও শ্রীগৌড়ীয়মঠের একটি বৈশিষ্ট্য।

১২। হরিকথা প্রচার করিতে হইলে আচার আবশ্যক এবং সেই আচার শাস্ত্রীয় সদাচার হওয়া উচিত। যে-সকল স্থানে কলি বাস করে—দ্যূত, পান, বৈধ স্ত্রী-আসক্তি বা অবৈধ স্ত্রী গ্রহণ, পশুবধ, ভোগের জন্য অর্থাসক্তি বা ভোগার্থ অর্থাদির প্রাপ্তি হইল না বলিয়া কামিনী-কাঞ্চনের প্রতি বিরাগ,—এই সকলই কলির সহচর। ভোগবুদ্ধিতে যে কোন বস্তুর সঙ্গই যোষিৎ সঙ্গ। যাহারা ঐরূপ যোষিতের সঙ্গ করে, আর যাহারা প্রচ্ছন্নভাবেই হউক বা স্পষ্টভাবেই হউক একমাত্র অধোক্ষজ কৃষ্ণের সেবা ব্যতীত হৃদয়ে অন্য কোন প্রকার অভিলাষ পোষণ করে বা উহাকে বহুমানন করে বা উহাদের সহিত কৃষ্ণসেবাকে সমান মনে করে, তাহাদের সঙ্গই—অসৎসঙ্গ। জগতে যদি এই প্রকার লোক অধিক সংখ্যক থাকে, এমন কি, শতকরা প্রায় শতজনও থাকে, তথাপি তাহাদের সঙ্গ হইতে কৌশলে স্বতন্ত্র ও সতর্ক থাকিয়া নিজের ও পরের নিত্য উপকারের জন্য অপ্রাকৃত শ্রীহরির সেবানুশীলন ও হরিকথার প্রচারময় জীবন-যাপনই সদাচার-গ্রহণ। এই সদাচার গ্রহণে কোন প্রকার আপোষ বা গৌঁজামিলের আবিলতা প্রবেশ না করাইয়া একান্তভাবে সদাচারের অনুসরণই শ্রীগৌড়ীয়মঠের বৈশিষ্ট্য।

১৩। ধ্যান, ধারণা, তপঃ, ব্রত, কর্ম্ম, ধর্ম্ম (পাপ বা পুণ্য), লোকরঞ্জন বা লোকের পরামর্শানুসারে ধর্ম্মের অনুষ্ঠানগুলিকে কাটিয়া ছাঁটিয়া সংস্কার করা কিংবা সামাজিক রাজনৈতিক কোন প্রকার আন্দোলনকে পরমার্থের বাহক করিয়া লওয়া বা প্রচ্ছন্নভাবে মিশ্রিত, তন্মধ্যে প্রবিষ্ট বা তদন্তর্ভুক্ত করিয়া জাগতিক কোন না কোন প্রকার সুবিধাবাদের অনুসন্ধান করা গৌড়ীয় মঠের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য নহে। কৃত্রিম ধ্যান-ধারণা, কৃত্রিম জপ-তপঃ বা জাগতিক বা অতিজাগতিক কোন প্রকার সুবিধাবাদের অন্বেষণ শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচারে নাই। একমাত্র স্বরাট্ লীলা-পুরুষোত্তম কৃষ্ণের সর্ব্বেন্দ্রিয়ের সার্ব্বকালীন সুখানুসন্ধানের জ্য চেতনের বৃত্তিকে প্রকাশ করাই শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচার্য্য বিষয়।

১৪। কৃষ্ণ কবিকল্পনার বস্তু নহেন, কৃষ্ণ ইতিহাসের পরীক্ষণীয় মরণশীল পাত্র নহেন, কৃষ্ণ রূপক, আধ্যাত্মিক বা তাত্ত্বিক ভাব বা পদার্থবিশেষ নহেন, কৃষ্ণ মানসিক সান্ত্বনা মাত্র নহেন, কৃষ্ণ লম্পটগণের আদর্শ নহেন, কৃষ্ণ আই, পি, সির আসামী নহেন, কৃষ্ণ সাময়িক পূজার পাত্র মাত্র নহেন। মানব-কল্পিত ঐরূপ কৃষ্ণের ভজন (?) প্রচার শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচার নহে। কৃষ্ণ নিখিল কাব্যের মূল নায়ক, তাঁহার আনখকেশাগ্র অপ্রাকৃত কাব্যের চরম আদর্শ, যাবতীয় যুক্তি, বিচার ও ইতিহাস কৃষ্ণের পদনখশোভার

আরতি করিতে পারিলে ধন্যাতিধন্য হয়, কৃষ্ণ অমরগণের অমৃত স্বরূপ, নিখিল বাস্তব রূপরাশি কৃষ্ণের পদনখচ্ছটায় আলোকিত, সমস্ত সান্ত্বনা ও শান্তি কৃষ্ণদাস্যের অতি আনুষঙ্গিক প্রাথমিক যাত্রী, কৃষ্ণলীলা জগতের লাম্পট্য দূর করিবার জন্য পরমতত্ত্বের নিরঙ্কুশ স্বেচ্ছাময়তা প্রচারকারিণী, কৃষ্ণ স্বরাট্ লীলা পুরুষোত্তম, কৃষ্ণ নিত্যগণের মধ্যে পরমনিত্য—এইরূপ কৃষ্ণের অনুশীলন-প্রচারই শ্রীগৌড়ীয়মঠের উদ্দেশ্য।

১৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠকে যেন অনেকে সংস্কারক (Reformer) বলিয়া ভুল না করেন। শ্রীগৌড়ীয়মঠ সংস্কারকও নহেন বা নূতন-মত-প্রবর্ত্তকও নহেন, পরন্তু সনাতনের পুনঃসংস্থাপক। বৈষ্ণবধর্ম্ম নিত্য ও সনাতন, কাল তাহাকে সৃষ্টি করে নাই, ইতিহাস তাহার আদি গণনা করিতে পারে নাই। যে ধর্ম্মকে ইতিহাস ও কাল তাহার অধীন করিয়াছে, তাহা নিত্য বৈষ্ণব ধর্ম্ম নহে, নৈমিত্তিক মনোধর্ম্ম মাত্র। সেই সর্ব্বাদি ও অনাদি নিত্য আত্মধর্ম্মেরই প্রচারক শ্রীগৌড়ীয়মঠ। নিত্য ও সনাতনকে কাটিয়া ছাঁটিয়া, কমাইয়া বাড়াইয়া সংস্কার করা যায় না। সনাতন আত্মধর্ম্ম লোকের বহির্ম্মুখতার নিকট যুগে যুগে অস্তমিত বা লুপ্ত হয়, তাহা যুগে যুগে পুনরাবিষ্কার করাই আত্মধর্ম্ম প্রচারক আচার্য্যগণের অবদান। এইজন্য শ্রীমদ্ভাগবতে ভাগবতধর্ম্ম-সম্বন্ধে উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

১৬। আধ্যক্ষিক-সম্প্রদায়ের কেহ কেহ শ্রীমদ্ভাগবতকে ঐতিহাসিক কালের অন্তর্গত, বেদ-সংহিতা ও উপনিষদের পরবর্ত্তী কালের রচিত, কেহবা ব্রহ্মসূত্রকার বেদব্যাস হইতে ভাগবতকার ব্যাসের পার্থক্য, কেহ বা শ্রীমদ্ভাগবতকে আধুনিক কোন ঐতিহাসিক পণ্ডিতের সৃষ্ট পুঁথিমাত্র, কেহ বা হেঁয়ালি ও পরীর রাজ্যের গল্প পরিপূর্ণ অপ্রামাণিক পুরাণ মাত্র, কেহবা ভাগবতকারের লেখনীর মধ্যে ভূগোল, জ্যোতিষ, ইতিহাসের বিপর্য্যয় ও অসামঞ্জস্য প্রভৃতি প্রতিপাদন করিবার চেষ্টায় ভাগবতধর্ম্মকে ভ্রম-প্রমাদাদির অধীন মানবের রচিত অন্যতম ধর্ম্ম প্রতিপাদন করিবার অভিসন্ধি পোষণ করেন। বস্তুতঃ শ্রীমদ্ভাগবতের 'পুরাণার্কোঽধুনোদিতঃ,' 'ধর্ম্মন্তু সাক্ষাদ্ভগবৎপ্রণীতং ন বৈ বিদুর্ঋষয়ো নাপি দেবাঃ,' মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ, 'ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিত কৈতবোঽত্র পরমো নির্ম্মৎসরাণাং সতাং, 'নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং' 'সর্ব্ববেদান্তসারং হি শ্রীমদ্বাগবতমিষ্যতে' প্রভৃতি শ্লোক আলোচনা করিলে জানা যায় যে, আজ প্রাতঃকালে আমরা যে সূর্য্য দর্শন করিয়াছি, তাহা আমাদের নিকট নূতন বা অমুক সনের অমুক তারিখের অমুক মুহূর্ত্তের মধ্যে তাহার জন্ম গ্রহণ করিয়াছে মনে হইলেও বস্তুতঃ সূর্য্য নিত্য, সনাতন ও স্বপ্রকাশ। সূর্য্যই কালচক্র বিধান করিতেছে, কালের মধ্যে সূর্য্য সৃষ্ট হয় নাই। যুগে যুগে শ্রীমদ্ভাগবতের অবতার বিভিন্ন ব্যাসের হৃদয় ও লেখনীর মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছেন। শ্রৌতসত্য যুগোপযোগী ভাষায় গ্রথিত হইয়াছে বলিয়া প্রাকৃত প্রত্নতাত্ত্বিকের প্রাচীনতার ছলনা শ্রৌতসত্যকে মলিন করিতে পারে না। সেই জন্যই শ্রীমদ্ ভাগবত বলিয়াছেন, ভাগবতধর্ম্ম সাক্ষাৎ ভগবানের সৃষ্ট, মানব, ঋষি বা দেবতার সৃষ্ট নহে—তাহা বেদের পরিপক্কফল, সমস্ত নির্ম্মৎসর সাধুগণের সেবিত। সেখানে মোক্ষাভিসন্ধিরূপা কপটতা পর্য্যন্ত নিরস্ত হইয়াছে। বেদের শিরোভাগ শ্রুতিসকল নিত্য যাঁহার আরতি করেন, সেই ভগবন্নামের অনুশীলনই ভাগবত ধর্ম্মের একমাত্র বিষয়। সেই নামই প্রণবের

প্রস্ফুটিত রূপ। প্রণব বেদমাতা গায়ত্রীর মূল বা বীজ স্বরূপ। সেই বীজ হইতেই 'ভাগবতধর্ম্মরূপ নিগম-কল্যাণ-কল্পতরু' পল্লবিত হইয়াছে এবং তাহা হইতে যে অমৃতফল ফলিয়াছে, তাহাই নির্ম্মৎসর সাধুগণ শ্রৌত-পরম্পরায় জগতে লইয়া আসিয়াছেন। স্বয়ং ভগবান্ হইতে ব্রহ্মা, ব্রহ্মা হইতে নারদ, নারদ হইতে ব্যাস, ব্যাস হইতে শুক বা মধ্বাচার্য্য এবং ক্রমে ক্রমে শ্রীচৈতনদেব, তদনুগ গোস্বামিগণ যে ভাগবতধর্ম্ম বিতরণ করিয়াছেন, তাহাই শ্রৌত পরম্পরার খাতে শ্রীগৌড়ীয়মঠ বরণ করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যদেব স্বয়ং সেই প্রেমামরতরু হইয়াও অসমোর্দ্ধ মালিরূপে সর্ব্বত্র সেই ফল বিতরণ করিয়াছিলেন। এই ফলের রসাস্বাদন এবং নিখিল বিশ্বে তাহার বিতরণের নামই বাস্তবসত্যের যথার্থ প্রচার ও যথার্থ জীবে দয়া। শ্রীগৌড়ীয় মঠের উপর সেই প্রচার ও যথার্থ জীবে দয়া। শ্রীগৌড়ীয় মঠের উপর সেই প্রচার বা জীবে দয়ার ভার ন্যস্ত হইয়াছে। স্বয়ং শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহার শ্রৌত শিষ্যপরম্পরার খাতে। এই 'চাপ্‌রাস্' প্রদান করিয়া বলিয়াছেন—

যারে দেখ, তারে কহ 'কৃষ্ণ'-উপদেশ।
আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার' এই দেশ।।
কভু না বাধিবে তোমার বিষয়-তরঙ্গ।
পুনরপি এই ঠাঁই পাবে মোর সঙ্গ।।

(চৈঃ চঃ মঃ ৭।১২৮-১২৯)

* * * * *

অতএব আমি আজ্ঞাদিলুঁ সবকারে।
যাঁহা তাঁহা প্রেমফল দেহ যারে তারে।।

(চৈঃ চঃ আঃ ৯।৩৬)

* * * * *

ভারত-ভূমিতে হৈল মনুষ্য-জন্ম যার।
জন্ম সার্থক কর করি' পর-উপকার।।

(চৈঃ চঃ আঃ ৯।৪১)

* * * * *

শ্রীচৈতন্যের এই আদেশ-বাণী—এই 'চাপরাস্' শ্রৌত পরম্পরায় লাভ করিয়া শ্রীগৌড়ীয় মঠ এই প্রচার-ব্রত বরণ করিয়াছেন। তাই শ্রীচৈতন্যের বাণীর বিজয়-বৈজয়ন্তী আজ বিশ্বাকাশে উড্ডীন হইয়াছে, শ্রীচৈতন্যের ভবিষদ্বাণী "পৃথিবী-পর্য্যন্ত যত আছে দেশ গ্রাম। সর্ব্বত্র সঞ্চার হইবেক মোর নাম।।"—(চৈঃ ভাঃ অঃ ৪।১২৬) আজ সফল হইতেছে।

১৭। শ্রীগৌড়ীয়মঠ স্বদেশ ও বিদেশ সর্ব্বত্রই হরিকথা বিস্তারের ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন, অথবা সাধারণের বিচারে যাহা 'স্বদেশ' বা 'বিদেশ', শ্রীগৌড়ীয় মঠের বিচার তাহা নহে। প্রাদেশিকতা বা জাতীয়তার সঙ্কীর্ণতা 'চৌদ্দপোয়া'কে অবলম্বন করিয়াই উদিত হয়। আত্মার সম্বন্ধে সকলেই স্বরূপতঃ আত্মীয়, সেই স্বরূপের বৃত্তি 'হরিসেবা' উদ্বোধন করাইবার জন্য অর্থাৎ পৃথিবীর সকলকে হরির সেবক-সূত্রে আত্মীয় করিবার জন্য শ্রীগৌড়ীয় মঠ সঙ্কীর্ণ স্বাদেশিক বা বৈদেশিক সাম্প্রদায়িকতা অবলম্বন না করিয়া পৃথিবীর সর্ব্বত্র হরিকথা-প্রচারের ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন। জাগতিক সভ্যজাতির অনুসরণেই অন্যান্য জাতি নিয়মিত হয়। এজন্য শ্রীচৈতন্য-কথা দ্বারা পার্থিব স্বাধীন ও সভ্য জাতির হৃদয় বিজয় করিবার জন্য শ্রীগৌড়ীয় মঠ পাশ্চাত্য দেশে প্রাচ্যের বাণী-বাহক দূত-সমূহকে প্রেরণ করিয়াছেন। লণ্ডন মহানগরীতে ও ইংলণ্ডের বিভিন্ন পল্লীতে শ্রেষ্ঠ অভিজাত সম্প্রদায় তথা মনীষিমণ্ডলীর নিকট শ্রীচৈতন্যের বার্ত্তা প্রচারিত হইতেছে এবং তথায় "লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ" নামে একটি প্রচার-কেন্দ্র ও স্থাপিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে জার্ম্মাণীর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ও প্রসিদ্ধ স্থানসমূহে শ্রীচৈতন্য-বাণীর বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীন হইয়াছে। কএকজন জার্ম্মেণ মনীষীও আচার্য্যের কৃপায় উদ্ভাসিত হইয়া প্রচার-কার্য্যে যোগ দিয়াছেন। কেহ কেহ মঠ জীবন যাপন করিবার উপযোগী সকল সদাচার অবলম্বনপূর্ব্বক নির্গুণ ভগবৎপ্রসাদ সেবন ও শ্রদ্ধার সহিত তুলসী মালিকায় হরিনাম-গ্রহণ, কণ্ঠে তুলসীমালিকা-ধারণ ও অনুক্ষণ হরিকথার শ্রবণ-কীর্ত্তন-কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। ইহারা ভাড়াটিয়া নহেন বা অন্য কোন ইতর লোভে লুব্ধ হইয়া আসেন নাই। যাহারা অন্যাভিলাষ লইয়া গৌড়ীয়মঠে আসিবার অভিনয় করে, তাহারা এখানে অধিক দিন টিঁকিতে পারে না—ছল-রূপ প্রকাশ করিয়া ফেলিতে বাধ্য হয়। কাহাকেও পূর্ব্ব ইতিহাস বা ভোগময় জীবন কিংবা ভোগময় জীবনের প্রতিযোগী আপাত ত্যাগময় জীবনের প্রতিষ্ঠাগর্ভ সাময়িক কঠোরতার মধ্যে সংরক্ষিত করিয়া কোন ধর্ম্ম বা প্রতিষ্ঠানের স্তাবক করা তাঁহার হৃদয় বা চেতনজয় নহে। পূর্ব্ব ইতিহাস বিস্মৃত করাইয়া একান্তভাবে আনুগত্য-বরণের জন্য যে শক্তি সঞ্চার, তাহাই যথার্থ হৃদ্বিজয়। জড়সর্ব্বস্বৈকবাদের দুর্ভেদ্য দুর্গ হইতেও এইরূপ কএকজন মনীষী শ্রীগৌড়ীয় মঠের আহ্বানে সাড়া দিয়াছেন, যাঁহার পূর্ব্ব ইতিহাস ভুলিয়া আচার্য্যের আনুগত্য করিতে প্রস্তুত। পূর্ব্ব ইতিহাস বিস্মৃত করাইয়া চেতন-বাণীর রাজ্যে পরিচালন করা শ্রীগৌড়ীয় মঠের একটি বৈশিষ্ট্য।

১৮। শ্রীগৌড়ীয় মঠ বিশ্বের সর্ব্বত্র শ্রীচৈতন্যের ভুবন-মঙ্গল নাম, ধাম ও কামের প্রচার করিতেছেন। ভারতের সমস্ত প্রদেশের সহরগুলিতে যথা—কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ, ভারতের বর্ত্তমান রাজধানী দিল্লী, যুক্ত প্রদেশের প্রধান নগর এলাহাবাদ ও কাশী বিহার প্রদেশের প্রধানা নগরী পাটনা, পূর্ব্ববঙ্গের ঢাকা ময়মনসিংহ, উড়িষ্যার কটক ও পুরী, আসামের গোয়ালপাড়া প্রভৃতি সহরে এবং ভাগবত-ধর্ম্মের স্মৃতি-বিরাজিত, আচার্য্যগণের সেবিত ও শ্রীচৈতন্যদেবের পদাঙ্কপূত মহাতীর্থ কাশী, প্রয়াগ, কুরুক্ষেত্র, নৈমিষারণ্য, শ্রীবৃন্দাবন, শ্রীরাধাকুণ্ড, হরিদ্বার, পুরী, আলালনাথ, ভুবনেশ্বর, কভুর, প্রভৃতি বহুস্থানে শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচার-কেন্দ্রসমূহ স্থাপিত হইয়াছে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি শ্রীনবদ্বীপের মধ্যে যে অন্তর্দ্বীপ অর্থাৎ

যে স্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার প্রকট-লীলা করিয়াছিলেন, সেই শ্রীধাম-মায়াপুরে—**মূল মঠায়তন শ্রীচৈতন্যমঠ** বিরাজিত রহিয়াছেন। এই শ্রীচৈতন্য মঠেরই প্রচারের অঙ্গ-স্বরূপ শ্রীধাম মায়াপুরে 'নদীয়া-প্রকাশ-যন্ত্রালয়', নদীয়ার সদর কৃষ্ণনগরে 'ভাগবত যন্ত্রালয়' এবং কলিকাতা মহানগরীতে 'গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্' স্থাপিত আছে। 'নদীয়া-প্রকাশ-যন্ত্রালয়' হইতে আজ নয় বৎসর যাবৎ অপতিত ভাবে পারমার্থিক দৈনিক সংবাদপত্র প্রকাশিত হইতেছে। ভাগবত ধর্ম্মের দৈনিক পত্রের প্রচার পৃথিবীর ইতিহাসে অভিনব ও সম্পূর্ণ নূতন। ভাগবত প্রেস হইতে পূর্ব্ব পর্য্যায়ের সজ্জনতোষণী পত্রিকা ও ভাগবত-ধর্ম্ম-বিষয়ক গ্রন্থাদি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে ও হইতেছে। নদীয়া- প্রকাশ প্রেসে শ্রীমদ্ভাগবত ও ভাগবত-ধর্ম্ম-গ্রন্থমালা মুদ্রিত হইতেছে। কলিকাতার গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কসে বাঙ্গালা সাপ্তাহিক 'গৌড়ীয়' ও ইংরেজী পাক্ষিক 'হারমনিষ্ট' নামক সাময়িক পত্র এবং বহু ভক্তিগ্রন্থ মুদ্রিত হয়। এতদ্ব্যতীত ঢাকা শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ হইতেও অনেক ভক্তিগ্রন্থ প্রকাশিত ও প্রচারিত হইতেছে।

১৯। শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে আচার্য্যের আনুগত্যে সর্ব্বক্ষণ হরিকথা আলোচনা করিবার যে আদর্শ আছে, তাহা প্রাচীনকালের বেদধ্বনি-মুখরিত তপোবনের মধ্যে ছিল কি না আমরা বলিতে পারি না। কারণ, যে যুগে কলিকল্মষ সমগ্র পৃথিবীর পারিপার্শ্বিকতায় একচ্ছত্র সাম্রাজ্য বিস্তার করিয়াছে, সেইরূপ এক যুগে আচার্য্যের আনুগত্যময় বাস্তব জীবন যাপন ও অনুক্ষণ অনাবিল হরিকীর্ত্তনে উদ্ভাসিত থাকিবার আদর্শগণের যুগপৎ এত অধিক সংখ্যায় একত্র সমাবেশ প্রকৃতই অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার। মঠের প্রত্যেক নিষ্কপট ব্রহ্মচারী, প্রত্যেক বানপ্রস্থ, প্রত্যেক সন্ন্যাসী ও প্রত্যেক হরিসেবাপর গৃহস্থই জানেন, মঠের সেবার জন্যই তাঁহার জীবন ধারণ, তাঁহার অস্মিতা, তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব। তাঁহাদের জপ-তপঃ, ভজন-পূজন সমস্তই আচার্য্যের মনোভীষ্ট হরিনাম প্রচারকারী মঠায়তনের সেবা। হরিকথার শ্রবণ-কীর্ত্তন ব্যতীত শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্য ভজনপূজন নাই, অন্য প্রয়োজন নাই। শ্রীধাম মায়াপুরে বালকগণ "শ্রীহরিনামামৃত" ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিতেছেন। তাঁহারা অতি বাল্যকাল হইতেই অনুক্ষণ ইহাই শ্রবণ করিতেছেন যে, হরিনামের শ্রবণ কীর্ত্তনই তাঁহাদের জীবনের ব্রত। শ্রীহরিনামের একান্ত আশ্রয়-গ্রহণই সকল পাণ্ডিত্যের অবধি—'বিদ্যা ভাগবতাবধি'। যাঁহারা শ্রীধাম মায়াপুরে পাশচাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হইবার জন্য ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনস্টিটিউটে অধ্যয়ন করিতেছেন, তাঁহারাও বিদ্যালয়ের আচার-প্রচার-পরায়ণ আদর্শ প্রধান শিক্ষক বা নিয়ামকের হরিকথা প্রচারের জন্য সর্ব্বস্বত্যাগ ও অনাবিল সদুপদেশ শ্রবণ করিবার অনুক্ষণ সুযোগ পাইতেছেন। আবার অন্যদিকে যাঁহারা সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া শ্রীধামের ক্ষেত্র-কর্ষণ, গোচারণ, বীজবপন ও শস্যোৎপাদন করিতেছেন, বাগান প্রস্তুত করিতেছেন, প্রেসে কালি দিতেছেন, দ্রব্য-সম্ভার বহন করিতেছেন, স্থপতিবিদের কার্য্য করিতেছেন, যানবাহনাদি চালন করিতেছেন, তাঁহারাও সকলেই হরিকথা শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিতে করিতে ইহাই উপলব্ধি করিতেছেন যে, ভোগের সংসার হইতে এই কৃষ্ণের সংসারের সেবা সম্পূর্ণ পৃথক ভোগের সংসারের সেবায় জীব বদ্ধ হয়, আর কৃষ্ণের সংসারের সেবায় জীব মুক্ত হইয়া নিত্যকাল কৃষ্ণের সেবা লাভ করে। ইহাই জীবের সাধ্য। ইহা অপেক্ষা আর উচ্চতর কোন প্রয়োজন নাই।

২০। লুপ্ত শাস্ত্র উদ্ধার, শাস্ত্রের শ্রৌত ও যথার্থ সিদ্ধান্তমূলক ব্যাখ্যা প্রচার, হরিসেবা ও হরিকথা-প্রচার-কেন্দ্র স্থাপন, লুপ্ত তীর্থ পুনঃ প্রকটন ও প্রত্যেক মানবের হৃদয়কে জীবন্তমঠ অর্থাৎ হরিকীর্ত্তন-নিকেতনে পরিণত করিবার জন্য আচার-প্রচারময় প্রযত্ন, সদাচার প্রবর্ত্তন, দৈববর্ণাশ্রম ধর্ম্মের পুনঃ সংস্থাপন, জগতের প্রত্যেক জীবের দ্বারে দ্বারে তাহার নিত্য স্বদেশের বার্ত্তা জ্ঞাপন, প্রত্যেকের নিকট শাস্ত্রের সুসিদ্ধান্ত-সমূহ কীর্ত্তন, দেশে-দেশে পল্লীতে-পল্লীতে ভক্তি প্রচারক প্রেরণ, বক্তৃতা, পাঠ, ব্যাখ্যা, আলোচনা, ছায়াচিত্র, মানচিত্র প্রভৃতির সাহায্যে সাধারণ্যে হরিকথা বিস্তার শ্রীচৈতন্যপাদপীঠ সংস্থাপন, ভক্ত ও ভগবানের স্মৃতি উৎসবাদির প্রবর্ত্তন, নগর-সংকীর্ত্তন, গৌড়মণ্ডল, ব্রজমণ্ডল ক্ষেত্রমণ্ডল ও ভগবদ্ধাম-সমূহ পরিক্রমা প্রভৃতি অনুষ্ঠানের দ্বারা শ্রীগৌড়ীয়মঠ জীবের নিত্যমঙ্গল বিধানের সর্ব্বতোমুখিনী চেষ্টা করিতেছেন। সর্ব্বপ্রকার অসৎসঙ্গ বর্জ্জনপূর্ব্বক সাধুসঙ্গ, নাম-সংকীর্ত্তন, ভাগবত-শ্রবণ, মথুরাবাস, শ্রদ্ধায় শ্রীমূর্ত্তির অঙ্ঘ্রিসেবা—শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথিত এই শ্রেষ্ঠ সাধনপঞ্চক শ্রীগৌড়ীয় মঠেই সর্ব্বাঙ্গীন সুষ্ঠুভাবে আচার্য্য আনুগত্যে অনুষ্ঠিত হইতে দেখা যায়।

২১। 'জীব-সেবা' ও 'জীব-দয়া' শব্দ দুইটি লইয়া অনেক সময়ই সাধারণ্যে নানাপ্রকার ভ্রমের উদয় হইয়া থাকে। অনেকেই 'সেবা'-শব্দের যে প্রচলিত অর্থ জানেন বা অনুভব করেন, তদ্দ্বারা 'সেবা'র প্রকৃত সার্থকতা সম্পন্ন হয় না। 'সেবা' অর্থে সেব্যের সুখ বা প্রীতি-বিধান। সেব্য ও সেবকের মধ্যস্থানে সেবা বর্ত্তমান। সেবা নিত্য না হইলে সেবকের সেবার নিত্যত্ব থাকে না, আবার সেবকও নিত্য না হইলে তিনি ও নিত্যকাল সেবা করিতে পারেন না, আর 'সেবা' নিত্য না হইলে সেবক সেব্যকে সাময়িক ভাবে বৃথা ছলনা করেন মাত্র। পৃথিবীতে আমরা অধিকাংশই ন্যূনাধিক অনাদি-বহির্ম্মুখ জীব, কেবল যুগে যুগে দুই একজন মহাপুরুষ আমাদের ন্যায় বহির্ম্মুখ জীবকে উদ্ধার করিবার জন্য জগতে আসেন, সুতরাং বহির্ম্মুখ জীবের সেবা অর্থাৎ তাহাদের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি-বিধানের দ্বারা তাহাদের বহির্ম্মুখতা বৃদ্ধি বা তাহাদের প্রতি হিংসা ও অকরুণাই করা হয়। এ জন্য সমগ্র শ্রীভাগবত সাহিত্যে বা শ্রীচৈতন্যদেবের সিদ্ধান্তে বা ভাগবতধর্ম্মে তথাকথিত 'জীবসেবা' কথার অস্তিত্ব নাই। 'বৈষ্ণব-সেবা' 'হরিসেবা' বা 'জীবে দয়া' কথাই হইতে পারে; কারণ বৈষ্ণব হরির প্রতি সর্ব্বদাই উন্মুখ, তাঁহারই অহৈতুকী সেবায় রত, সেইরূপ বৈষ্ণবের যে-কোনরূপ সেবা করিলে তদ্দ্বারা হরিসেবাই হয়। বহির্মুখ জীবের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করিয়া তাহার প্রতি নিত্য দয়া প্রদর্শন করাই পরোপকারের শ্রেষ্ঠ আদর্শ। ক্ষুধার্ত্তকে অন্নদান, বসনহীনকে বস্ত্রহীনকে বস্ত্রদান, আর্ত্তকে সান্ত্বনা দান, অশিক্ষিতকে পার্থিবশিক্ষা দান প্রভৃতি দ্বারা যে উপকার বা দয়া করা হয়, তাহা অতীব তাৎকালিক। ঐরূপ সাময়িক উপকারলব্ধ বদ্ধ জীব পুনরায় ক্ষুধাগ্রস্ত ও বস্ত্রের অভাবে পতিত হয়। রোগী রোগবিশেষ হইতে মুক্তি লাভ করিলেও অন্য প্রকার রোগ বা মানসিক অশান্তিতে আক্রান্ত হয়, অথবা সুস্থ হইয়া সমাজেরই কোন বিশৃঙ্খলা-কারক পাপকার্য্যে নিযুক্ত হয়, পার্থিব শিক্ষা লাভ করিয়াও কাম, ক্রোধ, হিংসা, দ্বেষ, এমন কি পশুচিত আদর্শ হইতেও হীন কুকর্ম্মে লিপ্ত হইয়া থাকে। শারীরিক বল সঞ্চয় করিয়া নানা প্রকার অসৎপথে ও পাশব-বল প্রয়োগে রুচি-বিশিষ্ট হয়; কিংবা হয়ত' কোন আধিদৈবিক

আধিভৌতিক বা আধ্যাত্মিক তাপের দ্বারা এক মুহূর্ত্তের সমস্ত সাময়িক লাভ হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়ে। এজন্য সর্ব্বাগ্রে প্রত্যেক জীবের চেতনকে উদ্বুদ্ধ করিবার উপযোগী পারমার্থিক শিক্ষা-দীক্ষা এবং তদনুকূলে জীবন যাপন করিবার জন্য যে যে প্রয়োজন, তাহা স্বীকার করিলেই ব্যষ্টি ও সমষ্টিগত মঙ্গল হইতে পারে। শ্রীগৌড়ীয় মঠ সেইরূপ 'জীবে দয়া'র ভার গ্রহণ করিয়াছেন। চেতনের প্রতি দয়া কর, তাহা হইলে অচেতনেরও নিরর্থকতা হইবে না—ইহাই শ্রীগৌড়ীয়মঠের বাণী; কিন্তু সর্ব্বাগ্রে কেবল অচেতনের প্রতি দয়া দেখাইতে দেখাইতেই সময় নষ্ট করিয়া ফেলিলে চেতনরাজ্যে প্রবেশের আর সময় থাকিবে না।

২২। দেহাত্মধর্ম্মে অধিকতর আকৃষ্ট ও আত্মধর্ম্মী হইতে বঞ্চিত হইবার জন্য ''শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্ম সাধনম্''— বাক্যের অনেক কদর্থ প্রচারিত আছে। ভাগবতধর্ম্ম প্রচারকারী শ্রীগৌড়ীয়মঠের মূলমন্ত্র ''তুর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যু যাবন্নিঃশ্রেয়সায়, বিষয়ঃ খলু সর্ব্বতঃ স্যাৎ''; নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্লভং, প্লবং সুকল্পং গুরুকর্ণধারম্ ময়ানুকূলেন নভস্বতেরিতং পুমান্ ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা।'' চেতনশরীরের বিকাশ-সাধনই সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। তাহাই প্রত্যেক জীবের পরম ধর্ম্ম। এই শরীর থাকিতে থাকিতে যাহাতে আত্মানুশীলনের পূর্ণতা সাধন করা যায়, তদ্বিষয়েই সর্ব্বাগ্রে যত্ন করা প্রয়োজন, কারণ এইরূপ স্থূল শরীর ত' সকল জন্মেই পাওয়া যাইবে, কিন্তু হরিভজনের উপযোগী ও সুযোগপূর্ণ মানব জন্ম বহুকষ্টে ও বহু ভাগ্যফলেই লাভ হয়। এইরূপ ''ভজনের মূল'' নরদেহ প্রাপ্ত হইয়া যে-ব্যক্তি আত্মমঙ্গলের জন্য আচার্য্যের নিকট অভিগমন না করে, সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই আত্মঘাতী। আপাত-প্রতীয়মান ও সাময়িক সৃষ্ট অসংখ্য কর্ত্তব্যের দিকে না তাকাইয়া সেই একমাত্র মূল কর্ত্তব্য হরিসেবানুশীলনের জন্য যত্নই সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। যাঁহারা প্রকৃত মঙ্গল চাহিবেন না, যাঁহারা আপাত প্রত্যক্ষকেই বড় মনে করেন, তাঁহারাই অগ্রে শরীরচর্য্যা ও পরে আত্মানুশীলন, অগ্রে জগতের, পার্থিব দেশের বা সমাজের সুবিধা, আর ভবিষ্যতের জন্য আত্মরাজ্যের— প্রকৃত নিত্য স্বদেশের সন্ধান মুলতুবী রাখেন; আর যাঁহারা আত্মার নিত্য স্বভাব যে নিত্যকালীয় হরিসেবা, তাহাকেই পরম শুভপ্রদ মনে করেন, তাঁহারা ''শুভস্য শীঘ্রম্ অশুভস্য কালহরণম্''—এই নীতি অনুসারে সর্ব্বশুভপ্রদ হরিসেবারই কর্ত্তব্যতা সর্ব্বাগ্রে স্থির করিয়া থাকেন। শ্রীগৌড়ীয়মঠ তুলনামূলক নিরপেক্ষ আত্মস্থবিচারে হরিসেবাকেই পরম শুভপ্রদ বলিয়া সকল কর্ত্তব্যের সর্ব্বাগ্রণী কর্ত্তব্যরূপে সুদৃঢ় সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ইহা শ্রীগৌড়ীয় মঠের আর একটি বৈশিষ্ট্য।

২৩। অনেকের ধারণা, ধর্ম্মাচরণ অতীব স্বার্থপরতা ও অক্ষমতার পরিচায়ক। যাঁহারা মানবজাতির নিত্যমঙ্গলের প্রতি বিমুখ হইয়া ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষাভিসন্ধিকেই ধর্ম্মের সীমা বলিয়া স্থির করিয়াছে, তাঁহাদের প্রতি ঐরূপ উক্তি প্রযোজ্য বটে; কেননা, যিনি পুণ্য, অর্থ, কাম বা মোক্ষের অনুসন্ধান করেন, তিনি ব্যক্তিগত সুখ ও স্বার্থ লইয়াই ব্যস্ত রহিলেন, তাঁহার ভ্রাতৃবৃন্দ বা মানব জাতির কোনই উপকার করিলেন না। ইহা অক্ষমতার পরিচায়কও বটে। কিন্তু শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার্য্যধর্ম্ম পুণ্য, অর্থ, কাম বা মোক্ষাভিসন্ধি নহে। শ্রীগৌড়ীয়মঠ পর্ব্বতের গুহায় লুকাইয়া ধ্যান করেন না, গৈরিক বসন পরিধান করিয়া

লোকালয় হইতে নির্ব্বাসিত বা লোকালয়ের পাপ, পুণ্য, অর্থ, কাম বা মোক্ষাভিসন্ধির কোন প্রকার রসদও সরবরাহ করেন না। শ্রীগৌড়ীয়মঠ-সেবক গৃহেই থাকুন, আর বনেই থাকুন, লাল কাপড়ই পরুন আর সাদা কাপড়ই পরুন, কুটীরেই থাকুন আর অট্টালিকাতেই থাকুন, হরিকীর্ত্তন, হরির তত্ত্ব, হরির সহিত জীবের সম্বন্ধ, কিভাবে হরিসেবা করিতে হয়, হরিসেবা কেন করিতে হয়, তাহা লোককে জানাইয়া হরিসেবায় জীবের নিত্যসিদ্ধ স্বাভাবিক রুচি উৎপাদন করাই শ্রীগৌড়ীয়মঠের কৃত্য। কাজেই শ্রীগৌড়ীয় মঠ স্বার্থপর অক্ষমতাধর্ম্মের প্রচারক নহেন। মানবজাতির কেন, সমগ্র জীবজগতের যথার্থ নিত্যোপকারের বার্ত্তাই শ্রীগৌড়ীয়মঠ প্রচার করেন। যাঁহারা কেবল মানবজাতির সাময়িক শারীরিক উপকারের ধর্ম্মব্রত গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে মানবজাতির উপকার করিতে গিয়া পশু-জাতি, পক্ষি-জাতি, কীটপতঙ্গ বা উদ্ভিদ জাতির প্রতি বাধ্য হইয়া হিংসক হইয়া পড়িতে হয়। রোগীর সেবককে হয়ত' রোগীর জন্য ছাগলাদ্য ঘৃত প্রস্তুত করিতে গিয়া ছাগলের প্রতি নির্দ্দয় হইতে হয়, কুক্কুরের সেবককে কুকুরের সেবার জন্য অন্য পশুর প্রতি নির্ম্মম হইতে হয় মানবের সেবককে এক মানবের প্রীতির জন্য অপর মানবের প্রতি বিরূপ হইতে হয়; কিন্তু শ্রীগৌড়ীয়মঠ যে হরিকীর্ত্তন করেন, তদ্দ্বারা যাবতীয় মানব পশুপক্ষী, কীট, পতঙ্গ, সমগ্র জৈবজগৎ সমভাবে মঙ্গল লাভ করিতে পারেন। অতএব শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারের মধ্যে অতিমর্ত্ত্য পরার্থপরতা, নিঃস্বার্থপরতা ও স্বার্থপরতার যুগপৎ অপূর্ব্ব সম্মিলন ও সমন্বয় আছে।

২৪। অনেকের ধারণা—যাঁহারা গায়ে বিভূতি মাখিতে পারেন, জটা বল্কল ধারণ করিতে পারেন, জগতের যাবতীয় ব্যবহার্য্য দ্রব্য ভোগি-সমাজের জন্য গচ্ছিত রাখিয়া বনচারী, বাতাহারী, ফলাহারী দিগম্বর মূর্ত্তিতে সাজিতে পারেন, তাঁহারাই ধার্ম্মিক বা পরমসাধু! কিন্তু শ্রীগৌড়ীয়মঠের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে ইহাই লক্ষ্য করিবার বিষয় যে,'খট্টাভঙ্গে ভূমিশয্যা'-নীতি বা বিষয়-সমূহ পরিত্যাগ করিলেই বিষয়ের সার্থকতা বা পরিত্যাগকারীর মঙ্গল হয় না। যিনি পরিত্যাগ করিলেন ও যাহা পরিত্যক্ত হইল—এই উভয়ের নিত্য মঙ্গল ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট সার্থকতা কিরূপভাবে হইতে পারে, সেই প্রণালীর অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য। বিষয়কে ছাড়িয়া দিলে ভোগি-সমাজ বিষয়ের ভাগ আরও প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত হইয়া একদিকে যেমন নিজ অমঙ্গল বরণকরিবে, তদ্দ্বারা অপরদিকে বিষয়ের যথাস্থানে প্রয়োগেও বাধা জন্মাইবে। এজন্য শ্রীগৌড়ীয়মঠ সমস্ত বিষয়কে, যিনি সমস্ত ভোগের মালিক অর্থাৎ সমস্ত বিষয় যাঁহার, তাঁহার সেবায় নিয়োগ করিয়া বিষয়ের সার্থকতা সম্পাদন করেন। ইহাদ্বারা বিষয়িগণেরও মঙ্গল হয় অর্থাৎ তাঁহাদের নিকট গচ্ছিত ভগবানের সম্পত্তি যে-কোন ভাবে ভগবানের সেবায় নিযুক্ত হওয়ায় তাঁহারা সেবোন্মুখী সুকৃতি লাভ করেন, তাঁহাদের হরিসেবা-বৃত্তি উন্মেষিত হইবার পথ পরিষ্কৃত হয়; আবার অন্যদিকে বিষয়ের দ্বারা যাহা সাধিত হওয়া প্রয়োজন, সেই প্রয়োজনও সর্ব্বতোভাবে সিদ্ধ হইয়া থাকে অর্থাৎ বিষয়ভোগের মধ্যে যে কুফল ও বিষয়ত্যাগের মধ্যে যে মঙ্গলময় ফল হইতে বঞ্চিতাবস্থা রহিয়াছে,—ঐ উভয় ভাব পরিত্যাক্ত হইয়া বিষয়ের সুষ্ঠু নিয়োগে যে পরমমঙ্গলজনক ফল উৎপন্ন হইতে পারে, তাহাই লাভ হইয়া থাকে। হরিসেবায় নিযুক্ত হইলেই বিষয় পরম ফল প্রসব করে। অপর দিকে বিষয় ত্যাগ করিয়া ত্যাগী যে নিরিন্দ্রিয় ও নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থকিয়া

আত্মহত্যা করিতে ছিলেন, সেই আত্মহত্যা হইতেও নিষ্কৃতি পাইয়া বিষয়কে যথার্থ কার্য্যে নিযুক্ত করিবার অবসর পাওয়া যায়। তাই শ্রীগৌড়ীয়মঠ বর্ত্তমান যুগের বিজ্ঞানের যাবতীয় অবদান, যথা—টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, বাষ্পীয়শকট, বৈদ্যুতিকযান, ব্যোমযান, মুদ্রাযন্ত্র, বিদ্যুৎ, এমন কি যে সকল ভোগোপকরণ ভোগীর সেবায় বিষয়ময় ফল প্রসব করে, তাহাদিগকেও হরিকথা প্রচারে নিযুক্ত করিয়া উহাদের সার্থকতা সাধন করিয়াছেন। অর্থ অনর্থের মূল, কিন্তু শ্রীগৌড়ীয় মঠ অর্থকে পরমার্থ প্রচারে নিয়োগ করিয়াছেন। সৌধমালা, অট্টালিকা প্রভৃতিকে বিলাস-ব্যসনের জন্য চিরসংরক্ষিত না করিয়া উহাঁদিগকে হরিকথা-কীর্ত্তনের সভা-সমিতি-অধিবেশনের স্থান করিয়াছেন। শ্রেষ্ঠ্যার্যা ভক্তিরঞ্জন জগবন্ধু এই যে শ্রীগৌড়ীয়মঠের অট্টালিকা বা উচ্চচূড়াযুক্ত মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন, তাহা আচার্য্যের নিয়ামকত্বে কিরূপ কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছে, সকলেই প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইতেছেন। এই অট্টালিকায় স্বয়ং ভগবান্ (শ্রীশ্রীগৌরবিনোদানন্দ জীউ) অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন। কেবল নাম মাত্র অধিষ্ঠিত থকিলে হয়ত' তাঁহাকে দাঁড় করাইয়া অনেক কিছু ভোগের উপায়ন সংগৃহীত হইতে পারে, কিন্তু গৌড়ীয় মঠাচার্য্য তাহার প্রশ্রয় দেন নাই। তিনি আচার ও প্রচারময় হরিকীর্ত্তনকারীর হরিকীর্ত্তনে শ্রীগৌড়ীয় মঠকে সর্ব্বক্ষণ মুখরিত রাখিবার জন্য অনুক্ষণই অনুপ্রেরণা প্রদান করিতেছেন। তাই শ্রীগৌড়ীয় মঠের এই সভামণ্ডপের নাম 'সারস্বত-শ্রবণ-সদন' অর্থাৎ এই স্থান শ্রীচৈতন্যবাণীর শ্রবণাগার। এখানকার বৈদ্যুতিক আলোকের দ্বারা কৃষ্ণের পদনখশোভা ও সাধুগণের পদ-নখশোভা দৃষ্ট হয়। এখানকার বৈদ্যুতিক আলোকের দ্বারা বেদ, ভাগবত, গীতা, শ্রীচরিতামৃতের বাণী-সমূহ পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়। এখানকার বৈদ্যুতিক পাখা হরিকথা-শ্রবণে সমাগত সজ্জন-মণ্ডলীর ও হরিকথা কীর্ত্তনকারীর সেবা করিয়া থাকে। শ্রীগৌড়ীয়মঠের মোটরযান দ্রুতগতিশীলতার দ্বারা সময়ের বিক্রম অনেক পরিমাণে হ্রাস করিয়া অল্প সময়ের মধ্যে বহুস্থানে হরিকথা প্রচার ও হরিসেবার অনুকূল কার্য্যসমূহ করিয়া থাকে। অথবা যাঁহারা হরিসেবা করেন, তাঁহাদের কার্য্যে-নিযুক্ত হইয়া পরোক্ষভাবে হরিসেবারই সাহার্য্য করে। শ্রীগৌড়ীয়মঠের দ্বাররক্ষক হরিকথা-শ্রবণে সমাগত ব্যক্তিগণের এবং হরিসেবার সম্পত্তি সংরক্ষণের জন্যই নিযুক্ত আছে। অর্থাৎ বহির্ম্মুখ চক্ষে বিষয়ীর বিষয়ভোগের ন্যায় যাহা কিছু প্রতীয়মান হয়, তাহা ও তদ্ব্যতীত যাহা কিছু বিষয়ের উপকরণরূপে ভবিষ্যতেও সৃষ্ট হইবে, তৎসমুদয়কে নিরর্থকভাবে বৃথা ত্যাগ না করিয়া তদ্দ্বারা আচার্য্যের নিয়ামকত্বে হরিকথা প্রচার, হরিসেবানুশীলন করিলেই সেই সকল বস্তুর সার্থকতা ও বিশ্বের মঙ্গল হইতে পারে, ইহাই হাতেকলমে প্রদর্শন করা শ্রীগৌড়ীয়মঠের বৈশিষ্ট্য। তাই ''গৌড়ীয়ে''র ললাটে শ্রীচৈতন্যের শ্রীরূপের এই দুইটি বাণী প্রচারের মূলসূত্ররূপে খচিত রহিয়াছে,—

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে।।
অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে।।

২৫। অপ্রাকৃত দর্শনে কৃষ্ণের ও কার্ষ্ণের আনুগত্যই বৈষ্ণবধর্ম্ম ও বৈষ্ণবধর্ম্মের বিশেষত্ব। শ্রীগৌড়ীয়মঠের বৈশিষ্ট্যও তাহাই। শ্রীগৌড়ীয়মঠ হরিসেবার্থ বিষয়-স্বীকারের বা হরিকথা প্রচারের আবশ্যকতা বিচার করেন বলিয়া **ব্যক্তিগত বিষয় স্বীকাব** বা নিত্যসিদ্ধ ভগবৎপ্রেরিত আচার্য্যের আনুগত্য-রহিত হইয়া **ব্যক্তিগত স্বতন্ত্রভাবে হরিকথা প্রচারের** ছলনা স্বীকার করেন না; কারণ তাহা অভক্তিবাদ। যদি কেহ কখনও বা কোথায়ও শ্রীচৈতন্যের বা শ্রীগৌড়ীয়মঠের দোহাই দিয়া ব্যক্তিগতভাবে বিষয় স্বীকার বা স্বতন্ত্রভাবে ভক্তি-প্রচারের ছলনা প্রদর্শন করেন, তাহা হইলে সেইরূপ আদর্শকে শ্রীগৌড়ীয়মঠের বৈশিষ্ট্য হইতে পৃথক জানিতে হইবে। পূর্ণ আনুগত্য, নিব্যূঢ় ও নির্হৈতুক আনুগত্য, সর্ত্তরহিত আনুগত্যই শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচার্য্য-বিষয় ও বৈশিষ্ট্য।

২৬। শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার কেবল স্বার্থপর ব্যক্তিগত ভজন নহে। অনেকে ব্যক্তিগত ভজনের সহিত সঙ্কীর্ত্তন বা প্রচারের বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করিতে না পারিয়া ভজনের নির্জ্জনতা, আড়ম্বরহীনতা, বৈভবশূন্যতা প্রভৃতি বিষয়সমূহকে সঙ্কীর্ত্তনের মধ্যেও দর্শন করিতে চাহেন। শ্রীচৈতন্যের কাজী-দলনের সঙ্কীর্ত্তনের মধ্যে পুরীতে কবাট বন্ধ করিয়া রাম রায় ও স্বরূপের সঙ্গে রসাস্বাদন বা ভজনের রহঃকথা আলোচনা খুঁজিতে গেলে ভগ্নমনোরথ হইতে হইবে। যাহাতে পাষণ্ডদলন ও প্রেমবিতরণরূপ প্রচারকার্য্য হইয়াছিল, সেই নগর-সঙ্কীর্ত্তনে নির্জ্জনতার পরিবর্ত্তে জনতা ও জনতার অধিনায়কত্ব, নিস্তব্ধতার পরিবর্ত্তে ''কাণে তালিলাগা''-উচ্চধ্বনি, আত্মগোপন করিয়া থাকার পরিবর্ত্তে আপনাকে 'জাহির' করিয়া যাইবার প্রদর্শনী, আঁকুপাঁকু ভাবের পরিবর্ত্তে কীর্ত্তনবিরোধীর প্রতি প্রচণ্ড ক্রোধপ্রকাশ, উচ্চ সঙ্কীর্ত্তনের অঙ্গোপাঙ্গ, অস্ত্রশস্ত্র ও বৈভব লইয়া আত্মপ্রকাশ। জগতে বৈষ্ণবধর্ম্মের নামে যে সকল অবিচার প্রবেশ করিয়াছে এবং পরমার্থের বিরোধী যে সকল তাণ্ডব নিত্য রচিত হইতেছে, তাহা দলন করিয়া সগণ নিত্যানন্দের প্রেম- প্রচারণরূপ কার্য্যই শ্রীগৌড়ীয়মঠের বাহ্য প্রচার। অনর্থমুক্ত জীব এই সঙ্কীর্ত্তনের অনুগমন না করিয়া যদি নির্জ্জনভজনের ছলনায় আলস্য বা ঔদাসীন্য প্রদর্শন করেন, তাহা হইলেও তাহাদের মঙ্গল হইবে না। এই পরম সত্যটি জানাইয়া দেওয়াও শ্রীগৌড়ীয়মঠের একটি বৈশিষ্ট্য।

২৭। লুপ্ততীর্থ-উদ্ধার, লুপ্তগ্রন্থ-প্রচার, লুপ্তসেবা-পুনঃপ্রকাশ প্রভৃতি কার্য্য শ্রীগৌড়ীয়মঠ গ্রহণ করিয়াছেন। সাধারণ প্রত্নতাত্ত্বিক-সম্প্রদায়ও এই সকল কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া থাকেন, সাধারণ সাহিত্য-পরিষদাদি ও লুপ্তগ্রন্থ-প্রকাশাদির জন্য যত্ন করেন, কিন্তু এই সকল কার্য্যে শ্রীগৌড়ীয়মঠের বৈশিষ্ট্য কোথায়? শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীগোস্বামিবৃন্দের শ্রীরাধাকুণ্ড বা শ্রীবৃন্দাবন-আবিষ্কার, আর সাধারণ প্রত্নতাত্ত্বিকের তত্তৎস্থানের সন্ধান 'এক' নহে। শ্রীচৈতন্যদেবের আবিষ্কার চেতনের আবিষ্কার, বাস্তব সত্যের আবিষ্কার, প্রকৃত বস্তুর আবিষ্কার। আর জাগতিক প্রত্নতাত্ত্বিক যত বড়ই মনীষী ও প্রতিভাশালী হউন না কেন, যত বড়ই প্রত্যক্ষ ও বিশ্বাস-যোগ্য প্রমাণ-প্রয়োগে পাণ্ডিত্য প্রদর্শন করুন না কেন, তাঁহার অনুসন্ধান জড়ত্ব, মাটী, ভোগ, প্রতিষ্ঠা বা হরিবিমুখতার অনুসন্ধান মাত্র। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীবৃন্দাবন-আবিষ্কার সম্বন্ধেও আধ্যক্ষিক সম্প্রদায়ে নানাপ্রকার

মতভেদের কথা এখনও পর্য্যন্ত শুনিতে পাওয়া যায়। কেহ কেহ তাঁহাদের মাটিয়া বুদ্ধিতে প্রকৃত (?) বৃন্দাবন ও কৃষ্ণের জন্মভূমি বা যোগপীঠের স্থিতিস্থান অন্যত্র নির্দ্দেশ করিতেও কুণ্ঠিত হন না! বৈষ্ণব সার্ব্বভৌম ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজ গুরুপরম্পরায় যে স্থানকে গৌরজন্মভূমি শ্রীধাম-মায়াপুর বলিয়া জানিয়া আসিয়াছেন ও স্বয়ং নির্দ্দেশ করিয়াছেন, ভ্রম- প্রমাদাদির কিঙ্করস্বরূপ প্রত্যক্ষবাদী জড় প্রত্নতাত্ত্বিকগণ তাঁহাদের মাটীয়া বুদ্ধি লইয়া সেই ভগবদ্ধাম সন্ধান বা দর্শন করিতে পারেন না। মহামায়ায় আচ্ছন্ন-চক্ষু ব্যক্তিগণের নিকট যোগমায়া ভগবদ্ধামকে আবৃত করিয়া রাখেন,—"নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়া-সমাবৃতঃ।" একমাত্র শ্রৌতপথেই শ্রীধামের আবিষ্কার হয় ও শ্রৌত চক্ষুর্দ্বারাই শ্রীধামের স্বরূপ উপলব্ধি হয়,—ইহার প্রচারই শ্রীগৌড়ীয়মঠের বৈশিষ্ট্য। শ্রীধাম— ব্যবসায়ীর ব্যবসায়ের পণ্যদ্রব্য নহে, ব্যভিচারের আশ্রয়স্থলও নহে। অপ্রাকৃত ধামকে কেহ জড়ীয় অর্থের দ্বারা ক্রয় করিয়া লইতে পারে না। তাহা কোন পার্থিব জমিদারের প্রভুত্বের অধীনতা স্বীকার করে না, তাহা স্বয়ং ভগবদ্বস্তুর জমিদারী। সেখানে প্রত্নতাত্ত্বিকের জড় পাণ্ডিত্য ও জড় গবেষণার বাহাদুরী চলে না। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ও একান্ত সত্যানুসন্ধিৎসুজনগণকে আচার ও প্রচারের দ্বারা জ্ঞাপন করা শ্রীগৌড়ীয়মঠের একটি বৈশিষ্ট্য।

শ্রীব্যাসদেবকে ভ্রান্ত, শ্রীচৈতন্যভাগবতের লেখক ঠাকুর শ্রীল বৃন্দাবনকে উৎক্ষিপ্ত, কবিরাজ গোস্বামীর লেখনীকে অতিরঞ্জিত ও কল্পিত, গোস্বামিগণের শাস্ত্রকে মহাপ্রভুর সিদ্ধান্ত হইতে ভিন্ন, আধ্যক্ষিক বঞ্চিত ও ভোগবুদ্ধি বিতাড়িত মস্তিষ্কদ্বারা ইহা কল্পনা করিয়া তুলট পুঁথির ধূলারাশি ও ইটপাটকেলের বিচার, আকার ইকার, কিংবা অনুস্বার বিসর্গ লইয়া মারামারি করিয়া নিজের পাণ্ডিত্য জাহির ও জড় অর্থ বা প্রতিষ্ঠাদি কুড়াইবার উদ্দেশ্যেও বস্তু-বিজ্ঞান হইতে অধঃপতিত হইবার জন্য পরসাহিত্য পরিষদ্ শ্রীগৌড়ীয়মঠ লুপ্তগ্রন্থ-প্রকাশের সেবা করেন না। তাঁহারা ঐ সকল গ্রন্থকে ভগবদ্‌বিগ্রহ ও ভাগবত-বিগ্রহ জানিয়া সারগ্রাহী হইয়া চেতনের সেবা করেন। ভারবাহী সাহিত্যিক বা প্রত্নতাত্ত্বিকের ন্যায় কেবল পুঁথির স্থূলত্বের স্তুপ ঘাঁটিয়া সত্যবস্তু লাভে বঞ্চিত হন না। ইহাই সাধারণ প্রত্নতাত্ত্বিক বা সাহিত্যেকের বহির্ম্মুখ চেষ্টার সহিত শ্রীগৌড়ীয় মঠের আপাত সৌসাদৃশ্যপর সেবার বৈশিষ্ট্য।

২৮। মানবজাতি পরমার্থ সম্বন্ধে সর্ব্বদাই কতকগুলি সাধারণ ভ্রম (common errors) করিয়া থাকে। এই সধারণ ভ্রমের পরিমাণ এত বেশী যে, মানব-জাতির সহিত সাধারণ ভাষায় পরমার্থের কথা বলিলে তাহারা এক বুঝিতে আর এক বুঝিয়া থাকে। যেমন অতি সাধারণ ও সর্ব্বত্র প্রচলিত 'সেবা', 'ভক্তি', 'হরিনাম' প্রভৃতি ক একটি কথা। 'সেবা' বলিতে শতকরা শতজন পৃথিবীর লোকই হয় দেবতাদি পূজ্যগমের নৈমিত্তিক ও হৈতুক পরিচর্য্যা কিংবা রোগীর শুশ্রূষা, না হয় ভোজনাদি ব্যাপার, না হয় ভক্তগণের অভিধানের বাগ্‌বৈখরী মনে করেন। সর্ব্বোপাধি-বিনির্ম্মুক্ত অণুচেতনের পূর্ণচেতনের প্রতি যে নিত্যসিদ্ধা স্বাভাবিকী চিদ্বৃত্তির প্রগতি, তাহা অনেকেই জানা দূরে থাকুক, বোধ হয় ধারণাও করিতে পারেন না। ভক্তিকে অনেকেই মনের উচ্ছ্বাস, উদ্দীপনা বা ভাবুকতা মাত্র, হরিনামকে অন্যান্য আভিধানিক শব্দের ন্যায় না

হইলেও কোন পূজ্যবস্তু-বিশেষের বোধক শব্দমাত্র বলিয়া মনে করেন; কিন্তু 'ভক্তি' যে আত্মার নিত্যবৃত্তি ও পরমমুক্ত পুরুষগণেরই নিত্য সেব্যবস্তু, শ্রীনাম যে সাক্ষাৎ পূর্ণ চেতন পরব্রহ্ম—ইহা কয়জন অভ্রান্তরূপে জানেন? কাজেই জীবের এই সর্ব্বব্যাপী বা সর্ব্বগ্রাসী সাধারণ-ভ্রম-সমূহ অপনোদন করিতে হইতে যে যে বিশেষ শব্দের দ্বারা বাস্তববস্তু পূর্ণ ও প্রকৃষ্টভাবে অনুভূতির বিষয় হয়, বিদ্বদ্রূঢ়ি-গর্ভ সেই সকল পরিভাষা প্রয়োগ করা ব্যতীত জীবগণকে ঐরূপ অসংখ্য সাধারণ ভ্রমের পিচ্ছিলরাজ্যে অধিকতর বেগে পতন হইতে বাধা দিবার আর অন্য উপায় নাই। এজন্য ভাষার বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ ভাগবতীয় পরিভাষার অনুসরণ শ্রীগৌড়ীয়-মঠের একটি বৈশিষ্ট্য। হইতে পারে, ইহা প্রথমতঃ প্রাকৃত সাহিত্যের পরিভাষায় অভ্যস্ত সাধারণের পক্ষে দুর্ব্বোধ্য হইয়া পড়ে, কিন্তু সুবোধ্য করিবার নাম করিয়া অর্থাৎ সাধারণে প্রচলিতভাব ও ভাষার সাহায্যে বলিতে গিয়া অধোক্ষজ কৃষ্ণকে যদি প্রাকৃত নায়করূপে অঙ্কিত সাহিত্যের ভাব-ভাষা-দ্বারা অপ্রাকৃত সাহিত্য-জগতের সন্ধান পাওয়া যায় না। অপ্রাকৃত সাহিত্য-জগতে প্রবেশের জন্য ভাগবতী দীক্ষা লাভ বা দিব্যজ্ঞানের পরিভাষার সেবা করিতে হইবে,—ইহা জগতের জীবকে বিশেষভাবে জ্ঞাপন করা শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

২৯। অর্থনীতির যুগে আর একটি কথা স্বতঃই অনেকের প্রশ্নের বিষয় হয়, শ্রীগৌড়ীয়মঠের পৃথিবীব্যাপী এই বিপুল প্রচারের আর্থিক-ভাণ্ডার ও রসদাদি কিরূপে সংগৃহীত হয়? ত্রিবিক্রম একদিন ত্রিপাদ পরিমিত ভূমি যাচ্ঞা করিয়া বলির আত্মা দেহ মন সর্ব্বস্বই বলিরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। পুরের হিতকারীর অভিনেতা শুক্রাচার্য্য শতবাধা দিয়াও বলিকে রক্ষা করিতে পারে নাই। যেখানে প্রাণ আছে, যেখানে চেতন আছে, সেখানে অর্থ মুকুলিতাঞ্জলি হইয়া ভগবৎ সেবকের প্রতীক্ষা করিয়া থাকে। বিশ্বের সর্ব্বত্রই স্বরূপতঃ বিষ্ণুদাসগণের 'ব্যাঙ্ক' ও তথায় বিষ্ণুর নিজস্ব অর্থরাশি গচ্ছিত ও সংরক্ষিত রহিয়াছে। বিষ্ণুদূতগণ—যাঁহারা বিষ্ণুর সেবায় প্রাণ ঢালিয়াছেন, সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়াছেন, তাঁহারাই মাধবের সংরক্ষিত ভাণ্ডার হইতে তাহা সংগ্রহ করিয়া মাধবের নাম-ধাম-কাম-প্রচার-সেবায় নিয়োগ করিতে পারেন। শ্রীগৌড়ীয় মঠের ভিক্ষার ঝুলির একটি বৈশিষ্ট্য আছে। সাধারণ ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠান-সমূহের প্রত্যক্ষ চেষ্টাগুলি জগতের সকল লোকেরই ন্যূনাধিক ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে আসিয়া তাঁহাদের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি করে বলিয়া, লোকে তত্তৎ প্রতিষ্ঠানের স্তাবক হইয়া তাঁহাদের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির 'মাস্তুল' বা প্রতিদান-স্বরূপ অর্থাৎ দ্বারা সেই সকল প্রতিষ্ঠানের ভাণ্ডার পূর্ণ করিয়া থাকেন। যেমন কেহ যদি একটি অনাথ-আশ্রম খোলেন বা বন্যা, ভূমিকম্প, দুর্ভিক্ষ বা আর্ত্তের সেবার জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান উন্মুক্ত করেন, সেই সকল প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা জগতের লোক তাঁহাদের দেহাত্মবুদ্ধির ধরাছোঁয়ার মধ্যে বুঝিয়া লইতে পারেন এবং যখন তাঁহারা দেখেন যে, চক্ষের সম্মুখে অপরে অধিকক্ষণ দুঃস্থাবস্থায় থাকিলে নিজের ভোগ ও সুখের প্রতিও একটা স্বাভাবিক বিতৃষ্ণা আসিয়া যায়, (যেমন নিজের বাড়ীতে রোগ-শোক-কাতর কেহ থাকিলে স্বভাবতঃই নিজের ভোগলালসাও সেরূপ ইন্ধন পায় না) ব্যষ্টি বা সমষ্টিভাবে ভোগের পথে কণ্টক উপস্থিত হয়, তখন ভোগের কণ্টক সরাইবার জন্য অপরকে দুঃস্থাবস্থায় রাখিয়া কেবল নিজে ভোগ করিলে প্রতিষ্ঠার লাঘব হইতেছে দেখিয়া ও উহাও

ভোগের আর এক জাতীয় ব্যাঘাতকারক অনুভব করিয়া যে সকল প্রতিষ্ঠান ভোগি-সমাজের প্রতিভূ হইয়া সাময়িক লোকোপকার করেন, জগতের বিষয়ি-সম্প্রদায় নিজেদের প্রচ্ছন্ন ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির উদ্দেশ্যে স্বভাবতঃই সেই সকল প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তিকে নানাভাবে সাহায্য করিয়া থাকেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, শ্রীগৌড়ীয়মঠে পার্থিব রোগীর হাসপাতাল নাই, বন্যা-দুর্ভিক্ষনিবারণী সমিতিও নাই, বিধবা-আশ্রম, অনাথাশ্রম বা আতুরালয় প্রভৃতিও নাই, সেরূপ ক্ষেত্রে কেবলমাত্র পরমেশ্বরের সেবা—যাহা প্রত্যক্ষ দেখা যায় না, ধরা যায় না, তাহার জন্য লোকে কেনই বা একমুষ্টি চাউল, এমন কি অন্ধ-কপর্দ্দকটিও দিবেন? বিশেষতঃ যে রাজ্যে পরমার্থের দোহাই দিয়া অনেক কিছু চলিয়াছে, যে যুগে পরমার্থ উপজীবিকার সুলভ ও অমোঘ অস্ত্র হইয়া পড়িয়াছে, সে ক্ষেত্রে, সে যুগে, লোকের নিকট হইতে অহৈতুকী হরিসেবার জন্য একটি কপর্দ্দক ও সংগ্রহ করা কিরূপে সম্ভব? বিশেষতঃ প্রচলিত ধারণা অনুসারে যেখানে সাধুগণ অর্থকে স্পর্শ পর্য্যন্ত করেন না, যেখানে সাধুত্বের ধারণা নগ্নাবস্থা, বাতাহার ও অর্থ বিদ্বেষাদির মধ্যেই কেন্দ্রীভূত, সেরূপ ক্ষেত্রে পৃথিবীব্যাপী হরিনাম প্রচারের জন্য কোটি কোটি মুদ্রা আহরণ কি রূপে সম্ভব? ইহা অম্বরীষ, পৃথু বা পরীক্ষিতের যুগ নহে, কিংবা প্রতাপরুদ্র, মানসিংহ, ভঞ্জদেও বা বীরহাম্বীরের যুগও নহে যে, অর্থ বিষয়ে প্রচুর রাজ-সাহায্য সম্ভব হইবে। বিশেষতঃ শ্রীগৌড়ীয়মঠ জগতের সর্ব্বপ্রকার ইন্দ্রিয়-তোষণপর অন্যাভিলাষী ও মনোধর্ম্মী কর্ম্মী ও জ্ঞানী-সম্প্রদায়ের মতবাদের প্রতিবাদকারী বলিয়া পৃথিবী-পরিপ্লাবিত ঐরূপ লোকমাত্রেই ন্যূনাধিক অপ্রীতিভাজন। আচার্য্যের অকপট আনুগত্যকারী শ্রীগৌড়ীয়মঠ-সেবক ব্যক্তিগত উদরভরণের জন্য ভিক্ষার প্রার্থী নহেন বলিয়া প্রচলিত সাধারণ বা অসাধারণ কোন ভিখারীরই ন্যায় দাতার বহির্ম্মুখতার স্তাবক হইতে পারেন না। কাজেই এরূপ ক্ষেত্রে এই বিশ্ব-ব্যাপী- প্রচারের প্রধান রসদ-স্বরূপ অর্থের সংগ্রহ কিরূপে সাধিত হতে পারে? কিন্তু আচার্য্যের কৃপায় অসম্ভবও প্রত্যক্ষ বাস্তব সম্ভবে পরিণত হইয়াছে। আচার্য্যের বাণীতে শুনিয়াছি,—

প্রাণ আছে তা'র সে হেতু প্রচার,
প্রতিষ্ঠাশাহীন কৃষ্ণগাথা সব।

কোন গচ্ছিত ধন লইয়া গৌড়ীয়মঠের প্রচার-কার্য্য আরম্ভ হয় নাই, কাহাকেও তোষামোদ করিয়া গৌড়ীয় মঠ প্রচারকার্য্যে ব্রতী হন নাই। আচার্য্যের একমাত্র নিরপেক্ষ সত্যবাণীর অকপটে ও নির্ভীকভাবে কীর্ত্তন মূলেই শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রথম প্রচারের সূচনা হয়। সমগ্রভারত ও ভারতবহির্ভূত বিভিন্ন স্থানের মঠে বহু ব্যক্তি নিত্য হরিসেবা করিতেছেন, প্রতি বৎসর বিভিন্ন স্থানের উৎসবাদিতে লক্ষ লক্ষ লোক ভগবৎপ্রসাদ সম্মান করিতেছেন। সহস্র সহস্র গ্রন্থরাজি বিনামূল্যে বিতরিত হইতেছে ও হইয়াছে। সমগ্র ভারতে, দেশে-বিদেশে ভাগবত-প্রদর্শনী উন্মোচন, মঠস্থাপন, পরিক্রমা, পাশ্চাত্যদেশে প্রচারক প্রেরণ প্রভৃতি বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আনুকূল্যের অবলম্বন একমাত্র মাধুকরী ভিক্ষার ঝুলি। জড়-দার্শনিক চার্ব্বাক উপদেশ দিয়াছিলেন—"ঋণ করিয়াও ঘৃত ভক্ষণ করিবে," কেননা ঘৃতই পরমায়ু; আর শ্রীগৌড়ীয় মঠের

আচার্য্যের আজ্ঞা এই যে,—‘‘ঋণ (?) করিয়াও হরিকথা প্রচার করিবে। তাহা হইলে উত্তমর্ণগণ (?) তোমাদিগকে অধমর্ণ মনে করিয়া তাগাদায় ব্যতিব্যস্ত করিতে থাকিলে তোমরা নিরলস ও তৃণাদপি সুনীচ হইয়া হরিসেবার আনুকূল্য আহরণে অধিকতর উদ্বুদ্ধ হইতে পারিবে। মঠায়তন-সমূহ তাহা হইলে অলসগণের গ্রাম্যকথা, গ্রাম্যচিন্তা ও অসদাচারের স্থান না হইয়া অনুক্ষণ হরিসেবা ও হরিকীর্ত্তনমুখরিত নির্গুণ বৈকুণ্ঠ-নিকেতন রূপে সর্ব্বদা প্রকাশিত থাকিবে।

শুভেচ্ছা ও বাস্তবসেবা

আমরা পরমার্থ-মন্দিরের দ্বারের বহির্ভাগে অবস্থান এবং কেহ কেহ উক্ত মন্দিরে প্রবিষ্ট হইবার অভিমান ও অভিনয় করিয়াও ভগবদ্ ভজনে প্রকৃত প্রস্তাবে আত্মনিয়োগ করিবার পরিবর্ত্তে শুভেচ্ছা-মাত্রই পোষণ ও প্রকাশ করিয়া থাকি। যখন একান্ত পারমার্থিকগণ সর্ব্বতোভাবে আত্মসমর্পনপূর্ব্বক আমাদিগকে গুরুগৃহে বাস, গুরুসেবার অনুশীলন এবং আচারের সহিত হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তন করিবার উপদেশ প্রদান ও আদর্শ প্রদর্শন করেন, তখন হয়তো আমরা ঐ সকল উপদেশের সাময়িক উপযোগিতা সংসারের অনিত্যতার তিক্ত অভিজ্ঞতা হইতে হৃদয়ে অনুভব করিয়া হরিভজনে আত্মনিয়োগ করিবার শুভেচ্ছামাত্র পোষণ বা অপরের নিকট তাহা প্রকাশ করিয়া থাকি; কিন্তু যখন আমাদিগকে কার্য্যতঃ সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিতে হয়, কার্য্যতঃ গুরুসেবায় আত্মনিয়োগ করিতে হয়, যখন কার্য্যতঃ কৃষ্ণের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করিবার জন্য আমাদিগের নিকট অবকাশ উপস্থিত হয়, তখন আমরা পশ্চাৎপদ হইয়া পড়ি। এই শুভেচ্ছামাত্র পোষণ একান্ত ভগবদ্‌বিমুখতা হইতে কিয়ৎ পরিমাণে শুভব্যঞ্জক হইলেও ইহাও একটি হৃদয়-দৌর্ব্বল্য-জাত অনর্থ বিশেষ। কেবল শুভেচ্ছামাত্র পোষণ করিলেই আমি হরিভজনে অগ্রসর হইতে পারিব না, কেবল বাক্যের দ্বারা দৈন্য, কিম্বা ‘‘ভগবদ্ অনুশীলন করা কর্ত্তব্য, হরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবা—উত্তম বা সর্ব্বোৎকৃষ্ট কার্য্য” ইহা অনুমোদন মাত্র করিলেই হরিভজনের পথে অগ্রসর হওয়া যাইবে না; এমন কি, হয়তো হরিভজন আরম্ভই হইবে না।

শুভেচ্ছার লোক-মনোহারিণী যবনিকার অন্তরালে দুর্ব্বলতারূপ অনর্থকে গোপন করিয়া নিজেকে ভগবদ্ভজনপিপাসু বলিয়া জয়ডঙ্কা বাজাইবার যে প্রচ্ছন্ন প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষা, তাহা ভগবদ্‌ভজনের উন্নতির পথে পরম-অন্তরায়। অশুভেচ্ছা অপেক্ষা শুভেচ্ছা কতকটা ভাল বটে; কিন্তু শুভেচ্ছাই শেষসীমা হইলে ঐ শুভেচ্ছাটুকুও ক্রমে ম্লান ও বিলীন হইয়া যাইবে।

শুভেচ্ছাকে বাস্তবতায় পরিণত করিতে হইবে। পার্থিব রাজ্যেও দেখা যায় ধন বা বিদ্যা লাভ করা উচিত বা উৎকৃষ্ট সিদ্ধান্ত করিয়া কেহ যদি সেই ধন ও বিদ্যালাভের শুভেচ্ছাটুকুই মনে মনে পোষণ মাত্র করিয়াই নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকেন, বিদ্যা ও ধনাগমের বাস্তব-প্রণালী-সমূহের মধ্যে যদি কার্য্যতঃ আত্মনিক্ষেপ

না করেন, তাহা হইলে যেমন তাঁহার ধন বা বিদ্যা লাভ হয় না,—নিশ্চেষ্ট ক্ষুধার্ত্ত সিংহের মুখবিবরে যেরূপ মৃগ স্বেচ্ছায় প্রবিষ্ট হইয়া ক্ষুধার্ত্তের আর্ত্তি মোচন করে না, সেইরূপ হরিভজনের শুভেচ্ছামাত্র করিলেই হরিভজন হয় না। কেবলমাত্র শুভেচ্ছা করিয়া হরিভজনের উপযোগী সুদুর্লভ মানবজীবনকে কাটাইয়া দিলে নিত্যমঙ্গল লাভ হইবে না। শুভেচ্ছাকে কার্য্যে পরিণত করিতে হইবে, বাস্তবতায় আনিতে হইবে, সত্য সত্য আচারময় প্রচার করিতে হইবে।

অনেক সময় সাধকজীবনের অভিনয়কারী আমাদের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়, আমরা আচার্য্য বা গুরুপাদপদ্ম হইতে কেবল কথা শ্রবণ করিয়াই যাইতেছি, হরিকথা শুনিবার সময় বাহ্য দৃষ্টিতে উৎকর্ণও থাকিতেছি, বৎসরের পর বৎসর চলিয়া যাইতেছে, হৃদয়ের মধ্যে কোন স্পন্দন নাই, যেন নিশ্চল, নিথর হিমাচলবৎ। অর্থাৎ যাহা শুনিয়াছি ও শুনিলাম, তাহা আমাদের আচারে, আমাদের বাস্তবজীবনে প্রতিফলিত করিবার জন্য হৃদয়ের অন্তস্থল হইতে স্বাভাবিকী বেগময়ী—অনুপ্রেরণা নাই—চেতনের দ্বার যেন রুদ্ধ, স্তব্ধ, প্রাণহীন, মৃতবৎ! জাগতিক কার্য্যের জন্য হয়ত' আকাশ পাতাল আলোড়ন করিতে পারি, অদম্য ও অপ্রতিহত উৎসাহের সহিত কার্য্য-সমাধার জন্য সমগ্র দেহ, মন, আত্মাকে ডালি দিতে পারি; কিন্তু হরিসেবার সহস্র কথা শুনিয়া, সহস্র প্ররোচনা লাভ করিয়াও চেতনের কোন স্পন্দনই নাই, কেবল যেন চেতনকে আরও অধিক দিন গভীরতর নিদ্রায় নিদ্রিত রাখিবার জন্য আর গুরুবর্গের নিকট হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য কেবলমাত্র শুভেচ্ছার রক্ষা-কবচটি সময় সময় বাহির করিয়া বলি, 'হরিভজনে আমার আন্তরিক অনুমোদন আছে, হরিভজন—ভাল, ইহা শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্যের মধ্যে পরিগণিত ইহা আমি বুঝি।' ইহা মুখে বলি, কিন্তু কার্য্যতঃ হরিভজন করি না, আত্মনিক্ষেপ করিতে চাহি না, গোপ্তৃত্বে বরণ বা শরণাগতির কথাগুলি মৌখিক স্বীকার করিয়াও কার্য্যক্ষেত্রে তাহা করিতে পারি না, সেবাই যে প্রকৃতপ্রস্তাবে ভগবৎকৃপা, এই কথা বুঝিয়াও বুঝি না।

অনেক সময় শুভেচ্ছা পরোপদেশে পাণ্ডিত্যমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়া আমার ব্যক্তিগত মঙ্গলরবিকে রাহুগ্রস্ত করিয়া ফেলে। শুভেচ্ছার যে অস্ত্রগুলি অপরের উপর প্রয়োগ করি, নিজেই সেই অস্ত্র হইতে গা' বাঁচাইয়া চলিবার কৌশল শিক্ষা করি। কাজেই যাঁহারা কেবল শুভেচ্ছায় সন্তুষ্ট হইয়া রহিয়াছেন, তাঁহাদের নিত্যমঙ্গলের ভাগ্যাকাশ কুজ্ঝটিকা-পূর্ব। যদিও তাঁহাদের ভাগ্যাকাশে এককালে প্রাথমিক অরুণোদয় লক্ষিত হইয়াছিল, তথাপি অরুণোদয়ের পরে আর যখন বাস্তব সেবা-সূর্য্য-রশ্মি ক্রমে ক্রমে তাঁহাদের ভাগ্যাকাশকে উদ্ভাসিত করিল না, তখন তাঁহাদের সমগ্র দিনটিই অর্থাৎ সমগ্র জীবনটিই ব্যর্থ হইয়া গেল। আবার সেই ব্যর্থ দিনের পরে হয়ত' রাত্রি বা অমানিশার ঘোর অন্ধকার তাঁহাদের শুভেচ্ছাকে চিরসমাহিত করিয়া ফেলিতে পারে, শুভেচ্ছার স্থানে বিদ্বেষের বহ্নিই তাঁহাদের অধিক আদরের বস্তু হইতে পারে। যাঁহারা সাময়িক উচ্ছ্বাস ও ভাবপ্রবণতায় উত্তেজিত হইয়া হরিসেবার প্রতি শুভেচ্ছামাত্র প্রকাশ করেন, তাঁহাদের জীবনে এইরূপ বহু সাক্ষ্য পাওয়া গিয়াছে। হয়ত' কেহ শুভেচ্ছায় অনুপ্রাণিত হইয়া দুই চারি দিন আনুষ্ঠানিক

সদাচার যেমন মৎস্য-মাংসাদি পরিত্যাগ, কণ্ঠে তুলসী মালিকা, অঙ্গে তিলকাদি ধারণ কিম্বা হরিভজনের কর্ত্তব্যতা স্বীকার করিলেন, কিন্তু কিছুদিন পরেই আবার তাঁহাদের সাময়িকী শুভেচ্ছা ম্লান হইয়া তাঁহাদিগকেই 'পুনর্মুষিকোভব'-মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া ফেলিল; শুধু পুনর্মুষিক হইয়াই নিষ্কৃতি হইল না, তাহার প্রতিক্রিয়ারূপে শুভেচ্ছা বিদ্বেষে পরিণত হইল! মৎস-মাংসাদি অমেধ্য গ্রহণ ও নানাপ্রকার অসদাচার, অসৎসঙ্গ আরও অধিকতর উত্তেজনার সহিত প্রবলভাবে স্বীকার করিবার জন্য তাঁহারা কোমর বাঁধিয়া লাগিলেন। পরমার্থ ও পারমার্থিকগণের চিরশত্রুতা করাই তাঁহাদের জীবনের একমাত্র ব্রত হইয়া পড়িল—শুভেচ্ছা বাস্তববিদ্বেষে পর্য্যবসিত হইল। তাই সাধক কেবলমাত্র শুভেচ্ছার তটস্থধর্ম্মে বিরাজিত থাকিবার চেষ্টা করিলে অনেক সময় হয়তো তাঁহাকে কৃষ্ণবহির্ম্মুখতার কালাপানিতেই টানিয়া আনে, সেবা-রসামৃত-সাগরের দিকে—অপ্রাকৃত প্রগতির দিকে তাঁহার অভিযান খুব কমই হয়। অতএব শুভেচ্ছাকে বাস্তবসেবায় পরিণত করা সাধক মাত্রেরই কর্ত্তব্য।

শুভেচ্ছা—দুর্ব্বলতা, আর সেবা—সবলতা। শুভেচ্ছা—স্বপ্ন, আর সেবা—সিদ্ধি। শুভেচ্ছা অনেক সময়ই— কল্পনা, আর সেবা—বাস্তব বস্তু। শুভেচ্ছা—অনেক সময়ই ভাবের ঘরে চুরি করিয়া আত্মবঞ্চনা ও লোকবঞ্চনা করিতে চেষ্টা করে, আর বাস্তব সেবা ঐ সকল কপটতা ধরাইয়া দিয়া নিত্য মঙ্গলের পথে অভিসার করাইয়া থাকে। শুভেচ্ছা—হৃদয়-দৌর্ব্বল্যরূপ অনর্থের সৃষ্ট একটি কৌশলমাত্র, আর বাস্তব হরিসেবার একটি পরমাণুও নিজ মঙ্গলের পথে অগ্রসর হইবার শ্রেষ্ট কৌশল বা উপাদান। শুভেচ্ছা—জাড্য বা আলস্যেরই একটি মোহিনীমূর্ত্তি, আর বাস্তব সেবার অতি ক্ষুদ্র পরিমাণও চেতনতা বিকাশের প্রশস্ত পথ।

অনেক সময় শুভেচ্ছার পক্ষসমর্থনকারী প্রচ্ছন্ন হৃদয়দুর্ব্বলতাগ্রস্ত ব্যক্তিগণ যুক্তি দিয়া বলেন,—"অনেকে হরি-সেবার উদ্দেশ্যে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়াও অন্যাভিলাষী হইয়া পড়েন, কেহ কেহ বা কিছুকাল বাস্তবসেবাক্ষেত্রে সর্ব্বতোভাবে আত্মনিয়োগ করিবার অভিনয় দেখাইয়া পরে সেই অভিনয় অকালেই উপসংহার করিয়া ফেলেন অর্থাৎ সেবা পরিত্যাগ করেন, এই ভয়েই আমরা বাস্তব সেবায় আত্মনিয়োগ অপেক্ষা শুভেচ্ছাকেই অধিকতর শ্লাঘ্য মনে করি। সেবা করিতে গিয়া বা সেবাক্ষেত্রে নামিয়া সেবার প্রতি বীতরাগ হওয়া অপেক্ষা শুভেচ্ছা পোষণ করিয়া সেবার প্রতি শ্রদ্ধাযুক্ত থাকা কি অধিকতর প্রশংসনীয় নহে?"

শুভেচ্ছাবাদিগণের এই যুক্তি ভ্রান্তি-মূলক। যাহারা নদীর পারে দাঁড়াইয়া কেবল সন্তরণের কর্ত্তব্যতা ও প্রয়োজনীয়তার প্রশংসা ও তদ্বিষয়ে শুভেচ্ছামাত্র পোষণ করিতেছে, আর যাহারা নদীতে নামিয়া সাঁতার শিখিবার চেষ্টা করিতেছে এবং সাঁতার শিখিবার কালে দুই একবার নাকেমুখে জল পান করিয়াও ফেলিতেছে কিম্বা সাঁতারের ক্লেশ অনুভব করিয়া তৎপ্রতি সময় সময় নিরুৎসাহের ভাবও দেখাইতেছে,—এই উভয় শ্রেণীর মধ্যে সন্তরণ-শিক্ষার দিকে কে অগ্রসর হইয়াছে? যে হৃদয়ে শুভেচ্ছামাত্র পোষণ করিয়া নিশ্চেষ্ট

হইয়া বসিয়া আছে সেই ব্যক্তি, না যে সন্তরণবিৎ গুরুর আশ্রয়ে সত্য সত্যই সাঁতার দিতে আরম্ভ করিয়াছে সেই ব্যক্তি? যে ব্যক্তি সাঁতার দিতে আরম্ভ করিয়াছে, অচিরেই তাহার সাঁতার শিখিবার ক্লেশ বিদূরিত হইবে এবং সে সাঁতার শিখিয়াও ফেলিবে। আর যে ব্যক্তি কেবলশুভেচ্ছামাত্র পোষণ করিতেছে, তাহার সন্তরণ শিক্ষা কেবল দূরে পড়িয়া যাইতেছে। হয়ত' কালে তাহার ঐ শুভেচ্ছাটুকুও একেবারে বিলীন হইয়া যাইবে এবং সাঁতার শিক্ষা তাহার পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব ব্যাপার মনে করিয়া তৎপ্রতি তাহার বীতস্পৃহাও আসিয়া যাইতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ হরিসেবা প্রাকৃত বিদ্যা বা দক্ষতালাভের ন্যায় ক্লেশকরব্যাপার নহে। যাহারা হরিসেবায় প্রবিষ্ট না হইয়া অন্যাভিলাষেই প্রবিষ্ট হইয়াছে, তাহাদের নিকটই হরিসেবার কার্য্য ক্লেশকর ও কঠোর বলিয়া মনে হয় এবং তাহারাই হরিসেবার দ্বার হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া অধিকতর অন্যাভিলাষে মত্ত হইয়া পড়ে। বস্তুতঃ যাঁহারা প্রকৃত হরিসেবারসামৃতবিন্দুর একটি কণারও আস্বাদন পাইয়াছেন, তাঁহারা কখনই তাহা পরিত্যাগ করিতে পারেন না। আর যদি সর্ব্বতোভাবে হরিসেবা করিতে উদ্যত হইয়া কেহ অসিদ্ধাবস্থায় ভজন হইতে কোন প্রকারে ভ্রষ্ট হন, এমন কি তাঁহার দেহত্যাগ পর্য্যন্ত হয়, তথাপি ঐ শুভেচ্ছামাত্র পোষণকারিব্যক্তি অপেক্ষা তিনি কোটিগুণেই শ্রেষ্ঠ। তিনি যতটুকু বাস্তব হরিভজনের পথে চলিয়াছিলেন, যতটুকু অগ্রসর হইয়াছিলেন, বিধিমহেন্দ্রাদি কেহই তাঁহার সে অগ্রসরকে চিরতরে বিনষ্ট করিতে পারে না; যদিও সাময়িকভাবে তাহা সুপ্ত বা লুপ্ত থাকে, একদিন না একদিন সেই সুপ্তবৃত্তিও পুনরায় উদ্বুদ্ধ হইয়া পড়িবে, তাহা অধিক দিন চাপা থাকিতে পারিবে না। এইজন্যই শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীনারদ বলিতেছেন,—

ত্যক্ত্বা স্বধর্ম্মং চরণাম্বুজং হরের্ভজন্নপক্কোঽথ পতেত্ততো যদি।

যত্র ক্ব বাভদ্রমভূদমুষ্য কিং কো বার্থ আপ্তো ভজতাং স্বধর্ম্মতঃ।।

(ভাঃ ১।৫।১৭)

অর্থাৎ বর্ণাশ্রমধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া শ্রীহরির পাদপদ্ম সেবা করিতে করিতে অপক্ব অবস্থায় যদি কোন কালে কেহ তাহা হইতে পতিত হয়, তাহা হইলে তাহাতেই বা কি অমঙ্গল হইবে? অর্থাৎ তাহাতে কোন ক্ষতি হয় না পরন্তু ভগবদ্ভজন-রহিত স্বধর্ম্মনিরত ব্যক্তির মঙ্গলের উদ্দেশ্যে কোনই বাস্তব প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না; অতএব একেবারে হরিভজনে বিমুখ থাকা অপেক্ষা হরিভজন করিতে করিতে অকস্মাৎ ভ্রষ্ট হইয়া যাওয়া বরং ভাল। তবে যদি কেহ প্রথম হইতেই পতিত হইবার আদর্শকেই বরণ করে, তাহার প্রথমেই ভক্তিদেবীর চরণে অপরাধ হওয়ায় সেই ব্যক্তি আর হরিভজনের পথই অবলম্বন করিতে পারে না। সেই ব্যক্তিকে ভক্তিপথের পথিকই বলা হইবে না সে ব্যক্তি অপরাধী প্রাকৃত সহজিয়া বলিয়াই গণ্য হইবে। আকস্মিক পতন ও সংকল্প করিয়া পতিত অবস্থাকেই 'ভজন' বলিয়া চালাইবার চেষ্টা দুইটি পৃথক্ ব্যাপার।

কেবলমাত্র শুভেচ্ছা পোষণ যেমন একটি অনর্থ, পতিত হইয়া বা পাতিত্য সংরক্ষণ ও পোষণ করিয়া ভজনের ছলনাও তেমনই অপরাধের ফল। প্রাকৃতসহজিয়াসম্প্রদায় এই দুইটিই বিশেষভাবে দেখিতে পাওয়া

যায়। তাহারা যেমন শুভেচ্ছার আবরণে হরিভজন হইতে দূরে থাকে, তেমনি পাতিত্যকেই হরিভজন বলিয়া চালাইবার চেষ্টা করায় হরিভজনের দ্বারে চির অপরাধী হইয়া থাকে। সাধক এই দুইটি অনর্থ হইতেই সাবধান থাকিবেন। একটি দুর্ব্বলতা, আর একটি বিশেষ অপরাধ। এই দুর্ব্বলতাই কিছুদিন পরে অপরাধের সহিত সখিত্ব পাতাইয়া থাকে। অতএব হৃদয়ে কেবল শুভেচ্ছা পোষণ মুখে এবং কৃপার দোহাই ও দৈন্যের আবরণে নিজ অসমর্থতা অক্ষমতা জ্ঞাপন করিয়া বাস্তব সেবাময়ী ভগবৎকৃপা বরণ করিতে পশ্চাৎপদ হইলে আমরা সাধক জীবন হইতেও ভ্রষ্ট হইয়া বিষয়ী, ভোগী, বিদ্বেষী, অপরাধী ও প্রাকৃতসহজিয়া হইয়া পড়িব। সাধু সাবধান!

গৃহী ও ত্যাগী

যাঁহারা হরিসেবার মূল উদ্দেশ্যে একনিষ্ঠ নহেন, তাঁহারাই 'গৃহী' ও 'ত্যাগী' এই দুইপ্রকার উপাধিযুক্ত অবস্থার বাদানুবাদে সময় নষ্ট করিয়া থাকেন। হরিসেবা হইতে ভ্রষ্ট হইলেই 'গৃহী বড়, না ত্যাগী বড়'— এইরূপ ঔপাধিক বিতর্ক মানবের হৃদয় অধিকার করে। যিনি যে দলের লোক, যিনি যে উপাধিতে আচ্ছন্ন, তিনি সেই দল ও সেই উপাধিকেই 'শ্রেষ্ঠ' বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চাহেন এবং ঐরূপ ঔপাধিক গোঁড়ামি হইতে নানা প্রকার মনোমালিন্য, বিচ্ছেদ, হিংসা-দ্বেষ ও ক্রমে অনেক কিছু বিস্তৃত হইয়া পড়ে।

অন্যাভিলাষি-কর্ম্মি-জ্ঞানি-যোগি-ব্রতি-তপস্বী প্রভৃতি সম্প্রদায়ে ঐরূপ বিবাদ স্বাভাবিক। এ বিষয়ে ইতিহাসে নানাপ্রকার গল্পও শুনিতে পাওয়া যায়। কোন কোন নির্ব্বিশেষবাদী ধর্ম্ম প্রচারকের গৃহী ও ত্যাগী শিষ্যের মধ্যে এইরূপ 'গৃহী বড় না ত্যাগী বড়' বিবাদ অবলম্বন করিয়া রক্তারক্তি পর্য্যন্ত হইয়া গিয়াছে। এমন কতকগুলি সত্য ঘটনা এসম্বন্ধে প্রসিদ্ধ আছে, যাহা হয়ত কাগজে কলমে প্রকাশিত হইলে আধুনিক কালেও ঐসকলকে কেহ কেহ মানহানিকর সংবাদ বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিতে পারেন। এজন্য আমরা ব্যক্তিগত নামোল্লেখে বিরত থাকিলাম।

ফল্গুত্যাগি-সম্প্রদায় ও ভোগি-গৃহি-সম্প্রদায় ত্যাগী ও গৃহীর যে চিত্র তাঁহাদের ধারণার ফলকে অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা হইতে হরিভজন-পরায়ণ গৃহস্থ ও নিষ্কিঞ্চন হরিসেবক সন্ন্যাসীর স্বরূপ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। শুনা যায়, বহির্ম্মুখ গণগড্ডলিকা পূজিত কোন এক ব্যক্তি বলিয়াছেন, "যেমন রশুনের বাটী শতবার ধুইলেও উহার গন্ধ দূর হয় না, সেইরূপ যে ব্যক্তি একবার সমাবর্ত্তন করিয়া স্ত্রীর সহিত বৈধভাবেও বাস করিয়াছেন, তিনিও যতই সাধু হউন না কেন, তাঁহার সেই সমাবর্ত্তনের দুর্গন্ধটি কোন দিনই তাঁহাকে পরিত্যাগ করে না। সেই উপদেশক আরও বলিয়াছেন, সন্ন্যাসী অর্থাৎ যিনি কোন দিন সমাবর্ত্তন করেন নাই তিনি, যেন নৈকষ্য কুলীনের ন্যায় অপতিত ও নিষ্কলঙ্ক। যেমন খই ভাজিবার সময় যে-সকল খই খোলা হইতে বাহিরে ছটকাইয়া পড়ে, সেগুলি নিষ্কলঙ্ক হয়, আর যেগুলি খোলায় থাকিয়া যায়, সেগুলিতে একটু না

একটু দাগ ধরিয়াই থাকে, সেইরূপ গৃহী যতই সচ্চরিত্র ও ভক্তিপরায়ণ হউন না কেন, তাহাতে একটু না একটু সংসার-তাপের 'লাল্‌চে' দাগ লাগিবেই, কিন্তু সন্ন্যাসীতে কোন দাগ নাই।"

কেহ কেহ সর্ব্বতোমুখী (?) অসাম্প্রদায়িকতার (?) দোহাই-দেওয়া প্রচারের মধ্যে ঐ সকল উক্তিকে সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক বলিয়া লক্ষ্য করিয়া থাকেন। যাঁহারা আত্মার নিত্যত্ব স্বীকার করেন না, দেহ ও মনই ভগবদ্ভজনের (?) যন্ত্রস্বরূপ বলিয়া কল্পনা করেন, তাঁহাদের মধ্যেই এইরূপ ঔপাধিক বিচার স্থান পায়। বস্তুতঃ আত্মা ঐরূপ ভোগী গৃহীও নহেন বা ভোগপ্রতিযোগী ত্যাগীও নহেন। কৃষ্ণানুশীলনকারী আত্মা গৃহী ও ত্যাগীর যে কোন পোষাকেই থাকিতে পারেন। আত্মার বিকাশের তারতম্য লইয়াই অধিকারের উচ্চাবচবিচার শাস্ত্রকারগণ নির্ণয় করিয়াছেন। পোষাকের তারতম্য লইয়া স্বরূপের ছোট বড় নির্ণীত হয় না। এজন্য শ্রীচৈতন্যদেব জানাইয়াছেন, গৃহী ও ত্যাগীর কোন পোষাকই কৃষ্ণভজনকারীর স্বরূপ নহে।

নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো
নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতির্নো বনস্থো যতির্বা।
কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিলপরমানন্দপূর্ণামৃতাব্ধে-
র্গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাস-দাসানুদাসঃ।।

ভগবদ্‌বহির্ম্মুখতার চিন্তাস্রোত যেন পরমার্থ-মন্দিরের দ্বারের সম্মুখীন হইতে না পারে, তদ্বিষয়ে আমাদের সতর্ক থাকিতে হইবে। কনক-কামিনী ও প্রতিষ্ঠা-কামনা হইতে অসৎসম্প্রদায়ে যে গৃহী ও ত্যাগীর দল সৃষ্ট হয়, সেরূপ দলাদলি যেন পারমার্থিক মন্দিরের ত্রিসীমায় উপস্থিত না হয়। তথাকথিত গৃহী মনে করেন, —"আমি নিজ বাহুবলে অর্থের প্রভু, কামিনীর প্রভু ও প্রতিষ্ঠার প্রভু হইয়াছি। সন্ন্যাসী আমার দ্বারের ভিখারী—আমার মুখাপেক্ষী, আমি তাহার বা তাহাদের পালক বা ভরণ-পোষণকারী! আমি বা আমাদের সমধর্ম্মিগণ পৃথিবীতে না থাকিলে সন্ন্যাসীর জীবিকা নির্ব্বাহই হইত না! আমি বা আমরাই তাহাদিগকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছি! আমাদের অর্থে মানুষ হইয়া তাহারা আমাদের অপেক্ষাও অধিক প্রতিষ্ঠা পাইবে, ইহা আমরা সহ্য করিতে পারিব না! আমাদের নুন খাইয়া তাহারা আমাদেরই গুণ গাহিবার পরিবর্ত্তে আমাদিগকে 'স্ত্রীপুত্রাদিতে আসক্ত গৃহব্রত' বলিবে, ইহা আমরা কিছুতেই সহ্য করিব না।!"

যখন প্রকৃতিদ্বারা পরিচালিত হইয়া আমরা অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা হই এবং আমাদিগকে প্রকৃতির প্রভু অভিমান করি, তখন সেইরূপ একদল ব্যক্তি সম-জাতীয় বহির্ম্মুখ সমবেদনায় ব্যথিত হইয়া এক একটি পৃথক্ গণ্ডি সৃষ্টি করিয়া ফেলি; তখনই অবস্থানুসারে হয় গৃহীর দল না হয় ত্যাগীর দলের অন্তর্ভুক্ত হই ও একদলের অন্তর্ভুক্ত হইয়া আর এক দলকে নিন্দা করি।

ঐরূপ অন্যাভিলাষের দ্বারা অভিভূত তথাকথিত ত্যাগীও তখন গৃহীর দলের প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া মনে করেন, "আমরা স্ত্রী-পুত্র-সংসার ত্যাগ করিয়াছি, আর গৃহিগণ সংসার-নরকে লুব্ধ হইয়া রহিয়াছে। আমরা

মধুমক্ষিকা, আর গৃহিগণ বিষ্ঠার কৃমি। আমরা তাহাদের মঙ্গলকামী উপদেষ্টা, সুতরাং আমাদের সম্মান সর্ব্বতোভাবে অধিক।" যখন এইরূপ পৃথক্ দুইটি দল সৃষ্টি হইয়া পড়ে, তখন উভয়েই শাস্ত্রের দোহাই দিয়া নিজ নিজ দলকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া সমর্থন করিবার চেষ্টা করেন। গৃহীর দল বলেন, আমরা অন্যান্য তিন আশ্রমকে পালন করি বলিয়া আমরাই শ্রেষ্ঠ, ত্যাগীর দল বলেন, সন্ন্যাস-আশ্রমকে ভগবান্ নিজের মস্তকের সহিত তুলনা করিয়াছেন, সুতরাং তাহাই সর্ব্বশীর্ষ আশ্রম।

এখানে আবার আর এক শ্রেণীর ব্যক্তি উপস্থিত হইয়া এই দুই দলের বিবাদকে আরও অধিকতর জটিল করিয়া দেন। তাঁহারা বলেন, "আজ কালকার গৃহীও যেমন, ত্যাগীও তেমন। গৃহী বরং ভাল, ত্যাগী গৃহী অপেক্ষা অধিকতর গুপ্ত পাপী। গৃহী—স্পষ্টভোগী, আর ত্যাগী—প্রচ্ছন্ন ভোগী। গৃহী বরং বৈধ স্ত্রী গ্রহণ করিয়া পুণ্য কার্য্য করেন, ত্যাগী গোপনে ব্যভিচার করিয়া পশু অপেক্ষা অত্যন্ত হীন ও কপটতাপূর্ণ পাপ করিয়া থাকেন। এইরূপ যুক্তি দিয়া একশ্রেণীর ব্যক্তি গৃহী ও ত্যাগীর দলের মুখরতাকে স্তব্ধ করাইবার চেষ্টা করেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে বিদ্বেষ লুক্কায়িত অগ্নির ন্যায় অন্তরে অন্তরে বৃদ্ধি পাইতেই থাকে।

অকৈতব পরমার্থ-শিক্ষার আচার্য্য এই সকল ঔপাধিক বিবাদ-বিতর্ক ও যুক্তির কোনটিরই অনুমোদন করেন না। যে মহাজন, শ্রীচৈতন্যের সর্ব্বতোমুখিনী সুশিক্ষার প্রচারক, তিনি বলেন,—

মহাপ্রভুর ভক্তগণের বৈরাগ্য প্রধান।
যাহা দেখি তুষ্ট হন গৌর ভগবান্।।

গৌরাশ্রিত গৃহস্থভক্তগণ ঐকান্তিক ভক্তগণের বিচার অনুশীলন করিলেই মঙ্গল লাভ করিতে পারেন। গৃহস্থগণের উহাতে অসন্তুষ্ট হইবার কোন কারণ নাই। প্রতিষ্ঠাকামনা বা নিজমঙ্গলের প্রতি বিমুখতা থাকিলেই অসন্তোষের ধূমায়িতবহ্নি হৃদয়কে দগ্ধ করে। গৃহব্রতগণের মঙ্গল সাধন কিছু ঐকান্তিক ভক্তগণের অকর্ত্তব্য নহে। **কৃষ্ণসেবা ও গৃহপতিত্ব—এই দুইটি বৃত্তি বিপরীত দিকে অবস্থিত। প্রাকৃত-সহজিয়াগণের সহিত শ্রীচৈতন্যের পদাঙ্কানুসরণকারী মঙ্গলকামী ব্যক্তিগণের পার্থক্য এই যে, তাঁহারা গৃহব্রতগণকে তাহাদের গৃহাসক্তিতে উৎসাহিত করেন না**। যে-সকল ত্যাগী নামধারী ব্যক্তি গৃহব্রতগণকে গৃহাসক্তিতে উৎসাহিত করিতে পারেন, সেই সকল ছদ্মবেশী ত্যাগীর সাধুত্বের কোন প্রতিবাদ হয় না ! বরং ঐরূপ ত্যাগীকে অন্নবস্ত্রের দ্বারা বাঁচাইয়া রাখিতে পারিলে গৃহব্রতগণ গৃহাসক্তিতে অধিকতর মশগুল্ থাকিতে পারেন। 'গৃহাসক্তি' বলিতে মহাজনগণ কৃষ্ণ ও কৃষ্ণসেবকের সেবায় বঞ্চিতাবস্থাকেই লক্ষ্য করিয়া থাকেন।

অনেকে নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নিম্নলিখিত কএকটি বাণীর তাৎপর্য্য ধরিতে পারেন না। আমরা আচার্য্যের পাদপদ্ম হইতে যতটুকু শ্রবণের সুযোগ পাইয়াছি, তদ্দ্বারা ঠাকুর ভক্তিবিনোদের একান্ত সত্যবাণীর তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করিব। আচার্য্যের পাদপদ্ম আমাদের অনবধানজনিত ভ্রম সংশোধিত করিবেন, এই আশায়ই আমরা এই সকল কথা আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁহার 'জৈবধৰ্ম্ম' গ্রন্থের সপ্তম অধ্যায়ে লিখিয়াছেন,—

১। "কলিকালে জীবের পক্ষে গৃহস্থবৈষ্ণব হওয়াই উচিত। পতনের আশঙ্কা নাই। ভক্তির সমৃদ্ধিও সম্পূর্ণরূপে হইতে পারে। গৃহস্থ বৈষ্ণবের মধ্যে অনেক তত্ত্বজ্ঞ গুরু আছেন।

২। গৃহস্থভক্তগণের মধ্যেই কেহ কেহ গৃহত্যাগী বৈষ্ণব হইবার অধিকারী হন। জগতে তাঁহাদের সংখা স্বল্প এবং তাঁহাদের সঙ্গ বিরল।

৩। জৈবধৰ্ম্মের সপ্তদশ অধ্যায়ে ব্রজনাথ বৃদ্ধবাবাজী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—'বৈষ্ণবজন' বলিলে কি 'গৃহত্যাগী' বৈষ্ণবকে বুঝিতে হইবে? বাবাজী মহাশয় সিদ্ধান্ত বা উত্তরে বলিতেছেন,—শুদ্ধ কৃষ্ণভক্তই বৈষ্ণব, গৃহস্থই হউন বা গৃহত্যাগীই হউন, ব্রাহ্মণই হউন বা চণ্ডালই হউন, ধনীমানীই হউন বা দরিদ্রই হউন, তাঁহার যে পরিমাণে কৃষ্ণভক্তি আছে, সেই পরিমাণে তিনি কৃষ্ণভক্ত।

৪। বৃদ্ধ বাবাজী মহাশয় পুনরায় জৈবধৰ্ম্মের দ্বাবিংশ অধ্যায়ে বলিতেছেন,—যে পৰ্য্যন্ত গৃহত্যাগের অধিকার না হয়, সে পৰ্য্যন্ত মানবগণ গৃহস্থ হইয়া কৃষ্ণসেবা করিবে। মহাপ্রভু প্রথম চব্বিশ বৎসর যে লীলা করিয়াছেন, তাহাই গৃহস্থ বৈষ্ণবের আদর্শ এবং শেষ চব্বিশ বৎসর যে লীলা করিয়াছেন, তাহাই গৃহত্যাগী-বৈষ্ণবের আদর্শ। এরূপ মনে করিও না যে, গৃহস্থাশ্রম-অবস্থায় কৃষ্ণপ্রেমের পরাকাষ্ঠা লাভ হইতে পারে না—মহাপ্রভুর অধিকাংশ কৃপাপাত্রই গৃহস্থ, সেই গৃহস্থদিগের চরণধূলি গৃহত্যাগী বৈষ্ণবগণও প্রার্থনা করেন।

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ঐ সকল বাণী শ্রবণ করিয়া অনেকে গৃহব্রত ধৰ্ম্মের পাকা খাতায় চিরদাসখত লিখাইবার জন্য উদ্যত হইয়া থাকেন। যখন ভোগের মধ্যে থাকিয়াও সিদ্ধির পরাকাষ্ঠা (?) লাভ হয়, তখন 'এদিক্ ওদিক্ দুদিক্ রাখিয়া দুধের বাটী খাইবা'র প্রযত্ন কোন্ সুচতুর ব্যক্তি পরিত্যাগ করিবেন? এই জাতীয় মনোভাব হইতেই মনোধৰ্ম্মী ও ভোগলুব্ধ সম্প্রদায়ে ভোগের মধ্য দিয়া ত্যাগ বা ভোগের সহিত মিশ্রিত করিয়া পরমার্থ অনুসন্ধানের ছলনারূপ প্রাকৃত সাহজিক মতবাদ অনাদিকাল হইতে জগতে প্রবাহিত রহিয়াছে। বস্তুতঃ ভোগবুদ্ধির দর্পণে শাস্ত্র ও মহাজনবাক্যকে বিকৃতভাবে প্রতিফলিত করিলেই ঐরূপ বিচার উপস্থিত হয়। এই বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিবার জন্য আমাদের আচাৰ্য্যদেব **'গৃহব্রত'** ও **'গৃহস্থ'** এই দুইটি পরিভাষার বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করিয়াছেন। কিছুদিন পূৰ্ব্বে "গৌড়ীয়ে" **'বৈষ্ণব-গৃহস্থ'** ও **'গৃহস্থ-বৈষ্ণব'**-শীর্ষক প্রবন্ধে এ সকল কথা আলোচিত হইয়াছিল। **যাঁহারা প্রকৃত গৃহস্থ, তাঁহারা গৃহব্রত নহেন—তাঁহারা কৃষ্ণব্রত। আর যাঁহারা প্রকৃত সন্ন্যাসী, তাঁহারা কৃষ্ণ ও কার্ষ্ণসেবা ত্যাগী নহেন—তাঁহারা কৃষ্ণ** সংসারের সংসারী বা কৃষ্ণ ও কার্ষ্ণ-গৃহব্রত। **বৈষ্ণব গৃহস্থ ও বৈষ্ণব সন্ন্যাসীতে স্বরূপতঃ কোন ভেদ নাই।**

গৃহব্রত সৰ্ব্বদাই পতিত এবং অনুক্ষণ পতনের পিচ্ছিল প্রপাতের মুখে বৰ্ত্তমান, সুতরাং সেইরূপ অবস্থায় পতনের আশঙ্কা নাই, ইহা ভক্তিবিনোদ প্রভুর উপদেশ নহে। ইহা পরের বাক্যের দ্বারাই সমর্থিত

হইয়াছে। গৃহস্থ ভক্তগণই গৃহত্যাগী বৈষ্ণব হইবার অধিকারী হন। **শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষায় কৌপীন বরণ ও মাধুকরী ব্রতে অন্তরকে দীক্ষিত করাই ভজনের আকাঙ্ক্ষা।** একদিন না একদিন সকলকেই এই ভজন বরণ করিতেই হইবে। এই কৌপীন ফল্গুত্যাগী মায়াবাদীর "কৌপীনবন্তঃ খলুভাগ্যবন্তঃ"—বাক্যের উদ্দিষ্ট কৌপীন নহে, বা মাধুকরী ভিক্ষা 'পেটভিখারী'র উদরবেগোত্থ অভাব-বোধের তাড়নাও নহে। **গৌড়ীয়ের কৌপীন গ্রহণ—শ্রীস্বরূপরূপের কৈঙ্কর্য্য, তাহা গোপীর আনুগত্য বা স্বরূপানুভূতি অর্থাৎ ভোক্তা বা পুরুষ অভিমান পরিত্যাগ-পূর্ব্বক গোপীর কিঙ্করী অভিমান, আর মাধুকরী—বিপ্রলম্ভ বা ভজনের সর্ব্বোত্তম অবস্থায় অবস্থিত হইয়া কৃষ্ণানুসন্ধান, তাহা উদরবেগের ভোগ্য সামগ্রীর অনুসন্ধান নহে।**

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ গৃহস্থ ও গৃহত্যাগী উভয়কেই শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদর্শ অনুসরণ করিবার উপদেশ দিয়াছেন। ইহা দ্বারা ঠাকুর জানাইয়াছেন যে, গৃহস্থগণ মহাপ্রভুর আদর্শ অনুসরণ করিয়া (অনুকরণ করিয়া নহে) সাময়িক গার্হস্থ্য জীবন যাপন করিলেও সর্ব্বতোভাবে নিষ্কিঞ্চন হইবার জন্য মহাপ্রভুর অন্ত্যলীলারই অনুসরণ করিবেন। মহাপ্রভু চিরকাল গৃহে থাকিবার জন্যই উপদেশ দেন নাই; বা স্বয়ং সেই আদর্শও প্রদর্শন করেন নাই। রায় রামানন্দ মহাপ্রভুর নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ হইলেও তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত অনুক্ষণ অবস্থানের জন্য বিষয়ত্যাগলীলার আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। যাঁহারা সমাবর্ত্তন করেন নাই, মহাপ্রভু তাঁহাদিগকে বিবাহ করিবার জন্য প্ররোচিত করেন নাই। এজন্য তিনি শ্রীল রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী প্রভুকে দার পরিগ্রহ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন, আর পারমার্থিক জীবনের নবীন প্রভাতে যে বহির্ম্মুখ মানবের প্রতিষ্ঠাশা-জনিত ফল্গুত্যাগের পিপাসা জাগ্রত হয়, তাহা প্রতিরোধ করিবার আদর্শ স্থাপন করিবার জন্য তিনি নিজ নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুকে 'ফল্গুবৈরাগ্য না কর লোক দেখাইয়া। যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হৈয়া।।"—প্রভৃতি উপদেশ-প্রদানের কিছুদিন পরেই শ্রীল রঘুনাথকে সর্ব্বতোভাবে গৃহত্যাগ-লীলার অভিনয়কারী ও অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের চরম আদর্শরূপে প্রকট করিয়াছিলেন।

গৃহস্থাশ্রমে পতনের আশঙ্কা নাই মনে করিয়া গৃহমেধ-যজ্ঞের পূর্ণাহুতি হইয়া যাওয়া পারমার্থিকের আদর্শ নহে বা গৃহে থাকিয়া কৃষ্ণের সংসার করিতেছি, কৃষ্ণের দাসদাসী সৃষ্টি (?) করিতেছি, এরূপ ছলনা করিয়া প্রাকৃত সহজিয়ার ন্যায় ভাবের ঘরে চুরি করিলেও কোনদিনই আত্মমঙ্গল হইবে না। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরই বা তাঁহার নিজের জীবনে কি আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন? নিত্যসিদ্ধ গৌরজন হইয়াও তাঁহার অন্ত্যলীলায় তিনি কৌপীন-গ্রহণের আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ইহা দ্বারাও তাঁহার অন্তর্নিহিত অভিপ্রায় ও বাণীর তাৎপর্য্যের ইঙ্গিত পাওয়া যাইতে পারে।

প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায় গৃহব্রত থাকিয়া ত্যাগিসম্প্রদায়ের দ্বারা আপনাদিগকে পূজা করাইয়া লইবার উচ্চ আশা পোষণ করেন। ত্যাগিগণের দ্বারা যদি গৃহব্রতসম্প্রদায় তাঁহাদের স্ব স্ব পূজা, বন্দনা, চরণার্চ্চন প্রভৃতি সেবা করাইয়া লইতে পারেন, তবে তাঁহারা তাঁহাদের গৃহব্রত ধর্ম্মকে আরও উচ্চতার শিখরে স্থাপন করিবার সুযোগ পান। এজন্য ঐরূপ গৃহব্রতগণের এক শ্রেণী পরমহংস বেষী অর্থাৎ কৌপীনাদি বেষ-গ্রহণকারী

(বাবাজী নামধারী সম্প্রদায়-দ্বারা) অনেক সময় ভৃত্যের যাবতীয় কার্য্য যথা—বাহকের কার্য্য, তামাক পান সাজাইবার কার্য্য, জল সংগ্রহ, তৈলমর্দ্দনাদি কার্য্য, এমন কি স্ত্রী পুত্র পরিবারের কার্য্যাদিও করাইয়া লন। তথাকথিত পরমহংসবেষিগণ (আধুনিককালের কৌপীনধারী বাবাজী নামে পরিচিত কোন কোন ব্যক্তি) ঐ সকল গৃহব্রতকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করেন, প্রত্যুত্তরে গৃহব্রতগণ আশীর্ব্বাদাদি করিয়া থাকেন। কখনও বা খুব দয়া করিয়া ভদ্রতা-ব্যঞ্জক প্রতি নমস্কারটুকুমাত্র দিয়া থাকেন। সাধু সাবধান। আমাদের গৃহব্রত-ধর্ম্মকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সনন্দের মধ্যে সসম্মানে স্থাপনের জন্য যে ঐরূপ কৌশল অবলম্বন না করি। আর ত্যাগীর অভিমান করিয়াও যেন আমাদিগকে গৃহব্রত সম্প্রদায়ের প্রতিযোগী করিয়া না তুলি!

বৈষ্ণবজন গৃহস্থ বা গৃহত্যাগী উভয় পোষাকেই থাকিতে পারেন, এই কথা জানাইয়াও ঠাকুর ভক্তিবিনোদ গৃহব্রত বা ফল্গুত্যাগব্রতের শিক্ষা দেন নাই। তিনি জানাইয়াছেন, যাঁহারা যে পরিমাণে শুদ্ধকৃষ্ণভক্তি আছে, তিনি সেই পরিমাণে কৃষ্ণভক্ত। এখানে **'শুদ্ধকৃষ্ণভক্তি'** কথাটি বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য। শুদ্ধকৃষ্ণভক্তি নাই, অথচ গৃহী বা ত্যাগীর দল বাঁধিয়া বৈষ্ণবের অযাচিত প্রাপ্য সম্মান আদায় করিবার পিপাসা সম্পূর্ণ অবৈষ্ণবতারই লক্ষণ, ইহা ঠাকুর ভক্তিবিনোদ—

"আমি ত' বৈষ্ণব এ বুদ্ধি হইলে
'অমানী' না হ'ব আমি।
প্রতিষ্ঠাশা আসি হৃদয় দূষিবে
হইব নিরয়-গামী।।"

প্রভৃতি উক্তির মধ্যে কীর্ত্তন করিয়াছেন।

যেমন এক শ্রেণীর কর্ম্মজড়স্মার্ত্ত 'বৈষ্ণবেজাতিবুদ্ধি'র বিচার কিছুতেই পরিত্যাগ করিতে পারে না, তদ্রূপ যদি আমরা বৈষ্ণবকে 'গৃহী' বা 'ত্যাগী' জাতির (?) মধ্যে ফেলিয়া তাঁহাদের বিচার করি, তাহা হইলেও আমরা আমাদিগকে কর্ম্মজড়ের দ্বিতীয় প্রকার সংস্করণরূপে প্রতিপন্ন করিব। এ জন্যই ঠাকুর মহাশয় স্বয়ং নিষ্কিঞ্চন ও আকুমার ব্রহ্মচারীর লীলাভিনয় করিয়াও গাহিয়াছেন,—

"গৃহে বা বনেতে থাকে, হা গৌরাঙ্গ ব'লে ডাকে,
নরোত্তম মাগে তার সঙ্গ।।"

যিনি 'হা গৌরাঙ্গ' বলিয়া ডাকেন অর্থাৎ অকপটে সর্ব্বতোভাবে নির্ম্মল অনাবৃত আত্মার দ্বারা ভগবন্নাম অনুশীলন করেন, সেইরূপ গৃহস্থ ও বনস্থ ব্যক্তিতে কোন ভেদ নাই। সেইরূপ গৃহস্থকে 'স্ত্রীসঙ্গী' বিচার করিলে ঠাকুর মহাশয় স্ত্রীসঙ্গীর সঙ্গ-স্পৃহা করিতেন না। আবার 'গৃহ' ও 'বন' উভয়ই হরিভজনকারীর পক্ষে সমান—এইরূপ বিচারের ছলনা লইয়া গৃহের প্রতি অধিকতর পক্ষপাতী অর্থাৎ কার্য্যতঃ **গৃহাসক্তির প্রতিই পক্ষপাতী হইয়া উহাকে বৈষ্ণবতার ছদ্মবেশে সাজাইবার জন্য যে চেষ্টা**, তাহাও ভাবের ঘরে চুরি মাত্র।

কতকগুলি লোক সন্ন্যাসীর ছিদ্রানুসন্ধান ও কোন কোন স্বকর্ম্মফলভুক্ ব্যক্তির সন্ন্যাসাশ্রম হইতে ভ্রষ্ট হইবার নজিরসমূহ সংগ্রহ করিয়া 'বনিয়াদী গৃহব্রত' থাকাই নিরাপদ মনে করেন। ইহা অত্যন্ত বহির্ম্মুখতা ও জড়াসক্তির লক্ষণ মাত্র—যেমন একশ্রেণীর নাস্তিক হরিভজনে নানাপ্রকার অগ্নিপরীক্ষা ও 'হাঙ্গামা' আছে দেখিয়া আহার-বিহার ও নাস্তিকতায় রত থাকাই সমীচীন বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন! তথাকথিত ব্রাহ্ম-মতবাদে স্ত্রীপুত্রগৃহাসক্তিরূপে নৈতিকতা লঙ্ঘনের বিচার দেখ ইহা গৃহস্থাশ্রম-ত্যাগের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত ও দেখাইয়া গৃহস্থাশ্রম-ত্যাগের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত ও লক্ষিত হয় না। এমন কি, ঐ মতবাদিগণ মনে করেন,—মহাপ্রভু সংসার-ত্যাগের লীলা প্রদর্শন করায় ভার্য্যা-সেবা-নীতি হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছিলেন! জড়ে অত্যন্ত আসক্তি ও ভগবৎসেবায় আর্ত্তির অভাব হইলেই নীতির প্রচ্ছদ-পটের অন্তরালে ভোগ বা আরামপ্রিয়তার ঐরূপ আদর্শ বিরাজিত থাকে। আমরা একান্ত পারমার্থিক মহাজনের বাণী শ্রবণের অভিনয় করিয়াও যদি সন্ন্যাসীর ছিদ্র অনুসন্ধান করিতে করিতে 'একান্ত নিষ্কিঞ্চন হইয়া সর্ব্বতোভাবে শ্রীগুরুপাদপদ্মের মনোঽভীষ্ট প্রচারের চরম আদর্শ'কে খর্ব্ব করিবার চেষ্টা করি অর্থাৎ যখন ত্যাগধর্ম্মের প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া কোন কোন স্বকর্ম্মফলভুক্ ব্যক্তি ত্যাগ ধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছেন, ছোট হরিদাস, কালা কৃষ্ণদাসের আদর্শে যখন ত্যাগ-ধর্ম্মের বিপর্য্যয়ভাব লক্ষিত হয়, ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর তাঁহার পূর্ব্বজীবনে কৌপীন গ্রহণ করিবার পরও যখন ইতরাদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া প্রাকৃতভাবাপন্ন হইয়াছিলেন, শাস্ত্রাদিতে এবং বাস্তব ক্ষেত্রেও যখন সন্ন্যাস বা সাময়িক বৈরাগ্য-ধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট বহুলোকের নিদর্শন পাওয়া যায়, তখন অধস্তন বংশের মধ্যে নিষ্কিঞ্চনতা বা কৃষ্ণপ্রীতে ভোগত্যাগের আদর্শে যাহাতে কেহই আকৃষ্ট না হয়, তজ্জন্য বংশে 'তালাক দিয়া যাওয়া সমীচীন মনে করি, এ জন্যই বোধ হয় শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন—

> ন তস্য তত্ত্বগ্রহণায় সাক্ষাদ্ বরীয়সীরপি বাচঃ সমাশন্।
> স্বপ্নে নিরুক্ত্যা গৃহমেধিসৌখ্যং ন যস্য হেয়ানুমিতং স্বয়ং স্যাৎ।।
>
> (ভাঃ ৫।১১।৩)

তাৎপর্য্য—স্বপ্নদৃষ্ট ভোগ্যবস্তু মিথ্যাত্ব যেমন স্বতঃই অনুভূত হয়, সেইরূপ গৃহমেধিসুখকে যাহার আপনা হইতেই তুচ্ছ বলিয়া বোধ না হয়, তাহার পক্ষে যথাযথ তত্ত্ব জ্ঞানোদয়ের জন্য সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বেদবাক্যসকলও যথেষ্ট নহে। অর্থাৎ যে ব্যক্তি গৃহমেধী থাকিবে স্থির করিয়া রাখিয়াছে, তাহার কর্ণে কখনও নিষ্কিঞ্চন ভগবদ্ ভজনের কথা প্রবেশ করিবে না। সেই ব্যক্তি প্রকৃত সন্ন্যাস-ধর্ম্মের চরণে অপরাধ করিয়া অধিকতর গৃহব্রত ধর্ম্মেই আসক্ত হইবে এবং ইহা তাহার উপযুক্ত পুরস্কারও বটে।

ভাগবত-ধর্ম্মে গৃহে থাকিয়া হরিভজন করিবার উপদেশ কিরূপভাবে আছে, তাহাও আমরা শুনিতে পাই; (ভাঃ ৫।১।১৮)—

> যঃ ষট্ সপত্নান্ বিজিগীষমাণো গহেষু নির্ব্বিশ্য যতেত পূর্ব্বম্।
> অত্যেতি দুর্গাশ্রিত ঊর্জ্জিতারীন্ ক্ষীণেষু কামং বিচরেদ্বিপশ্চিৎ।।

তাৎপর্য্য—যিনি শত্রুতুল্য মন ও পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়—এই ষড়্‌রিপুকে জয় করিতে ইচ্ছা করেন, প্রথমতঃ তাঁহার গৃহাশ্রমে থাকিয়াই তদ্বিষয়ে যত্ন করা কর্ত্তব্য। শত্রুবর্গ নির্জ্জিত হইলে যেরূপ তৎপশ্চাৎ দুর্গে বা তদ্ব্যতীত অন্য যে কোন স্থানে ইচ্ছামত বিচরণ করা যায়, সেইরূপ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি ষড়্‌রিপু জয় করিয়া তৎপশ্চাৎ গৃহে বা বনে যে কোন স্থানে ইচ্ছানুসারে বিচরণ করিতে পারেন। কারণ পুরুষ প্রথমে দুর্গ আশ্রয় করিয়াই প্রবল বিপক্ষ সমূহকে জয় করিয়া থাকেন।

গৃহ ষড়্ রিপুর সহিত যুদ্ধ করিবার দুর্গস্বরূপ বটে; কিন্তু গৃহকে যদি দুর্গ করিতে না পারিয়া উহাকে গৃহ-শত্রুর আগার করিয়া ফেলি, তাহা হইলে উহা বহিঃশত্রুর সহিত যুদ্ধ করিবার স্থান হওয়া দূরে থাকুক, যুদ্ধে অগ্রসর হইবার পূর্ব্বেই ঐস্থানে গৃহশত্রুর দ্বারা আমরাই বিজিত হইব। গৃহকে শতকরা প্রায় শতস্থানেই আমরা ভোগের আগার করিয়া ফেলিয়াছি। একান্ত অকপট কৃষ্ণ-সেবাব্রত উদ্‌যাপনের জন্য, ষড়্‌রিপুর সহিত সংগ্রামে জয়ী হইয়া ভগবৎসেবায় উহাদিগকে নিযুক্ত করিবার বুদ্ধি লইয়া কয়জন আমরা গৃহস্থ হইয়াছি? প্রথমমুখে মৌখিকতার কিম্বা কল্পনায় ঐরূপ চিত্র বা বুদ্ধি কাহারও কাহারও হৃদয়ে থাকিলেও সংসারের চক্রে পড়িয়া কয়জন সেই উদ্দেশ্যকে অটুট রাখিতে পারি?

এ জন্য শ্রীমদ্ভাগবত উপরি-উক্ত শ্লোকের অব্যবহতি পরেই প্রিয়ব্রতের গৃহাশ্রম-বাসের আদর্শ উল্লেখ করিয়া তাঁহাকে সম্বোধন করিয়াই লোক-শিক্ষা দিতেছেন—

ত্বন্ত্বজনাভাঙ্‌ঘ্রিসরোজকোশ-দুর্গাশ্রিতো নির্জ্জিতষট্‌সপত্নঃ।
ভুঙ্‌ক্ষ্ব হ ভোগান্ পুরুষাতিদিষ্টান্ বিমুক্তসঙ্গঃ প্রকৃতিং ভজস্ব।।

(ভাঃ ৫।১।১৯)

তাৎপর্য্য—হে প্রিয়ব্রত! তুমি শ্রীনারায়াণের পাদপদ্ম কোশদুর্গ আশ্রয় করিয়া ষড়্‌রিপুকে বিশেষভাবে জয় করিয়াছ, অতএব এখন গৃহাশ্রমে অবস্থান করিয়া ভগবৎ প্রদত্ত প্রচুর ভগবদ্ ভোগাবশেষের সেবা কর। পশ্চাৎ পুত্র-কলত্রাদির সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া বনে গমন পূর্ব্বক শ্রীহরির আরাধনা করিও।

গৃহস্থাশ্রমে 'যথাযোগ্য বিষয়ভুঞ্জ' বাক্য যথাযথ পালনের অধিকার-লাভ কোন্ সময়ে হয়, তাহা ভাগবত, ধর্ম্ম বলিয়া দিয়াছেন। যাঁহারা গৃহকে শ্রীনারায়ণের পাদপদ্ম-কোশদুর্গ অর্থাৎ হরিনিকেতন করিতে পারিয়াছেন, তাঁহারাই ষড়্‌রিপুকে জয় করিতে পারেন। তখনই গৃহাশ্রমে অবস্থান পূর্ব্বক যুক্তবৈরাগ্য যাজনের অধিকার হয়। প্রিয়ব্রতের ন্যায় বিজিতেন্দ্রিয় পরম ভাগবতকেও পশ্চাৎ পুত্রকলত্রাদির সঙ্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক বনে গমন করিয়া শ্রীহরি আরাধনার উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে।

শ্রীমদ্ভাগবতের ৭ম স্কন্ধে ১৪শ অধ্যায়ে শ্রীনারদ যুধিষ্ঠির মহারাজকে গৃহস্থধর্ম্মের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছেন। গৃহস্থ "বনিয়াদী গৃহব্রত" হইবার জন্যই শিক্ষা লাভ করিবেন না। গৃহ-দেহ-স্ত্রী-পুত্রাদিতে আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া হরিভজনময়ী নিষ্কিঞ্চনতালাভের শিক্ষার উত্তরোত্তর অনুপ্রাণিত হইবার জন্যই গৃহবাসের ব্যবস্থা। যেমন স্ত্রীসঙ্গ-স্পৃহা সঙ্কুচিত ও ক্রমে নির্ম্মূল করিবার জন্যই বিবাহিত জীবনে বৈধ স্ত্রীসঙ্গের ব্যবস্থা,

স্ত্রীসঙ্গে আসক্তি বর্দ্ধনের জন্য নহে, তদ্রূপ **গৃহাদিতে আসক্তি পরিত্যাগ করাইবার জন্যই হরিভজনের অনুকূল গৃহবাসের ব্যবস্থা—চিরকাল গৃহবাসের জন্য নহে।**

শৃণ্বন্ ভগবতোঽভীক্ষ্ণমবতার-কথামৃতম্।
শ্রদ্দধানো যথাকালমুপশান্তজনাবৃতঃ।।
সৎসঙ্গাচ্ছনকৈঃ সঙ্গমাত্মজায়াত্মজাদিষু।
বিমুঞ্চেন্মুচ্যমানেষু স্বয়ং স্বপ্নবদুত্থিতঃ।।

(ভাঃ ৭।১৪।৩-৪)

তাৎপর্য্য—গৃহস্থ ব্যক্তি কালে কালে প্রত্যহ ভগবদ্ভক্তগণে বেষ্টিত হইয়া সৎসঙ্গে শ্রদ্ধার অমৃতস্বরূপ ভগবানের অবতার-কথা শ্রবণ করিতে করিতে জাগরিত পুরুষের স্বপ্নবৎ স্বয়ং মুচ্যমান দেহ-স্ত্রী-পুত্রাদিতে ধীরে ধীরে সঙ্গ পরিত্যাগ করিবে।

যাবদ্ভ্রিয়েত জঠরং তাবৎ স্বত্বং হি দেহিনাম্।
অধিকং যোঽভিমন্যেত স স্তেনো দণ্ডমর্হতি।।

(ভাঃ ৭।১৪।৮)

তাৎপর্য্য—যে পরিমাণ অর্থাদির দ্বারা মাত্র ক্ষুধা নিবৃত্তি হয়, গৃহস্থব্যক্তির তদুপযোগী অর্থাদিতেই অধিকার। ইহা অপেক্ষা অধিক আকাঙ্ক্ষাকারী ব্যক্তি চোর অতএব দণ্ডার্হ।

অপ্যেকামাত্মনো দারাং নৃশাং স্বত্বগ্রহো যতঃ।।

(ভাঃ ৭।১৪।১১)

তাৎপর্য্য—গৃহস্থ ব্যক্তি মমতাস্পদ একমাত্র ভার্য্যাকে আত্মসেবায় উপেক্ষা করিয়াও অতিথি সেবায় নিযুক্ত করিবেন।

জহ্যাদ্যদর্থে স্বান প্রাণান্ হন্যাদ্বা পিতরং গুরুম্।
তস্যাং স্বত্বং স্ত্রিয়াং জহ্যাদ্যস্তেন হ্যজিতো জিতঃ।।

(ভাঃ ৭।১৪।১২)

তাৎপর্য্য—যাহার জন্য পুরুষ আপন প্রাণ পরিত্যাগ করে, পিতা ও গুরুকে হত্যা করে—যিনি সেই স্ত্রীর স্বত্ত্ব পরিত্যাগ করেন, তাঁহার দ্বারা অজিত ঈশ্বরও বিজিত হইয়া থাকে।

কৃমিবিড়্ভস্মনিষ্ঠান্তং ক্লেদং তুচ্ছং কলেবরম্।
ক্ব তদীয়রতির্ভার্য্যা ক্বায়মাত্মা নভশ্ছদিঃ।।

(ভাঃ ৭।১৪।১৩)

তাৎপর্য্য—কৃমি, বিষ্ঠা ও ভস্মে যাহার শেষ পরিণতি, সেই তুচ্ছ শরীর কোথায়? দেহের সহিত রতিমতী ভার্য্যাই বা কোথায়? আর স্বীয় মহিমাদ্বারা সর্ব্বব্যাপী আত্মাই বা কোথায়?

এই সকল বাক্যের দ্বারা দেবর্ষি নারদ কি গৃহস্থকে অধিকতর গৃহধর্ম্মে আসক্ত হইতে বলিয়াছেন, না গৃহধর্ম্মে আসক্তি পরিত্যাগ করিবার জন্যই গৃহবাসের যোগ্যতা জানাইয়াছেন?

অনেক সময় আমরা অন্তরে **অভিমানগর্ভ বাহ্য দৈন্যের ছলে নিজদিগকে 'গৃহমেধী' 'গৃহব্রত' প্রভৃতি বলিয়া বস্তুতঃ ও কার্য্যতঃ গৃহাসক্তিকেই অন্তরের অন্তস্তলে পূজ্যদেবতারূপে স্থাপন করিয়া থাকি। ঐরূপ বাহ্য দৈন্য ত্যাগিসম্প্রদায়ের প্রতি ক্রোধ বা হিংসা চরিতার্থ করিবার একটি প্রচ্ছন্ন অস্ত্র মাত্র।** ঐরূপ কপট দৈন্যের দ্বারা গৃহব্রত-ধর্ম্মে আসক্তিই বর্দ্ধিত হয়। উহার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া ভাগবতধর্ম্মে প্রবিষ্ট হওয়া যায় না। আবার যদি আমরা ত্যাগী অভিমান করিয়াও হরিভজন-পরায়ণ গৃহস্থমাত্রকেই 'গৃহব্রত' মনে করি বা হরিসেবাপর গৃহস্থ হইতেও আমরা অধিকতর হরিভজন করিতেছি বলিয়া 'ত্যাগী' অভিমানে আমাদের তুলনামূলক শ্রেষ্ঠতা নিজে নিজেই কল্পনা করি,—যে মুহূর্ত্তে আমাদের ঐরূপ বুদ্ধির উদয় হয়, আমরা নিজকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করায় বা নিজের সহিত সংযুক্ত করিয়া সন্ন্যাসী বা ত্যাগী সম্প্রদায়কে সমজাতীয়ত্বে স্থাপনপূর্ব্বক হরিভজন-পরায়ণ গৃহস্থসম্প্রদায় (?) অপেক্ষা হরিভজনপর সন্ন্যাসিসম্প্রদায় (?)কে প্রতিহিংসা ও প্রতিযোগিতাপূর্ণ শ্রেষ্ঠত্বের কক্ষায় প্রতিষ্ঠিত করিতে যাই, সেই মুহূর্ত্তেই প্রকৃত সন্ন্যাস-ধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট হয়। যে মুহূর্ত্তে 'নিজের শ্রেষ্ঠতা' জ্ঞানরূপ মাৎসর্য্য-ধর্ম্মের উদয় হয়, সে মুহূর্ত্তেই আমি ভাগবতধর্ম্মের ত্রিসীমানা হইতে দূরে সরিয়া পড়ি। ত্যাগিসম্প্রদায় (?) গৃহিসম্প্রদায়কে হীন চক্ষে (?) দেখিতেছেন বলিয়া গৃহিসম্প্রদায়ের গৃহস্থজাত্যভিমানে (?) যে বিদ্বেষপোষণের প্রতিধ্বনি ও তৎপ্রতিযোগিতা, তাহা কেবল জড়ে অধিকতর আসক্ত হইবার পিচ্ছিল পথমাত্র।

সাধু সাবধান! পরমার্থ-মন্দিরে ঔপাধিক দলাদলির স্থান নাই। অবৈষ্ণব-সুলভ বিচার ভগবদ্ভক্তের হৃদয়ের কোনস্থানে স্থান পায় না।

তাই শ্রীপ্রেমবিবর্ত্তকার বলিতেছেন—

"গৃহী হউক, ত্যাগী হউক, ভক্তে ভেদ নাই।
ভক্তে ভেদ হইলে কুম্ভীপাক নরকেতে যাই।।

* * * * *

গৃহস্থ বৈষ্ণব সদা নামাপরাধ রাখি দূরে।
আনুকূল্য লয়, প্রাতিকূল্য ত্যাগ করে।।
সংসারের গোত্র ত্যজি' কৃষ্ণ-গোত্র ভজে।
সেই নিত্য গোত্র তার, সেই বৈসে ব্রজে।।"

"শিখা-সূত্র ঘুচাইলেই সে কৃষ্ণ পাই।

শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবনও বলিতেছেন—

গৃহস্থ তোমার মতে বৈষ্ণব কি নাই?"

(চৈঃ ভাঃ মধ্য ২৬।১৭২)

"গৃহস্থ হইয়া ঘরে রহুক নিমাঞি।"

(চৈঃ ভাঃ আদি ৮।৯৪)

—প্রভৃতি বাক্য দেখিয়া অনেকেই আমরা গৃহস্থের নামানুকরণে গৃহব্রত বা গৃহমেধী হইতেই রুচিসম্পন্ন হইয়া থাকি। কারণ গৃহব্রত বা ত্যাগব্রত এই দুইটিই কৃষ্ণবহির্ম্মুখতা অর্থাৎ কৃষ্ণব্রতের পথ হইতে ভ্রষ্ট জীবের স্বভাবোত্থ নৈসর্গিক ধর্ম্ম। কিন্তু যাঁহার চিত্ত কৃষ্ণগৃহের সেবার প্রতি উন্মুখ, তাঁহার চরিত্র এইরূপ—

"গৃহে আইলেও গৃহ-ব্যভার না করে।

নিরবধি থাকে বিষ্ণু-গৃহের ভিতরে।।"

(চৈঃ ভাঃ আদি ৭।৬৯)

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজ বিবাহিত ব্যক্তিকে উপদেশ দিয়া বলিয়াছিলেন, —বেশ * * বাবু বিবাহ করিয়াছেন ত' ভালই, এখন তিনি প্রত্যহ নিজ হস্তে বিষ্ণুনৈবেদ্য রন্ধন করিয়া বিষ্ণুকে নিবেদনের পর সেই প্রসাদ সহধর্ম্মিণীকে সেবন করাইয়া 'বৈষ্ণব' বুদ্ধিতে সহধর্ম্মিণীর অবশেষ গ্রহণ করিবেন, তাঁহার প্রতি ভোগবুদ্ধির পরিবর্ত্তে ন্যূনাধিক সেবা গুরুবুদ্ধি করিবেন, তাহা হইলেই তাঁহার মঙ্গল হইবে। সমস্ত জগৎ—পৃথিবীর সমস্ত ধন, রত্ন, স্ত্রী, পুরুষ একমাত্র কৃষ্ণেরই ভোগের বস্তু। তিনি কৃষ্ণের বস্তু কৃষ্ণের সেবায় লাগাইয়া দিন, স্ত্রীকে নিজ সেবিকা না করিয়া কৃষ্ণের সেবিকা-বুদ্ধিতে সম্মান করুন।

অতএব 'গৃহস্থ' হওয়া সোজা নহে, বরং উহা সন্ন্যাস অপেক্ষাও অধিকতর দায়িত্বপূর্ণ ও বিঘ্নবহুল। মোট কথা আদর্শ গার্হস্থ্য ও আদর্শ সন্ন্যাসে কোন ভেদ নাই। আদর্শ গার্হস্থ্য ধর্ম্মই পারমহংস। জনকাদি, পৃথু-পরীক্ষিৎ আদি পরম ভাগবতগণ সেই আদর্শ গার্হস্থ্য বা পারমহংস্য ধর্ম্ম যাজনের উপমান-স্বরূপ। যদিও আদর্শের উচ্চতম পদবীতে সাধারণ জীব প্রথম হইতেই প্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারে না, তথাপি আদর্শকে খর্ব্ব করিয়া যে হিংসামূলক উচ্চাবচ বিচারের বিতর্ক, তাহা ভগবদ্‌ভজনের পরিপন্থী।

প্রাদেশিকতা ও হরিসেবা

হরিসেবার রাজ্যে অসংখ্য প্রকার কণ্টক ও ছলনা উপস্থিত হয়। প্রাদেশিকতা-বুদ্ধি তন্মধ্যে অন্যতম। পার্থিব সৎকার্য্যানুষ্ঠানে যেরূপ অনেকে প্রাদেশিকতা-বুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হইয়া থাকেন, হরিসেবানুষ্ঠান-কালেও অনেককে সেই বুদ্ধিতে আক্রান্ত দেখা যায়। বস্তুতঃ ঐরূপ বুদ্ধিতে আক্রান্ত দেখা যায়। বস্তুতঃ ঐরূপ বুদ্ধিতে আচ্ছন্ন হইলে প্রকৃত হরিসেবানুষ্ঠানের পথে বিঘ্ন উপস্থিত হয়। প্রাদেশিকতা-বুদ্ধিজাত চেষ্টাসমূহ কোন কোন সময় বাহ্যাকারে হরিসেবার ন্যায় দেখাইলেও তাহা ফলভোগপর কর্ম্মেরই অন্যতম।

যাঁহারা স্ব-স্ব দেশ বা প্রদেশাবদ্ধ বুদ্ধি লইয়া হরি সেবার কার্য্যে (?) উৎসাহ ও উদ্যম প্রদর্শন করেন, তাঁহারা বস্তুতঃ হরিগুরুবৈষ্ণবের প্রীতি বা সেবার অনুসন্ধিৎসু নহেন—ন্যূনাধিক আত্মেন্দ্রিয়তৃপ্তি বা নিজ-সুবিধাবাদেরই ভিক্ষুক। প্রাদেশিকতা বা স্বজাতীয়তা-বুদ্ধি কুকর্ম্মী বা সৎকর্ম্মি সম্প্রদায়ে 'স্বদেশ-প্রেম' ও 'স্বজাতিপ্রেম' বলিয়া বহুমানিত হয়; কিন্তু ঐরূপ পার্থিব প্রেম (?) অপার্থিব নির্ম্মল প্রেমভক্তির রাজ্যে অত্যন্ত হেয় 'কাম' বলিয়াই পরিগণিত ও নিন্দিত।

ভগবদ্ভক্তি-যাজনের অভিনয় করিতে আসিয়াও অনেকে অন্তরে প্রাদেশিকতা-বুদ্ধির দ্বারা এইরূপ পরিচালিত হন যে, পূর্ব্বাশ্রম বা পূর্ব্ব বহির্ম্মুখ জীবনের দেশ, সমাজ, জাতির লোক দেখিলেই যেন তাঁহাদের প্রতি অধিকতর দয়া পরবশ (?) হইয়া পড়েন! বহির্ম্মুখদেহ ও স্মৃতি-সম্পর্কিত দেশ বা সমাজের লোকের মঙ্গলচিন্তা (?) যেন অধিকতর প্রবল ও সহজভাবে তাঁহাদের হৃদয়ে আসন প্রতিষ্ঠিত করে। ঐ সকল লোকের নিকট স্বয়ং হরিকথা কীর্ত্তন বা তাঁহা দিগকে অধিকতর উল্লাস ও উৎসাহের সহিত অপরের দ্বারা হরিকথা শ্রবণ (?) করাইবার ও তাঁহাদিগকে সোৎসাহভরে আদর যত্ন অভ্যর্থনা পরিচর্য্যা প্রভৃতি সেবা করিবার জন্য তাঁহারা এতদূর ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়েন যে, অনেক সময় নিরপেক্ষ সাধুগণের কটাক্ষের ভয়ে বাহ্যে কিঞ্চিৎ সঙ্কুচিত থাকিলেও তাঁহাদের হৃদয়ের আবেগ বহু চেষ্টায়ও বহির্ম্মুখ স্বদেশ ও স্বজন-প্রীতিকে ঢাকিয়া রাখিতে পারে না। কারণ যাহা হৃদয় হইতে স্বাভাবিকভাবে উচ্ছলিত ও অনুপ্রেরিত হয়, তাহাকে বাহ্য সঙ্কোচের আবরণ কতক্ষণ আত্মগোপন করিয়া রাখিবে?

কেহ কেহ আবার স্বপ্রদেশস্থ বা সদেশস্থ লোক দেখিলেই সেই দলের দলভুক্ত হইয়া বা সেই দলের একজন প্রতিভু বা নেতৃরূপে আত্মপরিচয় প্রদান করিয়া হরি সেবানুষ্ঠান (?) যথা হরিসংকীর্ত্তন, শ্রীধাম-পরিক্রমা, শ্রীধামবাস, হরিকথা-শ্রবণাদি হরিসেবাকার্য্যে আনুকূল্যাদি করিবার অভিনয়ে উৎসাহিত হন। তাঁহারা সেই দলভুক্ত না হইয়া তত্তৎকার্য্যাদি করিতে সেরূপ উৎসাহিত বা আদৌ প্রবৃত্তই হইতে চাহেন না।

কেহ কেহ আবার মনে করেন, যদি তাঁহাদের স্বদেশে বা স্বপ্রদেশে ভগবন্নিকেতন বা মঠায়তন প্রভৃতি নির্ম্মিত হয়, তবেই তাঁহারা আনুকূল্য প্রদান বা সহানুভূতি প্রকাশ করিতে প্রস্তুত হইবেন। অপর প্রদেশে মঠমন্দিরাদি নির্ম্মাণ বা ভগবৎকথা-প্রচারে তাঁহাদের সহানুভূতি সঙ্কুচিত, অনেক সময় সম্পূর্ণ স্তব্ধ, এমন

কি বিদ্বেষ-ভাবাপন্ন হইয়া থাকে। লণ্ডনে বা জার্ম্মাণীতে মঠ-নির্ম্মাণ বা তথায় হরিকথা প্রচারের জন্য কোন কোন ভারতবাসী বা বঙ্গবাসী অর্থানুকূল্য করিতে প্রস্তুত নহেন, আবার হয়ত' পশ্চিমবঙ্গবাসী বা উত্তরবঙ্গবাসী পূর্ব্ববঙ্গে হরিকথা-প্রচার বা হরিনিকেতন নির্ম্মাণের জন্য অর্থানুকূল্য প্রদান কিংবা পূর্ব্ববঙ্গবাসী পশ্চিমবঙ্গ বা উত্তরবঙ্গে হরিকথা-প্রচারে সাহায্য করিতে ইচ্ছুক নহেন। এই প্রাদেশিকতা আরও সঙ্কীর্ণ আকার ধারণ করিলে হয়ত' ঢাকাবাসী শ্রীহট্টের প্রচারের জন্য অর্থানুকূল্য, কিংবা শ্রীহট্টবাসী যশোহর বা খুলনা প্রদেশে মঠাদি নির্ম্মাণের জন্য কোন প্রকার আনুকূল্য করিতে উৎসাহিত হন না।

কেহ কেহ আবার স্বপ্রদেশকেও আরও সঙ্কীর্ণতার গণ্ডিতে আবদ্ধ করিয়া বলেন যে, যদি আমাদের স্বগ্রামে হরিনিকেতন নির্ম্মিত না হয়, হরিকথা প্রচারিত না হয়, তাহা হইলে আমরা কোনও সহানুভূতি বা সাহায্য করিব না। এমন লোকও দেখিতে পাওয়া গিয়াছে, যাঁহারা হরিকথা-প্রচারের জন্য (?) পূর্ব্বে বিশেষ সোৎসাহ সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাঁহার যখন শুনিলেন যে, কোন হরিনিকেতন বা মঠায়তন তাঁহাদের পল্লী হইতে অর্দ্ধমাইল ব্যবধানে অন্য পল্লীতে অধিষ্ঠিত হইবে, তখন আর সেই সকল ব্যক্তির হরিনিকেতনের জন্য সহানুভূতি নাই! এইরূপ শ্রেণীর ব্যক্তি যুক্তি-দ্বারা বলিয়া থাকেন,—'আমাদের পল্লীতে যদি মঠায়তন থাকিত, তাহা হইলে আমাদের গৃহললনাগণ পদব্রজেই ঠাকুর দর্শনার্থ যাইতে পারিতেন। হরিগৃহ কিঞ্চিৎ দূরে নীত হইবার প্রস্তাব হওয়ায় গৃহলক্ষ্মীগণের সে সুযোগের অভাব অনুভব করিতেছি। কাজেই ঐরূপ মঠ-নির্ম্মাণের জন্য কোনও প্রকার আনুকূল্য বা সহানুভূতি আমরা প্রদর্শন করিতে পারি না।' ঐরূপ যুক্তিদ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয়, পূর্ব্বের যে উৎসাহ, অধ্যবসায়, তাহা অপ্রাকৃত কৃষ্ণ বা কৃষ্ণজনের প্রীতির জন্য নহে; উহা আত্মেন্দ্রিয়তর্পণের জন্য, ভোগ্য বা ভোগ্যাগণের সুখসুবিধার জন্য। হরিসেবার ছলনা কেবল বাহ্য প্রচ্ছদপট মাত্র, তাহার অন্তরালে হরি বা অপ্রাকৃত হরিজনগণের দ্বারা স্ব-স্ব পার্থিব সুখসুবিধা বা ধর্ম্মার্থকাম-মোক্ষাদির অভিসন্ধিকে চরিতার্থ করাইয়া লইবার চেষ্টা।

সদ্‌গুরুপাদপদ্মের সমীপে উপস্থিত হইবার অভিনেতা কোন কোন ব্যক্তির মধ্যেও ঐসকল চিত্র অনেক সময় দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহাদের কেহ কেহ স্বপ্রদেশস্থ অর্থ অপরপ্রদেশস্থ মঠমন্দিরাদির সেবায় নিযুক্ত করিবার প্রতিপক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া পরম নৈতিক নিরপেক্ষতা প্রদর্শন করিয়া থাকেন। অপরপ্রদেশে হরিকথা-প্রচারেও তাঁহাদের সহানুভূতি নাই, এমন কি, অপরপ্রদেশ যদি হরিকথায় অধিকতর আকৃষ্ট হয়, বা তথায় অধিক প্রবলভাবে হরিকথা প্রচারিত হয়, তাহা হইলে কেহ কেহ যেন অন্তরে ম্লান হইয়া পড়েন! এইরূপ চিত্তবৃত্তি বিশ্লেষণ করিবার প্রয়োজনীয়তা এই যে, ঐরূপ চিত্তবৃত্তিতে হরিসেবার আগ্রহ অপেক্ষা স্বভোগানুসন্ধিৎসাই প্রবলা। একান্ত মঙ্গলকামী ঐরূপ চিত্তবৃত্তিকে পরিহার করিবার জন্য নিরন্তর হরিগুরু-বৈষ্ণবের কৃপা প্রার্থনা করিবেন, নিরন্তর নিষ্কপটে গুরুবৈষ্ণবের নিকট একান্ত ক্রন্দন করিতে করিতে যাহাতে নিরুপাধিকা অহৈতুকী কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণলালসায় চেতনের বৃত্তি জাগরিত হয়, তজ্জন্য প্রার্থনা জানাইবেন প্রাদেশিকতা-বুদ্ধি হরিসেবা নহে, স্বদেশপ্রীতি বা স্বজাতি প্রীতি পার্থিব কর্ম্মরাজ্যে নীতির চরম শিখরে

স্থাপিত হইলেও বা পৃথিবীর বহির্ম্মুখ জনমতের দ্বারা বহুমানিত হইলেও তাহা হরিপ্রীতির বিরুদ্ধ ব্যাপার। হরিপ্রীতির একান্ত অভাব ও দেহগেহ-প্রীতি বা আসক্তি হইতেই ঐ সকল অন্তরায় বহির্ম্মুখ অন্যাভিলাষী বা সাধকগণের হৃদয় অধিকার করে।

প্রাদেশিকতা—জীবে দয়া নহে। 'জীবে দয়া' দেশ-কাল-জাতি-পাত্র—সর্ব্বনিরপেক্ষ। জীবে দয়ার নিজ সুবিধার অনুসন্ধান নাই—নিজ দেহগেহ দেশ সমাজাদি পার্থিব বস্তুর প্রতি আসক্তি নাই। একমাত্র কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণে যাঁহার চেতনের বৃত্তি দীক্ষিত হইয়াছে, তিনিই জীবে দয়ায় অনুপ্রাণিত হন। দেহগেহারামতা বা গৃহব্রতা বুদ্ধিই উদারতার ছদ্মবেশে-সাজিয়া প্রাদেশিকতার মোহিনী মূর্ত্তিতে জগতের রঙ্গমঞ্চে উপস্থিত হয়। তাহা আবার সময় সময় পরমার্থের নামাবলি পরিয়া, সর্ব্বাঙ্গে ধর্ম্মের ছাপ মারিয়া সাধারণ লোকের চক্ষে চটক লাগাইয়া থাকে; কিন্তু পরমার্থবিদ্‌গণ সেই কপটতা ও ছলনা ধরিয়া ফেলেন। সাধকগণ ইহাতে সাবধান হইবেন।

আবার প্রাদেশিকতার প্রতি ক্রোধান্বিত হইয়া ব্যতিরেকভাবে তৎপ্রতিই আসক্ত হইয়া পড়াও সাধক জীবনের দ্বিতীয় প্রকার বিপদ্। কোনও বিশেষ প্রদেশ—নিজেরই হউক আর পরেরই হউক, তৎপ্রতি জাতক্রোধী হওয়াও হরিভজন-চতুরের কর্ত্তব্য নহে। উপাধিক বিচার পরিত্যাগ করিয়া—নিজের ভাবের ঘরে চুরি না করিয়া—কোনও প্রকার আত্মবঞ্চনা বা পরবঞ্চনাতে অভিভূত না হইয়া নিরুপাধিকা চেতনবৃত্তিতে হরিসেবায় উৎসাহিত হইতে হইবে, সকল প্রদেশেই শ্রীগুরুপাদপদ্মের বাণীর আরতি করিতে হইবে, সর্ব্বত্রই শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নাম প্রচার করিতে হইবে, প্রাণ, অর্থ, বিদ্যা, বুদ্ধি, বাক্য, সর্ব্বস্ব অহৈতুকভাবে সকলদেশ-কালপাত্রের হরিসেবার সাহায্যের জন্য উৎসর্গ করিতে হইবে। বঙ্গবাসীর অর্থে (?) কামস্কাট্‌কায় যদি হরিকথা প্রচারিত হয়, হরিনিকেতন নির্ম্মিত হয়, তাদ্দ্বারা হরিরই সেবা হইবে, আর কামস্কাট্‌কাবাসীর অর্থে যদি বঙ্গের কোন পল্লীতে হরিসেবকগণের হরিভজনস্থল নির্ম্মিত বা বঙ্গভাষায় শ্রীমদ্ভাগবতের অনুবাদ প্রচারিত হয়, তদ্দ্বারা শ্রীহরিই বিস্তৃত হইবেন, তাঁহারাই ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি হইবে, এই বুদ্ধি-প্রণোদিত হইয়া আমাদিগকে হরিসেবা করিতে হইবে। অর্থের মূল মালিক পূর্ব্ববঙ্গবাসীও নহেন, পশ্চিমবঙ্গবাসীও নহেন, কিংবা কামস্কাট্‌কাবাসীও নহেন, ভারবাসীও নহেন; অর্থের মূলমালিক পার্থিব রাজাও নহেন, প্রজাও নহেন। তত্তদ্ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ের ব্যক্তি বিশেষের নিকট নির্দ্দিষ্ট অর্থ গচ্ছিত রহিয়াছে মাত্র। সকল অর্থ, সকল বিদ্যা, সকল প্রাণের একচ্ছত্র মালিক—শ্রীহরি। তাঁহার সন্ধান এই পার্থিব জগতে একমাত্র অপ্রাকৃত শব্দরূপেই পাই। শ্রীঅর্চ্চা ও অপ্রাকৃত শব্দই এই জগতে তাঁহার অবতার। সেই শ্রীহরিনামের সেবা যাহাতে হয়, শ্রীহরিনাম প্রভুর যাহাতে যাহাতে প্রীতি হয়—দেশ-বিদেশে সর্ব্বত্র যাহাতে শ্রীচৈতন্যনাম বিস্তৃত হয়, সেরূপ কার্য্যেই সকল দেশের, সকল প্রদেশের, সকল জাতির অর্থ, বিদ্যা, বুদ্ধি, প্রাণ নিয়োগ করিতে হইবে। তাহাতে প্রাদেশিকতার যবনিকা টানিয়া হরিসেবাময় দর্শনকে, 'ঈশাবাস্য' জগৎ দর্শনকে প্রতিহত করিতে হইবে না। সাধু সাবধান!

প্রাদেশিকতা-বুদ্ধি-প্রণোদিত হইয়া অনেকে নিজদেশ, নিজজাতি ও নিজের দৈহিক বংশগত ধর্ম্ম ব্যতীত পারমার্থিক নিত্যধর্ম্মের বার্ত্তাও শ্রবণ করিতে প্রস্তুত নহেন। যাঁহারা ঐরূপ বুদ্ধি-প্রণোদিত, তাঁহারা একান্ত অকৈতব আত্মধর্ম্মের কথা শ্রবণের অভিনয় করিয়াও কর্ণে সেই সকল কথা গ্রহণ এবং হৃদয়ে সেই সকল কথা নিরপেক্ষভাবে বিচার করিতে পারেন না। ঐরূপ বুদ্ধি হইতেই লৌকিক ও কৌলিক ধর্ম্মে নিষ্ঠার নামে গোঁড়ামি, স্বজাতীয় বা স্বদেশীয় ধর্ম্মে প্রীতির নামে আত্মমঙ্গলের প্রতি ঔদাসীন্যের পরিচয় পাওয়া যায়। 'আমাদের বংশের ধর্ম্ম শাক্তধর্ম্ম বা আমাদের সমাজ বা জাতির ধর্ম্ম শৈব-ধর্ম্ম, আমাদের প্রদেশের ধর্ম্ম বৌদ্ধধর্ম্ম বা নানাপ্রকার মনোধর্ম্ম, কিংবা আমাদের পূর্ব্বপুরুষ পঞ্চোপাসনার অন্তর্গত তথাকথিত বৈষ্ণব ধর্ম্ম বা প্রাকৃতসহজিয়াধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন, সুতরাং 'তাতস্য কূপঃ' এই ন্যায়ানুসারে আমরাও সেইরূপ মনোধর্ম্মেরই অনুসরণ করিয়া বংশ, জাতি, সমাজ বা দেশের প্রতি শ্রদ্ধাতর্পণ বিধান করিব,—এইরূপ বিচার প্রকৃত সত্যানুসন্ধিৎসু বা আত্মমঙ্গলকামীর বিচার নহে। ইউরোপে খৃষ্টধর্ম্মের প্রচার আছে, এশিয়া-মহাদেশের-বিভিন্ন স্থানে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচার আছে, ভারতবর্ষের কোন কোন প্রদেশে মায়াবাদ, কর্ম্মজড়-স্মার্ত্তমতবাদ, ভূতপ্রেত উপাসনা, সহজিয়ামতবাদ, অতিবাড়ী মত প্রভৃতি আছে বলিয়া সেই সকল প্রদেশের লোক যদি স্বদেশ ও স্বজাতি-প্রেমে অনুপ্রাণিত হইয়া প্রত্যেকেই অকৈতব অদ্বিতীয় নিত্য আত্মধর্ম্মকে সমাজচ্যুত করিবার চেষ্টা করেন, তাহা হইলে বঞ্চিত হইবে কে? ''উড়িষ্যায় জন্মগ্রহণ করিয়াছি বলিয়া আমাকে অতিবাড়ী মতকেই সমর্থন করিতে হইবে, বঙ্গে জন্মগ্রহণ করিয়াছি বলিয়া সহজিয়া-মতেরই স্তাবক হইতে হইবে, রাজা রামমোহন রায়ের সমাজে বর্দ্ধিত হইয়াছি বলিয়া যে কোন ভাবে ঐ মতকেই স্থাপন করিতে হইবে বা ইউরোপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি বলিয়া খৃষ্টীয় মতবাদের পরিপুষ্টি ও পরিশিষ্টরূপে যদি আরও অনেক উচ্চতর বিচারের কথা থাকিয়া থাকে, তাহা নিরপেক্ষভাবে শ্রবণই করিব না, ''এইরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞা সত্যানুসন্ধিৎসা বা সত্যপ্রীতি নহে। আবার সত্যানুসন্ধিৎসা বা সত্যপ্রীতির ছলনায় আধ্যক্ষিকতা অর্থাৎ প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আত্মধর্ম্মকে পরিমাপ করিবার চেষ্টারূপ যে দ্বিতীয় প্রকার প্রাদেশিক অর্থাৎ পার্থিব বুদ্ধির উদয় হয়, তাহাও সত্যানুসন্ধিৎসা নহে। সত্যানুসন্ধানের আবরণে নিত্যকল্যাণপ্রদ আত্মধর্ম্মকে মাপিয়া লইবার চেষ্টায় রাজা রামমোহনের তিব্বতে অভিযান বা দেশবিদেশীয় ধর্ম্মের আলোচনাও প্রাদেশিক বুদ্ধির প্রচ্ছন্ন মূর্ত্তি। পার্থিব বুদ্ধি বা মাটিয়া বুদ্ধি প্রাদেশিক বুদ্ধিরই জননী। কোনও এক মনোধর্ম্ম প্রচারক শিবলিঙ্গের ঘরে মুষিককে ঘৃতসিক্ত প্রদীপ অপহরণ করিতে দেখিয়া বিচার করিয়াছিলেন, '' যে ভগবানের নিজের নৈবেদ্য রক্ষা করিবারই সামর্থও নাই, সেই ভগবান্ আবার অপর কাহাকে রক্ষা করিবেন?'' হয়ত' তিনি সেই বুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া নিজ প্রাদেশিক ধর্ম্ম পরিত্যাগ ও সত্যানুসন্ধিৎসার অভিনয় করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহা প্রাদেশিকধর্ম্মবর্জ্জন নহে, প্রাদেশিকবুদ্ধি-বিসর্জ্জনও নহে—অন্য আকারে, অন্য প্রতীকে প্রাদেশিক অর্থাৎ মাটিয়া বুদ্ধিরই প্রতি অধিকতর নিষ্ঠা প্রদর্শন বা সর্ব্বতোভাবে বরণ। তিনি প্রাদেশিক চক্ষু লইয়া যে প্রাদেশিক মাটিয়া বস্তুই দেখিয়াছিলেন, একথা তিনি ধরিতে পারেন নাই। তাঁহার মনীষা, তাঁহার প্রতিভা, তাঁহার পাণ্ডিত্য, তাঁহার বিচক্ষণতা প্রাদেশিক বুদ্ধিকেই সত্যানুসন্ধিৎসার আত্মবঞ্চক প্রচ্ছদপটে সাজাইয়া

আঁকড়াইয়া ধরিয়াছিল। সেরূপ সত্যানুসন্ধিৎসার অভিনয় পার্থিব বুদ্ধিরই অধিকতর নিন্দিত মূর্ত্তি। আবার ঐরূপ সত্যানুসন্ধিৎসার অভিনয়ে পার্থিব বুদ্ধিকে অধিকতর আত্মবঞ্চনা ও পরবঞ্চনার দিকে পরিচালিত করিবার জন্য তথাকথিত সমন্বয়বাদের এক অভিনয় মতবাদ প্রচারিত হইয়াছে। সকলের সর্ব্বপ্রকার প্রাদেশিক বুদ্ধিকেই সমর্থন করিবার অভিনয়ে গোঁজামিল দিয়া সর্ব্বচিত্তরঞ্জক তথাকথিত সমন্বয়বাদের আবির্ভাব হইয়াছে। 'একমাত্র আত্ম-ধর্ম্ম বা ভাগবতধর্ম্মই পরমধর্ম্ম', এই কথা বলিলে সকল প্রাদেশিক বুদ্ধিজাত ধর্ম্মমতবাদসমূহ সমভাবে মস্তক উচু করিয়া রাখিতে পারে না, এজন্য 'যেখানে যত প্রাদেশিক মতবাদ সৃষ্ট হইয়াছে, সকলই সমান', এই মৌলিকতার লোক ভুলাইয়া নিজের প্রাদেশিক বুদ্ধিজাত মতবাদকে প্রবল করিবার যে কৌশল, তাহাই জনমনোরঞ্জক সমন্বয়বাদ।

প্রকৃত সত্যানুসন্ধিৎসু প্রাদেশিক বুদ্ধির অত্যন্ত প্রচ্ছন্ন নিন্দিত-সংস্করণ ঐ সকল মতবাদ হইতে সতর্ক থাকিবেন। "ধর্ম্মন্তু সাক্ষাদ্ভগবৎপ্রণীতং", "এতাবানেব লোকেঽস্মিন্ পুংসাং ধর্ম্মঃ পরঃ স্মৃতঃ। ভক্তিযোগো ভগবতি তন্নামগ্রহণাদিভিঃ।।", "স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে", "ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিত-কৈতবোঽত্র পরমো নির্ম্মৎসরাণাং সতাং" প্রভৃতি বিচার হইতে যে সর্ব্বপ্রকার প্রাদেশিক-বুদ্ধি-বিবর্জ্জিত নির্ম্মৎসর সাধুগণের পরমোপাস্য সর্ব্ববিধ কপটতা-লক্ষণ-রহিত নিত্য আত্মধর্ম্মের অবস্থান, তাহা যে কোন দেশে, যে কোন কালে, যে কোন পাত্রে প্রকাশিত হউক না কেন, সেখান হইতেই গ্রহণ করিতে হইবে। পরমার্থ-রাজ্যে প্রবেশেচ্ছু নিত্যমঙ্গলাভিলাষী ব্যক্তি এবং সত্যপ্রিয় সাধক মাত্রেই এ বিষয়ে সতর্ক থাকিবেন—প্রাদেশিকবুদ্ধি হইতে যে সকল মতবাদ সৃষ্ট হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে, তাহা আত্মধর্ম্মের বিরোধী এবং অনাত্ম ধর্ম্মের আপাত-মিত্র—এই লক্ষণ দেখিয়া সর্ব্বদা সেই সকল মতবাদ হইতে দূরে থাকিবেন। ঐ সকল মতবাদী নিত্য আত্মধর্ম্মকে প্রাদেশিক বা একঘেয়ে ধর্ম্ম নামে কলঙ্কিত করিবার চেষ্টা করিবে; কিন্তু নিরপেক্ষভাবে, সুস্থচিত্তে এ সকল কথা বিচার করিতে হইবে, বিচার করিবার কালে পরমেশ্বরের নিকট নির্ম্মল অন্তঃকরণে আর্ত্তি ও নিবেদন জানাইতে হইবে অর্থাৎ সতত যুক্ত, প্রীতিপূর্ব্বক ভজনশীল চিত্তে যে বিচার ও বুদ্ধিযোগ, তদ্দ্বারাই প্রাদেশিক বুদ্ধি হইতে জীব নির্ম্মুক্ত হইতে পারেন। কোন প্রকার পার্থিব বা মাটিয়া বুদ্ধিতে আসক্ত থাকিলে অকৈতব সত্যের সন্ধান লাভ হইতে পারে না। সাধু সাবধান!!

পরিপ্রশ্ন বনাম কৌতূহল-নিবৃত্তি

পারমার্থিক জীবনে প্রবেশের দ্বারে 'পরিপ্রশ্ন' একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় ব্যাপার। বেদান্তসূত্রের 'অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা', বেদান্তভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবতের 'তস্মাদ্‌গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয়ো উত্তমম্', শ্রীগীতার 'তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া', ভক্তিরসামৃত-সিন্ধুর 'সদ্ধর্ম্মপৃচ্ছা' সাধকজীবনের প্রারম্ভিক পরিপ্রশ্নকেই লক্ষ্য করিয়াছেন।

পরিপ্রশ্ন বনাম কৌতূহল-নিবৃত্তি

পরিপ্রশ্নই আরব্ধ সাধকজীবনের প্রথম ও প্রধান সূচনা। পরমার্থ-বিষয়ে যাঁহার বা যাঁহাদের পরিপ্রশ্ন অর্থাৎ জিজ্ঞাসার উদয় হয় নাই, তিনি বা তাঁহারা পরমার্থ-সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন বা জড়তা-প্রাপ্ত। শিশু যেমন তাহার নবীন জীবন-যাত্রার প্রারম্ভে মাতাপিতা, অভিভাবক বা অভিজ্ঞের নিকট হইতে তাহার নিত্য নবীন প্রত্যক্ষ বিচিত্র জগতের বিষয় জানিবার জন্য কৌতূহলী হইয়া শত শত প্রশ্ন করিয়া থাকে, তদ্রূপ পারমর্থিক শিশুও নবীন পরমার্থ-রাজ্যের বিভিন্ন সংবাদ জানিবার জন্য স্বতঃই ব্যাকুল হইয়া থাকেন। কোন ক্রেতা বা গ্রাহক যেরূপ কোন নূতন প্রয়োজনীয় বস্তু ক্রয় বা গ্রহণ করিবার প্রাক্‌কালে বস্তুর সম্বন্ধে যাবতীয় সংবাদ ও তথা সংগ্রহ করিয়া থাকেন, সেইরূপ প্রচলিত ব্যবহারিক জীবনে অতৃপ্ত হইয়া যাঁহারা নূতন পারমার্থিক জীবনযাপনের গ্রাহক হন, তাঁহারাও পূর্ব্বাহ্ণেই তৎসম্বন্ধে নানা তথ্য আহরণ করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া থাকেন।

বস্তুতঃ পারমার্থিক জীবনযাপন বা পরমার্থসম্বন্ধে বিভিন্ন তথ্য আহরণের জন্য কৌতূহল এবং বাস্তব পারমার্থিক জীবনে আত্মনিয়োগ ও তাহা সর্ব্বতোভাবে বরণ করিবার জন্য যে অকপট সাধন—এই উভয়ের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য আছে। শাস্ত্রীয় পরিভাষায় একটিকে 'কৌতূহলনিবৃত্তি স্পৃহা', আর একটিকে 'পরিপ্রশ্ন' বলা যায়। কৌতূহল-নিবৃত্তির স্পৃহার প্রেরণা আত্মেন্দ্রিয়তৃপ্তি-বাঞ্ছা হইতে উদিত, আর পরি প্রশ্নের ভিত্তি সেবোন্মুখতার উপর সুপ্রতিষ্ঠিত। পরিপ্রশ্ন সেবোন্মুখতার প্রাথমিক অভিসার, আর কৌতুহল-নিবৃত্তি ইন্দ্রিয়-কাম চরিতার্থ করিবার প্রাথমিক ও শেষ অভিযান। পরিপ্রশ্নের উত্তর-ফল সেবা, তদুত্তর-ফল অধিকতর সেবা ও সেবারই প্রগতি; আর কৌতুহল-নিবৃত্তির উত্তর ফল নাস্তিকতা এবং তাহারই প্রবৃদ্ধি। কৌতুহল কামের তাড়না বা সামরিক উচ্ছ্বাস ও উত্তেজনা; আর পরিপ্রশ্ন পারমার্থিক জীবনে আত্মনিক্ষেপ বা প্রনিপাতেরই বাস্তব ফল ও সেবোন্মুখতারই ধ্বজা। যেরূপ অবৈধ কামুকব্যক্তি কামের উত্তেজনার সামরিক নিবৃত্তির পর নির্দ্দিষ্ট যোষতির প্রতি বীতরাগ হইয়া নবীনতর উত্তেজনায় দ্বিতীয় বা নূতনতর যোষিতের অনুসন্ধান করিয়া থাকে, সেইরূপ যাঁহারা কেবল কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া পরমার্থ-রাজ্যের বিভিন্ন তথ্য আহরণে উদ্যোগী হন, তাঁহারাও প্রকৃত অকৈতব পরমার্থ তাঁহাদের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি বিধান করিতে পারে না বলিয়াই অনেক সময় প্রকৃত পরমার্থ-জিজ্ঞাসা পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাদের নূতনতর কৌতূহল-নিবৃত্তির বার্ত্তার অনুসন্ধান করিয়া থকেন! ইন্দ্রিয়লুব্ধের সাময়িক উত্তেজনায় ভোগ্যা বরণ ও উত্তেজনার ক্লান্তিতে সেই ভোগ্যাকে divorce বা পরিত্যাগ করিবার দৃষ্টান্তের ন্যায় ইন্দ্রিয়লুব্ধগণের পারমার্থিক বিষয়ে কৌতূহল-নিবৃত্তির অভিনয় দৃষ্ট হয়। অনেকে বাহ্যে পরিপ্রশ্নের ছদ্মবেশ পরিয়া সাধু ও সদ্‌গুরুর সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া থাকেন; কিন্তু কিছুকাল পরমার্থরাজ্যের (?) নানা সংবাদ ও তথ্য আহরণ করিবার পর যখন তাঁহারা দেখিতে পান যে, একান্ত পরমার্থ বা অকৈতব ভাগবতধর্ম্ম তাঁহাদের কোন ইন্দ্রিয়তৃপ্তিই করিবে না, তাঁহাদের ধর্ম্মৈষণা, বিত্তৈষণা, কামৈষণা, এমন কি মোক্ষৈষণার মূল সমূলে উৎপাটিত করিবে, যাবতীয় অন্যাভিলাষকে নির্ম্মূল করিবে, তখন তাঁহারা স্বরূপ প্রকাশ করিয়া ফেলেন অর্থাৎ তাঁহারা যে

ইন্দ্রিয়তৃপ্তিবাঞ্ছাকে কেন্দ্র করিয়া কৌতূহল-নিবৃত্তির চেষ্টাকেই পরিপ্রশ্নের স্বরূপ বলিয়া লোকবঞ্চনা করিতেছিলেন, সেই মুখোসটি সরাইয়া ফেলিতে বাধ্য হন।

এইরূপ কৌতূহল-নিবৃত্তির আন্তরিকতা লইয়া পরিপ্রশ্নের ছদ্মবেশে সজ্জিত হইবার চেষ্টা বিভিন্ন কপট ও দুর্ব্বল ব্যক্তির হৃদয়ে বিভিন্নপ্রকারে স্থায়িত্বলাভ করিয়া থাকে অর্থাৎ পরিপ্রশ্ন করিবার অভিনয়ে এই কৌতূহল নিবৃত্তির চেষ্টা কেহ বা এক মুহূর্ত্ত, কেহ বা একদিন, কেহ বা এক সপ্তাহ, কেহ বা একমাস, কেহ বা এক সম্বৎসর, কেহ বা এক যুগ, কেহ বা ততোধিক কাল, কেহ বা সমগ্র জীবনকালও প্রদর্শন করিয়া থাকে। অনেক সময় পরিপ্রশ্নের ছদ্মবেশে ঐ কৌতুহলনিবৃত্তি-পিপাসার আন্তরিক চেষ্টা নানাবিধ সেবাকার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার ছলনা লইয়াও উপস্থিত হয়। বস্তুতঃ ঐ পরিপ্রশ্নের অভিনয় যেরূপ কপটতা, সেবার অভিনয়ও তদ্রূপই কপটতা বা কনক-কামিনী প্রতিষ্ঠাশা-পূরণের জন্য উত্তেজনা মাত্র। কৌতূহল নিবৃত্তিবাঞ্ছার ইন্ধন-সংগ্রহের সহিত প্রতিষ্ঠাশাদির উত্তেজনায় উত্তেজিত হইয়া বিপুল কর্ম্মপ্রেরণা অনেকসময় সাধারণ চক্ষে পরিপ্রশ্ন ও অদ্ভুত অক্লান্ত সেবা প্রাণতারূপে প্রতিভাত হইয়া থাকে; কিন্তু সেই ছদ্মবেশ যখন আর অধিকদিন লুকাইয়া রাখা যায় না, ইন্দ্রিয়-চরিতার্থের স্পৃহা যখন প্রয়োজনীয় নব নব ইন্ধন না পাইয়া কিছুদিন পরেই শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়ে, তখন কপটতা আপনাকে ব্যক্ত করিয়া ফেলিতে বাধ্য হয়। এরূপ বহু লোককে দেখিতে পাওয়া গিয়াছে, যাঁহারা গুরুপদাশ্রয়ের অভিনয় করিয়াছেন এবং গুরুপদাশ্রয়ের পূর্ব্বেও বহু প্রশ্ন ও বিচারের অবতারণা করিয়াছেন, গুরুপদাশ্রয়ের পরেও পরিপ্রশ্নের অভিনয় এমন কি বিভিন্ন সেবাকার্য্যের জন্য অমানুষিক চেষ্টা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাঁহারাও ভাগবতধর্ম্মের নিরঙ্কুশ স্বেচ্ছাচারিতার বা তাঁহাদের বিচারে নিষ্ঠুরতায় (?) মর্ম্মাহত হইয়া তৎপ্রতি বীতরাগ এবং চিরবিদায়-অভিনন্দন প্রদান পূর্ব্বক নিষ্কৃতি পাইবার পথই চরমে বরণ করিয়াছেন।

কৌতূহল-নিবৃত্তি-বাঞ্ছার ইন্ধন বা ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনা কতক্ষণ মানুষকে ধরিয়া রাখিতে পারে? উহাকেই যখন মানব 'ধর্ম্ম' বলিয়া বরণ করে, তখন সেই 'ধর্ম্ম' কিছু সময়ের জন্য মানবের বহির্ম্মুখ-ইন্দ্রিয়তৃপ্তি করাইবার পর মানবকে পরিশ্রান্ত করাইয়া দেয়, তখন মানুষ পূর্ব্বের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির প্রকারকে 'একঘেয়ে' মনে করিয়া দ্বিতীয় প্রকার ইন্দ্রিয়তৃপ্তিবাঞ্ছার ইন্ধনরূপ ধর্ম্মান্তর গ্রহণে ব্যস্ত হয়! অকৈতব ভাগবতধর্ম্মের ইহাই নিজস্ব বৈশিষ্ট্য যে, তাহা কখনও মানবের বা জীবের খিদ্‌মৎগারী করে না। মানুষ যতক্ষণ ভাগবত-ধর্ম্মের আবরণকে তাহার ইন্দ্রিয়তৃপ্তির উপকরণ করিয়া রাখিতে পারে, ততক্ষণই ঐরূপ ছলনায় তাহার কৌতূহল দেখা যায়; কিন্তু যখন অনাবৃত ভাগবত-ধর্ম্ম জীবের যাবতীয় কপটতার আবরণের উপর বিক্রম প্রকাশ করে, তখন আর মানুষ সেই নিরুপাধিক বস্তুর গ্রাহক থাকিতে পারে না। কেবল যাঁহাদের একান্ত বাস্তব পরম সত্যের জন্য চেতনের বৃত্তি উন্মেষিত হইয়াছে, সেইরূপ সুকৃতিমন্ত ব্যক্তিগণই ভাগবত-ধর্ম্মের নবনবায়মান সৌন্দর্য্যে চির-আকৃষ্ট হইয়া থাকেন। যাঁহাদের চেতনের বৃত্তি উন্মেষিত হয় নাই, যাঁহাদের চেতন অহৈতুকী সেবার জন্য অকপটভাবে সেবোন্মুখ নহে, তাঁহাদের পরিপ্রশ্নের ছলনা কেবল মানসিক

কৌতূহল-নিবৃত্তির চেষ্টা মাত্র। তাঁহারা ভাগবতধর্ম্মে নিত্য নবনবায়মান সন্দেশ না পাইয়া, উহাকে একঘেয়ে চর্ব্বিতচর্ব্বণ বা নিত্য-নূতনত্ব-রহিত 'পচা সংবাদ' ধারণা করিয়া ভাগবত-ধর্ম্মের বিদ্বেষী হইয়া পড়েন কিম্বা ভাগবত ধর্ম্ম অপেক্ষাও তাঁহাদের অধিকতর ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকর ধর্ম্ম আছে মনে করিয়া সেইরূপ ইন্দ্রিয়ের পরিচারক ধর্ম্মের প্রতিই আকৃষ্ট হইয়া থাকেন।

প্রণিপাতযুক্ত পরিপ্রশ্ন না হইলে অর্থাৎ সর্ব্বতোভাবে অকপট আত্মসমর্পণের সহিত একান্ত বাস্তব-সত্য বরণের জন্য চেতনের সেবোন্মুখতা-বৃত্তির প্রথম বিকাশস্বরূপ পরিপ্রশ্ন সেবোন্মুখতাকে প্রগাঢ় হইতে প্রগাঢ়তর ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিয়া সেবার প্রগতি প্রকাশ না করিলে শ্রবণ ও কীর্ত্তনের অভিনয় কিছুদিন পরে ক্লান্ত হইয়া পড়ে এবং ক্লান্তিতে সম্পূর্ণ অন্তর্হিত হইয়াও যায়। যাঁহার চেতনে আত্মজগতের নিত্য নূতন বার্ত্তা সঞ্চারিত না হয়, চেতনরাজ্যের বিদ্যুদ্বার্ত্তাবহ প্রতিক্ষণে চিরনূতন, চিরতরুণ, চিরনবকিশোর নটবরের নূতন হইতে নূতনতর সন্দেশ হৃদয়ে জ্ঞাপন করিয়া অপ্রাকৃত চিরনূতনের সেবায় নবীন হইতে নবীনতরভাবে উদ্বুদ্ধ না করে, তাঁহার দেহ-মনের ক্রিয়া প্রবল হইয়া সত্বরই তাঁহাকে তাঁহার পারমার্থিকতার অভিনয়-মঞ্চ হইতে বিতাড়িত করিবে, ইহা সুনিশ্চয়। আমাদের আত্মা বা চেতন চিরনূতনের উপাসক বলিয়া, সেবা নিত্যনূতনময়ী আত্ম-বৃত্তি বলিয়া প্রতিফলিত জড়ের রাজ্যেও তাহারই প্রতিচ্ছবি দেখিতে পাওয়া যায়। মানুষ একঘেয়ে ভাবে অধিকক্ষণ অধিষ্ঠিত থাকিতে পারে না। তবে জড়ের সহিত চেতনরাজ্যের পার্থক্য এই যে, জড়ের নূতনত্ব সসীম ও হেয়তার খনি, আর চেতনের নূতনত্ব অসীম ও উপাদেয় তার অফুরন্ত ভাণ্ডার। জড়ের নূতনত্বের আকাঙ্ক্ষা জীবের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির মায়ামৃগ, আর চেতনের নূতনত্বের আর্ত্তি পূর্বচেতন বা অপ্রাকৃত চিরনূতনের ইন্দ্রিয়তৃপ্তিতে পর্য্যবসিত; তাই চেতনরাজ্যের নূতনত্বের ইতি নাই। অচেতনের আবরণ অপসারিত হইবে যখন চেতনের রাজ্য আবিষ্কৃত হয়—যখন অনর্থমুক্তি হয়, তখন আমরা যে সকল সেবার কথা শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিবার যোগ্যতা লাভ করি, তাহাতে একঘেয়ে ভাব নাই, প্রতিমুহূর্ত্তে অপ্রাকৃত নূতনত্বের সহস্রধারা উৎসারিত হইয়া থাকে। কাজেই যাঁহারা সেই অনর্থমুক্তি লাভ করেন নাই, তাঁহারা অনর্থনিবৃত্তির পূর্ব্বেই কৌতূহল-নিবৃত্তির জন্য ব্যাকুল বা তাহাতে বঞ্চিত ও ব্যথিত হইয়া ভাগবত-ধর্ম্মকে কতকগুলি একঘেয়ে মতবাদেরই আগার মনে করিয়া থাকেন; তাহা তাঁহাদের প্রকৃত পরিপ্রশ্নেরই অভাব-জ্ঞাপক। তাঁহারা এতদিন যে সকল প্রশ্ন করিয়াছেন, তাহা বস্তুতঃ প্রণিপাত ও সেবোন্মুখতাযুক্ত পরিপ্রশ্ন নহে, তাঁহারা এতকাল যে সেবার অভিনয় করিয়াছেন, তাহাও প্রকৃত পরিপ্রশ্নের উত্তর-ফল সেবা নহে, তাহা কেবল জড়েন্দ্রিয়ের কৌতূহলনিবৃত্তির চেষ্টা বা কোন না কোন কামের বশবর্ত্তী হইয়া জড়েন্দ্রিয়-পরিচালনাময় কর্ম্মাড়ম্বর মাত্র।

সাধক-জীবনে শ্রবণ-কীর্ত্তনের মধ্যে প্রতিমুহূর্ত্তে প্রতি ক্ষণে যাঁহাদের নিকট চেতন-জগতের নিত্যনূতন তড়িদ্বার্ত্তা সঞ্চারিত না হয়, জানিতে হইবে, তাঁহাদের প্রণিপাতে কপটতা আছে, পরিপ্রশ্নের অভিনয়েও ইন্দ্রিয়তৃপ্তির কামনা আছে, সেবার আকাশ পাতাল আলোড়নের অভিনয়েও অন্যাভিলাষ নিহিত রহিয়াছে।

তাঁহারা কেবল শুকপাখীর মুখস্থ করা একঘেয়ে বুলি, 'দেহ কিছু নয়, মন কিছু নয়' এই কএকটি কথা লইয়া শারীরিক কসরৎ করিতেছেন এবং কণ্ঠস্বর ও কর্ণ-পটহের শারীরিক ব্যায়ামে অচিরেই তাঁহারা ক্লান্ত হইয়া পড়িলে ঐ বুলিটুকুও ছাড়িয়া দিবেন। ঐ মুখস্থ করা পাঠ তাঁহাদের শরীরের উপর ক্রিয়া করিয়াছে, চেতন হইতে জিহ্বাতে অবতীর্ণ হয় নাই, কাজেই 'দেহ কিছু নয়, মন কিছু নয়, বলিয়াও দেহ ও মনেতেই তাঁহারা আসক্ত আছেন এবং তাহাতেই অধিকতর আসক্ত হইতেছেন। চেতনের অফুরন্ত মৌলিক খনি হইতে তাঁহাদের ঐ বাণী প্রকাশিত হয় নাই বলিয়া—তাঁহাদের চেতনের কর্ণবেধ-সংস্কার চেতন-বাণীর খনির আবরণকে উদ্ঘাটিত করিয়া দেয় নাই বলিয়াই তাঁহাদের ভাণ্ডারে মুখস্থ করা বুলি ছাড়া কোন মৌলিক চেতন-বাণীর সন্ধান পাওয়া যায় না; আর তাঁহারা সেই সকল মৌলিক চেতনবাণী পুনঃ পুনঃ শুনিয়াও ধরিতে পারেন না, কখনও কখনও মৌলিক নূতন কথা শুনিয়া তাহাকে কৌতূহল-নিবৃত্তিরই উপকরণ বা ইন্ধনরূপে গ্রহণ করিয়া ইন্দ্রিয়তৃপ্তির যজ্ঞেই পূর্ণাহুতি দিয়া থাকেন। অতএব সেই-সকল মৌলিক চেতনবাণীও তাঁহাদের মঙ্গলজনক কার্য্যে লাগিতে পারে না; এজন্য কিছুদিন পরেই তাঁহারা একান্ত পরমার্থ-রাজ্য বা ভাগবতধর্ম্মের বিচার, সিদ্ধান্ত, আচার বা সেবাপ্রণালীকে একঘেয়ে মনে করিয়া পুনর্মুষিক হইয়া পড়েন। সেই পূর্ব্বের ভোগোন্মুখ বা ত্যাগোন্মুখ একঘেয়ে জীবনযাপনের জন্য সাময়িক ইন্দ্রিয়তৃপ্তির উত্তেজনায় বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রকার ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকর ধর্ম্ম গ্রহণ করেন ও ভাগবত-ধর্ম্ম যেহেতু তাঁহাদের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি করিতে পারে নাই, সেইহেতু উহা ততদূর কাজের নয় বা উহা একঘেয়ে,—লোকের নিকট এই কৈফিয়ৎ দিয়া তাঁহারা নিজেদের সাধুত্ব সংরক্ষণ করিতে চাহেন অর্থাৎ 'তাঁহাদের ব্যক্তিগত কোন দোষ নাই, দোষ সকলই ধর্ম্মের'—ইহাই তাঁহারা প্রতিপন্ন করিয়া থাকেন।

একশ্রেণীর ব্যক্তির বিভিন্নপ্রকার ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকর ধর্ম্ম চাখিয়া বেড়াইবার একটা বাতিক আছে। ইহারা কৌতূহল-নিবৃত্তির তাড়নায় দুই চারি দিন করিয়া প্রত্যেক ধর্ম্মের আখড়ায় ঘুরিয়া বেড়ান এবং প্রয়োজন হইলে 'সভায়াং বৈষ্ণবোমতঃ' এই ছদ্মবেশেরও আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন। ছদ্মবেশ গ্রহণ করিয়া ইঁহারা সেবা-তৎপরতার বিপুল অভিনয়ও প্রদর্শন করেন এবং যে আখড়া হইতে যে যে ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির সামগ্রী আহরণ করা যায়, তাহাও চয়ন করিয়া লন। সকল ধর্ম্মের আখড়াই কিছু না কিছু ইন্দ্রিয়তৃপ্তির উপকরণ যোগাইতে পারে; কিন্তু অকৈতব ভাগবত-ধর্ম্ম সেরূপ ইন্ধনের যোগানদার হইতে পারে না বলিয়া এখানে আসিয়াই তাঁহাদের সমগ্র স্বরূপটি ধরা পড়িয়া যায়, তখন তাঁহারা তাঁহাদের ছদ্মবেশ কিছু দিনের মধ্যে পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। তাঁহাদের পরিপ্রশ্নের অভিনয় ও সেবার আড়ম্বরের অভিনয় যে কেবল তাঁহাদের কৌতূহল-নিবৃত্তির ও অন্যাভিলাষ চরিতার্থ করিবার তাড়না ও উত্তেজনা, তাহা প্রকাশিত হইয়া পড়ে।

সাধু সাবধান! এইরূপ কৌতূহল-নিবৃত্তির চেষ্টা ও অন্যাভিলাষ চরিতার্থ করিবার উত্তেজনাকে পরিপ্রশ্ন বা সেবার ছদ্মবেশে সাজাইয়া অকৈতব ভাগবত ধর্ম্মবক্তা নির্ম্মৎসর সাধুগণের মন্দিরে যাইও না কিম্বা যাঁহারা ঐরূপ বৃত্তিতে পরিচলিত, তাঁহাদিগকেও আত্মীয়জ্ঞান করিও না, তাহা হইলে সর্ব্বনাশ হইবে।

প্রাণিপাত অর্থাৎ সর্ব্বতোভাবে আত্মনিঃক্ষেপ করিতে শিক্ষা কর। সেই আত্মনিঃক্ষেপই তোমার পরিপশ্নের আধার বা ভূমিকা, সেই অক্ষয় আধারে তুমি সাধুর বাক্যামৃত ধারণ ও সংরক্ষণ করিতে পারিবে, তখনই তোমার চেতনবৃত্তিতে সেবা-সঞ্জীবনীর শতধারা উৎসারিত হইবে, সেই সেবাবৃত্তিই তোমাকে কৃষ্ণচরণ-কল্পবৃক্ষে আরোহণ করিবার বল প্রদান করিবে। প্রণিপাত অর্থাৎ আত্মনিক্ষেপ পরিবর্জ্জন করিয়া পরিপ্রশ্নের অভিনয় কপটতা মাত্র। আবার পরিপ্রশ্নকে বাস্তব-সেবা-বিরহিত রাখিয়া উহাকে কেবল কৌতূহলনিবৃত্তরূপ মানসিক ব্যায়ামের যন্ত্র করিবার চেষ্টাও আত্মবঞ্চনা ও পরবঞ্চনা; অতএব সাধু সাবধান!!

"শ্রী" ও "ঁ"

জীবিত ব্যক্তির নামের পূর্ব্বে 'শ্রী' ও মৃত-ব্যক্তির নামের পূর্ব্বে 'ঁ' লিখিবার প্রথা এদেশে প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়। গতানুগতিকভাবে আমরা প্রায় সকলেই এই আদর্শের অনুকরণ করিয়া থাকি।

উচ্চারণকালে 'ঁ' এই চিহ্নটি 'ঈশ্বর'-শব্দে উচ্চারিত হয়। জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠ, পূজনীয়-কল্যাণীয়, উচ্চ-নীচ, ধাম্মিক-অধার্ম্মিক, সাধু-অসাধু যে-কোনও মৃতব্যক্তির নামের পূর্ব্বে এইরূপ চিহ্ন প্রদান এবং নামোচ্চারণ-কালে তৎপূর্ব্বে 'ঈশ্বর'শব্দ উচ্চারণ করিবার প্রথা আমরা বঙ্গীয় সমাজের সর্ব্বত্রই দেখিতে পাই। কেহ কেহ বলেন, ইহা বঙ্গদেশেরই নিজস্ব। সংস্কৃতসাহিত্যে 'স্বর্গীয়', 'পরলোকগত' কিংবা 'স্বধামগত' প্রভৃতি শব্দ-ব্যবহারের রীতি আছে।

'ঁ' চিহ্নটি 'শ্রী'র বিপরীত বা প্রতিযোগী। এই চিহ্নটি কোন মনুষ্যের নামের পূর্ব্বে ব্যবহৃত হইলে তাহার মৃত্যু-বোধক হইয়া থাকে; কিন্তু প্রচলিত সাহিত্যে দেবতার নাম, দেবতার স্থান বা তীর্থস্থানাদির পূর্ব্বেও এই চিহ্নের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়, যেমন ঁদুর্গা, ঁষষ্ঠীদেবী, ঁচন্দ্রনাথ, ঁকাশীধাম প্রভৃতি। এইরূপ ব্যবহার দেখিয়া মনে হয়,—কেবল মনুষ্যের নামের পূর্ব্বে ব্যবহৃত হইলে উহা মৃত্যুবোধক; দেবতা বা তীর্থাদির নামের পূর্ব্বে তদ্রূপ নহে। কারণ কাশীধামাদি তীর্থস্থানের অস্তিত্ব সর্ব্বজন প্রত্যক্ষ।

কেহ কেহ বেলন,—'ঁ' এই চিহ্নটি ওঁকারের সংক্ষিপ্ত চিহ্ন। ওঁকার বা প্রণবের 'ও'কার বিলুপ্ত হইয়া গেলে কেবল চন্দ্রবিন্দুটি অবশিষ্ট থাকে। মনুষ্য মৃত্যুর পর ওঁকারস্বরূপ ব্রহ্মে লীন হইয়া যায়, তখন তাহার কোন রূপ থাকে না; তাহার নির্ব্বিশেষ অবস্থা বুঝাইবার জন্য 'ঁ' এইরূপ একটি চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। মনুষ্য ঈশ্বরের সহিত একীভূত হইয়া ঈশ্বর হইয়া পড়ে; এজন্য মৃত ব্যক্তি মাত্রেরই নামের পূর্ব্বে ঈশ্বর-শব্দের উচ্চারণ বা ঐরূপ চিহ্নের প্রয়োগ হইয়া থাকে।

আবার কেহ কেহ বলেন, মনুষ্য মৃত্যুর পরে চন্দ্রলোকে বাস করে, এইরূপ বিশ্বাস হইতে মৃতব্যক্তির নামের পূর্ব্বে চন্দ্রবিন্দুর ন্যায় এই 'ঁ' চিহ্ন প্রযুক্ত হয়।

মৃতব্যক্তির নামকে 'শ্রী'-হীন, জীবিত-ব্যক্তির নামকে 'শ্রী'যুক্ত করিবার প্রথা সাহিত্যে ও সমাজে চলিয়া আসিতেছে। সম্মানের তারতম্যের সহিত 'শ্রীযুক্ত', 'শ্রীযুক্তা', 'শ্রীমৎ', 'শ্রীমতী', 'শ্রীমান্', 'শ্রীল', 'শ্রীশ্রী', 'শ্রীশ্রীশ্রী', 'পঞ্চশ্রীক', '১০৮শ্রী'', 'কোটিশ্রী' প্রভৃতি 'শ্রী'শব্দের সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার প্রথা আমরা সাহিত্য, ধর্ম্মশাস্ত্র, আচার, ব্যবহার ও পদ্ধতির মধ্যে দেখিতে পাই। ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রয়োগমন্ত্রাদির মধ্যে 'শ্রী'যুক্ত করিয়া মন্ত্রোচ্চারণের বিধি রহিয়াছে। বিষ্ণুর নামের পূর্ব্বে 'শ্রী'শব্দের প্রয়োগ বিশেষভাবে দৃষ্ট হয়। 'শ্রীমূর্ত্তি'শব্দে বিষ্ণুমূর্ত্তির উল্লেখ হয়; কেবল মূর্ত্তি, প্রতিমা বা প্রতীক শব্দ বিষ্ণুবিগ্রহে প্রযুক্ত হয় না। বিষ্ণুর তীর্থাদি ও পর্ব্বাদি সর্ব্বদাই শ্রীযুক্ত; যেমন 'শ্রীবৃন্দাবন', 'শ্রীরামনবমী' প্রভৃতি। 'শ্রীমতী'-শব্দ শ্রীরাধিকাতেই রূঢ় অর্থাৎ প্রসিদ্ধার্থে রাধিকাকেই বুঝায়। ''জয়শ্রী'' বলিতেও একমাত্র শ্রীরাধিকাই লক্ষিতা হইয়া থাকেন। 'শ্রীঅঙ্গ' বলিতে গুরু-বৈষ্ণব-ভগবান্ প্রভৃতির চিদানন্দদেহই লক্ষিত হয়। 'শ্রীধাম', 'শ্রীনাম', 'শ্রীকাম' প্রভৃতি শব্দের দ্বারা ভগবান্ বিষ্ণুর 'স্থান', 'নাম' ও 'অভীষ্ট'কে বুঝাইয়া থাকে। মহাপ্রসাদ, বৈষ্ণব প্রভৃতি শব্দের পূর্ব্বেও 'শ্রী'শব্দের প্রয়োগ হয়। গুরুদেবের নামোচ্চারণকালে তাঁহার নামের পূর্ব্বে ওঁ শ্রী, অষ্টোত্তর-শতশ্রী বা বিষ্ণুপাদ বলিবার আদেশ পরমার্থশাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়; —

'যথা তথা যত্র তত্র ন গৃহ্লীয়াচ্চ কেবলম্।
অভক্ত্যা ন গুরোর্নাম গৃহ্লীয়াচ্চ যতাত্মবান্।।
প্রণবঃ শ্রীস্ততো নাম বিষ্ণুশব্দাদনন্তরম্।
পাদশব্দসমেতঞ্চ নতমূর্দ্ধাঞ্জলিযুতঃ।।

(হঃ ভঃ বিঃ ১।৬০ নারদপঞ্চরাত্র-বচন)

নারদপঞ্চরাত্র বলেন, যতাত্ম ব্যক্তি যেখানে সেখানে অভক্তির সহিত গুরুদেবের নাম উচ্চারণ করিবেন না। মস্তক অবনত করিয়া ও কৃতাঞ্জলি হইয়া প্রণব, বিষ্ণুপাদ, শ্রী ও তৎপরে শ্রীগুরুদেবের নামোচ্চারণ করিবেন।

বিষ্ণুর শক্তির নাম—'শ্রী'। ষড়ৈশ্বর্য্যশালী ভগবানের শ্রী অর্থাৎ সৌন্দর্য্যই তাঁহার সমগ্র ঐশ্বর্য্য, সমগ্র বীর্য্য, সমগ্র যশঃ, সমগ্র জ্ঞান ও সমগ্রবৈরাগ্যের মধ্যস্থলে স্থিত। যেমন শরীর অঙ্গী, হস্তপদাদি অঙ্গ, তদ্রূপ সচ্চিদানন্দবিগ্রহ ভগবানের 'শ্রী'ই অঙ্গী, আর ঐশ্বর্য্য-বীর্য্য-যশঃ-শ্রী-জ্ঞান, বৈরাগ্য গুণসমূহ অঙ্গ।

অবৈষ্ণবসম্প্রদায় অনেক সময় বৈষ্ণবগণকে বিদ্রূপ করিয়া বলেন,—''বৈষ্ণবগণ অত্যধিক 'শ্রী'র পক্ষপাতী; তাঁহারা 'শ্রীঅঙ্গ', 'শ্রীমহাপ্রসাদ', 'শ্রীবৈষ্ণব', 'শ্রীবিষ্ণু', 'শ্রীমূর্ত্তি' 'শ্রীপাদ' প্রভৃতি শ্রী-সংযুক্ত শব্দ প্রয়োগ করিয়াও ক্ষান্ত হন না; মৃত (?) ব্যক্তি বা দেবতার পূর্ব্বেও 'শ্রী' বসাইয়া থাকেন, যেমন 'শ্রীকৃষ্ণ', 'শ্রীচৈতন্য', 'শ্রীরামানুজ', 'শ্রীমধ্ব' ইত্যাদি।'' এজন্য আধুনিক প্রগতির ধূয়ায় সাহিত্যে ঐসকল শব্দকে সম্পূর্ণ 'শ্রী'-হীন না করিতে পারিলে সাহিত্যে-প্রগতি যেমন স্থগিত ও অতৃপ্ত হইয়া পড়ে! ঐ সকল 'শ্রী' যেন আবর্জ্জনা-সদৃশ।

সে দিন একজন বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও সংস্কৃতের প্রবীণ অধ্যাপক আমাদিগের প্রতি দোষারোপ করিয়াই যেন বলিতেছিলেন—''আপনারা মৃতব্যক্তির নামের পূর্ব্বে 'শ্রী' শব্দ প্রয়োগ করিয়া থাকেন। সাহিত্যের ও সমাজের প্রগতি ও আচারের বিরুদ্ধে ঐরূপ ভাবে মৃতব্যক্তির নামের পূর্ব্বে 'শ্রী' লিখিবার আপনাদের কি যুক্তি আছে?'' আমরা উত্তরে বলিলাম যে, আমরা কখনও মৃত্যক্তির নাম 'শ্রী' শব্দেরসহিত উল্লেখ করি না। এই উত্তরের প্রতিবাদে তিনি বলিলেন—''আপনারা চৈতন্যকে 'শ্রীচৈতন্য', 'শ্রীশ্রীচৈতন্য'—বলেন না কি? 'শ্রীরূপ', 'শ্রীসনাতন' বলিয়া রূপসনাতনের উল্লেখ করেন না কি?'' আমরা বলিলাম—''তাঁহাদের নামের পূর্ব্বে একটি 'শ্রী' কেন, অগণিত শ্রীই নিত্যসিদ্ধরূপে বর্ত্তমান আছে। শ্রীচৈতন্যের পদনখ হইতেই 'শ্রী' প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীনিত্যানন্দ সমগ্র 'শ্রী'র মূলপুরুষ। কৃষ্ণের মাধুর্য্যময়ী 'সেবাশ্রী' রূপ ধারণ করিয়া শ্রীরূপগোস্বামিরূপে প্রকটিত। জগতে যে সকল 'শ্রীমান্' হইয়াছেন ও হইবেন, তাঁহারা শ্রীরূপের পদনখ-শ্রীর আংশিক আভাসের দ্বারাই পরিপূর্ণ হইতে পারেন। সামাজিক ও সাহিত্যিকগণ জাগতিক ব্যক্তিগণের নামের পূর্ব্বে যে 'শ্রী' শব্দ প্রয়োগ করেন, তাহা কিছুদিন পরে তাঁহারাই 'বি-শ্রী' করিয়া দেন। মৃত্যুর পরমুহূর্ত্তেই সামাজিকগণ সেই সকল ব্যক্তিকে 'শ্রী-হীন' করিয়া ফেলেন। কিন্তু শ্রীচৈতন্যের 'শ্রী', শ্রীচৈতন্যদাসগণের 'শ্রী', শ্রীচৈতন্যের প্রকাশবিগ্রহগণের অর্থাৎ গুরুবর্গের 'শ্রী', শ্রীচৈতন্যশক্তির 'শ্রী', বৈষ্ণবগণের 'শ্রী' বা শোভা নিত্যা 'শ্রী'। তাঁহাদের মৃত্যু নাই, তাই তাঁহাদের 'শ্রী'রও বিয়োগ নাই; তাঁহারা ভগবানের নিত্য সেবাশ্রীতে বিভূষিত।

সামাজিক প্রথানুসারে বহির্ম্মুখ ব্যক্তিকে তাহার জীবিতকালেও যে 'শ্রী'-যুক্ত করিয়া বলা হয়, তাহা বস্তুতঃ আপেক্ষিক ও অনিত্য-শ্রীর সংস্পর্শের দ্যোতক ও অধিকাংশস্থলে গতানুগতিক কপটতা-ব্যঞ্জক। দ্বিতীয়ঃ বহির্ম্মুখগণের জীবিতোত্তরকালে যে তাহাদিগকে 'শ্রী'-হীন করিয়া 'ঈশ্বর' নামে অভিহিত করা হয়, তাহাও তত্ত্বান্ধতার পরিচায়ক। 'শ্রী'-বিহীনকে 'ঈশ্বর' বলা—কিরূপ যুক্তি? 'শ্রী'-যুক্ত ব্যক্তিই—ঈশ্বর। 'শ্রী'-বিহীন ঈশ্বর (?) 'দরিদ্র-নারায়ণ' শব্দের ন্যায় তত্ত্ব ও সদ্‌যুক্তির বিরোধী শব্দাড়ম্বর নহে কি? দরিদ্র অথচ নারায়ণ (লক্ষ্মীনাথ) যেরূপ বিরুদ্ধার্থ। সোনার পাথরের (?) বাটীর ন্যায় 'শ্রী'-বিহীন ঈশ্বর ও দারিদ্র্য-যুক্ত নারায়ণ প্রভৃতি শব্দ মায়াবাদ এবং পরমেশ্বরের নিত্যসেবা-বিরোধের বিচার হইতে হরিবিমুখ সমাজে সুপ্রচারিত হইয়াছে। ঐশ্বর্য্যতত্ত্বের মধ্যে 'শ্রী'ই অঙ্গী বা প্রধান, সেই শ্রীকে পরিত্যাগ করিয়া ঈশ্বরত্বই বা কিরূপে সম্ভব?''

আমাদের এই সকল কথা শুনিবার পর পূর্ব্বোক্ত সাহিত্যিক পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন,—আপনাদের তত্ত্বকথা ত' শুনিলাম; কিন্তু আপনাদেরই গৌড়ীয়-বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ প্রবীণ সাহিত্যিক ও আচার্য্য-সন্তাননামে পরিচিত মহাশয় ব্যক্তি তাঁহার শ্রীচৈতন্যভাগবতের ব্যাখ্যার প্রারম্ভেই তাঁহার স্বধামগত পুত্রের নামের পূর্ব্বে 'ঁ' এই চিহ্ন প্রয়োগ করিয়াছেন। ইহা ছাপার হরফে প্রকাশিত হইয়াছে, আপনি স্বচক্ষে দেখিতে পারিবেন।

আমরা সাহিত্যিক পণ্ডিতবরের এইরূপ নজিরের সাক্ষ্যের কথা পূর্ব্ব হইতে অবগত থাকিয়াও বলিলাম—"আমরা কোন ব্যক্তিগত বিচার বা আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব না; সত্য ও আদর্শ যাহা, তাহাই বলিলাম; কোন শুদ্ধ বৈষ্ণব মৃত ব্যক্তিকে 'ঈশ্বর' বলেন না। বহির্ম্মুখ ব্যক্তিগণকে 'শ্রী'-হীন করিয়া তাহাদের নামোল্লেখ করিতে পারেন, কিম্বা তাহাদের নামের পূর্ব্বে 'স্বধামগত' ইত্যাদি শব্দও প্রয়োগ করিতে পারেন। আর ইহ জগৎ হইতে অপ্রকট হইবার পরেও ভগবদ্ভক্ত্যাশ্রিত বৈষ্ণবের নামের পূর্ব্বে 'শ্রী'-শব্দই প্রযুক্ত হইয়া থাকে। কারণ, তাঁহারা ইহ জগৎ হইতে অন্য স্থানে গমন করিয়াও তাঁহাদের চেতনের বৃত্তি দ্বারা নিত্য হরিসেবাই করেন। তাঁহারা 'সেবা-শ্রী' হইতে কোন দিনই বিচ্যুত হন না এবং উত্তরোত্তর 'সেবা-শ্রী'-যুক্ত হইয়া থাকেন। মহাভাগবত বৈষ্ণবের ত' কথাই নাই, তাঁহারা নিত্য অপ্রাকৃতধামে নিত্যলীলায় প্রবিষ্ট হইয়া অপ্রাকৃতদেহে ভগবানের নিত্যসেবা করিতে থাকেন। এজন্য তাঁহাদের সম্বন্ধে শাস্ত্র বলিয়াছেন—

যথা সৌমিত্রি-ভরতৌ যথা সঙ্কর্ষণাদয়ঃ।
তথা তেনৈব জায়ন্তে মর্ত্ত্যলোকে যদৃচ্ছয়া।।
পুনস্তেনৈব যাস্যন্তি তদ্বিষ্ণোঃ শাশ্বতং পদম্।
ন কর্ম্মবন্ধং জন্ম বৈষ্ণবানাঞ্চ বিদ্যতে।।

(পাদ্মোত্তরখণ্ড ২৫৭।৫৮)

যেরূপ সুমিত্রা-নন্দন ভরত ও লক্ষ্মণ, যেরূপ সঙ্কর্ষণাদি ভগবদ্বিগ্রহসকল স্বতন্ত্রেচ্ছাবশতঃ প্রপঞ্চে প্রাদুর্ভূত হন, ভগবৎপার্ষদ বৈষ্ণবগণও সেইভাবেই আবির্ভূত হন এবং পুনরায় সেই ভাবেই বিষ্ণুর সেই নিত্যধামে গমন করেন। বৈষ্ণবগণেরও বিষ্ণুর ন্যায় কর্ম্মবন্ধনজনিত জন্ম নাই।

যাঁহারা বস্তুসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের নামের পূর্ব্বে 'নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট' ও 'শ্রীমৎ', 'শ্রীল', বা বহু 'শ্রী' সংযুক্ত করাই সমীচীন ও শাস্ত্রবিধি। তাঁহারা আশ্রয় জাতীয় নিত্য ভগবৎসেবক ও বস্তুসিদ্ধিপ্রাপ্ত বলিয়া মায়াবাদী ও কর্ম্মজড়স্মার্ত্তের বিচারের অনুকরণে তাঁহাদের নামের পূর্ব্বে 'ঈশ্বর' শব্দ প্রয়োগ করা কেবল অযৌক্তিক মাত্র—পরন্তু পরমেশ্বরের বিরোধচেষ্টা। সাধারণ জীব ত' ঈশ্বর হইতেই পারে না, যুক্ত পুরুষগণও পরমেশ্বরেরই নিত্য সেবা করিয়া থাকেন—তাঁহারা ঈশ্বরের আসন অধিকার করেন না।

'মায়াধীশ', 'মায়াবশ'—**ঈশ্বরে জীবে ভেদ।**
হেন জীবে ঈশ্বর-সহ কহ ত' অভেদ?
গীতাশাস্ত্রে জীবরূপ 'শক্তি' করি' মানে।
হেন জীবে 'অভেদ' কহ ঈশ্বরের সনে?

(চৈঃ চঃ মঃ ৬।১৬২, ১৬৩)

মায়াবাদ ও ভগবচ্চরণে অপরাধ কিংবা বহির্ম্মুখতা যদি সমাজে ও সাহিত্যে সর্ব্বসাধারণে সংক্রামিত ও প্রচারিত থাকে, তবেই যে তাহা গ্রহণীয় ও বরণীয় হইবে—এরূপ যুক্তি অধিকতর আশ্চর্য্যজনক। যদিও গতানুগতিকতার মোহ ও সংক্রামকতা সাধারণ লোক অতিক্রম করিতে পারে না, তথাপি জীবশ্রেষ্ঠ মানবজাতির পক্ষে সুযুক্তি-সমর্থিত সত্যের অনুসন্ধানই আবশ্যক। শ্রীমদ্ভাগবতাদি সংস্কৃত-সাহিত্যে, শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি যাবতীয় বাঙ্গালা-বৈষ্ণব-সাহিত্যে বিষ্ণু, বৈষ্ণব, ভগবন্নাম, মহাপ্রসাদ, ভগবদ্ধাম, ভগবদ্ভক্তি—ইহাদিগকে সর্ব্বদা 'শ্রী'-যুক্ত করিয়াই বর্ণন করিবার বিধি আছে। নিত্য 'শ্রী'-যুক্তকে 'শ্রী'-হীন করিবার চেষ্টা কি রূপে সাহিত্য-সংস্কারের মর্য্যাদা লাভ করিতে পারে,—তাহা সুধীগণের বিচার্য্য। আধুনিক কালে যদি সমগ্র সমাজও মস্তকে শিখা-সংরক্ষণ, অঙ্গে তিলক-অঙ্কন, কণ্ঠে তুলসী মালিকা-ধারণ প্রভৃতি ভক্তি-শিষ্টাচারকে অসভ্যতা বলিয়া মনে করে এবং ঐরূপ শিষ্টগণকে বিদ্রূপ করে, তাহা হইলেও যে তাহা সর্ব্ববাদিসম্মত ব্যবস্থা বা শিষ্টাচার বলিয়া গৃহীত হইবে, ইহারই বা যুক্ত কি?

যখন বৈষ্ণব ও বৈষ্ণবোত্তমগণ 'শ্রীপাদ', 'শ্রীল', শ্রীমৎ' 'ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী' প্রভৃতি 'শ্রী' সংযুক্তরূপে কীর্ত্তিত হন, তখন তাঁহাদেরও আরাধ্য সচ্চিদানন্দবিগ্রহ সর্ব্বকারণ কারণ শ্রীচৈতন্য বা শ্রীনিত্যানন্দ বা শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু যে 'শ্রী'-যুক্ত হইয়া নিত্য কীর্ত্তিত হইবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? নিখিল অমরগণ যাঁহাদের পদনখের সেবাশ্রী-সিন্ধুর কণা স্পর্শ করিতে পারিয়া আপনাদিগকে কৃতকৃতার্থ মনে করেন, তাঁহারা 'শ্রী'-যুক্ত হইয়া অভিহিত হইবেন, ইহা বুঝিতে না পারাই বহির্ম্মুখতার চরম।

গয়াক্ষেত্র

গয়া বহু প্রাচীনকাল হইতে পরমপবিত্র ও প্রধান তীর্থ বলিয়া হিন্দুগণের নিকট সুপরিচিত হইয়া রহিয়াছে। পূর্ব্বে এইস্থান জরাসন্ধের রাজত্বের অধীন 'মগধ'-নামে খ্যাত ছিল। এইস্থান শৈলমালা দ্বারা পরিবেষ্টিত ও সুশোভিত। পিতৃপুরুষ বা প্রেতাদির উদ্দেশ্যে পিণ্ড প্রদান ও তদনুকূলে নানাপ্রকার অনুষ্ঠানের জন্যই গয়াতীর্থ সমধিক বিখ্যাত। গয়াতীর্থের বৃত্তান্ত ও মাহাত্ম্য বিবিধ পুরাণশাস্ত্রে শুনিতে পাওয়া যায়। গরুড়পুরাণ ৮২-৮৬ অধ্যায়, বায়ুপুরাণ (শ্বেঃ বঃ কঃ) ১—৮ অধ্যায়, অগ্নিপুরাণ ১১৪-১১৬ অধ্যায়, বিষ্ণুপুরাণ ২ অং ১৬ অধ্যায়, পদ্মপুরাণ স্বর্গখণ্ড আদি ১৯ অধ্যায়, রামায়ণ অযোধ্যাকাণ্ড ১০৭। ১১১-১১২; মহাভারত বনপর্ব্ব ৮৪, ৮৭ ও ৯৫ অধ্যায়; অনুশাসনপর্ব্ব ২৫ অধ্যায়; হরিবংশ ১০ম অধ্যায় প্রভৃতিতে গয়ার মাহাত্ম্য ও বৃত্তান্ত বিস্তারিত ভাবে বর্ণিত রহিয়াছে।

প্রত্নতত্ত্ববিৎ কানিংহাম, রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র, স্যর উইলিয়াম হান্টার * প্রভৃতি মনীষিগণের বিচারে গয়া প্রথমে বৌদ্ধতীর্থ বলিয়াই প্রসিদ্ধ ছিল। তাঁহারা বলেন,—বৌদ্ধগণের অধঃপতনের পর হিন্দুগণ বৌদ্ধকীর্ত্তির উপর বিষ্ণুগয়া স্থাপন করেন। পুরীর শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দির ও ভুবনেশ্বরের শ্রীমন্দির প্রভৃতি

সম্বন্ধেও পাশ্চাত্য মনীষি সম্প্রদায় ও তাঁহাদের মতাবলম্বিগণের এইরূপ মত শুনা যায়। আমরা গৌড়ীয় ঐ মতের অর্ব্বাচীনতা যুক্তি ও ইতিহাসের সাহায্যে অনেকবারই প্রদর্শন করিয়াছি। এখন গয়া সম্বন্ধে ঐ সকল মনীষি-সম্প্রদায়ের ঐরূপ মতের কিছু সমালোচনা করিব। বৌদ্ধ-প্রাধান্যের উপর বিষ্ণুগয়া নির্ম্মিত হওয়া দূরে থাকুক, বুদ্ধদেবের জন্মের বহু পূর্ব্ব হইতেই গয়া যে সনাতনধর্ম্মাবলম্বিগণের তীর্থ বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল, তাহার সাক্ষ্য আমরা বাল্মীকির রামায়ণ ও ব্যাসের মহাভরতের মধ্যে দেখিতে পাই। বাল্মীকি রামায়ণে এইরূপ লিখিত আছে,—

* Cunninggham's Archaeological Survey Reports Vol. 1. 111, Raja Rajendra Lal Mittra's "Budha Gaya", Sir W. W. Hunter's "Imperial Gazetter" of India (2nd Editon) Vol. V. P. 47.

শ্রূয়তে ধীমতা তাত শ্রুতির্গীতা যশস্বিনা।
গয়েন যজমানেন গয়েম্বেব পিতৃন্ প্রতি।।
পুন্নাম্নো নরকাদ্ যস্মাৎ পিতরং ত্রায়তে সুতঃ।
তস্মাৎ পুত্র ইতি প্রোক্তঃ পিতৃ ন যঃ পাতি সর্ব্বতঃ।।

(অযোধ্যাকাণ্ড ১০৭।১১-১২)

গয়া বিষ্ণুর ক্ষেত্র বলিয়াই চিরবিদিত। কিন্তু বিষ্ণুর অসুরমোহনাবতার বুদ্ধদেবের আচার-প্রচারে এক শ্রেণীর লোক বিমোহিত হইয়াছিলেন। ইহারাই বুদ্ধকে ‘বিষ্ণু’ হইতে স্বতন্ত্র নায়ক-বিশেষ জ্ঞান করিয়াছিলেন। এজন্য তাঁহারা আপনাদিগকে বিষ্ণুর উপাসক ‘বৈষ্ণব’ বলিয়া জানিবার পরিবর্ত্তে ‘বৌদ্ধ’ বলিয়াই আত্ম-পরিচয় প্রদান করিতে যত্নবিশিষ্ট হইয়াছেন।

বিষ্ণুর নিঃশ্বাস হইতেই বেদ নির্গত হইয়াছে। বিষ্ণুই বেদের উদ্ধারক, সংরক্ষক ও প্রচারক। বুদ্ধমূর্ত্তিতে বিষ্ণু বেদের কর্ম্মকাণ্ডের অপব্যবহার নিরাস করিয়াছেন; কিন্তু তাহা বুঝিতে না পারিয়া এক শ্রেণীর লোক বুদ্ধ বিষ্ণুকে বেদের নিন্দক ও বেদবিরোধী অবিষ্ণু বলিয়া বিচার করিয়াছিলেন। ঐ সকল ব্যক্তি কালক্রমে প্রধান দুইভাগে বিভক্ত হইয়া ‘বৌদ্ধ’ ও ‘পাষণ্ডী হিন্দু’ নামে পরিচিত হইলেন। ইঁহারা উভয়েই অবৈষ্ণব বা বিষ্ণুর বিরোধী। ‘পাষণ্ডী হিন্দুগণ’ মুখে বিষ্ণু ও বেদকে স্বীকার করিলেও কার্য্যতঃ বিষ্ণু ও বেদের বিরুদ্ধ ও নিষিদ্ধ কার্য্যেরই অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন এবং ঐ সকল বিষ্ণু সেবাবিরোধী আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকলাপকেই হিন্দুধর্ম্মের বা সনাতনধর্ম্মের অনুষ্ঠান বলিয়া প্রচার করেন। ইহারা ‘প্রচ্ছন্নবৌদ্ধ’; ইহাদেরই আর এক শ্রেণী ‘নির্ব্বিশেষবাদী’ বা ‘মায়াবাদী’। পাষণ্ডী হিন্দুগণ কখনও বা পঞ্চোপাসনার ক্রমপরিণতিতে নির্ব্বিশেষবাদী। চিজ্জড়সমন্বয়বাদী, পঞ্চোপাসক, নির্ব্বিশেষবাদী ইঁহারা সকলেই কার্য্যতঃ বিষ্ণু ও শ্রুতির বিরুদ্ধ আচরণকারী এবং বেদ ও বিষ্ণুর প্রতি মৌখিক বা লোকদেখান' সম্মান-প্রদর্শনকারী প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ। শ্রীচৈতন্যদেব ইঁহাদিগকে স্পষ্ট বৌদ্ধ অপেক্ষাও অধিকতর নাস্তিক বলিয়াছেন,—

বেদ না মানিয়া বৌদ্ধ হয়ত' নাস্তিক।
বেদাশ্রয়ে নাস্তিক্যবাদ বৌদ্ধকে অধিক।।

বর্ত্তমানে পৃথগ্‌ভাবে চিহ্নিত ও পরিচিত করাইবার জন্য যে 'বিষ্ণুগয়া' ও 'বুদ্ধগয়া' নামে দুইটি পৃথক্ গয়ার অস্তিত্ব নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে, তাহা গয়ার অসম্যক্ ও আগন্তুক ঐতিহাসিক পরিচয় মাত্র, বস্তুতঃ সমগ্র গয়াই বিষ্ণুতীর্থ।

পুরাণে 'গয়া' নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে নানাপ্রকার আখ্যায়িকা শুনিতে পাওয়া যায়। তাহা হয়ত অনেকেরই সুপরিচিত, এজন্য আমরা সেই সকল প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া প্রবন্ধ বিস্তার করিব না।

গয়াতীর্থের নামোৎপত্তি সম্বন্ধে প্রধানতঃ দুইটি বিবরণ সুপ্রসিদ্ধ। (১) অমূর্ত্ত রাজার পুত্র রাজর্ষি 'গয়' একটি যজ্ঞ করিয়া দেবতাগণকে প্রচুর ধনসম্পৎ দান করিয়াছিলেন, তাহাতে দেবগণ প্রীত হইয়া ঐ যজ্ঞক্ষেত্র 'গয়' নৃপতির নাম হইতে 'গয়া' নামে প্রসিদ্ধ হইবে, এইরূপ বরদান করেন। (২) এই স্থানে ত্রিপুরাসুরের পুত্র গয়াসুর নিহত হয়। কুলগুরু শুক্রাচার্য্যের নিকট গয়াসুর বেদবেদাঙ্গ ধর্ম্মশাস্ত্রাদি অধ্যয়ন পূর্ব্বক কঠোর তপস্যা আরম্ভ করেন, ইহার তপস্যা-প্রভাবে দেবতাগণ ভীত ও তস্ত্র হইয়া উঠিয়াছিলেন। দেবতাগণ তাঁহাদের সমস্ত শক্তি ও বল প্রয়োগ এবং গয়াসুরের মস্তকে 'ধর্ম্মশিলা' নামক একটি শিলা স্থাপন করিয়া উক্ত অসুরকে চাপিয়া রাখিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু দেবতাগণ কোন ক্রমেই অসুরকে নির্য্যাতিত করিতে পারেন নাই। গয়াসুর কঠোর তপস্যাপ্রভাবে অমিত বল লাভ করিয়াছিল। অবশেষে দেবতাগণ গদাধর বিষ্ণুর শরণাগত হইলে বিষ্ণু গদার আঘাতে গয়াসুরের শরীরকে নিস্পন্দ করিয়াছিলেন। গয়াসুরের মৃত্যুকালে গদাধর উক্ত অসুরকে বর দিতে চাহিলে গয়াসুর বলিয়াছিল,—'ভগবান্, যেস্থানে আমি আহত হইয়াছি, সেইস্থানেই যেন আমি শিলা হইয়া থাকি।' বাঞ্ছাকল্পতরু ভগবান্ গয়াসুরের সেই অভিলাষ পূর্ণ করিলেন এবং কৃপাপূর্ব্বক সেই শিলার উপর তাঁহার পাদপদ্ম স্থাপন করিলেন। গয়াসুরের অন্যতম প্রার্থনানুসারে এইস্থানে যে কেহ পিণ্ডদান ও তর্পণ করিবেন, তাঁহার পিতৃপুরুষ বা স্বজন সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া স্বর্গে গমন করিতে পারিবেন, এইরূপও একটি বর গদাধর পরিপূরণ করিয়াছিলেন। এই সময় হইতেই এইস্থান গয়াক্ষেত্র ও কর্ম্মমার্গীয় ব্যক্তিগণের পিতৃতর্পণের প্রধানস্থান বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছে।

অসুরগণ প্রস্তরাদি স্থাবরদেহ লাভকেই তাহাদের তপস্যার চরম প্রয়োজন মনে করিয়া থাকে—ইহা আমরা গৌর-রামানন্দ-সংবাদেও দেখিতে পাই।

মুক্তি ভুক্তি বাঞ্ছে যেই, কাঁহা দুহাঁর গতি।
স্থাবর-দেহ, দেব-দেহ যৈছে অবস্থিতি।।

(চৈঃ চঃ মঃ ৮ম পঃ)

ইহাই নির্ব্বিশেষ গতি। এই নির্ব্বিশেষ গতি দুই প্রকার। দার্শনিকের পরিভাষায় (১) 'অচিন্মাত্রবাদ' ও (২) 'চিন্মাত্রবাদ'। অচিন্মাত্রবাদে একেবারে অচিৎ বা জড় অর্থাৎ প্রস্তরাদির ন্যায় অনুভূতি-রহিত হইয়া

যাওয়ার অবস্থা বুঝায়। চিন্মাত্রবাদে অচিৎ অর্থাৎ সম্পূর্ণ জড়াবস্থালাভের কামনা নাই বটে, কিন্তু কেবল-চেতনময় ভাব বা চিন্মাত্রে পর্য্যবসিত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা আছে। বস্তুতঃ 'জ্ঞাতা' ও 'জ্ঞেয়' ব্যতীত কেবল-চেতনময় বা জ্ঞানময় অবস্থা অস্বাভাবিক ও নিরর্থক। জ্ঞান বা আনন্দ থাকিলেই জ্ঞানের ও আনন্দের একজন জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় অবশ্যই থাকিবে। যেখানে কেবল চিন্মাত্রবাদ আকাশকুসুমের ন্যায় সিদ্ধির স্বপ্নরূপে স্বীকৃত হইয়াছে, সেখানে উহা অচিন্মাত্রবাদেরই প্রচ্ছন্ন প্রতীক মাত্র। শ্রীচৈতন্যদেব চিন্মাত্রবাদকে 'প্রচ্ছন্নবৌদ্ধবাদ' অর্থাৎ প্রচ্ছন্ন অচিন্মাত্রবাদ বলিয়াছেন।

গয়ার একটি উপনগর 'বুদ্ধগয়া' নামে পরিচিত। এইস্থান গয়া হইতে ৭ মাইল দূরে নিরঞ্জনা নদীর তীরে অবস্থিত। কেহ কেহ এই স্থানের প্রাচীন নাম উরুবিল্ল বলিয়া থাকেন। শাক্যসিংহ যখন শান্তি-লাভের জন্য নিজ রাজ্যৈশ্বর্য্য, প্রিয়তমা পত্নী, আত্মীয়-স্বজন—সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করিতেছিলেন, তখন কোথায়ও হৃদয়ের তৃষ্ণা শান্ত হইতেছে না দেখিযা অবশেষে উরুবিল্লগ্রামে আসিয়া উপনীত হন এবং তথায় ষড়্বার্ষিক ব্রতের অনুষ্ঠান করেন। তাহাতেও তাঁহার শান্তি লাভ হইল না। তখন তিনি নিরঞ্জনা নদীর জলে স্নান করিয়া শান্তি দূর করেন ও সুজাতানাম্নী এক কন্যার হস্তে অন্ন ভোজন করিয়া পরিতৃপ্ত হন। তৎপরে তিনি বোধিবৃক্ষ-মূলে "মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন"—এই সঙ্কল্প করিয়া কঠোর সাধনায় প্রবৃত্ত হন ও তথায় বুদ্ধত্ব লাভ করেন। এই জন্যই উরুবিল্লগ্রাম 'বুধগয়া' বা 'বুদ্ধগয়া' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। 'ললিতবিস্তর' গ্রন্থের ত্রয়োদশ অধ্যায়ে লিখিত আছে—"শাক্যসিংহ সংসার পরিত্যাগ পূর্ব্বক গয়াক্ষেত্রের অন্তর্গত গয়াশীর্ষ পর্ব্বত হইয়া নৈরঞ্জনা নদী তীরে উপস্থিত হন এবং উাহরই অদূরে বোধিতরুমূলে বুদ্ধপদ লাভ করেন।' এই স্থনে শাক্যসিংহ পূর্ব্বাভিমুখী হইয়া ছত্রিশ দিন পর্য্যন্ত অনাহারে তপস্যা করিয়াছিলেন। এই স্থানে বুদ্ধদেবের একটি বিশাল প্রস্তরমূর্ত্তি উপবিষ্ট অবস্থা অবস্থিত আছেন। মূর্ত্তির অঙ্গ সোণার পাতে মণ্ডিত। বুদ্ধগয়ার মন্দির ভূগর্ভে প্রোথিত ছিল। কেবলমাত্র মন্দিরের চূড়ার কিয়দংশ ঈষৎ বাহির হইতে দেখা যাইত। ৪০১ খৃষ্টাব্দে চীন-পরিব্রাজক ফাহিয়ান্ গয়ানগরী বিধবস্ত ও জনমানবহীন মরুপ্রায় দেখিয়া গিয়াছিলেন। ১৮৮১ সালে গভর্ণমেন্টের সহায়তার বালুকাস্তূপ অপসারিত করিয়া এই মন্দিরের উদ্ধার-সাধন হইয়াছে। এই মন্দিরটি ১৭০ ফিট উচ্চ। মন্দিরের পশ্চিমদিকে একটি অশ্বত্থবৃক্ষ আছে। এই বৃক্ষের দক্ষিণভাগে হিন্দুগণ প্রাচীনকাল হইতে পিতৃপুরুষের পিণ্ডদানাদি করিয়া আসিতেছেন; সুতরাং এই স্থান যে, শাক্যসিংহের পূর্ব্ব হইতেও হিন্দুগণের তীর্থরূপে পরিচিত ছিল, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে চীনপরিব্রাজক হিউএন্ সিয়াং গয়ানগরীতে আগমন করেন। তখন তথায় প্রায় হাজার ঘর ব্রাহ্মণের বাস ছিল।

বুদ্ধদেব নিরঞ্জনা নদীতে স্নান করিয়া শান্তি লাভ করিয়াছিলেন। 'নিরঞ্জনা' ও 'বিরজা' শব্দ-ভেদ মাত্র; বস্তুতঃ একই অর্থদ্যোতক। যাহাতে অঞ্জন অর্থাৎ কোন প্রকার মলিনতা নাই, তাহাই নিরঞ্জন। যাহা হইতে সমস্ত রজোধর্ম্ম বিগত হইয়াছে, তাহাই বিরজ; নদীর নাম বলিয়া স্ত্রীলিঙ্গে 'আপ্' প্রত্যয় হইয়াছে। শাক্যসিংহ

বা কপিল প্রভৃতি মনীষিগণের আকাঙ্ক্ষিত স্থান—বিরজা। বিরজার পর চিন্মাত্রবাদিগণের আকাঙ্ক্ষিত জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মের লোক ভেদ করিয়া চিদ্‌বিলাস-পরায়ণ বৈষ্ণবগণের পরব্যোম। পরব্যোমের নিম্নার্দ্ধই আড়াই প্রকার রসের সেবিত নারায়ণের বৈকুণ্ঠ, আর উত্তরার্দ্ধই পরিপূর্ণ বিশ্রম্ভযুক্ত পঞ্চরস-সেবিত অদ্ভুত ক্রমপরায়ণ স্বভাব কৃষ্ণলোক বা গোলোক। তারতম্য-বিচারে পরব্যোম নিম্নার্দ্ধ বৈকুণ্ঠ ও তদ্ভিন্ন ব্রহ্মাণ্ডের অভাবশংসী বিচার সমূহ গোলোকেরেই ব্যতিরেকভাব ও অংশান্তর্গত।

গয়াতীর্থে গয়াসুর প্রস্তরত্বে পরিণত হইবার আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছিল। এই আদর্শ অচিন্মাত্রবাদেরই স্বরূপ। এই অচিন্মাত্রবাদের উপরেই কর্ম্মজড়স্মার্ত্ত ও পঞ্চোপাসকগণের ফলভোগবাদ এবং নির্ব্বিশেষবাদীর ফলত্যাগবাদের শ্রাদ্ধপিণ্ড রচিত হয়। বিমুখমোহনাবতার শাক্যসিংহ তাঁহার বোধিসত্ত্বালাভ বা নির্ব্বাণবাদের মধ্যে গয়াসুরের অচিন্মাত্রবাদের আদর্শেরই দ্বিতীয় পরিশোধিত সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তৎপরে চিন্মাত্রবাদের প্রচারক দ্বিতীয় বিমুখমোহনাবতার আচার্য্য শঙ্করের ফলত্যাগবাদের মহিমায় এই স্থান প্লাবিত হইয়াছিল। ফলভোগের মধ্য দিয়া ফলত্যাগবাদের আকাঙ্ক্ষা বা স্বপ্ন এই সময় তথাকথিত হিন্দুধর্ম্মাবলম্বীর চিত্তকে গ্রাস করিয়াছিল। ইহার পরে গয়ার বিষ্ণুপাদের মন্দিরের সেবকগণ সকলেই অদ্যাবধি মধ্বানুগ আচার ও বিচার গ্রহণ করিয়াছেন। তাই এখনও বিষ্ণুপাদের মন্দিরের দ্বারে শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের আলেখ্য ও শ্রীমাধ্বসিংহাসনসমূহ শোভিত আছে। পরবর্ত্তি সময়ে গয়ার বিষ্ণুপাদের মন্দিরের দ্বারে গয়েশ্বরী, দত্তাত্রেয়, শ্রীশঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি মূর্ত্তি বসাইয়া শ্রীশঙ্করানুগ পঞ্চোপাসনা-পদ্ধতিও প্রচলনের চেষ্টা হইয়াছে।

এই স্থনে মধ্বানুগত্যের এইরূপ প্রবল বিচার ছিল বলিয়াই মধ্ব-সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী শ্রীঈশ্বরপুরীপাদ গয়াক্ষেত্রে বিচরণ করিতেন এবং বর্ত্তমানকালেও শ্রীমাধ্ববৈষ্ণবগণ উত্তর ভারতের মুখ্যতীর্থ বলিয়া গয়া দর্শন করেন এবং এজন্যই শ্রীগৌরসুন্দর এই স্থানে আগমন করিয়া একদিকে মধ্বানুগত্যের নামে যেসকল আনুষ্ঠানিক কর্ম্মকাণ্ড পরবর্ত্তিকালে তত্ত্ববাদি-শাখায় প্রবেশ করিয়াছিল, তাহা নিরাসকল্পে দিব্যজ্ঞান-লাভ-লীলা-প্রকাশের পূর্ব্বে অজ্ঞান কর্ম্মসঙ্গিগণের পক্ষে ঐরূপ কর্ম্মকাণ্ডের সাময়িক প্রয়োজনীয়তার কথা স্বয়ং আচরণ করিয়া * জানাইয়াছিলেন। বস্তুতঃ ইহা গৌরসুন্দরের কর্ম্মমার্গের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন বা প্রেরণা-প্রদান নহে, তাহা শব্দের অবিদ্বদ্রূঢ়িরূপ প্রেতের উদ্দেশ্যে পিণ্ডদান ও কর্ম্মকাণ্ড-নিরাস-মাত্র। কারণ, এই গয়ায়ই জগদ্‌গুরুর লীলাভিনয়কারী শ্রীমন্মহাপ্রভু মধ্ব-সম্প্রদায়ের আচার্য্য শ্রীঈশ্বরপুরীর নিকট দীক্ষালীলা প্রকাশ করিয়া ব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়-পরম্পরা আবিষ্কার ও তাহার অব্যবহিত পরেই শব্দের বিদ্বদ্রূঢ়ি ও প্রেমভক্তি প্রকাশের প্রথম প্রস্তাবনা করিয়াছিলেন। গদাধর বিষ্ণুর পাদপদ্ম স্পর্শে গয়াসুর প্রস্তরত্বে পরিণত হইয়া নির্ব্বিশেষগতি লাভ করিয়াছিল। কিন্তু হতারিগতিদায়ক স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণের ঔদার্য্যময় স্বরূপ শ্রীগৌর-সুন্দরের পাদস্পর্শে এইস্থান প্রচ্ছন্ন ও স্পষ্ট যাবতীয় অচিন্মাত্রবাদের বিচার হইতে মুক্ত হইয়া চিদ্‌বিলাস-

---

* ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম্।
যোযয়েৎ সর্ব্বকর্ম্মাণি বিদ্বান্ মুক্তঃ সমাচরন্।। (গীঃ ৩।২৬)

সিদ্ধান্তের দিব্যজ্ঞান-বিচারে উদ্ভাসিত হইয়াছিল। এখানে শাক্যসিংহের দিব্যজ্ঞান লাভের অভিনয় ও সমগ্র বিষ্ণুতত্ত্বের অবতারী শ্রীগৌরসুন্দরের দিব্যজ্ঞান-লাভ-লীলার আদর্শ বিমুখমোহন ও উন্মুখের আত্যন্তিক মঙ্গলোদয় করিয়াছে। এই সত্যবাণী ঘোষণা ও দিব্যজ্ঞানের পথ প্রদর্শনের জন্যই গয়ায় শ্রীগৌড়ীয়মঠস্থাপনের সূচনা হইয়াছে।

দৈব-বর্ণাশ্রম

অকপট ও ঐকান্তিক বিষ্ণুসেবার প্রতি বহির্ম্মুখ ভোগপর সাধারণ তথাকথিত বর্ণাশ্রম হইতে পৃথগ্‌ভাবে চিহ্নিত করিবার জন্য সাত্বত শাস্ত্রসমূহ বৈষ্ণবাচার্য্যশাসনানুগত বিষ্ণুসেবাপর বর্ণ ও আশ্রমকে 'দৈব-বর্ণাশ্রম' আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবদগীতা, শ্রীপদ্মপুরাণ প্রভৃতি সাত্বতশাস্ত্রে বিষ্ণুভক্ত-সম্প্রদায় 'দৈব-সর্গ' ও বিষ্ণু-বিদ্বেষী বা বিষ্ণুবিমুখ-সম্প্রদায় 'অদৈব-সর্গ' বা 'আসুরসৃষ্টি' বলিয়া উক্ত হইয়াছেন।

"বিষ্ণুভক্তো ভবেদ্দৈব আসুরস্তদ্বিপর্য্যয়ঃ।।"

মনুষ্যের আন্তরবৃত্তি বা স্বভাব লক্ষ্য করিয়া বর্ণ ও আশ্রম-নিরূপণের সুবৈজ্ঞানিক প্রণালী যে অতি সুপ্রাচীনকাল হইতে সনাতনধর্ম্মের মধ্যে প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে, ইহার সাক্ষ্য বেদ, মহাভারত, ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র প্রচুর পরিমাণে প্রদান করিয়াছেন। সেই সকল প্রমাণ উল্লেখ করিয়া প্রবন্ধ বিস্তার করিবার প্রয়োজন এখানে নাই। বাঙ্গালা ১৩১৮ সালের ২২শে ভাদ্র মেদিনীপুর জেলার বালিঘাই-উদ্ধবপুর গ্রামে ভারতের বিশিষ্ট স্মার্ত্ত ও বৈষ্ণব পণ্ডিতমণ্ডলিমণ্ডিত-সভায় ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ "ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবের তারতম্য বিষয়ক সিদ্ধান্ত"-নামক যে একটি ক্রমিক প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন, তাহাতে ঐ সকল প্রমাণ প্রচুর পরিমাণে উদ্ধৃত আছে। বর্ত্তমানে ঐ গ্রন্থের ("ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব") দ্বিতীয় সংস্করণ শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত 'শ্রীসজ্জনতোষণী' 'গৌড়ীয়' 'দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ' প্রভৃতি পারমার্থিক সাময়িক পত্রে এবং ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিভিন্ন গ্রন্থে বহু প্রমাণ, যুক্তি ও বহু আলোচনা দৈব-বর্ণাশ্রম-সম্বন্ধে সম্পুটিত রহিয়াছে।

বৃত্তি বা স্বভাবানুসারে বর্ণ ও আশ্রম-নিরূপণের প্রণালী কেবল যে শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা, তাহা নহে; তাহা যুক্তি ও বিজ্ঞান-সম্মত বিচার। যাঁহার চিত্ত শম-দমাদি গুণে বিভূষিত, যাঁহাতে ঐকান্তিক বিষ্ণুসেবার স্বাভাবিকী রুচিই স্বরূপলক্ষণ এবং সত্য, দান, অদ্রোহ, অনিষ্ঠুরতা, হরিসেবাবিমুখ-বিষয়ে লজ্জা, ইতর বিষয়ে ঘৃণা প্রভৃতি তটস্থ লক্ষণ দৃষ্ট হয়, তাঁহাকে ক্ষাত্রোচিত যুদ্ধ-কার্য্যে কিংবা বণিগ্‌বৃত্তিতে অথবা শূদ্রতুল্য কার্য্যে নিযুক্ত করিলে ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিসমাজগত বিষময় ফল উৎপন্ন হইবে,—ইহা যুক্তিবাদিগণও অস্বীকার করিতে পারিবেন না। আবার শূদ্র, বৈশ্য বা ক্ষাত্র-বৃত্তি-সম্পন্ন ব্যক্তিকেও ব্রাহ্মণোচিত কার্য্যে কৃত্রিমভাবে নিযুক্ত করিলে তদ্দ্বারা হিতে বিপরীত ফল হইবে। আশ্রম সম্বন্ধেও সেই ব্যবস্থা। যাহার স্বভাব অত্যন্ত

তমোগুণান্বিত, যে কাম-ক্রোধলোভাদিতে আচ্ছন্ন, দাম্ভিক ও দুষ্কার্য্যপরাণ, সেইরূপ শূদ্রস্বভাবতুল্য ব্যক্তি ব্রাহ্মণ-স্বভাবের অবস্থান সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণের ছল করিলে সে কোনদিন সন্ন্যাসের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারিবে না। সেরূপ ব্যক্তি পতিত ও বান্তাশী হইয়া পড়িবে অথবা বেশোজীবী কিম্বা গোপনে নানাপ্রকার ব্যভিচারসম্পন্ন হইবেই হইবে।

অনেক বারই কএকজন জিজ্ঞাসুর প্রাণে প্রশ্ন উঠিয়াছে যে, আচার্য্যের দৈব-বর্ণাশ্রমের আশ্রমগত ব্যবস্থায় ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসী—এই চারিপ্রকার আশ্রমীর যেরূপ স্পষ্টবিভাগ ও আদর্শ দেখিতে পাওয়া যায়, দৈব-বর্ণ-সম্বন্ধে শূদ্র, বৈশ্য, ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ—এই চারিপ্রকার বর্ণের বিভাগ সেরূপ স্পষ্টভাবে দেখিতে পাওয়া যায় না কেন? দৈব-বর্ণাশ্রমের মধ্যে কি কেবল আশ্রমের চারিপ্রকার বিভাগ থাকিবে, আর বর্ণ কি এক পারমার্থিক ব্রাহ্মণ-মাত্রেই পরিসমাপ্ত হইবে? পারমার্থিক ক্ষত্রিয়, পারমার্থিক বৈশ্য বা পারমার্থিক শূদ্র কি থাকিবেন না?

চারিপ্রকার আশ্রমের ন্যায় বিষ্ণুভক্ত সাধকগণের মধ্যে চারিপ্রকার বর্ণও আছে এবং সেই চারিপ্রকার বর্ণের নির্দ্দেশ শ্রীমদভাগবত-শাস্ত্রের ''যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং'' (ভাঃ ৭।১১।৩২) শ্লোকানুসারেই হইয়াছে। যাঁহাদের স্বাভাবিক রুচি বা বৃত্তি একমাত্র অন্যাভিলাষশূন্য বিষ্ণুর শ্রবণ-কীর্ত্তনের প্রতিই গতিবিশিষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়; যাঁহারা তৃণাদপি সুনীচ, তরুর ন্যায় সহিষ্ণু, অমানী ও মানদ হইয়া শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে শ্রুত শ্রীচৈতন্যবাণী অনুক্ষণ শ্রবণ-কীর্ত্তন করিতেছেন; যাঁহাদের হৃদয় হরিসেবাময়ী সরলতা ও আত্মসমর্পণ বা শরণাগতির ভাবে পরিপ্লুত; যাঁহারা একান্ত সত্যরত; যাঁহারা বর্ণাশ্রমাতীত পরমহংস-শিরোমণি শ্রীগুরু-পাদপদ্মের বাণী আচার-প্রচারে স্বাভাবিক বৃত্তিযুক্ত ও স্বাভাবিক রুচিবিরিষ্ট; যাঁহারা কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাশা-হীন হইয়া বাণীর সেবায় নিযুক্ত; তাঁহারাই পারমার্থিক ব্রাহ্মণ। সরলতার সহিত শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের বাণীর **সেবায়** স্বাভাবিকী প্রবৃত্তিই পারমার্থিক ব্রাহ্মণতার লক্ষণ। 'ভট্টদেশিক', 'আচার্য্য', 'উপদেশকা'দি পারমার্থিক ব্রাহ্মণোচিত পদবী। পারমার্থিক ব্রাহ্মণ শ্রীগুরুপাদপদ্ম-লব্ধ পরমার্থ-যজন, পরমার্থের যাজন, অধ্যাপনা, জগতে হরিকথা দান ও বৈষ্ণব-সেবার জন্য প্রতিগ্রহ করিয়া থাকেন। পারমার্থিক ব্রাহ্মণের প্রতিগ্রহ ও আর্থিক ব্রাহ্মণের প্রতিগ্রহের মধ্যে পার্থক্য এই যে, আর্থিক বিপ্র নিজের বা নিজ ভোগ্যগণের জন্য অর্থ- দ্রবিণাদি গ্রহণ করিয়া থাকেন; কিন্তু শ্রীগৌড়ীয়মঠের পারমার্থিক ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসিগণের বা পারমার্থিক ব্রাহ্মণ মহামহোপদেশকগণের যে প্রতিগ্রহ, তাহা বৈষ্ণবসেবার জন্য,—আত্মসেবার জন্য নহে। পারমার্থিক ব্রাহ্মণকুলভূষণ মহামহোপদেশক আচার্য্য শ্রীপাদ নারায়ণ দাস ভক্তিসুধাকর প্রভু তাঁহার সর্ব্বস্ব শ্রীগুরু- পাদপদ্মে সমর্পনপূর্ব্বক বাণী ও লেখনীর দ্বারা ''শ্রীচৈতন্যবাণীর দান'' জগতে দান করিতেছেন। তিনি কখনও নিজের জন্য বা নিজের ভোগ্য-বিচারে কাহারও জন্য এক কপর্দ্দক ও প্রতিগ্রহ করেন না। মহা- মহোপদেশক শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ প্রভু গৌড়ীয়-প্রতিষ্ঠানের গুরুসেবাপরায়ণ বৈষ্ণবগণের সেবার জন্য যে ভিক্ষা বা প্রতিগ্রহ করিয়া থাকেন, তাহা নির্গুণ বৃত্তি বা প্রকৃত পারমার্থিক ব্রাহ্মণের বৃত্তি। কথিত হয়

যে, রাজদরবার 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধিকে একমাত্র ব্রাহ্মণের জন্যই সংরক্ষণ করিয়াছেন; তবে বিশেষ ক্ষেত্রে অন্যথা যে না হয়, তাহা নহে। পারমার্থিক রাজ্যেও পারমার্থিক ব্রাহ্মণগণই প্রৌঢ় পারমার্থিক পাণ্ডিত্যলাভের ফলে বৈষ্ণব-জগতের সম্রাট্‌স্বরূপ শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে 'মহামহোপদেশক' আশীর্ব্বাদ-প্রাপ্তির অধিকারী।

আর যাঁহারা সাক্ষাদ্ভাবে বাণীর সেবায় নৈষ্ঠিকী রুচি অপেক্ষা সেবা-প্রতিষ্ঠানেরই বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যক্তিগণের হরিভজনের সৌকর্য্যার্থ বিধি-ব্যবস্থাদি করিবার প্রতি অধিকতর যোগ্যতা বা রুচিসম্পন্ন, যাঁহাদের স্বভাবে শাসন, নিয়মন বা পালনাদি করিবার রুচি বা যোগ্যতারই অধিক প্রাবল্য দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহারা পারমার্থিক ক্ষত্রিয়। তাঁহারা হরি-গুরু-বৈষ্ণবের প্রীতির জন্যই শাসন, নিয়মন, পালন, নানাপ্রকার সুব্যবস্থাকরণ, প্রতিষ্ঠানের রক্ষার্থ সাম-দানাদি নানাপ্রকার নীতি অবলম্বন করিয়া থাকেন। 'মঠরক্ষক'-আদি পদবী পারমার্থিক ক্ষাত্রোচিত।

যাঁহারা অর্থাদি আনুকূল্যের দ্বারা শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের সেবানিকেতন মঠমন্দিরাদি নির্ম্মাণ বা অর্চ্চনাদি কার্য্যের সহায়তা কিম্বা ভগবৎসেবকগণকে আংশিকভাবে পালন ও পোষণে অধিকতর যোগ্যতা ও রুচিবিশিষ্ট, তাঁহারা পারমার্থিক বৈশ্য। ইঁহারা সর্ব্বস্ব সমর্পণে সমর্থ না হইলেও নিজেদের ভোগ্যবিচারপর অর্থের অংশবিশেষ হরিসেবার অনুকূলে নিযুক্ত করিয়াছেন। 'শ্রেষ্ঠ্যার্য্য' (শ্রেষ্ঠা+আর্য্য) প্রভৃতি উপাধি পারমার্থিক বৈশ্যোচিত।

আর যাঁহারা পরমার্থ-বিষয়ে দীক্ষিতের অভিনয় করিয়াও কি অর্চ্চনাদিকার্য্যে অর্থানুকূল্য, কি ভগবৎসেবা-প্রতিষ্ঠানের রক্ষা, কি আচার্য্যের হরিকীর্ত্তনময় আদর্শ-জীবনের আচার-প্রচার করিবার উপযোগিতা লাভ বা তাহাতে রুচি প্রকাশ করিতেছেন না, যাঁহাদের মধ্যে নানাপ্রকার কপটতা, অন্যাভিলাষ, তমোভাব ও গুরু-বৈষ্ণবের প্রতি অকপট শ্রদ্ধার অভাব তথা হরিকথায়, হরিকার্য্যে ক্রমশঃই শ্লথভাব দৃষ্ট হইতেছে, অথচ যাঁহারা সম্পূর্ণভাবে হরি-গুরু-বৈষ্ণব-বিদ্বেষী পাষণ্ডও নহেন, কিন্তু সময় সময় যাঁহাদের মধ্যে অন্যাভিলাষযুক্ত পরিচর্য্যার ভাবও দেখা যায়, তাঁহারা পারমার্থিক শূদ্রতুল্য। যদি ইঁহারা তাঁহাদের ঐরূপ কপটতা, অন্যাভিলাষাদি অচিরে পরিত্যাগ করিতে যত্নবিশিষ্ট না হন, তাহা হইলে তাঁহারা অতি শীঘ্রই 'দৈব-শূদ্র' পদবী হইতেও পতিত হইয়া অন্ত্যজত্ব প্রাপ্ত হইবেন অর্থাৎ সম্পূর্ণ ভক্তি-সদাচারভ্রষ্ট হইয়া পড়িবেন। ঐরূপ শূদ্রতুল্য ব্যক্তিগণ প্রায়ই পতিত হইয়া থাকেন। ইঁহারা পারমার্থিক ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য—এই পারমার্থিক ত্রিবর্ণের যে সাময়িক পরিচর্য্যাবৃত্তিটুকু প্রদর্শন অথবা যে সাময়িক ভক্তি-সদাচারাদি পালন করিবার অভিনয় প্রদর্শন করেন, তাহা হইতে অচিরেই পতিত হইয়া সমস্ত সমাচার বর্জ্জিত, অধিকতর তমোগুণান্বিত, বিষ্ণু-বৈষ্ণবে আস্থাহীন, কখনও বিদ্বেষী পাষণ্ড হইয়া পড়েন।

বর্ণ ও আশ্রমের অতীত অবস্থার নাম—পারমহংস্যাবস্থা। দৈব ও অদৈব-ভেদে পরমহংসও দুই প্রকার। বস্তুতঃ দৈব-পরমহংসই প্রকৃত পরমহংস, ইহারই অপর নাম—ভাগবত-পরমহংস বা মহাভাগবত।

অদৈবপ্রকৃতির ব্যক্তিগণ যেসকল পরমহংসের চিত্র বা আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাঁহাদের সেই আনুকরণিক 'পরমহংস'-নাম ও আদর্শের নিরর্থকতা প্রতিপাদনের জন্যই অদৈব-পরমহংসরূপ একটি ভেদ পরিকল্পিত হইয়াছে। বস্তুতঃ অদৈব-পরমহংস-শব্দের আদর্শটি ''মাটির সোণার বাটী'র ন্যায় নিরর্থক। অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী, তপস্বী, চিজ্জড়সমন্বয়বাদী ও নানাপ্রকার দাম্ভিক ও পাষণ্ড-সম্প্রদায়ের মধ্যে যে-সকল আনুকরণিক পরমহংসের নাম শুনিতে পাওয়া যায়, তাঁহারা অদৈব পরমহংস (?)। অনেক সময় ইঁহারা অনুকরণ ও কপটতা করিয়া ভাগবত-পরমহংসের ক্রিয়া মুদ্রার অভিনয় প্রদর্শন করিলেও প্রকৃত ভগবৎ-সেবকগণ ইহাদিগকে চিনিয়া লইতে পারেন। কিন্তু জগতের অন্যাভিলাষী সম্প্রদায় দৈব-পরমহংসকে চিনিতে পারেন না, আসুর পরমহংসই তাঁহাদের নিকট 'পরম-সাধু' বলিয়া বিবেচিত হয়। কারণ, ঐরূপ কৃত্রিম সাধুত্ব গণমতের বহির্ম্মুখতার ও মনোধর্ম্মের তৃপ্তি বিধান করে।

পারমার্থিক ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের বিভাগের কথা শুনিয়া আমরা যেন মনে না করি যে, হরি-গুরু-বৈষ্ণবের প্রীতির উদ্দেশ্যে বা তাঁহাদের আদেশে সেবা-প্রতিষ্ঠানের রক্ষণাবেক্ষণাদি কিম্বা অর্চ্চনাদি-বিষয়ে বা হরিকথা-প্রচারে নানাপ্রকার অর্থানুকূল্য প্রভৃতি পারমার্থিক ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যস্বভাবোচিত সেবাকৃত্য করিলে আমরা পারমার্থিক ব্রাহ্মণ হইতে নিম্ন হইয়া গেলাম; অতএব আমরা ঐসকল কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া সকলেই প্রচারক, লেখক, উপদেশক বা বক্তা হইয়া যাইব। আমরা ইহাও যেন মনে না করি,—'আমরা পারমার্থিক ব্রাহ্মণগণকে কেন রক্ষা করিব? তাঁহারা নির্ব্বিঘ্নে, নিশ্চিন্তে শ্রীগুরুপাদপদ্মের মনোঽভীষ্ট যজ্ঞ পূর্ণ করুন,—ইহা আমরা কেন করিতে যাইব, আমরা পরমহংসবর শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবায় কেন সাহায্য করিব?'—এইরূপ বিচার করিলে আমাদের মঙ্গল হইবে না। আমাদের প্রত্যেকের অধিকারোচিত সেবা নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

'স্বে স্বেঽধিকারে যা নিষ্ঠা স গুণঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।'

অধিকার লঙ্ঘন করিলে কোন দিন মঙ্গল হইবে না। তাহাতে শ্রীগুরুপাদপদ্মের বিধান-লঙ্ঘনজনিত অপরাধ উপস্থিত হইবে। অনুকরণ ও প্রতিযোগিতা বৈষ্ণবতা নহে, তাহা মৎসরতা। মৎসরতা ও কপটতা থাকিলে কখনও ব্রাহ্মণতা আসিবে না।

দৈব-বর্ণাশ্রম-সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া আরও কএকটি বিশেষ প্রশ্নের উদয় হয়, তাহা এই,—

১। পারমার্থিক বর্ণ-বিধান কি প্রচলিত স্মার্ত্তবিধানের সহিত প্রতিযোগিতা বা স্মার্ত্ত ব্রাহ্মণাদি বর্ণের সহিত সমকক্ষতা লাভের পিপাসা নহে?

২। পারমার্থিক বর্ণাশ্রম-বিধি কি সমষ্টি বা সমাজগত বিধান, না ব্যক্তিনিষ্ঠ বিধি?

৩। যদি ব্যক্তিনিষ্ঠ বিধিই হয়, তাহা হইলে উহা কি কখনও সমাজ-গত ব্যাপ্তি লাভ করিতে পারে? ব্যক্তিগত বিধিদ্বারা সমাজের কি উপকার হইবে?

৪। পারমার্থিক বর্ণাশ্রম জগতে ব্যবহারোপযোগী বা কার্য্যোপযোগী (practical) কিনা? অথবা উহা আদর্শবাদ মাত্র (idealism)?

৫। দৈব-বর্ণাশ্রমের সকল অঙ্গ পালনোপযোগী কি না? আমরা উপরি-উক্ত প্রশ্নগুলির যুক্তিযুক্ত উত্তর দিবার প্রয়াস করিতেছি ঃ—

১। পারমার্থিক বর্ণ-বিধান প্রচলিত স্মার্ত্ত-বিধানের সহিত কোন মতেই প্রতিযোগিতা নহে। তাহার প্রধান কারণ, পারমার্থিকগণের সমস্ত কার্য্যই ভগবদ্ভক্তি বা পরমার্থের অনুকূল প্রতিকুল বিচারের দ্বারা শাসিত। আর কর্ম্ম-জড়-স্মার্ত্তগণের যাবতীয় বিধি ও অনুষ্ঠান ভোগ বা ধর্ম্মার্থ-কামাদির অনুকূল বা প্রতিকূল বিচারের দ্বারা অনুশাসিত। স্মার্ত্তগণও বলিয়া থাকেন যে, তাঁহারাও পরমার্থ, এমন কি, বিষ্ণুভক্তিমূলেই সমস্ত বিধিব্যবস্থা করিয়া থাকেন; কিন্তু তাঁহাদের পরমার্থ বা বিষ্ণুভক্তির মৌখিক প্রতিজ্ঞা সাময়িক ও ব্যবহারিক। তাঁহারা ধর্ম্মার্থকাম বা মোক্ষের উপাসক; কিন্তু ভগবদ্ভক্তগণ ধর্ম্মার্থকাম ও মোক্ষবাসনাতীত বিষ্ণুভক্তি অর্থাৎ অপ্রাকৃত পুরুষোত্তমের ইন্দ্রিয়তর্পণের উপাসক।

মহাভাগবত অর্থাৎ পরমহংস বৈষ্ণব যখন লোকশিক্ষার্থ আচার্য্যের কার্য্য করিবার জন্য ত্রিদণ্ডাদি আশ্রম-বেষ গ্রহণ বা পারমার্থিক ব্রাহ্মণাদি বর্ণের দ্বারা পরিচিত হইবার অভিনয় করেন, তখন তিনি স্বেচ্ছায় কৃপাপূর্ব্বক অনেক নীচে নামিয়া (?) আসিয়া সেই পরিচয়ের অভিনয় প্রদর্শন করেন। কাজেই ব্রাহ্মণাদি বর্ণের সহিত সমকক্ষতা লাভ করিবার চেষ্টা তাঁহাতে আরোপ করা ত' কোন মতেই যুক্তিযুক্ত হয় না। সকল যুগে আচার্য্যগণ এইরূপ কৃপা প্রদর্শন করেন না। কোন বিশেষ যুগে আচার্য্যের এইরূপ কৃপা দৃষ্ট হয়। এই কৃপারও একটি বিশেষ উদ্দেশ্য আছে। যখন বর্ণাশ্রমাতীত পরমহংস বৈষ্ণবকে দেহাত্মবুদ্ধিবিশিষ্ট কর্ম্মজড়গণ বর্ণ বা আশ্রমসামান্যবুদ্ধিতে দর্শন করেন অর্থাৎ মহাভাগবত বা ভগবৎপার্ষদাদিকে ব্যবহারিক ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র বা অন্ত্যজ জাতির অন্তর্গত, কিম্বা সন্ন্যাসী, বানপ্রস্থ, গৃহস্থ বা ব্রহ্মচারী এই আশ্রমীর অন্তর্গত বা তদ্বহির্ভূত স্বেচ্ছাচারী মনে করেন, তখন তাঁহাদের ঐ ভ্রান্ত ধারণা নিরাস করিবার জন্যই স্বয়ং পরমহংসশ্রেষ্ঠ হইয়াও কোন বিশেষ যুগে ভগবদিচ্ছায় আচার্য্যবতার নিজে পরমহংসশিরোমণি গুরুগণের দাসাভিমান করিয়া পূর্ব্ব গুরুপাদপদ্মগণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা প্রদর্শন করিয়া থাকেন অর্থাৎ তিনি জানান যে, যখন গুরুপাদপদ্মগণের দাসগণেই পারমার্থিক ব্রাহ্মণতা অনুস্যূত, তখন শ্রীসনাতন, শ্রীরূপ, শ্রীরঘুনাথ দাস প্রভু, শ্রীল নরোত্তম, শ্রীল শ্যামানন্দ, শ্রীরসিকানন্দ, শ্রীজগন্নাথ, শ্রীল ভক্তিবিনোদ, শ্রীল গৌরকিশোর প্রভু প্রমুখ জগদ্গুরু ভগবৎপার্ষদগণের কথা আর কি? তাঁহাদের শ্রেষ্ঠতা অসমোর্দ্ধ।

২। পারমার্থিক বর্ণাশ্রম-বিধি যখন ব্যক্তিগত বা গুণগত, তখন তাহা যে ব্যক্তিনিষ্ঠ, একথা আর পৃথগ্ভাবে বলিবার আবশ্যকতা কি? পিতা বৈষ্ণব বলিয়া যে পুত্র বৈষ্ণব হইবেন, তাহার কোন ধরাবাঁধা নিয়ম নাই। আবার পুত্রের বৈষ্ণবতার কারণ যে পিতা, তাহাও নহে। তবে পিতার বৈষ্ণবতা পুত্রের হরিভজনের অনেক সুযোগ প্রদান করিতে পারে। কিন্তু সেই সুযোগ-গ্রহণের পরিবর্ত্তে সুযোগের অপব্যবহার করিলে সেইরূপ

স্বতন্ত্র পুত্র পিতৃ-সম্মান লাভ করিতে পারে না। অদ্বৈতাচার্য্য প্রভুর গৌরবিমুখ সন্তানগণ শ্রীঅচ্যুতানন্দের ন্যায় পারমার্থিক সম্মান দাবী করিলে তাহা পারমার্থিক বৈষ্ণবগণ কখনও প্রদান করেন না। হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদের প্রাপ্ত পারমার্থিক সম্মানের দাবী করিলে তাহা বৈষ্ণবজগতে গৃহীত হইবে না। পারমার্থিক ব্রাহ্মণের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া যে সন্তান হরিভজনের স্পৃহা প্রদর্শন না করিল, তাহাকে 'পারমার্থিক ব্রাহ্মণ' বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইবে না। হয়ত' বৈষ্ণব পিতার সম্মান বা অন্যান্য সুবিধাগুলিকে স্বভোগে লাগাইবার জন্য পুত্র কপটতা করিয়া বৈষ্ণবপিতৃভক্তি বা বৈষ্ণবসেবাপরায়ণতার অভিনয় দেখাইতে পারে; কিন্তু নিরপেক্ষ সত্য সেইরূপ কপটতাকে পারমার্থিক ব্রাহ্মণতার লক্ষণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিবে না।

অনেক সময় বৈষ্ণব-গৃহস্থপিতার পুত্র গুরুগৃহে গুরুসেবার্থ বাস না করিয়াও আপনার পরিচয় প্রদানকালে "আমি অমুক ব্রহ্মচারী"—ইহা বলিয়া থাকেন। কিন্তু ব্রহ্মচারীর সর্ব্বপ্রধান কৃত্য যে বিশ্রম্ভসহকারে গুরুসেবা, এমন কি দীক্ষা, সদাচার, ব্রহ্মচারীর উপযুক্ত বেশাদি-গ্রহণ, তাহা উক্ত বৈষ্ণব-পুত্রে সকল সময় দেখা যায় না। বস্তুতঃ অকপটে গুরুপদাশ্রয় ও একমাত্র গুরুসেবার্থ গুরুগৃহে বাস ও সদাচার পালন না করিয়া কেবল পিতার বৈষ্ণবতার পরিচয়ে পুত্রের অবিবাহিতকাল পর্য্যন্ত 'ব্রহ্মচারী' পরিচয় ও পরবর্ত্তিকালে সমাবর্ত্তন (?), অথবা ঐরূপ 'ব্রহ্মচারী'র পরিচয়-প্রদানকালের অবস্থায়ই নানাপ্রকার বিলাসাদির আবাহন করিয়া তাহাকেই 'বৈষ্ণবতা' বলিয়া ঘোষণা করিলে ন্যূনাধিক বংশ-পরম্পরায়ই অদৈব-বর্ণাশ্রমধর্ম্মকে প্রবাহিত করিবার চেষ্টার প্রশ্রয় দেওয়া হইবে না কি? এ বিষয়ে নিরপেক্ষতা ও সত্যনিষ্ঠতা অবলম্বন করা একান্ত কর্ত্তব্য।

৩। দৈব-বর্ণাশ্রম-বিধি ব্যক্তিনিষ্ঠ বটে; কিন্তু উহা ঐরূপ সদাচার-পরায়ণ গোষ্ঠী বা বহু ব্যক্তির সংযোগে সমষ্টিগত বা সমাজগতও হইতে পারে। ঐরূপ ব্যক্তিগত বিধি যতই ক্রমে অকৃত্রিমভাবে বিস্তারিত হইবে, ততই তাহা পারমার্থিক-সমাজ-গঠনে সহায়তা করিবে। তবে ব্যক্তিগত নির্ম্মল স্বভাবের পরিবর্ত্তে তাহাতে কোনপ্রকার কপটতা প্রবেশ করিলে এবং সমষ্টির মধ্যে তাহা গোপনে পুষ্ট হইতে দিলে তদ্দ্বারা মঙ্গলময় সমাজ-গঠনের পরিবর্ত্তে শুদ্ধপারমার্থিকতাধ্বংসকারী সংঘর্ষই বৃদ্ধি করিবে।

সত্যকথা বলিতে গেলে বলিতে হয়,—হরিভজননিষ্ঠ পারমার্থিক বর্ণাশ্রম শৌক্রবংশ-ধারায় প্রবাহিত করিবার চেষ্টা করিলে বা অধিকতর সমষ্টিগত করিতে চাহিলে তাহা কোনদিনই মঙ্গলজনক ফল প্রসব করে না। যিনি অকপটভাবে হরিভজন করেন বা করিবেন, একমাত্র সেই ব্যক্তিগত দেশ-কাল-পাত্রনিষ্ঠ হইয়াই দৈব-বর্ণাশ্রমধর্ম্ম মঙ্গলময় আদর্শ প্রকাশ করিয়া থাকে। ঐরূপ অকপট সদাচার-পরায়ণ আচার্য্য-শাসনানুগত ব্যষ্টির সম্মিলনে যে সমাজ, তাহাকেই 'পারমার্থিক-সমাজ' বলা যাইবে। কিন্তু বৈষ্ণব পিতা, অবৈষ্ণব সন্তান; বৈষ্ণব পতি, ভগবৎসেবা বিমুখী পত্নী; বৈষ্ণবী পত্নী, বৈষ্ণববিদ্বেষী পতি; বৈষ্ণব ভ্রাতা, অবৈষ্ণব ভ্রাতা প্রভৃতি লইয়া যদি পারমার্থিক-সমাজের সভামণ্ডপের তলে 'পারমার্থিক গোষ্ঠী' নাম ঘোষণা পূর্ব্বক আশ্রয় গ্রহণ করিবার অভিনয় করেন, অথচ বৈষ্ণববিদ্বেষী ও বিরোধিগণের সেবাবিমুখতা সম্পূর্ণ-

ভাবেই যথাযথ সংরক্ষণ ও পরিপোষণ করেন, তবে সেইরূপ সমষ্টির দ্বারা কখনও পারমার্থিক সমাজ গঠিত হইতে পারে না।

৪। পারমার্থিক বর্ণাশ্রম আদর্শবাদ অর্থাৎ আকাশকুসুম-মাত্র নহে; তাহা জগতে সম্পূর্ণ ব্যবহারোপযোগী ও কার্য্যোপযোগী। বর্ণাশ্রম যদি বিষ্ণুসেবা-ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত না থাকে, তবে উহা কেবল নিরীশ্বর ব্যবহারিকতায় পর্য্যবসিত হয়। বিষ্ণুসেবার উদ্দেশ্যেই চারিবর্ণ ও চারি আশ্রমের যাবতীয় কার্য্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যদেব জানাইয়াছেন,—

চারিবর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে।
স্বকর্ম্ম করিতেও সে রৌরবে পড়ি' মজে।।

(চৈঃ চঃ মঃ ২২।২৬)

৫। দৈব-বর্ণাশ্রমের সকল অঙ্গই পালনোপযোগী হইতে পারে,—যদি ঐ সকল ভোগের অঙ্গ না হইয়া পারমার্থিকতার অঙ্গ হয়। কেহ কেহ বলেন,—পূর্ব্ব বর্ণে যিনি যে-কুলেই উদ্ভুত থাকুন না কেন, গুরুপদাশ্রয় করিবার পর যখন তিনি বা তাঁহারা দৈব-বর্ণের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইলেন, তখন সেইরূপ ব্যক্তিগণের দীক্ষিতাবস্থার পূর্ব্ব বর্ণের বিভিন্নতা তাঁহাদের সন্তানাদির বিবাহাদি ক্রিয়া-কলাপে বিঘ্নকারক হইবে কি? অর্থাৎ ব্রাহ্মণকুলে উদ্ভুত একজন দীক্ষিত পারমার্থিক ব্রাহ্মণের পুত্রের সহিত নীচ শূদ্রকুলে উদ্ভুত কোন দীক্ষিত পারমার্থিক ব্রাহ্মণের (সামাজিক তথাকথিত ব্রাহ্মণ না হইলেও) কন্যার বিবাহাদি হইবে কি? এই প্রশ্নের ঠিক এক কথায় মীমাংসা হয় না। কারণ, ইহার মধ্যে কতকগুলি বিশেষ বিচার্য্য বিষয় আসিয়া পড়ে। পারমার্থিক দিক্ দিয়া দেখিলেও জানা যায় যে, অকৈতব পরমার্থ-চেষ্টাই যাঁহাদের স্বাভাবিক বৃত্তি, তাঁহারা বিবাহাদি পুণ্যজনক ফলভোগপর কার্য্যে পারমার্থিকভাবে লিপ্ত হন না, হরিসেবার প্রাতিকুল্য বর্জ্জনার্থ কথঞ্চিৎ ব্যবহারিক ভাবেই পুত্র-কন্যাদির বিবাহের চেষ্টা প্রদর্শন করেন। তাঁহারা নূতন করিয়া সংসারপত্তন বা বহির্ম্মুখ সামাজিকতা ও ব্যবহারিকতার প্রশ্রয় দান, কিংবা পুত্র-কন্যাকে বিবাহাদি করিবার জন্য প্ররোচনা দিয়া পারমর্থিকভাবে পুণ্যকর্ম্মকে আলিঙ্গন করেন না। পুত্র-কন্যার কর্ম্মাধিকার ও যোগ্যতা-দর্শনে তাহাদিগের প্রাতিকুল্য-বর্জ্জনের জন্যই বা পারমার্থিক বিচারে তাহাদিগের সঙ্গত্যাগের জন্যই পুত্র-কন্যাকে বিবাহাদি বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া নিজে সঙ্গ ত্যাগ-পূর্ব্বক হরিভজনের সুযোগ লাভ করেন।

দ্বিতীয়তঃ পরমার্থই যাঁহার একমাত্র ধ্রুবতারা, তিনি কখনও চিরন্তন বহির্ম্মুখ সামাজিক বিধি-ব্যবস্থাকে বৃথা আলোড়িত করিয়া নিজের হরিভজনের সময় নষ্ট করেন না। যাঁহারা একান্তভাবে হরিভজন করিবেন না, তাঁহাদিগের অধিকারে যে-সকল বহির্ম্মুখ সামাজিক ব্যবস্থা রহিয়াছে, তাঁহারা স্বতঃই তাহাতে ধাবিত হইলে সঙ্গত্যাগ-জন্য একান্ত হরিভজনকারীর হরিভজনের সুযোগ লাভ হয়।

আর একটি কথা এই যে, পারমার্থিকের সন্তানমাত্রেই পারমার্থিক নহেন; সুতরাং তাঁহারা অপারমর্থিক অবস্থায় জাগতিক কর্ম্মকাণ্ডে যে রুচি প্রদর্শন করেন, তাহাতে বাধা দিলে হয়ত' সৎকর্ম্ম হইতেও তাঁহার

ভ্রষ্ট হইয়া পাপকর্ম্মনিষ্ঠ হইয়া পড়িতে পারেন। কোন দৈব-বর্ণাশ্রমী হয় ত' পূর্ব্ববর্ণে সামাজিক ব্রাহ্মণকুলে আবির্ভূত ছিলেন, তিনি তাঁহার পুত্রকে কোন শূদ্রকুলোদ্ভুত বৈষ্ণবের কন্যার সহিত বিবাহ দিলেন বা নিজ পুত্রকে ঐরূপ কার্য্যে বাধ্য করিলেন। পুত্রের আত্যন্তিক পরমার্থে রুচি না থাকায় উক্ত পুত্র আপনাকে বহির্ম্মুখ সামাজিক ব্রাহ্মণ অভিমান করিয়া পত্নীর প্রতি বীতরাগ হইয়া শ্বশুরকে শূদ্রজাতিসামান্য বুদ্ধি করিতে লাগিলেন এবং ক্রমশঃ বৈষ্ণবাপরাধ সঞ্চয় করিতে করিতে সৎকর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক অত্যন্ত পাপাসক্ত হইয়া পড়িলেন। এমন কি, ধর্ম্মপত্নী পরিত্যাগ করিয়া অবৈধ কামিনীর আশ্রয় গ্রহণ করিলেন এবং বৈষ্ণব- বিদ্বেষের ফলে নাস্তিকতার চরমসীমায় উপনীত হইলেন। প্রশ্ন হইতে পারে,—সাধারণ সমাজে যে অসবর্ণ বিবাহ প্রচলিত হইয়াছে, তাহাতে ত' সকল ক্ষেত্রে ঐরূপ অসুবিধা দেখা যায় না? তদুত্তর এই যে, বহির্ম্মুখ- সমাজে প্রচলিত অসবর্ণ-বিবাহাদি পরস্পর ভোগমূল-রুচিপর। সেখানে দম্পতী পরস্পর ভোগমূলা প্রেরণা ও উত্তেজনার বশবর্ত্তী হইয়াই অসবর্ণ বিবাহাদি করিয়া থাকে। কিন্তু পারমার্থিকতার মধ্যে সেইরূপ ভোগ- পরতার কুহক না থাকায় যুবক-যুবতী যদি কেবল পারমার্থিক অনুশাসনের বিভীষিকাদ্বারা শাসিত হইয়া অসবর্ণ-বিবাহের আনুকরণিক সংস্করণকে দৈব-বর্ণাশ্রমের ভাব্না দিয়া সমাজে প্রচলিত করিতে চাহে, তবে হিতে বিপরীত ফল হইবে। পারমার্থিকসমাজেও তাহার স্থান অধিকদিন হইবে না, বহির্ম্মুখ-সমাজও তাহাকে পারমার্থিকতার অভিনয়ের উচ্ছিষ্ট জানিয়া অধিক আদর করিবে না।

আবার আর একদিক্ হইতে ইহাও বিচার করা আবশ্যক যে, যিনি সত্যসত্য পারমার্থিক হইবেন, তিনি নিজ-সন্তানাদির বিবাহাদি কার্য্যের জন্য পূর্ব্ববর্ণীয় বহির্ম্মুখ-সামাজিকগণের সহিত আপনাকে অধিক সম্পর্কিত ও ব্যতিব্যস্ত না করিয়া ফেলেন; তাহা হইলে তাঁহার পারমার্থিক অভিমানের পরিবর্ত্তে ব্যবহারিক অভিমানই অধিক প্রবল হইয়া উঠিতে পারে। মোটকথা, হরিসেবার প্রতিকূল বর্জ্জন ও অনুকূল স্বীকারের মূল উদ্দেশ্যে সন্তানসন্ততির বহির্ম্মুখ সঙ্গ হইতে যতটা নিষ্কৃতি পাওয়া যায়, তজ্জন্যই সন্তানাদিকে পুণ্যজনক বিবাহাদি কার্য্যে নিযুক্ত করিবার যোগ্যতা আছে। বস্তুতঃ পারমার্থিক পিতার আদর্শ দেখিয়া পুত্রও যাহাতে গুরসেবারত নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী বা ত্রিদণ্ডি-সন্ন্যাসী হইতে পারেন, সেরূপ আদর্শ প্রদর্শন করাই পারমর্থিক পিতার কর্ত্তব্য। বলিতে কি, ব্যক্তভাবেই হউক বা অব্যক্তভাবেই হউক, কায়মনোবাক্যে প্রকৃত ত্রিদণ্ড-গ্রহণের আদর্শ প্রদর্শন করাই পারমার্থিক সোপানে আরোহণ। দৈব-বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মে ভোগ বা ত্যাগের কথা নাই। হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবাই তাহার মেরুদণ্ড।

আর একটি প্রশ্ন এইরূপ উত্থাপিত হইতে পারে,—"কোন পারমার্থিক ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচারী সমাবর্ত্তনকালে অবরকুলোদ্ভুত কোন দীক্ষিতব্যক্তি (পারমার্থিক ব্রাহ্মণের) দীক্ষিতা কন্যার পাণিগ্রহণ করিতে পারেন কি না? অথবা তাঁহার দীক্ষিতাবস্থার পূর্ব্বকালীন বহির্ম্মুখ বর্ণের কোন দীক্ষিতা বা অদীক্ষিতা কন্যার পাণিগ্রহণ করিবেন?" ইহার উত্তরে প্রথম কথা এই যে, পরিনিষ্ঠিত গুরুসেবারূপ ব্রহ্মচর্য্য হইতে সমাবর্ত্তনের অভিলাষ মানবে যখনই দৃষ্ট হয়, তখনই তাহাতে ন্যূনাধিক পুণ্যময় কর্ম্মের ফলভোগ-পিপাসা ও একান্ত-পারমার্থিকতা

হইতে বিচ্যুতির লক্ষণ প্রকাশিত হইয়া থাকে। সুতরাং ইহাতে আচার্য্যের আনুগত্য অপেক্ষা জীবের স্বতন্ত্রতার চেষ্টাই যখন প্রবল, তখন যাহাতে জীব পরমার্থ হইতে চিরতরে ভ্রষ্ট হইয়া না পড়ে এবং ক্রমে ক্রমে পরমার্থ সোপানে পুনরায় আরোহণে তাহার সুযোগ হয়, তদ্বিষয়ে লক্ষ্য রাখিয়াই কার্য্য করা উচিত। তৎসম্বন্ধে বাঁধাবাঁধি নিয়ম করিলেও জীবের রুচিই প্রবল হইয়া দাঁড়াইবে।

অনেকে আপনাদিগকে দৈব-বর্ণাশ্রমের অন্তর্গত বলিয়া পরিচয় প্রদান করেন। তাঁহাদের ঐ পরিচয়ের মধ্যে একটি পরিচয় এইমাত্র পাওয়া যায় যে, ব্যয়সংক্ষেপের জন্যই ইউক বা অন্য কোন কারণেই হউক, তাঁহারা পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধাদি কার্য্যমাত্র বৈষ্ণব-বিধানে করিবার অভিনয় করেন। আবার কেহ কেহ বহির্ম্মুখ-সমাজের মন রক্ষা করিয়া একুল ওকুল দুকুল রাখিবার জন্য পারমার্থিক সামাজিকগণের সংক্ষিপ্ত বিধিরও সম্মানের অভিনয় করেন। বৈষ্ণবাচারসম্মত শ্রাদ্ধকৃত্য ব্যতীত তাঁহারা অন্যান্য কৃত্যাদিকে সেরূপভাবে পালন করিবার সমীচীনতা বোধ হয় মনে করেন না বা তাহাতে তাঁহাদের মনোযোগ আকৃষ্ট হয় না। দৈব-বর্ণাশ্রমধর্ম্মে অবস্থিত হইয়া যাহাতে প্রকৃত পারমার্থিক ব্রাহ্মণতা লাভ হয় অর্থাৎশ্রীআচার্য্যপাদপদ্মের বাণী অকপটে শ্রবণ-কীর্ত্তনে ও যাহাতে তাহা নিজ চরিত্রে আচরণে রুচির উদয় হয়, তজ্জন্যই সাধনোৎসাহ প্রদর্শন করা কর্ত্তব্য। দৈব-বর্ণের অন্তর্গত হইয়া শূদ্রবর্ণে অধিষ্ঠিত হইলে অর্থাৎ কপটতা ও ভজনবিমুখতা সংরক্ষণ করিলে বাহ্যে কোন কোন সুবিধাজনক অনুষ্ঠানবিষয়ে পারমার্থিক ব্রাহ্মণের আচারবিশেষ পালনের অভিনয় করিয়াও—একমাসকাল শোকচিহ্নধারণের পরিবর্ত্তে শোকচিহ্ন পরিত্যাগের অভিনয়ে একাদশ দিবসে পূর্ব্বপুরুষের অর্চ্চন করিলেও তদ্দ্বারা প্রকৃত পারমার্থিক ব্রাহ্মণতার পথে বিশেষ অগ্রসর হওয়া যায় না। তবে দৈব-বর্ণাশ্রমের অন্তর্গত গৃহস্থের পরিচয় প্রদান করিয়া অদৈব শ্রাদ্ধবিধি প্রভৃতির সম্মান কর্ত্তব্য ত' নহেই, বরং তাহা নামাপরাধ বলিয়াই শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে।

দৈব-বর্ণাশ্রমান্তর্গত গৃহস্থের পক্ষে অর্চ্চন একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় ব্যাপার। তবে অর্চ্চন যেন কীর্ত্তনের বিঘ্নকারক না হয়—কীর্ত্তনে প্রবেশাধিকারের জন্যই অর্চ্চন আবশ্যক। আবার অর্চ্চন পরিত্যাগ করিয়া কপট পারমহংস্যাচার প্রদর্শনেও কোন মঙ্গলের সম্ভাবনা নাই; শ্রীগুরুপাদপদ্মের বাণীর কীর্ত্তন-সঙ্ঘারাম মঠাদি-প্রতিষ্ঠানের সেবাবিমুখ হইয়া অর্চ্চনাড়ম্বর বা অর্চ্চন-বিমুখতা কোনটিই দৈব-বর্ণাশ্রমের পক্ষে মঙ্গলকর নহে।

বৈষ্ণবধর্ম্ম বর্ণাশ্রমের অতীত ব্যাপার। তবে বর্ণাশ্রমের বিপর্য্যয় বা উচ্ছৃঙ্খলতা-বিধায়ক নহে। অধিকার লঙ্ঘন করিয়া বর্ণাশ্রমের অতীতাবস্থার অভিনয় দেখাইলে দুকুলই বিনষ্ট হইবে অর্থাৎ বৈষ্ণবতা লাভ ত' হইবেই না, সাধারণ মনুষ্যোচিত সদাচার হইতেও ভ্রষ্ট হইতে হইবে। বর্ণাশ্রম-সম্বন্ধে আরও অনেক বিষয় আমরা ক্রমে ক্রমে যথাসময়ে আলোচনা করিব।

কৃপা কি বঞ্চনা ?

'কৃপা' ও 'বঞ্চনা'—এই দুইটি পরস্পর বিপরীতার্থক পরিভাষা। হরি-গুরু-বৈষ্ণবের যে প্রসাদের দ্বারা আমাদের নিত্য মঙ্গল লাভ হয়, তাহাই 'কৃপা' বা 'দয়া'; আর যে অনুগ্রহ আমাদিগকে নিত্যমঙ্গল হইতে বঞ্চিত করে, তাহাই 'বঞ্চনা'।

বিভিন্ন অধিকারে কৃপা-সম্বন্ধে বিভিন্ন ধারণা দেখিতে পাওয়া যায়। যাঁহারা অত্যন্ত দেহগেহাসক্ত, তাঁহারা ঐহিক লাভকেই দয়ার দৃষ্টান্ত মনে করিয়া থাকেন। ধর্ম্ম, অর্থ ও কামবাসনার পুর্ত্তি—এই ত্রিবর্গ বা মোক্ষবাসনা চরিতার্থতারূপ চতুর্থ বর্গ ভিন্ন ভিন্ন অধিকারে দয়ার উদাহরণ বলিয়া মনে হইয়া থাকে। আবার কোনও বিশেষ অধিকারে ঐগুলি দয়ার অন্তরায় বা বঞ্চনা বলিয়াই বিচারিত হয়।

শ্রীস্বরূপ-রূপানুগবর ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর দুই প্রকার কৃপার কথা শাস্ত্র-বাক্য হইতে প্রদর্শন করিয়াছেন,—একটি **"কপট-কৃপা"**, আর একটি **"অকপট-কৃপা"**। ধন, ধান্য, পুত্রাদির আরোগ্য প্রাপ্তি বা স্বর্গসুখাদি লাভ; অথবা সাযুজ্যমুক্তি প্রভৃতি বরগুলি কৃষ্ণমায়ার কপট কৃপা। সেই কপটকৃপাদ্বারা জীবের সংসারচক্রে ভ্রমণ হয়; আর কৃষ্ণশক্তির অকপট কৃপায় সংসারক্ষয় ও কৃষ্ণের প্রতি অহৈতুকী সেবা-বৃত্তি উদ্বুদ্ধ হইয়া থাকে। শ্রীল স্বরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীচৈতন্যের কৃপাকে **'অমন্দোদয়া'** অর্থাৎ যাহা অমন্দ বা মঙ্গলফল উদয় করায় এবং **'মন্দোদয়া'**—যাহা মন্দ বা অমঙ্গল উদয় করায়—এইরূপ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যের অমন্দোদয়া কৃপা গ্রহণ করিবার পরিবর্ত্তে তাঁহার জড়মায়ার প্রদত্ত ঘর বা দান ভোগ-বৃত্তির সহিত গ্রহণ করাই তাঁহার মন্দোদয়কৃপা বরণ।

বদ্ধজীবেব যাহা **রুচির অনুকূল** বা প্রেয়ঃ, তাহাই কৃষ্ণের **কপট-কৃপা** বা মন্দোদয়-দয়া; আর যাহা জীবের পক্ষে পরম শ্রেয়ঃ, তাহাই কৃষ্ণের **অকপট কৃপা** বা **অমন্দোদয়-দয়া**। এই কপট-কৃপা বা মন্দোদয় দয়াই— বঞ্চনা। বদ্ধজীব স্বভাবতঃ জ্ঞাতসারেই হউক, আর অজ্ঞাতসারেই হউক, ঐরূপ কপট কৃপা বা বঞ্চনার প্রতি রুচিবিশিষ্ট।

আমরা অনেক সময় ভক্তিরাজ্যে প্রবেশের অভিনয় করিয়াও এবং মৌখিক ভগবানের নিষ্কপট কৃপা চাহিয়াও কার্য্যতঃ কপট কৃপাই গ্রহণ করিতে অধিকতর প্রস্তুত হইয়া থাকি। গুরু, বৈষ্ণব, ভক্তি ও ভক্তকে সেবা করিবার পরিবর্ত্তে তাঁহাদিগের নিকট হইতে জাগতিক লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠা-প্রাপ্তির আমাদের নিকট অধিকতর কৃপার পরিচয় বলিয়া মনে হয়। শ্রীগুরুদেব বা বৈষ্ণব কৃপা করিয়া আমাদিগকে জাগতিক কোন ভোগ্য বস্তু (যথা লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠা) দান করিয়াছেন, ইহা আমরা সময় সময় মুখেও বলিয়া ফেলি; আবার অধিকতর চতুর হইলে মৌখিক স্বীকারে সতর্ক হইয়া কার্য্যতঃ ঐসকল বস্তু 'হজম' করিয়া থাকি।

হরি-গুরু-বৈষ্ণবের প্রদত্ত ভোগ্যবস্তু-স্বীকার যদি হরিসেবার অকপট ও অকৃত্রিম আনুকূল্য করে, তবেই তাহা ভক্তির অঙ্গ বলিয়া গৃহীত হইবে; আর যদি তাহা না করিয়া ব্যক্তিগত বা দৈহিক স্বজনগত জাগতিক

কোন সুবিধা আনয়ন করে এবং অন্তরে অন্তরে লাভ-পূজাপ্রতিষ্ঠার বাসনাই অধিকতর বাড়াইয়া তুলে, তবে তাহাকে গুরু-বৈষ্ণবের অকপট-কৃপা-বরণ বা শুদ্ধভক্তিনিষ্ঠা বলা যাইবে কি?

অনেক সময় একটি প্রবল যুক্তি বা 'অজুহাত' দেখাইয়া বলিয়া থাকি যে, শ্রীগুরু-বৈষ্ণব স্বয়ং উপযাচক হইয়া যদি আমাকে কোন ভোগ্যবস্তু বা কোন না কোনভাবে লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠার সামগ্রী প্রদান করেন, তখন তাহা ভগবৎপ্রসাদজ্ঞানে গ্রহণ না করিয়া বর্জ্জন করিলে অপরাধ ও 'ফল্গুবৈরাগী'র ন্যায় অভক্তিই হইয়া যাইবে। ভাবের ঘরে চুরি না করিয়া আমরা যদি গুরু-বৈষ্ণবের প্রদত্ত বস্তুকে ভগবৎপ্রসাদ ও ভগবৎসেবানুকূল বস্তুরূপে গ্রহণ করিতে পারি, তাহা হইলে স্বতন্ত্র কথা। কিন্তু তাহাতে কোন না কোন প্রকার ভোগবুদ্ধি আসিয়া পড়িলে আমরা কি গুরু-বৈষ্ণবের নিষ্কপট কৃপা-লাভে বঞ্চিত হইব না? দ্বিতীয়তঃ ইহাই শুদ্ধভক্তির লক্ষণ যে, অভীষ্টের একমাত্র সেবাসুখ ব্যতীত আশ্রয়বস্তু নিজের সুখের জন্য কিছুই গ্রহণ করেন না; এমন কি, হরিগুরু-বৈষ্ণব উপযাচক হইয়া কোন বস্তু প্রদান করিতে আসিলেও শুদ্ধ সেবক তাহা গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হন না।

সালোক্যসার্ষ্টিসারূপ্যসামীপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ।।

(ভাঃ ৩।২৯।১৩)

শ্রীভগবান্ কপিলদেব বলিলেন,—আমার ভক্তগণকে সালোক্য (বৈকুণ্ঠবাস), সার্ষ্টি (সমান ঐশ্বর্য্য), সারূপ্য (চতুর্ভুজাদিরূপ), সামীপ্য (নৈকট্য), একত্ব (সাযুজ্য) আমি প্রদান করিতে চাহিলেও তাঁহারা আমার নিত্যসেবা ব্যতীত অন্য কিছুই গ্রহণ করেন না।

যখন ভগবান্ শ্রীনৃসিংহদেব স্বয়ং উপযাচক হইয়া প্রহ্লাদকে বর দিতে চাহিয়াছিলেন, তখন—

ভক্তিযোগস্য তৎ সর্ব্বমন্তরায়তয়ার্ভকঃ।
মন্যমানো হৃষীকেশং স্ময়মান উবাচ হ।।
"মা মাং প্রলোভয়োৎপত্ত্যাসক্তং কামেষু তৈর্ব্বরৈঃ।
তৎসঙ্গভীতো নির্ব্বিণ্ণো মুমুক্ষুস্ত্বামুপাশ্রিতঃ।।
ভৃত্যলক্ষণজিজ্ঞাসুর্ভক্তং কামেষ্বচোদয়ৎ।
ভবান্ সংসারবীজেষু হৃদয়গ্রন্থিষু প্রভো।।
নান্যথা তেঽখিলগুরো ঘটেত করুণাত্মনঃ।
যস্ত আশিষ আশাস্তে ন স ভৃত্যঃ স বৈ বণিক্।।
আশাসানো ন বৈ ভৃত্যঃ স্বামিন্যাশিষ আত্মনঃ।
ন স্বামী ভৃত্যতঃ স্বাম্যমিচ্ছন্ যো রাতি চাশিষঃ।।

অহং ত্বকামস্ত্বদ্ভক্তস্ত্বঞ্চ স্বাম্যনপাশ্রয়ঃ।
নান্যথেহাবয়োরর্থো রাজসেবকয়োরিব।।
যদি দাস্যসি মে কামান্ বরাংস্ত্বং বরদর্ষভ।
কামানাং হৃদ্যসংরোহং ভবতস্তু বৃণে বরম্।।"

(ভাঃ ৭।১০।১-৭)

"শ্রীনারদ কহিলেন,—বালক প্রহ্লাদ ভগবান্ নৃসিংহকথিত ঐ সকল বর ভক্তিযোগের অন্তরায় বিবেচনা করিয়া ঈষৎ হাস্য-সহকারে বলিলেন।

শ্রীপ্রহ্লাদ কহিলেন,—হে ভগবন্, **স্বভাবতঃ কামাসক্ত** আমাকে ঐসকল **বরের দ্বারা লুব্ধ করিবেন না,** আমি কামসঙ্গভীত, নির্ব্বেদপ্রাপ্ত এবং মুমুক্ষু হইয়া আপনার শরণাপর হইয়াছি।

হে প্রভো, আপনি ভক্তের লক্ষণ-জিজ্ঞাসু হইয়া হৃদয়ের গ্রন্থি এবং **সংসারের বীজস্বরূপ কামে আমাকে প্রেরণা করিয়াছেন।**

নতুবা হে অখিলগুরো, করুণাময়, আপনা কর্ত্তৃক অন্য প্রকার সম্ভব নহে। **আপনা হইতে যে ব্যক্তি বিষয়াদি ভোগ প্রার্থনা করে, সে আপনার ভৃত্য নহে, বণিক্।**

স্বামীর নিকট কল্যাণকামী ব্যক্তি ভৃত্য নহে এবং ভৃত্য হইতে স্বীয় প্রভুত্বাকাঙ্ক্ষী ঐশ্বর্য্যদাতা ব্যক্তিও প্রভু নহেন।

আমি আপনার নিষ্কাম ভক্ত এবং আপনি আমার নিরুপাধিক স্বামী, অতএব রাজা ও ভৃত্যের ন্যায় আমাদের অন্য প্রকার প্রয়োজন নাই।

হে বরদর্ষভ, আপনি যদি আমাকে আমার **অভীষ্ট বরই দান করেন,** তবে আমি আপনার নিকট **হৃদয়ে কামবাসনার অনুৎপত্তি প্রার্থনা করি।"**

প্রহ্লাদের ঐসকল বাক্য হইতে জানা যায় যে, কখনও কখনও ভগবান্ উপযাচক হইয়া ভক্তকে দ্রবিণাদি প্রদান করিতে চাহেন, কিন্তু শুদ্ধভক্ত তাহা স্বভোগার্থ গ্রহণ করেন না; কারণ, একমাত্র হরিসেবা ব্যতীত নিজের জন্য কিছু গ্রহণ ভক্তিযোগের অন্তরায়।

গুরু-বৈষ্ণবগণ আমাদিগকে পরীক্ষা করিবার জন্য কিংবা কোনপ্রকার স্নেহপরবশ হইয়া আমাদিগকে কোন প্রকার বস্তু প্রদান করিতে চাহিলেও আমরা একান্ত মঙ্গল ইচ্ছা করিলে একমাত্র তাঁহার সেবা-ব্যতীত আন্তরিকভাবে আর কিছুই চাহিব না। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষার "ন ধনং ন জনং" শ্লোক বা যামুনাচার্য্যের "নাহং বন্দে তব পদকমলয়োর্দ্বন্দ্বমদ্বন্দ্বহেতোঃ" প্রভৃতি শ্লোক কেবল মুখে উচ্চারন করিলেই আমি শুদ্ধ-ভক্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিব না। কার্য্যকালে, নিজ আচরণে, অন্তরের অন্তস্থলে সর্ব্বদা গুরুবৈষ্ণবের সেবা-বুদ্ধিতে অধিষ্ঠিত থাকিতে হইবে।

আবার "আমার সত্তাকে শ্রীগুরুবৈষ্ণবের শ্রীচরণ হইতে পৃথক্ করিয়া রাখিয়া বা গুরু-বৈষ্ণবের পাদপদ্মে শরণাগত না হইয়া আমি তাঁহাদের কিছু গ্রহণ করিব না, প্রাকৃত নিরপেক্ষতা-মাত্র প্রদর্শন করিব,"—এরূপ বুদ্ধিও অভক্তি। সর্ব্বদা শরণাগতিময় জীবনই শুদ্ধভক্তির অনুকূল। গুরুবৈষ্ণবের পাদপদ্মে সর্ব্বতোভাবে আত্মবিক্রয় করিয়া তাঁহাদের উচ্ছিষ্টভোজী কুক্কুর হইয়া তাঁহাদের সেবা করাই শুদ্ধভক্তির লক্ষণ। শ্রীগুরুবৈষ্ণব এইরূপ শরণাগত ব্যক্তিকে কখনও কপট কৃপা দ্বারা বঞ্চিত করেন না।

অকপট শরণাগত জীবনে যে "দদাতি প্রতিগৃহ্ণাতি" অর্থাৎ গুরু-বৈষ্ণবকে কোন বস্তু প্রদান বা তাঁহাদের দান গ্রহণ, তাহাতে প্রচ্ছন্ন আত্মভোগ-পিপাসা নাই। আর 'শরণাগত না হইয়া গুরু-বৈষ্ণবের কিছু গ্রহণও করিব না, তাঁহাদিগকে কিছু সমর্পণও করিব না'—এইরূপ বুদ্ধি প্রাকৃত নীতি হইলেও সম্বন্ধজ্ঞানহীন অভক্তির লক্ষণ। আবার শরণাগতের চলনা করিয়া বা শরণাগত না হইয়া গুরুবৈষ্ণবের দ্রবিণাদি ভোগ করিবার প্রচ্ছন্ন পিপাসা বা তদ্দ্বারা কোনপ্রকার নিজের সুবিধা করিয়া লওয়া অভক্তিরই পরিচয়।

আমরা অনেক সময় একান্ত শরণাগত মঠবাসী না হইয়াও শরণাগত মঠবাসিগণের প্রাপ্য সুবিধাগুলি ভোগ করিতে চাহি; এমন কি, সেই সকল সুবিধা-লাভে বিন্দুমাত্র প্রতিবন্ধক বা বিলম্ব ঘটিলে আমরা ক্রোধে ক্ষিপ্ত হইয়া পড়ি। অনেক সময় বাহ্যে ক্রোধ প্রকাশ না করিলেও অন্তরে প্রচ্ছন্ন ক্রোধরিপুর তাণ্ডবে মুহ্যমান হইয়া থাকি। আমরা অতীতকালে শ্রীগুরুবৈষ্ণবের সেবার আনুকূল্য করিবার অভিনয় করিয়াছি, বা বর্ত্তমানে করিতেছি, কিংবা ভবিষ্যতে করিব; সুতরাং শ্রীগুরু-বৈষ্ণবে বা মঠ-প্রতিষ্ঠান আমাদের দৈহিক, এমন কি, জাগতিক ও সামাজিক সুবিধা করিয়া দিতে বাধা—আমরা এরূপ মনে করিয়া থাকি। কোন কোন সময় শ্রীগুরু-বৈষ্ণব বা মঠপ্রতিষ্ঠানাদির সাহায্যে বা তাঁহাদের নামের বলে ভাল চাকুরী, লাভজনক ব্যবসায় বা জাগতিক সুখ-সুবিধা আহরণ করা শ্রীগুর-বৈষ্ণব বা মঠ-প্রতিষ্ঠানের সেবারই সাহায্যকারক বলিয়া মনে করিয়া থাকি এবং আমার সেই সিদ্ধান্তকে পারিপার্শ্বিক দৃষ্টান্তসমূহ-দ্বারা সমর্থন করিবারও চেষ্টা করি! যদি সেরূপ জাগতিক সুযোগ-সুবিধা লাভের জন্য শ্রীগুরু-বৈষ্ণব বা মঠায়তন আমাকে সাহায্য না করেন, তাহা হইলে নজির দেখাইয়া বলি,—"অমুক ব্যক্তিকে, অমুকের আত্মীয়স্বজনকে, অমুকের বংশ-পরম্পরাকে শ্রীগুরু-বৈষ্ণব নানাভাবে জাগতিক সুবিধা প্রদান করিতেছেন; তাঁহাদিগের জাগতিক সুবিধার জন্য সুপারিশপত্র প্রদান, অকাতরে দ্রবিণাদি ব্যয়, কতপ্রকার চিন্তা-ভাবনা, প্রতিষ্ঠানের নানাবিধ শক্তি নিয়োগ করিতেছেন; কিন্তু আমার বেলায় অন্যরূপ কেন? এই সকল কথা মুখে প্রকাশ করিতে না পারিলেও আমার অন্তর ঐসকল চিন্তার গুপ্ত আগ্নেয় পর্ব্বত পোষণ করিয়া থাকে। সময় সময় দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িয়া বলি,—সকলেই সকল সুবিধা করিয়া লইল, কেবল আমিই ঠকিলাম!

কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে ঠকিল কে, আর জিতিলই বা কে, তাহা বুঝিতে চাই না; কারণ, আমার ভোগবুদ্ধি অত্যন্ত প্রবল্য। এই সকল কথা আলোচনা করিতে গেলে পূর্ব্বের সেই প্রবন্ধগুলির আলোচনাই আবার আসিয়া পড়ে। সেই "ঠকিয়াছি কি জিতিয়াছি?", সেই "বেণু ও বপু", সেই "সেবার খতিয়ান", সেই

অনেক পূর্ব্বের ''আমি চাই আত্মবঞ্চনা'' প্রভৃতি প্রবন্ধগুলির অপ্রীতিকর পুনরাবৃত্তি হইয়া পড়ে। যেখানে কেবল বপু-দর্শন, সেখানেই বঞ্চনার সহস্র নাগপাশ চতুর্দ্দিকে আমাদিগকে আক্রমণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে; আর যেখানে আমরা শ্রীগুরুদেবের বাণী শ্রবণ করি, বাণীর কষ্টিপাথরে মেকি ও আসল যাচাইয়া লই, সেখানে আত্মবঞ্চিত হইবার কোন প্রলোভন আসিতে পারে না। এখানে একটা সংশয় উপস্থিত হইতে পারে। তাহা হইলে কি গুরু-বৈষ্ণবের কথা ও কাজ,—এ দুইটি ভিন্ন? আর কথায় যদি তাঁহারা প্রকৃত ভক্তিসিদ্ধান্ত প্রচার করিয়া কার্য্যে অন্যরূপ আদর্শ দেখান, তাহা হইলে দুর্ব্বল জীব কিরূপেই বা সেই সিদ্ধান্তবাণীকে ধরিয়া থাকিতে পারে?

এই কথার উত্তর একান্ত ভজন-পিপাসুগণের হৃদয়েই শ্রীগুরুকৃপাবলে প্রকাশিত হয়। অন্তরকে জিজ্ঞাসা কর, ''তুমি কি অকৃত্রিম মঙ্গল চাহ? তুমি কি গুরুবৈষ্ণবের ঐকান্তিকী সেবা চাহ? —না আপাত সুবিধাপূর্ণ অমঙ্গল অভিলাষ কর?''

রায় রামানন্দের সম্বন্ধে মহাপ্রভু বাণীনাথ পট্টনায়ককে, কিংবা সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের সম্বন্ধে অমোঘকে আর্থিক ও দৈহিক সুবিধা প্রদান করিলেও শ্রীরায় রামানন্দ, সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য, কিংবা শ্রীরূপ-সনাতন-শ্রীরঘুনাথাদি গোস্বামিবৃন্দ মহাপ্রভুর সেই নজির দেখাইয়া অহৈতুকী শুদ্ধভক্তির পথ পরিত্যাগ করেন নাই। শ্রীবাস পণ্ডিতের সম্বন্ধে শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার মৃতপুত্রকে সঞ্জীবিত করিয়াছিলেন বলিয়া মহাপ্রভুর অন্যান্য গৃহস্থ ভক্তগণ বা স্বয়ং শ্রীবাস পণ্ডিতও ত' মহাপ্রভুকে মৃতের প্রাণদানকারী ডাক্তার-কবিরাজ-রূপে পরিণত করিয়া তাঁহার নিকট আত্মীয়স্বজনের কোনপ্রকার দৈহিক সুবিধা প্রার্থনা করেন নাই। সর্ব্বাঙ্গে গলিতকুষ্ঠ বাসুদেবকে শ্রীমন্মহাপ্রভু কুষ্ঠব্যাধি হইতে মুক্ত ও রূপবান্ করিয়াছিলেন বলিয়া সেই নজির দেখাইয়া সচ্চিদানন্দবপু শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু স্বীয় অঙ্গে কণ্ডুরসার অভিনয় করিয়াও ত' মহাপ্রভুর দ্বারা স্বীয় দৈহিক রূপ পুনরুদ্ধারের কোন আদর্শ প্রদর্শন করেন নাই; বরং শ্রীমন্মহাপ্রভু নিজ-অন্তরঙ্গ পার্ষদ-ভক্তকে গাঢ় আলিঙ্গন বদ্ধ করিতে আসিলেও শ্রীল সনাতন অত্যন্ত দৈন্যভরে নিজেকে পৃথক্ রাখিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এমন কি, অতি দৈন্য করিয়া রথের চক্রতলে নিজের দেহ-বিসর্জ্জনের সঙ্কল্প করিয়াছিলেন।

শুদ্ধভক্ত কখনও জাগতিক অসুবিধা বা অভাব গুরুবৈষ্ণবের দ্বারা পূরণ করাইবার চেষ্টা করেন না, বরং নিজের সেবাপ্রবৃত্তির অভাবের কথা ভাবিয়াই তৎপ্রতি ধিক্কার ও অধিকতর অকপট আত্মদৈন্য করিয়া থাকেন। নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুর বা শ্রীল ঝড়ু ঠাকুর বা শ্রীল উদ্ধারণ ঠাকুর কখনও কি মহাপ্রভুর দ্বারা সামাজিক সুবিধা করাইয়া লইয়াছিলেন? না, তাঁহাদের আদর্শে অধিকতর দৈন্যই প্রকাশিত হইয়াছিল? শ্রীবাসের গৃহে যখন মহাপ্রভু সংকীর্ত্তন করিতেছিলেন, তখন শ্রীবাসের পুত্র-বিয়োগ হয়। শ্রীবাস পণ্ডিত ত' তখন তাঁহার পুত্রের সঙ্কটাপন্ন অবস্থার কথা মহাপ্রভুকে আকার-ইঙ্গিতেও জানাইয়া পুত্রকে মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করিতে পারিতেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীবাস পণ্ডিতকে উপযাচক হইয়া বর দিয়াছিলেন,—যদি লক্ষ্মীরও কখনও ভিক্ষা করিতে হয়, তথাপি তোমার অর্থের অভাব হইবে না। ভক্তবৎসল ভগবান্ শ্রীবাসকে

এই বর দিয়াছিলেন বলিয়া শ্রীবাস কখনও অন্তরে মহাপ্রভুর নিকট ঐরূপ দ্রবিণাদির কামনা করেন নাই; কিংবা শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী, বা শ্রীধর পণ্ডিত, অথবা দারিদ্র্যলীলাভিনয়কারী মহাপ্রভুর অন্যান্য কোন ভক্ত শ্রীবাস পণ্ডিতের নজির দেখাইয়া বলেন নাই,—'মহাপ্রভু শ্রীবাসকে ঐরূপ বর দিলেন, আমাদিগকে দিলেন না কেন? ইহা কি মহাপ্রভুর পক্ষপাতিত্ব নহে?' মহাপ্রভু তাঁহার নবদ্বীপ-লীলায় অনেক সময় শচীমাতাকে স্বর্ণখণ্ড আনিয়া দিতেন, শচীমাতা উহা দ্বারা কৃষ্ণসংসারের ব্যয় নির্ব্বাহ করিতেন। কিন্তু এই নজির দেখাইয়া অন্যান্য গৃহস্থ ভক্তগণ কি মহাপ্রভুর নিকট স্বর্ণ ও দ্রবিণাদি ভিক্ষা করিয়াছিলেন?—না, শুদ্ধাভক্তি চাহিয়াছিলেন?

শ্রীমন্মহাপ্রভুকে গৌড়েশ্বর হোসেন সাহ, উৎকল সম্রাট্ গজপতি প্রতাপরুদ্র এরূপ ভক্তি-শ্রদ্ধা করিতেন যে, মহাপ্রভুর ইঙ্গিত পাইবামাত্র তাঁহারা সমস্ত ধন-সম্পত্তি সমর্পণ বা যে-কোন কার্য্য সম্পাদন করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। কিন্তু শ্রীসনাতন বা শ্রীরায় রামানন্দ সেই সুযোগ গ্রহণ করিয়া কি তাঁহাদের রাজকর্ম্মের পরমায়ুঃ বা অর্থাদি বৃদ্ধি করাইয়া লইয়াছিলেন?—না, মহাপ্রভুর সেবার জন্য ছলে-বলে-কৌশলে বিষয়ের সংস্পর্শ পরিত্যাগ করিয়া ছিলেন? গোপীনাথ পট্টনায়ককে প্রাণদণ্ড হইতে রক্ষা করিবার জন্য তৎপিতা ভবানন্দ রায় বা ভ্রাতা রামানন্দ রায় মহাপ্রভুর দ্বারা প্রতাপরুদ্র বা যুবরাজের নিকট অনুগ্রহ প্রার্থনার কোন প্রস্তাব করেন নাই। অপর নিরপেক্ষ ব্যক্তিগণই মহাপ্রভুকে গোপীনাথের অবস্থার কথা জানাইয়াছিলেন। ভক্তবৎসল মহাপ্রভুর কৃপায় গোপীনাথ রক্ষা পাইবার পর মহাপ্রভুর চরণতলে পতিত হইয়া বলিলেন,—

''বাকী-কৌড়ি বাদ, আর দ্বিগুণ বর্ত্তন কৈলা।
পুনঃ 'বিষয়' দিয়া 'নেতধটী' পরাইলা।।
কাঁহা চাঙ্গের উপর সেই মরণ-প্রমাদ।
কাঁহা 'নেতধটী' পুনঃ—এসব প্রসাদ!
চাঙ্গের উপরে তোমার চরণ ধ্যান কৈলুঁ।
চরণ-স্মরণ-প্রভাবে এই ফল পাইলুঁ।।
লোকে চমৎকার মোর এসব দেখিয়া।
প্রশংসে তোমার কৃপা-মহিমা গাঞা।।
কিন্তু তোমার স্মরণের নহে এই 'মুখ্যফল'।
'ফলাভাস' এই,—যাতে 'বিষয়' চঞ্চল।।
রামরায়ে, বাণীনাথে কৈলা 'নির্ব্বিষয়'।
সেই কৃপা আমাতে নাহি, যাতে ঐছে হয়!

শুদ্ধ কৃপা কর, গোসাঞি, ঘুচাহ 'বিষয়'।
নির্ব্বিণ্ণ হইনু, মোতে 'বিষয়' না হয়।।"

(চৈঃ চঃ অঃ ৯।১৩৩-১৩৯)

গোপীনাথ বলিলেন যে, তাঁহার ভ্রাতা রামানন্দ রায় ও বাণীনাথকে সম্পূর্ণ নির্ব্বিষয় করিয়া মহাপ্রভু তাঁহাদের প্রতি যে অকপট কৃপা করিয়াছেন, সেইরূপ অকপট কৃপা তিনি (গোপীনাথ) বরণ করিতে পারেন নাই; তিনি সেইরূপ শুদ্ধ কৃপাই যাচ্ঞা করেন।

কাশীমিশ্রও মহাপ্রভুকে গোপীনাথ-প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন,—

"ব্যবহার লাগি' তোমা ভজে, সেই জ্ঞান-অন্ধ।।

* * * * *

তোমার ভজনফলে তোমাতে 'প্রেমধন'।
বিষয় লাগি' তোমায় ভজে, সেই মূর্খ জন।।
তোমা লাগি' রামানন্দ রাজ্যত্যাগ কৈলা।
তোমা লাগি' সনাতন 'বিষয়' ছাড়িলা।।
তোমা লাগি' রঘুনাথ সকল ছাড়িল।
হেথায় তাঁহার পিতা বিষয় পাঠাইল।।
তোমার চরণ-কৃপা হঞাছে তাঁহারে।
ছত্রে মাগি' খায়, বিষয় স্পর্শ নাহি করে।।
রামানন্দের ভাই গোপীনাথ-মহাশয়।
তোমা হৈতে বিষয়-বাঞ্ছা, তাঁ'র ইচ্ছা নয়।।
তাঁ'র দুঃখ দেখি' তাঁ'র সেবকাদিগণ।
তোমারে জানাইল, যাতে 'অনন্যশরণ'।।
সেই 'শুদ্ধভক্ত', যে তোমা ভজে তোমা লাগি'।
আপনার সুখ-দুঃখে নহে ভোগ-ভাগী।।
তোমার অনুকম্পা চাহে, ভজে অনুক্ষণ।
অচিরাৎ মিলে তাঁরে তোমার চরণ।।"

(চৈঃ চঃ অ ৯।৬৮-৭৬)

'হরিসেবা করিতে আসিয়া জাগতিক ক্ষতিগ্রস্ত হইলাম' মনে করিয়া আমরা গুরু-বৈষ্ণবকে তজ্জন্য দায়ী করিয়া থাকি এবং সেই ক্ষতি পূরণ করিবার জন্য চক্রবৃদ্ধি-সুদসহ গুরুবৈষ্ণবের নিকট হইতে জাগতিক সুবিধা আহরণ করি। ইহা "তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণঃ" (ভাঃ ১০।১৪।৯) এই শুদ্ধভক্তিপর বিচার হইতে বিচ্যুতিরই লক্ষণ। অনেক সময় বা মনে করি, 'হরিভজন করিতে আসিয়া আমার দারিদ্র্য ও জাগতিক নানাপ্রকার অসুবিধা উপস্থিত হইল; কিন্তু কেহ কেহ শ্রেষ্ঠভক্ত-নামে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াও জাগতিক অনেক উন্নতি করিয়া ফেলিল।' একাধারে জাগতিক অভ্যুদয় ও পারমার্থিক প্রতিষ্ঠা-লাভ যদি সংঘটিত হয়, তবেই আমাদের কোন ক্ষোভের কারণ থাকে না! কিন্তু আমরা গোপীনাথ পট্টনায়কের ঐ কথাটি ভুলিয়া যাই,—

"রামরায়ে, বাণীনাথে কৈলা 'নির্ব্বিষয়'।
সেই কৃপা আমাতে নাহি, যাতে ঐছে হয়।।
শুদ্ধ কৃপা কর, গোসাঞি, ঘুচাহ 'বিষয়'।
নির্ব্বিণ্ণ হইনু, মোতে 'বিষয়' না হয়।।"

(চৈঃ চঃ অ ৯।১৩৮, ১৩৯)

আমরা শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেই উপদেশ ভুলিয়া যাই,—

"ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—আপনে আইসে।
তথাপিহ না চায়, না লয় মোর দাসে।।"

(চৈঃ ভাঃ অ ৫৫।৯)

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীধরকে প্রশ্নের ছলে যে মহতী লোক-শিক্ষা দিয়াছিলেন, তাহা আমরা অনেকেই ভুলিয়া যাই,—

"প্রভু বলে,—শ্রীধর, তুমি যে অনুক্ষণ।
'হরি' 'হরি' বোল, তবে দুঃখ কি কারণ?
লক্ষ্মীকান্তে সেবন করিয়া কেনে তুমি।
অন্ন-বস্ত্রে দুঃখ পাও, কহ দেখি, শুনি?
দেখ, এই চণ্ডী-বিষহরিরে পূজিয়া।
কে না ঘরে খায় পরে' সব নগরিয়া।।"

(চৈঃ ভাঃ আ ১২।১৮৩-১৮৪, ১৮৭)

"যত দেখ বৈষ্ণবের ব্যবহার-দুঃখ।
নিশ্চয় জানিহ সেই পরানন্দসুখ।।"

(চৈঃ ভাঃ ম ৯।২৪০)

এই কথাটি কেবল অপরের জন্য মুখে না আওড়াইয়া নিজে শরণাগত হইয়া অনুক্ষণ অনুভব করিতে করিতে হরিসেবা করিলেই আমরা গুরু-বৈষ্ণবের অকপট কৃপা বরণ করিতে পারিব, আমরা বঞ্চিত হইতে চাহিব না।

'ভক্তি'র স্বরূপ সম্বন্ধে সাধারণ ভ্রম

'ভক্তি' বা কৃষ্ণসেবার প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে জগতে যেরূপ সাধারণ ভ্রম (common error) দেখিতে পাওয়া যায়, এরূপ ভ্রম আর পৃথিবীতে কোন বস্তু সম্বন্ধেই হয় নাই। তথাকথিত ধার্ম্মিক ও উচ্চশিক্ষিত-সম্প্রদায় হইতে আরম্ভ করিয়া সাধারণ ব্যক্তিগণ পর্য্যন্ত প্রায় সকলেই যেন ঐ ভ্রমের অন্ধকূপে ন্যূনাধিক পতিত হইয়াছেন।

'ভক্তি' সম্বন্ধে এই মারাত্মক সাধারণ ভ্রমটিই ভক্ত ও ভগবান্ সম্বন্ধে অসংখ্য ভ্রমের উদয় করাইয়াছে। ভক্তির যথার্থ স্বরূপে এই সাধারণ ভ্রম উদিত হওয়ায় জগতে তথাকথিত সমন্বয়বাদের উৎপত্তি হইয়াছে এবং জনসাধারণ ঐ মতবাদকেই পরমাগ্রহের সহিত লুফিয়া নিতেছে। কিন্তু যাঁহারা ভক্তিবিজ্ঞানের রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছেন, তাঁহারা তথাকথিত সমন্বয়বাদী ও মনোধর্ম্মিগণের ভ্রম এবং ঐরূপ ভ্রমে পতিত হইয়াও তাহাদের (মনোধর্ম্মিব্যক্তিগণের) নিজদিগকে অভ্রান্ত জ্ঞান করিয়া আত্মগৌরবানুভব তথা ভগবদ্ভক্তগণকে ভ্রান্ত ও একঘেয়ে বিবেচনা করিবার দৃষ্টান্ত-সমূহ দেখিয়া বিশেষ ব্যথিত হন।

স্বধামগত মনীষী অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশয়ের জনপ্রিয় 'ভক্তিযোগে' ভক্তিবিজ্ঞান-সম্বন্ধে ঐরূপ অনেক কিছু বিকৃত ধারণা প্রবিষ্ট হইয়াছে। তাহাতে 'কৃষ্ণসেবা'-শীর্ষক পরিচ্ছেদে লিখিত আছে ঃ—

"কৃষ্ণসেবা বলিতে অনেক বুঝায়। চৈতন্যদেব অপর এক স্থলে ভক্তির পঞ্চ প্রধান সাধন বলিতে কৃষ্ণসেবার পরিবর্ত্তে 'শ্রীমূর্ত্তির শ্রদ্ধায় সেবন' বলিয়াছেন। * * * যিনি যে দেবতার উপাসক, তিনি সেই দেবতার মূর্ত্তির সেবা করিলেই ভক্তি লাভ করিবেন। রামপ্রসাদ, রাজা রামকৃষ্ণ * * * কালীমূর্ত্তির পূজা করিতে করিতে ভক্তি লাভ করিয়াছিলেন। * * * যাঁহারা মূর্ত্তিতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন না, কিংবা যাঁহাদিগের ধর্ম্ম-মত মূর্ত্তিপূজার বিরোধী, তাঁহাদিগের পক্ষে প্রকৃতির মধ্যে ভগবান্‌কে উপলব্ধি করিয়া তাঁহার চিন্তা, লীলা-কীর্ত্তন প্রভৃতি করাই—কৃষ্ণসেবা। * * প্রভাতের অরুণ রবি, সূর্য্যাংশুস্নাত বসুন্ধরা, মহাসাগরের অম্বুরাশি, সুবর্ণকিরণ-রঞ্জিত মেঘমালা প্রভৃতি প্রকৃতির মনোহর দৃশ্য দেখিতে দেখিতে মানুষ ভগবৎপ্রেমে ডুবিয়া যায়। ব্রহ্মসম্ভোগে তাঁহার চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ হয়।"

উপর্য্যুক্ত উক্তিগুলি শুনিয়া বা পাঠ করিয়া ভক্তি বিষয়ে অনভিজ্ঞ বা তদ্‌রাজ্যে অপ্রবিষ্ট জন-সাধারণ বা তথাকথিত ধর্ম্মপ্রবণ সম্প্রদায় ঐরূপ বিচারকে কিছুতেই 'অভক্তিযোগ' মনে করিতে পারেন না। যিনি উহাকে ভক্তিযোগের পরিবর্ত্তে 'অভক্তিযোগ', বা কৃষ্ণসেবা বলিবার পরিবর্ত্তে 'মায়ার সেবা' বলিবেন, তাঁহার বিরুদ্ধে দণ্ডধারণ করিবার ও তাঁহাকে একঘেয়ে সাম্প্রদায়িক বলিবার জন্য দুনিয়ার বোধ হয় প্রায় শতকরা শতজনই প্রস্তুত হইবেন! কিন্তু ঐরূপ বিপদের বোঝা মাথায় বরণ করিয়াও—সাধারণের নিকট ঐরূপ লাঞ্ছিত হইবার আশঙ্কা লইয়াও সত্যের অনুরোধে, ভক্তিবিজ্ঞানের মূলমহাজন শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুর চরণরেণুগণের বলে বলীয়ান হইয়া একান্ত নিরপেক্ষ প্রকৃত সত্যপিপাসুগণের নিকট কৃষ্ণসেবা ও মায়ার সেবার পার্থক্য বর্ণন না করিলে কেবল যে কর্ত্তব্যের ত্রুটি হইবে, তাহা নহে, সমগ্র মানবজাতির প্রতি হিংসাও বিহিত হইবে।

শ্রীমদ্ভাগবত ও তাঁহারই মূর্ত্তবিগ্রহ শ্রীচৈতন্যদেব 'কৃষ্ণসেবা'র কথা জানাইয়াছেন। সেই **কৃষ্ণসেবার মেরুদণ্ডই ইহা যে, তাহা অপ্রাকৃত লীলাপুরুষোত্তমের নিত্য ব্যক্তিত্ব স্বীকার করে। যেখানে পুরুষোত্তমের অপ্রাকৃত-সবিশেষত্ব ও ব্যক্তিত্ব বিকল্পে লোপ পায়, সেখানে ভক্তির কোনই অস্তিত্ব নাই**। যেখানে সেব্যতত্ত্ব পূর্ণতম শক্তিমান্, আর সেবকতত্ত্ব অসংখ্য শক্তি-জাতীয় বস্তু, সেখানেই সেবার অস্তিত্ব। যেখানে সেব্য নিত্য, সেবক নিত্য ও সেবা নিত্যা, তাহাই হরিসেবা। যেখানে হরি পূর্ণতম স্বরাট্ এবং সকল রসের আকরও ও বিষয়, সেখানেই তাঁহার কৃষ্ণস্বরূপ প্রকাশিত। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই পঞ্চ অপ্রাকৃত রসে কৃষ্ণসেবা আছে। আত্মবৃত্তি-দ্বারা সেই কৃষ্ণসেবা হয়। অপ্রাকৃত নন্দ-যশোদা অপ্রাকৃত পুত্ররূপী কৃষ্ণের সেবা করেন—আত্মজের সেবা করেন; কেন না, মাতা বা পিতা পুত্রের অনুরাগী সেবক। ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্ব হইতেই মাতা পুত্রের সেবা করিতে পারেন এবং সেই সেবা হৃদয়ের স্বাভাবিক আকর্ষণ ও অনুরাগের দ্বারাই সঞ্চালিত হয়, তাহা কোনপ্রকার হেতু বা কৃতজ্ঞতা-দ্বারা জন্মগ্রহণ করে না। কিন্তু পুত্র মাতাকে যে পূজ্য বা আরাধনা করেন, যে ভক্তি (?) করেন, তাহা পুত্রের জন্মগ্রহণ ও জ্ঞান লাভ করিবার বহু পরে এবং সেই শ্রদ্ধা বা ভালবাসার মধ্যে হৃদয়ের টান অপেক্ষা কৃতজ্ঞতা ও কর্ত্তব্যবুদ্ধির প্রাবল্যই অধিকতর দেখিতে পাওয়া যায়। পুত্র মাতাকে নানাভাবে দোহন করেন; মাতার স্তন্যদোহন, দ্রবিণ-দোহন, শিক্ষা-দোহন, যত্ন-দোহন, লালন-পালনাদি দোহন করিয়া থাকেন। এত দোহন করিবার পর মাতার প্রতি যে সামান্য একটুকু কৃতজ্ঞতা বা কর্ত্তব্যবুদ্ধি, কিংবা কর্ত্তব্যের অকরণে প্রত্যবায় বা পাপ হইবে,—এইরূপ যে বুদ্ধির উদয় হয়, সেইরূপ মনোভাব হইতেই পুত্র মাতার প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তির অভিনয় প্রদর্শন করিয়া থাকেন। সুতরাং দোহন-ক্রিয়াটি যাঁহা হইতে লাভ হয়, তাঁহাকে মুখে 'সেব্য' বলিলেও কার্য্যতঃ তাঁহাকেই আমরা 'সেবক' করিয়া ফেলি! ঐরূপ ভক্তি 'অহৈতুকী ভক্তি'-পদবাচ্য হইতে পারে না। এইজন্য কৃষ্ণসেবা-বিজ্ঞানের **মধ্যে যত কিছু চাওয়া-ধর্ম্ম, সমস্তই কৃষ্ণের জন্য সংরক্ষিত বা তাঁহার জন্যই 'একচেটিয়া'**; আর যত কিছু দেওয়া বা আত্মনিক্ষেপের ধর্ম্ম, তাহা সমস্তই ভক্ত বা সেবকের চেতনবৃত্তির স্বাভাবিক ধর্ম্ম। কৃষ্ণ যদি পুত্র

না হইয়া 'মা' হন, তাহা হইলে জগতের পুত্রগণের আব্দার পরিপূরণেই তাঁহাকে ব্যস্ত থাকিতে হইবে। জগতের সন্তানগণ কেবল চাহিবেন, মুখে না বলিলেও কার্য্যতঃ দোহন করিবেন, আর মাতৃরূপী কৃষ্ণকে (?) কেবল প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে তাহা যোগাইতে হইবে। এইজন্য কৃষ্ণতত্ত্বে (যেখানে প্রেমের পূর্ণ সন্ধান আছে) কৃষ্ণ শক্তিজাতীয় বস্তু বলিয়া স্বীকৃত হন নাই, তিনি শক্তিমজ্জাতীয়। তিনি মাতা-নহেন, তিনি অপ্রাকৃত নন্দের অপ্রাকৃত পুত্র।

কর্ত্তব্যবুদ্ধি বা কৃতজ্ঞতাবুদ্ধি-দ্বারা চালিত হইয়া কৃষ্ণসেবা হয় না। মাতৃসেবা, পিতৃসেবা, দেশসেবা ও জনসেবা প্রভৃতি 'পঞ্চায়েতী সেবা'র ন্যায় কৃষ্ণ সেবা বা কৃষ্ণভক্তি নহে। কৃষ্ণ কাহারও ইন্দ্রিয়তৃপ্তি করেন না। অপ্রাকৃত কামদেব কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তর্পণের জন্যই সকল চেতনের অস্তিত্ব। সেই অপ্রাকৃত কামদেব নপুংসক নহেন, তিনি লীলাপুরুষোত্তম। তাঁহার সমস্ত ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়চালনা করিবার পূর্ণতম শক্তি আছে। যেখানে বিকল্পে তিনি নিরিন্দ্রিয় হন—এইরূপ ধারণার বিন্দু-বিসর্গও বা কোনরূপ সমন্বয় আছে, সেখানে কৃষ্ণসেবা বা কৃষ্ণভক্তি নাই; তাহাকে মায়ার সেবাই বলা যাইবে। 'ঠুঁটোরাম' বস্তুতে ভাব বা প্রেম হয় না। অচেতন বা নপুংসকের সঙ্গে শক্তি বা প্রকৃতি-জাতীয় জীবের প্রেম হইতে পারে না। কেন না, 'ঠুঁটোরাম' বা নপুংসকের সেবা গ্রহণ করিবার মত ইন্দ্রিয় কিংবা আদান-প্রদানের শক্তি-সামর্থ্য নাই, ঠুঁটোরাম নিষ্ক্রিয়।

গণগড্ডলিকার নিকট শ্রেষ্ঠ ভক্ত বা মহাসিদ্ধ-নামে পরিচিত ও সমগ্র গণ-সমাজের শ্রদ্ধা-পুষ্পাঞ্জলিতে চির পূজিত কোন কোন ব্যক্তি যে কামীমূর্ত্তির পূজা করিয়াও ভক্তি লাভ করিয়াছিলেন, সেই ভক্তি কি জাতীয় ভক্তি, তাহা কি একান্ত সত্যানুসন্ধিৎসুগণ নিরপেক্ষভাবে বিচার করিবেন না? জগতের শ্রেষ্ঠ মনীষিগণ, জগতে ধার্ম্মিক নামে পরিচিত মহারথিগণ লোকের উপর যে একটা গতানুগতিক ধর্ম্ম-ধারণা ও স্থির-সিদ্ধান্তের প্রহেলিকা বা যাদু আনিয়া ফেলিয়াছেন, সেই ইন্দ্রজাল হইতে মুক্ত হইয়া একটি একান্ত-সত্য-পিপাসু-হৃদয়ও কি পরমসত্যের সন্ধানের জন্য পরম সৎসাহস প্রদর্শন করিবেন না? অন্ততঃ একটি বারও কৃষ্ণের নিকট একান্ত মুক্ত প্রাণে এই প্রবল জনমতরূপ বিরাট্ স্তূপের অভ্যন্তর হইতে সত্যের গুপ্ত কৌস্তুভমণিটি উদ্ধারের জন্য কাতরস্বরে প্রার্থনা জানাইবেন না? গতানুগতিকতার ও জনমতের যাদুই কি আমাদিগকে পাইয়া বসিবে? 'পঞ্চায়েতী ভক্তি'কে কৃষ্ণভক্তি বা কৃষ্ণসেবার নামে গোঁজামিল দিবার যে একটা প্রবল চেষ্টা বর্ত্তমান সাহিত্যে, ধর্ম্মপ্রচারকগণের 'রোজনামচা'য়, লোকপ্রিয় ধর্ম্ম-বিক্রেতাদিগের বিপণিতে ও জন-মতের হাটে দেখা যাইতেছে, তাহার সেই গতি রোধ করিবার জন্য গৌড়ীয়মঠের যে বিপ্লবী বাণী—শ্রৌতবাণী—শ্রীচৈতন্যবাণী, তাহা কি একজন সত্য-পিপাসুর কর্ণেও প্রবেশ করিবে না?

যদিও একান্ত সত্যকথায় মুখ খুলিতে গেলেই প্রকৃত কৃষ্ণসেবকগণের কণ্ঠরোধ করিবার চেষ্টা হইবে, তথাপি প্রকৃত ভাগবত-ধর্ম্মের বাণী-ঘোষণায় পশ্চাৎপদ হইলেও আত্মহিংসা ও পরহিংসার প্রশ্রয় দেওয়া হইবে। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষাভিসন্ধি-কপটতা লইয়া যে দেবতাপূজা, তাহা কখনও কৃষ্ণসেবা নহে; অধিক কি, কৃষ্ণমূর্ত্তির সম্মুখে বসিয়া, তাঁহার মন্দিরে প্রবেশ করিয়াও যদি অন্তরে তাঁহাকে আমাদের

কোন-না-কোন প্রকার ইন্দ্রিয়তৃপ্তি বা সম্ভোগবাদের যোগানদাররূপে ভাবা যায়, তাহা হইলে তাহাও কৃষ্ণমূর্ত্তির সেবা হইবে না। তাহা কৃষ্ণের বহিরঙ্গা শক্তি মায়া বা তাঁহার ছায়াশক্তিরই পূজা, তাহা ভক্তি নহে।

অশ্বিনীবাবুর 'ভক্তিযোগে'র 'কৃষ্ণসেবা' শীর্ষক পরিচ্ছেদের এক স্থানে কাহারও সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে— "কালীপূজা করিতে করিতে তাঁহার জীবন ধন্য হইয়া গিয়াছে। নিষ্কামভক্তি অজস্রধারে সুরধুনীর ন্যায় প্রবল বেগে হৃদয়ের ভিতরে বহিয়া যাইতেছে।"

জন-মতের নিকট 'সিদ্ধ' বা 'মহাসিদ্ধ' নামে পরিচিত ব্যক্তিগণ যে নিষ্কামভক্তি লাভ করিয়াছিলেন, সেই নিষ্কাম ভক্তির স্বরূপ কি? 'আমি কিছু চাহি না, আমি অষ্টসিদ্ধি, লোক-মান্য, শাস্ত্রজ্ঞান কিছুই চাহি না, আমি কেবল মাকে দেখিতে চাই' প্রভৃতি উক্তি মৌখিকই হউক, আর অকপট আন্তরিকই হউক, তাহাই কি নিষ্কিঞ্চনা ভক্তির মাপকাঠি হইবে? যিনি নিষ্কিঞ্চনা ভক্তি চাহেন, তিনি ত' যিনি সেই ভক্তি দিতে পারেন, তাঁহার নিকটই চাহিবেন। যিনি অপ্রাকৃত কামদেব, তিনিই ত' সকল জীবকে তাঁহার কামের ইন্ধন করিয়া লইতে পারিবেন। ভক্ত হওয়া অর্থই ভগবানের সর্ব্ববিধ কামের ইন্ধন হইয়া যাওয়া। নিষ্কিঞ্চনা ভক্তি একমাত্র অপ্রাকৃত কামদেবেরই একচেটিয়া বস্তু। একমাত্র মাধুর্য্য-বিগ্রহ স্বরাট্‌লীলা পুরুষোত্তমেই সকল রস ও সকল কামভোগের শক্তি আছে। প্রকৃতি বা শক্তি—ভোগ্য, ভোক্তা নহে। ইহা এই প্রতিবিম্বিত ছায়া জগতেও দেখা যায়। 'সকল জনপ্রিয় দোকানেই শুদ্ধভক্তি পাওয়া যায়' বলিয়া যদি অব্যভিচারিণী ভক্তিকে উদার (?) করিবার চেষ্টা হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাহার মধ্যে ভেজাল আসিয়াছে, জানিতে হইবে। সকল দোকানদারই নিজের দোকানের দুগ্ধ (?) বা দুগ্ধের ন্যায় প্রতীয়মান শ্বেত তরল পদার্থকে 'খাঁটি' বলেন বলিয়া 'বাজারে আদৌ খাঁটি নাই' সিদ্ধান্ত করা বা সকলের দোকানের শ্বেত তরল পদার্থ গুলিকেই 'বিশুদ্ধ দুগ্ধ' বলিয়া জনপ্রিয়তা অর্জ্জন ও গোঁজামিল দেওয়াটাই বা কোন্ যুক্তি বা বুদ্ধিমত্তা?

জড়মায়া আমাদিগকে জাগতিক লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠা দিতে পারেন ও দিয়া থাকেন। জড়মায়া যাঁহার ছায়া, সেই চিৎশক্তি আমাদিগকে কৃষ্ণসেবা প্রদান করিয়া আমাদের প্রতি অকপট কৃপা বর্ষণ করিতে পারেন; কিন্তু তিনি স্বয়ং কৃষ্ণের ন্যায় কামদেব বা সম্ভোগ-বিগ্রহ হইয়া আমাদিগকে তাঁহার কামের ইন্ধন করেন না, অর্থাৎ স্বয়ং আমাদের ভক্তির মূল বিষয় হন না।

শ্রীচৈতন্যদেব জানাইয়াছেন,—

ভুক্তিমুক্তিস্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে।
তাবদ্ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ।।

(চৈঃ চঃ ম ১৯।১৭৬)

যে কাল পর্য্যন্ত জীবের হৃদয়ে ভোগ বা ভোগের প্রতিযোগী মুক্তির বাসনা বিন্দুমাত্রও থাকে, সেকাল পর্য্যন্ত কিছুতেই ভক্তিদেবী জীবের হৃদয়ে তাঁহার আত্মস্বরূপ প্রকাশ করেন না। হয়ত' কেহ মুখে বলিতে পারেন—'আমি ভোগ চাই না, এমন কি, মোক্ষও চাই না, আমি তোমাতে অহৈতুকী ভক্তি চাই'; কিন্তু

যদি তাঁহার অন্তরে ঐরূপ মৌখিক ভক্তির প্রার্থনার অন্তরালে সংসারের ত্রিতাপ হইতে নিবৃত্তি বা মুক্তির কামনা থাকিয়া যায়, অথবা যাঁহার প্রতি মৌখিক ভক্তির অভিনয় দেখাইতেছেন, তিনি যদি নিত্যকাল তাঁহার অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়বান্ লীলাপুরযোত্তম স্বরূপ সংরক্ষণ করিতে অসমর্থ হন, কিংবা বিকল্পে নিরিন্দ্রিয় হইয়া যান, তাহা হইলে তাহাকে আদৌ 'ভক্তি'ই বলা যাইবে না, নিষ্কাম বা অকিঞ্চনা ভক্তি ত' দূরের কথা! —ইহাই ভক্তিবৈজ্ঞানিকগণের ও শ্রীচৈতন্যদেবের সিদ্ধান্ত।

মুমুক্ষু প্রভৃতীনাঞ্চেদ্ভবেদেষা রতির্ন হি।।
বিমুক্তাখিলতর্ষৈর্যা মুক্তৈরপি বিমৃগ্যতে।
যা কৃষ্ণেনাতিগোপ্যাশু ভজদ্ভ্যোঽপি ন দীয়তে।।
সা ভুক্তিমুক্তিকামত্বাচ্ছুদ্ধাং ভক্তিমকুর্ব্বতাম্।
হৃদয়ে সংভবত্যেষাং কথং ভাগবতী রতিঃ।।
কিন্তু বালচমৎকারকারী তচ্চিহ্নবীক্ষয়া।
অভিজ্ঞেন সুবোধোঽয়ং রত্যাভাসঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।।

(ভঃ রঃ সিঃ পূঃ লঃ ৩।১৯, ২০)

"এই রতি বা ভাব যদি মুমুক্ষু প্রভৃতি ব্যক্তিতে লক্ষিত হয়, তাহা হইলে উহা 'রতি'-পদ বাচ্য হইবে না। মুক্তপুরুষগণ নিখিল কাম বিসর্জ্জনপূর্ব্বক যে রতির অন্বেষণ করেন, যাহা কৃষ্ণ স্বয়ং অতিশয়-গোপ্য-সম্পত্তিরূপে সংরক্ষণ করিয়াছেন এবং যে রতি তিনি ভজনকারিগণকেও সহসা প্রদান করেন না, ভুক্তি ও মুক্তিকাম-বশতঃ যাঁহাদের শুদ্ধভক্তির যাজন হয় না, সেই সকল কর্ম্মী ও জ্ঞানীর হৃদয়ে সেই ভাগবতী রতির কিরূপে সম্ভাবনা হইতে পারে? কিন্তু ঐ **রতির বাহ্য চিহ্ন দেখিয়া অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের চমৎকার বোধ হয়** অর্থাৎ তাঁহারা তাঁহাদের এই লক্ষণকে অহৈতুকী বা নিষ্কামভক্তির ফল 'প্রেম' বলিয়া মনে করেন; বস্তুতঃ অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের নিকট উহা 'রহিত আবাস' বলিয়াই উপলব্ধি হয় এবং তাঁহারা উহাকে সেই নামেই আখ্যা দিয়া থাকেন।" তাৎপর্য্য এই যে, রতির আভাস 'প্রকৃত রতি' নহে, তাহা প্রকৃত বস্তুর ছায়ামাত্র। রতির আভাসেও 'ছায়ারত্যাভাস' ও 'প্রতিবিম্বরত্যাভাস'—এই দুইটি ভেদ দৃষ্ট হয়। যাঁহারা মুখে নিষ্কামা ভক্তির প্রতিজ্ঞা বা বাহ্যে ভাবভক্তির ক্রিয়া-মুদ্রা প্রদর্শন করেন, অথচ যাঁহারা কর্ম্ম জ্ঞান যোগাদি মতকে ভক্তিরই ন্যায় অন্যতম মত বা পথ-বিশেষ মনে করেন, কিংবা যাঁহারা কৃষ্ণসেবার অনুকরণে স্বতন্ত্রভাবে দেবতান্তরের পূজা করেন অথবা কৃষ্ণভক্তি ও প্রেমের লক্ষণসমূহের কথা শুনিয়া ইতর দেবতা-ভক্তির (?) মধ্যেও অনুকরণ করিয়া সেইগুলি প্রয়োগ (?) করিতে চাহেন, তাঁহাদিগের মধ্যে যদি কোন রতির (?) লক্ষণও দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হইলে ঐগুলি 'প্রতিবিম্ব রত্যাভাস' মাত্র, উহা শুদ্ধভক্তির লক্ষণ নহে—তাহা কৃষ্ণসেবা বা ভক্তি হইতে বহুদূরে অবস্থিত।

কালীভক্তি প্রভৃতি করিয়া যাঁহারা মহাসিদ্ধ বা 'অহৈতুকপ্রেমভক্ত' বলিয়া অনভিজ্ঞ বিরাট্ গণমতের নিকট বহুমানিত ও পূজিত হইয়াছেন, তাঁহাদেরই কেহ কেহ বলিয়াছেন,—"অদ্বৈতবাদ আঁচলে বেঁধে যাহা ইচ্ছা, তাহা কর।" কেহ বা বলিয়াছেন—"আমি চিনি হইতে চাহি না, আমি চিনি খাইতে চাহি।" অশ্বিনী বাবুর ভক্তিযোগের মতে "যাঁহারা ঐরূপ উক্তি করিয়াছেন, তাঁহাদেরই হৃদয়ে নিষ্কামভক্তি অজস্রধারে সুরধুনীর ন্যায় প্রবলবেগে প্রবাহিত হইয়াছে!"

"অদ্বৈতবাদ আঁচলে বেঁধে যাহা ইচ্ছা, তাহাই কর"—এই মূল নীতির অনুসরণ করিয়া নিষ্কাম ভক্তি-যাজনের অভিনয় ভক্তিবিনাশের (?) একটি সাময়িক বা আগন্তুক অস্ত্র হইয়াছে। অদ্বৈতবাদ অর্থাৎ যদ্দ্বারা সেব্য-সেবকের মধ্যে যাবতীয় বৈচিত্র্য তিরোহিত হয়, তাহাই যখন মূল উদ্দেশ্য হইল, তখন নিষ্কামভক্তির সাময়িক অভিনয় কি ভক্তির পাত্রের প্রতি ব্যঙ্গ হইয়া দাঁড়াইল না? **ভক্তিকে অন্তিমে চির বিনাশ করিবার জন্যই যেন সেখানে ভক্তির সাময়িক যাজন**। ইহা কি আরও অধিকতর কপটতা নহে? এই জন্য কোন বৈষ্ণব-মহাজন গাহিয়াছেন,—

ধিক্ তার কৃষ্ণসেবা, শ্রবণ-কীর্ত্তন।
কৃষ্ণ-অঙ্গে বজ্র হানে তাহার স্তবন।।

তথাকথিত সমন্বয়বাদী বা মায়াবাদিগণ যে কৃষ্ণসেবা বা ভগবানের (?) কথা শ্রবণ-কীর্ত্তন কিংবা তাঁহার নিকট নিষ্কাম অহৈতুকী ভক্তির প্রার্থনার অভিনয় প্রদর্শন করেন, তাহা কৃষ্ণের সুখদায়ক না হইয়া কৃষ্ণের অঙ্গে (?) যেন বজ্র নিক্ষেপ করে।

"আমি অষ্টসিদ্ধি চাই না, কিছুই চাই না, আমি কেবল তোমার দেখা চাই"—ইহাও অহৈতুক ভক্তের কামনা নহে। শ্রীচৈতন্যদেব অহৈতুক ভক্তের কিরূপ প্রার্থনা, তাহা জানাইয়া বলিয়াছেন,—

আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্ট মা-
মদর্শনান্মর্ম্মহতাং করোতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো
মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ।।

—কৃষ্ণের যদি ইচ্ছা হয়, তিনি আমাকে তাঁহার দাসী বলিয়া আলিঙ্গন করুন, না হয়, আমাকে দেখা না দিয়া যদি আমাকে মর্ম্মাহত করিবার ইচ্ছা হয়, তাহাই করুন। সেই লম্পটের যাহাতে সুখ হয়, তিনি তাহাই করুন। তিনিই আমার একমাত্র প্রাণনাথ, অপর কেহ নহেন।

"চিনি হইতে চাহি না, চিনি খাইতে ভালবাসি"—এই জাতীয় উক্তির মধ্যেও সম্ভোগবাদের কথা রহিয়াছে। চিনি হইয়া যাওয়া অর্থাৎ ব্রহ্মের সহিত একীভূত হওয়া বা ব্রহ্মের আসন গ্রহণ করা যেরূপ নিজের সম্ভোগ-চেষ্টা, তাহা না করিয়া চিনি ভোগ করা অর্থাৎ ব্রহ্মকে বা কৃষ্ণকে ভোগ করার চেষ্টাও অপর প্রকার

সম্ভোগ-পিপাসা। কেহ অদ্বৈতবাদী হইয়া সম্ভোগ করিতে চাহেন; কেহ বা সম্ভোগের জন্য জড়দ্বৈতবাদী থাকিতে চাহেন! **ঐরূপ দ্বৈতবাদ বা অদ্বৈতবাদ কোনটিতেই ভক্তির 'ভ' নাই, নিষ্কাম ভক্তি ত' দূরের কথা!**

যে কোন বদ্ধজীবের যাহাতে রুচি, যে-কোন বদ্ধজীবের যাহা কল্পনা, সেই কল্পনায় বিশ্বাসের নামে যে ধর্ম্মান্ধতা এবং যাহাদিগের ধর্ম্ম-মত যে-কোন বাস্তবসত্যের বিরোধী, তাহাদের পক্ষে সেইরূপ ভাবে ভগবদুপলব্ধির (?) ছলনাই 'কৃষ্ণসেবা',—ইহা কিরূপ 'কৃষ্ণসেবা' বুঝা যায় না! কোন ধর্ম্ম-মতে যদি গো-মাংস ভক্ষণই ভগবদুপলব্ধির (?) সহায়ক হয়, কোন ধর্ম্মমত-বিশেষ যদি জীবাত্মার অস্বীকারই তাহার পক্ষে ধর্ম্মসাধন হয়, তবে তাহাই কি তত্তদ্ধর্ম্মমতবাদীর পক্ষে 'কৃষ্ণসেবা' (?) হইবে? উহা কিরূপ 'কৃষ্ণে'র সেবা? শাস্ত্রে 'অসুর কৃষ্ণে'র নামও শুনিতে পাওয়া যায়। আত্মার অস্তিত্বই ঠিক, না আত্মার অনস্তিত্বই ঠিক, ভগবৎপ্রসাদ গ্রহণই ঠিক, না গোমাংস গ্রহণই ঠিক? উভয়ই সত্য হইলে বাস্তব সত্য কোন্‌টি? 'উভয়টিই স্ব-স্ব অধিকারে বাস্তবসত্য'—সমন্বয়বাদীর এই কথা কি বাস্তব সত্যের অপলাপ করিবার চেষ্টা নহে? প্রচ্ছন্ন সামাজিক বা রাজনৈতিক একতা, ব্যবহারিক বিরোধ প্রভৃতি অন্যাভিলাষ চরিতার্থ করিবার জন্য ধর্ম্মবিশ্বাসের সমন্বয় করিবার ছলে সত্যে গোঁজামিল দেওয়াই কি 'কৃষ্ণসেবা'? কৃষ্ণসেবায় এইরূপ বাহ্য গোঁজামিলও নাই বা সংঘর্ষও নাই। যেখানে সকল আশ্রিত বস্তুই এক পরাৎপরতত্ত্বের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির স্বার্থে পরিচালিত, সেখানে 'বিরোধ' বলিয়া কিছুই নাই। ব্যবহারিক শিষ্টাচার বা দ্বন্দ্ব-রাহিত্য 'লৌকিক সভ্যতা' বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে; কিন্তু তদ্দ্বারা কৃষ্ণ সন্তুষ্ট হন না; উহা কৃষ্ণসেবা নহে, সামাজিক সম্ভোগময় প্রচ্ছন্ন-নাস্তিকতা।

"প্রভাতের অরুণ রবি, সূর্য্যাংশুস্নাত বসুন্ধরা মহাসাগরের অম্বুরাশি" প্রভৃতি নয়নতৃপ্তিকর প্রাকৃতিক দৃশ্যসম্ভোগকে 'ভগবৎপ্রেম' বলা যাইতে পারে না; তাহা এক প্রকার প্রচ্ছন্ন আত্মভোগ বা প্রাকৃতিক ও নৈতিক বিশুদ্ধতা-সম্ভোগের নামে প্রকৃতিভোগ-পিপাসা। যাঁহারা প্রকৃতিকে, বিশ্বকে বা কার্য্যকে সর্ব্বকারণ-কারণ ভগবানের সহিত একাকার করিয়া প্রচ্ছন্ন চরম নাস্তিকতার পথে ধাবিত, যাঁহারা সবিশেষ লীলা-পুরুষোত্তমের ইন্দ্রিয়তৃপ্তিতে বিমুখ, তাঁহারাই ঐরূপ প্রকৃতি বা বিশ্বের উপাসনাকে 'ভগবদুপাসনা' বলিয়া থাকেন। **বিশ্ব কিছু ভগবান্ নহেন; কার্য্য কিছু কারণ নহেন; প্রকৃতি কিছু প্রকৃতির অধীশ্বর নহেন; মায়া কিছু মায়াধীশ নহেন।**

ভক্তিশাস্ত্রে বিশ্বরূপের উপাসনাকেও ভক্তির মধ্যে স্থান দেওয়া হয় নাই। গীতার ১১শ অধ্যায়ে যে বিশ্বরূপের উপাসনার কথা আছে, সেই বিশ্বরূপ কৃষ্ণের প্রকৃতস্বরূপ নহেন, তাহা **প্রাকৃতরূপ**। শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে তৃতীয়সংখ্যা শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভু জানাইয়াছেন,—"অবয়ব সংস্থানৈঃ সাক্ষাৎ শ্রীচরণাদিসন্নিবেশৈর্লোক-বিস্তরো বিরাড়াকারঃ প্রপঞ্চঃ কল্পিতঃ। যথা—তদবয়বসন্নিবেশস্তথৈব পাতালমেতস্য হি পাদমূলমিত্যাদিনা **নবীনোপাসকান্ প্রতি মনঃস্থৈর্য্যায় প্রখ্যাপিতঃ। ন তু বস্তুতস্তদেব তস্যাঙ্গমিত্যর্থঃ।**" অবয়ব-সংস্থান অর্থাৎ

সাক্ষাৎ শ্রীচরণাদির সন্নিবেশ-দ্বারা বিরাট্ আকার প্রপঞ্চ কল্পিত হয়। নবীন উপাসকগণের মনঃস্থৈর্য্যের জন্যই ঐ বিরাট্ রূপের উপাসনার কথা উপদিষ্ট হইয়াছে; কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে ঐ সকল তাঁহার অঙ্গ নহে।

বিশ্বরূপ-দর্শন অর্জ্জুনের অভিপ্রেত ছিল না বলিয়াই তিনি বলিয়াছিলেন,—

* * *

ভয়েন চ প্রব্যথিতং মনো মে।
তদেব মে দর্শয় দেবরূপং
প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস।।

(গীঃ ১১।৪৫)

শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে তাঁহার চতুর্ভুজরূপ দর্শন করাইয়া নিজ-দ্বিভুজ-সৌম্যমূর্ত্তি দর্শন করাইলে অর্জ্জুন বলিয়াছিলেন,—

দৃষ্ট্বেদং মানুষং রূপং তব সৌম্যং জনার্দ্দন।
ইদানীমস্মি সংবৃতঃ সচেতাঃ প্রকৃতিং গতঃ।।

(গীঃ ১১।৫১)

কৃষ্ণ জানাইলেন যে, তাঁহার সেই সচ্চিদানন্দ নরাকৃতিরূপই তাঁহার নিজ-রূপ—

ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য অহমেবংবিধোঽর্জ্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ।।

(গীঃ ১১।৫৪)

অর্থাৎ অনন্যা ভক্তির দ্বারাই ভগবানের সেই নিজস্বরূপ জ্ঞাত ও পরিদৃষ্ট হয়। এতৎপ্রসঙ্গে কৃষ্ণসন্দর্ভের ৮২ সংখ্যায় শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—

"নরাকার-চতুর্ভুজরূপস্যৈব স্বকত্বনির্দ্দেশাৎ। **তদ্বিশ্বরূপং ন তস্য সাক্ষাৎস্বরূপমিতি স্পষ্টম্।**"

অর্থাৎ নরাকার চতুর্ভুজরূপেই স্বকীয়ত্ব নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এইজন্য **বিশ্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ স্বরূপ নহে,** ইহা স্পষ্টই সিদ্ধান্তিত হইল।

অতএব প্রাকৃতিক ভোগ্যদৃশ্য-সম্ভোগকে, অধিক কি, বিরাট্‌রূপ দর্শনে চিত্ত-নিয়োগকেও 'শ্রীকৃষ্ণসেবা' বলা যাইতে পারে না।

অশ্বিনী বাবুর 'ভক্তিযোগে' লিখিত হইয়াছে,—"প্রকৃতির মধ্যে ভগবান্‌কে উপলব্ধি করিয়া তাঁহার চিন্তা, লীলাকীর্ত্তন প্রভৃতি করাই কৃষ্ণসেবা।" ভাগবত-শাস্ত্রে এইরূপ বিচারকে অভক্তিযোগের চরম বলিয়াছেন। প্রকৃতির মধ্যে যাহা উপলব্ধি হয়, তাহা প্রাকৃত—প্রাকৃতের চিন্তা, ধ্যান প্রভৃতিও প্রাকৃত।

প্রাকৃত বস্তুর লীলা নাই, তাহার অনিত্য ক্রিয়া মাত্র দৃষ্ট হয়। মনের দ্বারাই প্রাকৃতবস্তুর চিন্তা ও ভাবনা হইতে পারে; কিন্তু **কৃষ্ণভক্তি জড়মনের কার্য্য নহে**। এইজন্য শ্রীমদ্ভাগবত কৃষ্ণে ভক্তিযোগের কথা বলিতে গিয়াই প্রতিপদে **'অধোক্ষজ, অপ্রাকৃত'** শব্দের প্রয়োগ করিয়া আমাদের বহির্ম্মুখ প্রাকৃত সাহজিক বুদ্ধিকে নিয়মিত করিয়াছেন। ভক্তিযোগের স্বরূপ নির্ণয় করিতে গিয়া শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্ম যতো **ভক্তিরধোক্ষজে**।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা **সুপ্রসীদতি**।।

(ভাঃ ১।২।৬)

যাহা অক্ষজ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ভোগ্য, তাহা ভগবান্ নহে, আর অক্ষজবস্তুর সম্ভোগও ভক্তি নহে। প্রকৃতির **নির্জ্জনতা-সম্ভোগ, প্রাকৃতিক সুষমা-সম্ভোগ বা প্রকৃতির নানা বৈচিত্র্য-ভোগ-পিপাসা ধর্ম্ম-প্রবণতা-ছলনার মনোহর অবগুণ্ঠনে সজ্জিত হইয়া অনাদিবহির্ম্মুখ জীবকে বঞ্চনা ও প্রচ্ছন্ন নাস্তিকতা শিক্ষা দেয়।** বেদে যে বহু দেবতার উপাসনার কথা আছে, তাহা ভগবদ্ভক্তি নহে। ধর্ম্মের আদিম অবস্থায় ও নবীন উপাসকগণের জন্য ঐরূপ একটি অধিকার আছে সত্য, কিন্তু 'ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্" —এই ঋঙ্ মন্ত্রে একমাত্র-পরমপদ অধোক্ষজ বিষ্ণুর ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য দিব্যসূরিগণের নির্ম্মল আত্মার যে লালসা, তাহাই ভক্তি। যখন উপাস্যবস্তুর ঐশ্বর্য্য অপেক্ষা তাঁহার মাধুর্য্য আমাদের আত্মাকে অধিকতর আকর্ষণ করে, তখনই তাহা কৃষ্ণসেবা।

অধোক্ষজ ও অপ্রাকৃত

গত ১০ই জ্যৈষ্ঠ (১৩৪২), শুক্রবার শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে ৪১ নং থিয়েটার রোডে আগমন-সময়ে মোটরযানে বসিয়া শ্রীল প্রভুপাদ 'অধোক্ষজ' ও 'অপ্রাকৃত' শব্দের বৈশিষ্ট্য কীর্ত্তন করেন। থিয়েটার রোডের ভবনে পৌঁছিয়াও রাত্রি প্রায় ১১।। টা পর্য্যন্ত এই দুইটি শব্দের পার্থক্য বর্ণনা করিয়াছিলেন। সেই সকল বাণী আমরা যতটুকু ধারণা করিতে পারিয়াছি, তাহারই দিগ্‌দর্শন এই প্রবন্ধে প্রদান করিবার চেষ্টা করিব।

ইতঃপূর্ব্বে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীগৌড়ীয়মঠের একটি বিশেষ অধিবেশনে তাঁহার অভিভাষণের মধ্যে 'প্রত্যক্ষ', 'পরোক্ষ', 'অপরোক্ষ', 'অধোক্ষজ' ও 'অপ্রাকৃত' শব্দপঞ্চকের বৈশিষ্ট্য ও পার্থক্য বিশেষভাবে বিশ্লেষণ করিয়াছিলেন। ইহারও বহু পূর্ব্ব হইতে প্রভুপাদ 'অপ্রাকৃত' ও 'অধোক্ষজ' শব্দদ্বয় সম্বন্ধে অনুক্ষণ অনর্গল উপদেশ দিয়া আসিতেছেন। 'অধোক্ষজ' ও 'অপ্রাকৃত' শব্দের তাৎপর্য্যকে প্রত্যেকের হৃদয়ে গভীর রেখাপাত করাইবার জন্য প্রভুপাদ তাঁহার প্রত্যেক উপদেশ, অভিভাষণ, বক্তৃতা ও হরিকীর্ত্তনে এই শব্দদ্বয়ের উল্লেখই পুনঃ পুনঃ করিয়া থাকেন। যাঁহাদের শুনিবার মত কাণ হইয়াছে—যাঁহারা সেবোন্মুখতার উত্তরোত্তর অগ্রসর

হইতেছেন, তাঁহারা এই 'অধোক্ষজ' ও 'অপ্রাকৃত'-শব্দদ্বয়ের বিশ্লেষণযুক্ত নব নব তাৎপর্য্যপর ব্যাখ্যা ধরিতে পারেন এবং প্রত্যেকবারই নূতন সেবাপর আলোকে আলোকান্বিত হইয়া থাকেন। 'অধোক্ষজ' ও 'অপ্রাকৃত' শব্দদ্বয়ই যেন শ্রীচৈতন্যবাণীর যথাসর্ব্বস্ব,—ইহাই তাঁহার বাণীর মূল উপকরণ। অধোক্ষজই ধ্যান, অধোক্ষজই জ্ঞান, অধোক্ষজই মন্ত্ররূপ, অধোক্ষজই একমাত্র কীর্ত্তনীয় ও স্মরণীয় বিষয়। এই অধোক্ষজ-সর্ব্বস্বতাই জীবনের জীবন। এই অধোক্ষজের অনুক্ষণ কীর্ত্তন করিতে করিতে 'অধোক্ষজ'-শব্দ শব্দীরূপে মূর্ত্ত হইয়া অধোক্ষজ-যোগপীঠ শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীজগন্নাথমিশ্রভবনে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন।

আমাদের বাহ্য, বিদ্ধ ও বিমুখ বা বদ্ধ ইন্দ্রিয়ের নিকট যাহা আত্মসমর্পণ করে, তাহাই প্রত্যক্ষ। চার্ব্বাকাদি ভারতীয় দার্শনিক, ইয়াংচু, এপিকিউরাস প্রভৃতি অন্যান্য দেশীয় দার্শনিকগণ প্রত্যক্ষ ব্যতীত অন্য প্রমাণ স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। কেহ কেহ নিজ-প্রত্যক্ষ ব্যতীত সমজাতীয় পূর্ব্বপুরুষগণের প্রত্যক্ষকে স্বীকার করিয়া থাকেন। যেমন আকবর বাদশাহকে আমি বর্ত্তমানে প্রত্যক্ষ না করিলেও এক বা বহু অপর ব্যক্তির প্রত্যক্ষের কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহার অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপন করি। ইহাকে 'পরোক্ষ জ্ঞান' বলে। পরের বা অপরের অক্ষ অর্থাৎ ইন্দ্রিয় যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছে, তাহাতে বিশ্বাস-স্থাপনের নাম 'পরোক্ষ জ্ঞান'। 'প্যারাডাইস্', 'বিহিস্তা', 'ইন্দ্রপুর', 'স্বর্গ' প্রভৃতি যে সকল বস্তুর অস্তিত্ব বিভিন্ন ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ে স্বীকৃত হয়, তাহা সকলই পরোক্ষর অন্তর্গত।

যাহা 'প্রত্যক্ষ'ও নহে, 'পরোক্ষ'ও নহে, তাহাই 'অপরোক্ষ'। 'প্রত্যক্ষ' ও 'পরোক্ষে'র অতীত বস্তুই 'অপরোক্ষ'। যে বস্তু আমি স্বয়ং বা আমার ন্যায় অপর এক বা বহু ব্যক্তি প্রত্যক্ষ করিয়াছি, তাহা জীবেন্দ্রিয়ের অধীন বস্তু। এজন্য ইন্দ্রিয়াতীত বস্তু 'অপরোক্ষ' নামে কথিত হইয়া থাকে। 'অপরোক্ষ' শব্দের অর্থ কেহ কেহ 'প্রত্যক্ষ (ন + পরোক্ষ—'প্রত্যক্ষ') বলিয়া থাকেন। বস্তুতঃ তত্ত্ববস্তু বিচারে যে 'অপরোক্ষ' শব্দের প্রয়োগ, তাহাতে যাহা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষের অতীত, সেইরূপ ইন্দ্রিয়াতীত সত্তাকেই বুঝায়। কিন্তু সত্তার কেবল ইন্দ্রিয়াতীতত্ব হইলেও তাহার সম্পূর্ণ পরিচয়, বিশেষত্ব ও ব্যক্তিত্ব প্রকাশিত হয় না। যাহা আমি বা অপরে প্রত্যক্ষ করি নাই, তাহার স্বরূপ কি? তাহার বিশেষত্ব কি? তাহার পরিচয়ই বা দিবেন কে? ঐরূপ সত্তার অস্তিত্বমাত্র স্বীকার অন্যান্য সম্যক্ পরিচয়ের অভাবে নিরর্থক হইয়া যায়। এই জন্য 'অপরোক্ষানুভূতি' প্রভৃতি শব্দ নির্ব্বিশেষ মতবাদে পর্য্যবসিত হয়।

'অপরোক্ষ'-শব্দের প্রতিশব্দ-প্রতিম 'অতীন্দ্রিয়' প্রভৃতি শব্দ বস্তু বা তত্ত্বের স্বতঃকর্ত্তৃত্ব-ধর্ম্ম প্রকাশ না করিতেও পারে; কিন্তু 'অধোক্ষজ' শব্দের ইহাই বৈশিষ্ট্য যে, তাহা কেবলমাত্র যে জীবের অক্ষজাত (ইন্দ্রিয়জ) জ্ঞানকে তিরস্কৃত করেন, তাহা নহে; তাঁহার স্বতঃকর্ত্তৃত্ব-ধর্ম্মের দ্বারা জীবের ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের উপর পূর্ণ প্রভুত্ব স্থাপন করিয়া থাকেন। জীব নিজে নিজ তাহার ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানকে তিরস্কৃত করিতে গেলে হয়ত তদুপরি দ্বিতীয় প্রকার ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের সূক্ষ্ম ও কপট-আবরণ তাহার অজ্ঞাতসারে আনিয়া ফেলিতে পারে বা আনিয়া ফেলিতেই বাধ্য হয়। মুখে 'অতীন্দ্রিয়' বা 'অপরোক্ষ' বলিয়া কার্য্যতঃ তত্ত্ববস্তুকে ইন্দ্রিয়াধীন বা

অক্ষজ করিয়া ফেলে। ধর্ম্মার্থকাম ও মোক্ষকে প্রয়োজন বোধ করিয়া বদ্ধজীব যে সকল কুহক বা কপটতার আহ্বান করে ও তদ্দ্বারা আচ্ছন্ন হয়, তাহাই আবরণ।

যাঁহারা তত্ত্ববস্তুকে স্বতঃকর্ত্তৃত্ব-ধর্ম্মহীন করিয়া তাঁহাকে 'অতীন্দ্রিয়' বা 'অপরোক্ষ' বলিয়া থাকেন, তাঁহারা বস্তুতঃ তত্ত্ববস্তুর উপর তাঁহাদেরই ইন্দ্রিয়ের প্রভুত্বের প্রয়াস করিয়া থাকেন। 'অপরোক্ষ' শব্দের কেবল-অতীন্দ্রিয়-বাদ নিরাস করিবার জন্য তত্ত্ববস্তুর স্বতঃকর্ত্তৃত্ব-ধর্ম্ম-ব্যঞ্জক 'অধোক্ষজ' শব্দ শ্রীমদ্ভাগবতে পুনঃ পুনঃ কথিত হইয়াছে। অতীন্দ্রিয় বস্তু নির্ব্বিশেষ হইতে পারে; কিন্তু অধোক্ষজ বস্তু ইন্দ্রিয়ভোগ্য না হইয়াও চিৎসবিশেষ।

শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভু দশমস্কন্ধের টীকায় 'অধোক্ষজ' শব্দের এইরূপ অর্থ করিয়াছেন,—"স্বনিয়ম্যত্বেন অধঃকৃতং অক্ষজং ইন্দ্রিয়-সামর্থ্যং যেন সঃ" (ভাঃ ১০।১৪।১২) অর্থাৎ যে লীলাপুরুষোত্তম স্বয়ং স্বতঃকর্ত্তৃত্ব-ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া জীবের যাবতীয় ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানকে তিরস্কৃত করিয়াছেন, তিনিই বস্তুতঃ অধোক্ষজ হৃষীকেশ। তিনি হৃষীক অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের অধীন বা ইন্দ্রিয়ের অতীত মাত্র নহেন, তিনি ইন্দ্রিয়ের উপর নিরঙ্কুশ স্বতন্ত্রতা, স্বেচ্ছাচারিতা ও প্রভুত্ব বিস্তারকারী পরমেশ্বর। হৃষীক-শূন্য সত্তার প্রতি 'ভক্তি'-শব্দের প্রয়োগ হইতে পারে না। পূর্ণচিন্ময় হৃষীকেশের অধিপতিকে সেবোন্মুখ হৃষীকের দ্বারা সেবাই ভক্তি। 'অধোক্ষজ'-শব্দে স্বতঃকর্ত্তৃত্ব-ধর্ম্ম ব্যতীত ব্যক্তিত্বধর্ম্মও পরিস্ফুট। অধোক্ষজবস্তু পুরুষোত্তম; কেবল অচিদ্ভাব বা অচিৎ-সত্তামাত্র নহেন; তিনি মূর্ত্তবিগ্রহ—যে বিগ্রহ অচেতন নহেন কিংবা অচেতন-প্রায় নহেন বা নির্ব্বিশেষমাত্র নহেন; কিন্তু পূর্ণ চেতনের স্বতঃকর্ত্তৃত্ব-ধর্ম্ম বিস্তার করিয়া জীবের ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানকে নিরস্ত ও তাহার উপর প্রভুত্ব ও পূর্ণনিয়ামকত্ব বিস্তার করেন, এইরূপ সবিশেষ বস্তু।

শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু শ্রীমদ্ভাগবত ১০।১৪।১২ শ্লোকের বৃহদ্বৈষ্ণবতোষণী টীকায় হরিবংশের বাসুদেবমাহাত্ম্যের নারদ-বাক্য উদ্ধার করিয়া 'অধোক্ষজ' শব্দের অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন ঃ—

'অধোঽনেন শয়ানেন শকটান্তরচারিণা।
রাক্ষসী নিহতা রৌদ্রা শকুনীবেষধারিণী।।
পূতনা নাম ঘোরা সা মহাকায়া মহাবলা।
বিষদিগ্ধং স্তনং ক্ষুদ্রা প্রযচ্ছন্তী জনার্দ্দনে।।
দদৃশুর্নিহিতাং তত্র রাক্ষসীং বনগোচরাঃ।
পুনর্জ্জাতোঽয়মিত্যাহুরুক্তস্তস্মাদধোক্ষজঃ।।'

—ইতি ব্যাখ্যাতঞ্চ তদীয়টীকাকারৈঃ অধঃ শকটস্যাক্ষে পুনর্জ্জাত ইবেত্যধোক্ষজঃ।

শকটাসুররূপ ইন্দ্রিয়ভারবাহিতা বালকৃষ্ণকে তাহার অধোভাগে স্থিত মনে করিয়াছিল। শকট বা শকটের ধুর 'অক্ষ' বলিয়া কথিত। শকট ভারবাহিতার প্রতীক। ইন্দ্রিয়জ্ঞানরূপ ভারবাহিতা যখন বালকৃষ্ণকে নিজের

আয়ত্ত বা অধীন বস্তু মনে করে, যখন তাঁহাকে মাপিয়া লইতে চাহে, তখন বালকৃষ্ণ নিজস্বরূপকে আবৃত রাখেন। কিন্তু যখন কৃষ্ণ স্বতঃকর্ত্তৃত্বধর্ম্ম প্রকাশ করিয়া সেই শকটের ধুর ভাঙ্গিয়া দেন, অর্থাৎ বদ্ধ জীবের অক্ষজ জ্ঞানকে নিরস্ত করেন, তখনই অধোক্ষজ-তত্ত্ব আত্ম-প্রকাশিত হন। এজন্যই সনাতন গোস্বামী প্রভু বলিলেন,—'অধঃ শকটস্যাক্ষে পুনর্জ্জাত ইবেত্যধোক্ষজঃ।।'

শ্রীব্যাসদেব যখন শুদ্ধীভূত মন সম্পূর্ণভাবে সমাহিত করিয়া পূর্ণপুরুষ শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়াছিলেন, তখনই তিনি অধোক্ষজ ভক্তিযোগের কথা জগতে প্রচার করিয়াছিলেন। 'প্রত্যক্ষ', 'পরোক্ষ'—এমন কি অপরোক্ষে অভক্তিযোগের যোজনা হইতে পারে; কিন্তু অধোক্ষজে ভক্তিযোগ ব্যতীত অন্য কোন যোগ সম্ভব নহে; কেননা অধোক্ষজ কাহারও ইন্দ্রিয়ের প্রভুত্ব স্বীকার করেন না। তিনি হৃষীক (ইন্দ্রিয়)-বশ্য নহেন। অধোক্ষজের অপর নাম বিষ্ণু, সূর্য্য, গণেশ, শক্তি, রুদ্র প্রভৃতি দেবতা জীবের ইন্দ্রিয়-ভোগ্য অর্থাৎ অক্ষজ ধর্ম্ম, অক্ষজ অর্থ, অক্ষজ কামরূপ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষের বিষয় এবং অক্ষজ-ব্যতিরেক ভাবাপর অপরোক্ষ-মোক্ষের সন্ধান প্রদান করেন। মোক্ষ কামনা পর্য্যন্ত জীবের ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের শেষ সীমা। বিষ্ণু ইন্দ্রিয়জজ্ঞান বা জীবের ভোগ্য বা ত্যাজ্য বিষয় সরবরাহ করিবার ভৃত্য নহেন বলিয়া বিষ্ণুর নিকট ধর্ম্ম, অর্থ, কাম বা মোক্ষ-কামনার জন্য কোন প্রকার অভক্তিযোগ উপস্থিত হইতে পারে না। বিষ্ণু বিশ্বরূপ 'কার্য্য' নহেন, তিনি বিশ্বের কারণের কারণ।

'অধোক্ষজত্ব' ও 'বিষ্ণুত্ব' একই পর্য্যায়ভুক্ত তত্ত্ব। অহৈতুকী ভক্তিই অপরভাষার 'অধোক্ষজ-ভক্তি'। এই ভক্তিতে ভক্তের বিজ্ঞান স্বতঃকর্ত্তৃত্বধর্ম্ম-বিশিষ্ট বিষ্ণুদ্বারা নিয়মিত। পুরুযোত্তমের যাহা ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকর, তাহাই 'অধোক্ষজ-ভক্তি'; আর পুরুষের যাহা তৃপ্তিকর, তাহাই 'অক্ষজ ভক্তি' বা 'অভক্তি'। প্রাকৃত সাহজিক সম্প্রদায় যাহাকে তাহাদের 'স্বারসিকী' ভক্তি বলিয়া মনে করে, তাহা 'অক্ষজভক্তি' বা 'অভক্তি'। আর 'স্ব' অর্থ যেখানে 'বিষ্ণু' বা 'অধোক্ষজ' পুরুযোত্তম, সেখানে সেই স্বতঃ-কর্ত্তৃত্বধর্ম্ম-বিশিষ্ট পুরুযোত্তম বিষ্ণুর ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিকারিণী যে ভক্তি, তাহাই 'অধোক্ষজ ভক্তি'।

'অধোক্ষজ'-শব্দের সহিত 'অপ্রাকৃত'-শব্দের বৈশিষ্ট্য এই যে, 'অপ্রাকৃত'-শব্দে 'অধোক্ষজে'র ন্যায় স্বতঃকর্ত্তৃত্বধর্ম্মের পরিচালনা পরিস্ফুটভাবে প্রকাশিত না থাকিলেও 'অধোক্ষজ'-তত্ত্বে উপনীত হইলেই অপ্রাকৃতের বিজ্ঞান লাভ হয়। অপ্রাকৃত-শব্দ-দ্বারা কেবল যে প্রাকৃত-নিষেধ বা প্রাকৃতের ব্যতিরেক সূচনা করে, তাহা নহে; তদ্দ্বারা 'অপ্রাকৃতা প্রকৃতি' অর্থাৎ 'পরা প্রকৃতি' বা চিচ্ছক্তির বিলাসের পরিপূর্ণতা প্রকাশ করে—'অপ্রাকৃত'-শব্দের দ্বারা প্রাকৃত বৈচিত্র্য, প্রাকৃত বিশেষ, প্রাকৃত ধর্ম্ম-সমূহ যে অপ্রাকৃতেরই হেয়, খণ্ড, বিকৃত, অস্ফুট প্রতিফলন, তাহা নির্দ্দেশ করে। সুতরাং অপ্রাকৃতের দ্বারা চিদ্‌বিলাসের পূর্ণতা বা বিচিত্রাতর সমগ্রতা অধিক প্রকাশিত হয়। অধোক্ষজ হইতে অপ্রাকৃত-শব্দের বৃত্তি অধিকতর প্রগতি শালিনী ও উন্নতা। 'অধোক্ষজ'-শব্দের দ্বারা সাধারণী শুদ্ধভক্তি বুঝাইলে 'অপ্রাকৃত'-শব্দ-দ্বারা অসাধারণী পরম গুহ্য 'প্রেমভক্তি' বুঝাইয়া থাকে।

"প্রাকৃত করিয়া মানে বিষ্ণু-কলেবর।
বিষ্ণু-নিন্দা আর নাহি ইহার উপর।।"

—এই বাক্য লইয়া বিচার করিলে 'প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ' বিষ্ণু-কলেবরকে প্রাকৃত-বিচিত্রতা-যুক্ত এবং 'অপরোক্ষ' 'বিচিত্রতাহীন' কল্পনা করিয়া বিষ্ণু-কলেবরকে (?) বস্তুতঃ 'প্রাকৃত' বলিয়াই স্বীকার করে! কিন্তু জীবের এই ত্রিবিধ ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞানকে নিরাস করিয়া যখন তত্ত্ববস্তু তাঁহার পূর্ণ ইন্দ্রিয়জজ্ঞান পরিচালনা করেন, তখনই 'অধোক্ষজ-তত্ত্ব'-রূপ সম্বন্ধ ও 'অধোক্ষজ'-ভক্তি-রূপ অভিধেয় প্রকাশিত হয়। এই অধোক্ষজ-বিজ্ঞান যখন অধিকতর চিদ্‌বিলাসরূপ জ্ঞানের দ্বারা উদ্‌ভাসিত হইয়া থাকে, তখনই অপ্রাকৃত জ্ঞানের আবিষ্কার হয়। 'অধোক্ষজ-বিষ্ণুতত্ত্ব' হইতে 'অপ্রাকৃত-শ্রীরাধাকৃষ্ণ-তত্ত্বে'র অধিকতর চমৎকারিতা অনর্থমুক্ত হৃদয়ে উপলব্ধির বিষয় হয়। সেই উপলব্ধি অপ্রাকৃত বিচিত্রতাময়ী ও অপ্রাকৃত রসময়ী। অপ্রাকৃত শব্দ চেতন বা অধোক্ষজ-সেবাবৃত্তির প্রত্যক্ষকে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। এই প্রত্যক্ষ প্রাকৃত নহে, ইহা জানাইবার জন্যই 'অ-প্রাকৃত' শব্দের আবিষ্কার। অধোক্ষজ শব্দে ঐশ্বর্য্যভাব আছে, কিন্তু অপ্রাকৃত শব্দ মাধুর্য্যভাবপ্রচুর। প্রত্যক্ষের অতীত পরোক্ষ, পরোক্ষের অতীত অপরোক্ষ, অপরোক্ষের অতীত অধোক্ষজ, অধোক্ষজ হইতে অধিকতর চমৎকারিতাময় অপ্রাকৃত। প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ ও অপরোক্ষ অধোক্ষজের অন্তর্গত ও তদ্দ্বারা নিয়মিত। কিন্তু প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ দ্বা অপরোক্ষের অন্তর্গত অধোক্ষজ নহেন। অধোক্ষজ অপ্রাকৃতের অন্তর্ভুক্ত।

'আকাশাদির গুণ যেন পর পরভুতে।
এক দুই তিন চারি ক্রমে পঞ্চ পৃথিবীতে।।"

(চৈঃ চঃ ম ১৯।২৩২)

বিচারের ন্যায় অপ্রাকৃত প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ ও অপরোক্ষ নির্দ্দোষ-ভাবে বিরাজিত এবং অধোক্ষজতত্ত্বও তদন্তর্গত।

"'কাম লাগি' কৃষ্ণ ভজে, পায় কৃষ্ণ-রসে"

বর্ত্তমান বর্ষের (বাঙ্গালা ১৩৪১ সনের) জ্যৈষ্ঠমাসে একদিন পুরীতে সমুদ্রের তীরে তীরে শ্রীল প্রভুপাদ টোটাগোপীনাথের দিক্ হইতে শ্রীপুরুষোত্তম মঠের দিকে যাইতেছিলেন। এমন সময় বিখ্যাত ঔপন্যাসিকবর বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র ঔপন্যাসিক শ্রীযুক্ত শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় প্রভুপাদকে দর্শন করিবামাত্র তাঁহার বাসা হইতে বাহিরে আসিয়া প্রভুপাদকে অভিবাদন করিলেন। শচীশবাবুর সঙ্গে ছিলেন,—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়। শচীশবাবু ইতঃপূর্ব্বে একদিন শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে শ্রীমদ্ভাগবতের অসমোর্দ্ধত্বেরকথা শ্রবণ করিয়া শ্রীমদ্ভাগবত

সম্বন্ধে জীবনে প্রথম সম্পূর্ণ নূতন আলোক পাইলেন, বলিয়াছিলেন এবং তজ্জন্য প্রভুপাদের প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। শচীশবাবুর বাসার সম্মুখে দাঁড়াইয়াই শ্রীল প্রভুপাদ কথা-প্রসঙ্গে শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভুর ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর—

"সর্ব্বোপাধি-বিনির্ম্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলম্।
হৃষীকেণ হৃষীকেশ-সেবনং ভক্তিরুচ্যতে।।"

(ভঃ রঃ সিঃ পুঃ বিঃ ১।১০ ধৃত নারদপঞ্চরাত্রবাক্য)

শ্লোকটি হইতে নিরুপাধিক অহৈতুক হরিভজনের আবশ্যকতার কথা জানাইলেন। তৎপ্রসঙ্গে,—

"অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা।।"

(ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ ১।৯)

" যেষাং স এষ ভগবান্ দয়য়েদনন্তঃ
সর্ব্বাত্মনাশ্রিতপদো যদি নির্ব্যলীকম্।
তে দুস্তরামতিতরন্তি চ দেবমায়াং
নৈষাং মমাহমিতিধীঃ শ্বশৃগালভক্ষ্যে।।"

(ভাঃ ২।৭।৪২)

প্রভৃতি কএকটি শ্লোকও ব্যাখ্যা করিলেন।

প্রভুপাদ বলিলেন,—যাঁহারা ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের প্রার্থী বা কোন প্রকার অন্যাভিলাষী, তাঁহারা সব্যলীক—কৈতবযুক্ত, তাঁহারা অভক্ত। শতকরা শতভাগই ভগবানে অহৈতুকী সেবোন্মুখতা না হইলে কৃষ্ণের পূর্ণ কৃপা পাওয়া যায় না। ধর্ম্মার্থ-কাম-বাসনা চলিয়া গেলেও মোক্ষের সুবিধা-প্রাপ্তিরূপ কপটতা যাঁহাদের আছে, তাঁহারাও কৃষ্ণপ্রেম পাইতে পারেন না। কৃষ্ণকে order-supplier করিতে চাহিলে তিনি তাহা হন না, সেখানে কৃষ্ণমায়া আসিয়া উপস্থিত হয়। নিজের জন্য 'গ্রহণ' বা 'ত্যাগ' কোনটির দ্বারাই মঙ্গল হইবে না। সকল ইন্দ্রিয়ের দ্বারা হৃষীকেশেরই সেবা করিতে হইবে। কৃষ্ণকে ভোগ করিব, এই বিচারে মানবজাতির কত অসুবিধা হইয়া গিয়াছে!

রায় বাহাদুর মিত্র মহাশয় এই সকল কথা শ্রবণ করিতেছিলেন; কিন্তু তিনি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের নিম্নলিখিত পদটি উচ্চারণ করিয়া বলিলেন,—সকাম ব্যক্তিকেও কৃষ্ণ কৃপা করেন; দুর্ব্বল মানবজাতি অত উঁচু কথা ধরিতে ও বুঝিতে পারে না, কৃষ্ণ তাহা জানিয়া সকামকেও প্রেমের দ্বারা আত্মসাৎ করিয়া থাকেন,—

"অন্যকামী যদি করে কৃষ্ণের ভজন।
না মাগিলেহ কৃষ্ণ তারে দেয় স্বচরণ।।
কৃষ্ণ কহে,—আমা ভজে, মাগে বিষয়-সুখ।
অমৃত ছাড়ি' বিষ মাগে,—এই বড় মূর্খ।।
আমি বিজ্ঞ, এই মূর্খে 'বিষয়' কেনে দিব?
স্বচরণামৃত দিয়া বিষয় ভুলাইব।।
কাম লাগি' কৃষ্ণ ভজে পায় কৃষ্ণরসে।
কাম ছাড়ি' দাস হ'তে হয় অভিলাষে।।"

(চৈঃ চঃ মঃ ২২।৩৭-৩৯, ৪১)

"সত্যং দিশত্যর্থিতমর্থিতো নৃণাং নৈবার্থদো যৎ পুনরর্থিতা যতঃ।
স্বয়ং বিধত্তে ভজতামনিচ্ছতামিচ্ছাপিধানং নিজপাদপল্লবম্।।"

(ভাঃ ৫।১৯।২৬)

"স্থানাভিলাষী তপসি স্থিতোঽহং ত্বাং প্রাপ্তবান্ দেবমুনীন্দ্রগুহ্যম্।
কাচং বিচিন্বন্নপি দিব্যরত্নং স্বামিন্ কৃতার্থোঽস্মি বরং ন যাচে।।"

(হরিভক্তিসুধোদয়ে ধ্রুবচরিতে ৭ম অঃ ২৮শ শ্লোক)

[সামান্য কামের উদ্দেশে যদি কেহ কৃষ্ণভজনের অনুসন্ধান করেন, তাহা হইলেও তদ্ভক্ত-সঙ্গফলে তাঁহারা পূর্ব্বোদ্দিষ্ট কাম দূর হইয়া যায়।) সেই সকল সকাম ভক্ত ভগবানের নিকট কিছু প্রার্থনা করিলে ভগবান্ তাঁহাদের প্রার্থিত বিষয় প্রদান করিয়া থাকেন সত্য; কিন্তু যে অর্থ হইতে পুনঃ পুনঃ প্রার্থনার উদয় হয়, সেই অর্থ দেন না। যাঁহারা ইতর কামশান্তিকারী তাঁহার যে পাদপল্লব, কেবল্ সেই পাদপল্লব পাইবার ইচ্ছা না করিয়াও ভজনা করেন, তাঁহাদিগকে তিনি স্বয়ংই সেই পাদপল্লব দিয়া থাকেন।]

ধ্রুবকে কৃষ্ণ বর দিতে ইচ্ছা করিলে ধ্রুব কহিলেন,—স্বামিন্, আমি স্থানাভিলাষী হইয়া তোমার তপস্যায় স্থিত হইয়াছিলাম; কিন্তু এখন দেবমুনীন্দ্রগুহ্য তোমাকে প্রাপ্ত হইয়া আমি কৃতার্থ হইলাম—সামান্য কাচ অন্বেষণ করিতে করিতে দিব্যরত্ন পাইলাম। আমি কৃতার্থ হইয়াছি, আর অন্য বর যাচ্ঞা করি না।)

আমাদের ন্যায় কৈতবপূর্ণ চিত্তবৃত্তি-বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের পক্ষ সমর্থন করিয়া রায়বাহাদুর খগেন্দ্র বাবু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের ও ধ্রুবচরিত্রের যে প্রমাণ দিয়াছিলেন, তাহার প্রকৃত তাৎপর্য্য জানিবার জন্য অনেক সময়ই অনেকের হৃদয়ে প্রশ্নের উদয় হইয়া থাকে। এজন্য আমরা এই প্রবন্ধে এই বিষয়ের আলোচনা করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। শ্রীল প্রভুপাদ রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত খগেন্দ্র বাবুর যুক্তির উত্তরে যে সকল কথা বলিয়াছিলেন, তাহাই আমাদের প্রবন্ধের উপকরণ হইয়াছে।

রূপানুগ-ভজনের পথ কোনওপ্রকার কামনামূলক কপটতাপূর্ণ নহে। কামের দ্বারা প্রেম-লাভ হয় না। গুরু-কৃষ্ণ-কৃপায় যাবতীয় জন বা জড়প্রতিযোগী কামতৃষ্ণা নির্ম্মুক্ত হইলেই নিরুপাধিক জীবাত্মায় অপ্রাকৃত কৃষ্ণকামপরিপূরণের মুক্তপ্রগ্রহবৃত্তি প্রকাশিত হইয়া থাকে। আমি সকাম হইলেও কৃষ্ণ আমাকে প্রেম দান করিবেন, এইরূপ কৃষ্ণভোগবুদ্ধির সহিত ভজনের অভিনয়ই সম্ভোগবাদ ও অপরাধ। 'নাম বলে পাপবুদ্ধি' অর্থাৎ 'শ্রীনামের আভাসেই যখন সকল পাপ অনায়াসে দূরীভূত হয়, তখন পাপ করিব ও হরিনাম (?) করিয়া সেই সঞ্চিত পাপকে কাটাইয়া দিব'—এইরূপ বুদ্ধির সহিত নাম-গ্রহণের অভিনয় যেরূপ নাম-গ্রহণ নহে, নামাপরাধের প্রশ্রয়দান ও প্রেমের পথে অর্গল-নিক্ষেপ মাত্র, তদ্রূপ 'আমি কামনাযুক্ত হইয়া কৃষ্ণভজনের অভিনয় করিলে কৃষ্ণই তাঁহার প্রতিজ্ঞানুসারে আমাকে স্বচরণামৃত বা তাঁহার দাস্য প্রদান করিবেন',—এইরূপ কৃষ্ণে ভোগবুদ্ধি লইয়া কৃষ্ণভজনের অভিনয়ও অপরাধের প্রশ্রয়-প্রদান। কোনও একনিষ্ঠ ভগবদ্ভক্তের হৃদয়ে যদি তাঁহার অজ্ঞাতসারে কোনও কামনা উপস্থিত হয় বা মুক্তিসুখ হইতেও অনন্তকোটিগুণে শ্রেষ্ঠ দাস্য-সুখের মহিমা না জানিয়া অজ্ঞতাবশতঃ কোনব্যক্তি যদি তীব্র ভক্তিযোগ অর্থাৎ অপতিত ঐকান্তিকতার সহিত ভগবদ্ ভজনেই সংলগ্ন থাকেন, ভগবান্ তাঁহারই হৃদয়ে বুদ্ধিযোগপ্রদান করিয়া কামনার অকিঞ্চিৎকরতা বুঝাইয়া দেন, অথবা কোন নিষ্কিঞ্চন মহাজনকে প্রেরণ করিয়া সাধককে সেই সকল কৈতব পরিহারের উপদেশ দেন। সাধক তখন তাঁহার পূর্ব্বকৃত অপরাধের জন্য সাতিশয় অনুতপ্ত হন এবং সর্ব্বতোভাবে অন্যাভিলাষরহিত হইয়া কৃষ্ণকৃপা প্রার্থনা করিতে করিতে অহৈতুকভাবে ভগবদ্ভজন করেন। এইরূপ অজ্ঞসাধকের প্রতিই ভগবৎকৃপা হয়। এই ভগবৎকৃপাই সম্বন্ধজ্ঞান অর্থাৎ কৃষ্ণই নিত্যসেব্য,—এই উপলব্ধি। কৃষ্ণ আমাদিগের সেব্য বস্তু, আমাদের ভোগ্য বস্তু নহেন, অর্থাৎ আমাদিগের কামনা সরবরাহকারী নহেন—এইরূপ স্বাভাবিকী বুদ্ধির সহিত কৃষ্ণসেবায় অভিনিবেশই কৃষ্ণরসাকৃষ্টি। এই কৃষ্ণসেবারস কৃষ্ণকৃপায় হৃদয়ে উদিত হইলেই কাম পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণের দাস হইবার জন্য অভিলাষ হয়। এখানে 'অভিলাষ' শব্দটি বিশেষ বিবেচ্য, 'কাম ছাড়ি' কথাটিও বিশেষ বিচার্য্য। কাম না ছাড়িলে কৃষ্ণদাস্যে অভিলাষ পর্য্যন্তও উদিত হয় না—দাস্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়া ত' দূরের কথা—প্রেমলাভ ত' ততোধিক দূরে। যাঁহারা কামকে লালনপালন ও পোষণ করিয়া কৃষ্ণ-প্রেমিক হইয়া যাইতে চাহেন, তাঁহারাই কৃষ্ণচরণে নিত্য অপরাধী প্রাকৃত সহজিয়া। যাঁহারা নিজের কামস্পৃহাকে মূর্খতা না জানিয়া তাহকেই ভজন-বিজ্ঞতা মনে করেন এবং ঐরূপ কল্পিত ভজনবিজ্ঞতা-দ্বারাই তাঁহারা কৃষ্ণকৃপা বা কৃষ্ণপ্রেম লাভ করিবেন বা করিয়াছেন মনে করেন,—তাঁহারাই প্রাকৃত সহজিয়া। শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—

"ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে।
তাবদ্ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ।।"

(ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ ২য় লঃ ১৫ শ্লোক)

ভুক্তিস্পৃহা ও মুক্তিস্পৃহা—এই দুইটি পিশাচী; যে পর্য্যন্ত ইহারা কোন ব্যক্তির হৃদয়ে বর্ত্তমান থাকে, সে পর্য্যন্ত তাঁহার হৃদয়ে ভক্তিসুখের অভ্যুদয় হইতে পারে না।

"ভুক্তি মুক্তি আদি বাঞ্ছা যদি মনে হয়।
সাধন করিলে প্রেম উৎপন্ন না হয়।।"

(চৈঃ চঃ মঃ ১৯।১৭৫)

শ্রীসনাতন-শিক্ষায় শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

"কাম ত্যজি' কৃষ্ণ ভজে শাস্ত্র-আজ্ঞা মানি'।
দেব-ঋষি-পিত্রাদিকের কভু নহে ঋণী।।
বিধি ধর্ম্ম ছাড়ি' ভজে কৃষ্ণের চরণ।
নিষিদ্ধ পাপাচারে তাঁ'র কভু নহে মন।।
অজ্ঞানে বা হয় যদি পাপ উপস্থিত।
কৃষ্ণ তাঁরে শুদ্ধ করে, না করায় প্রায়শ্চিত্ত।।"

(চৈঃ চঃ মঃ ২২।১৩৬, ১৩৮,১৩৯)

দুর্ব্বল ও অপরাধী ব্যক্তি ঠিক একশ্রেণীর নহে। যদিও দুর্ব্বলতাই কালে অপরাধে পরিণত হইতে পারে, তথাপি দুর্ব্বলতার অধিকারে কামনা-রূপ পাপ ও অপরাধের প্রতি ঘৃণা আছে; কিন্তু দুর্ব্বল ব্যক্তি পাপ ও অপরাধ অত্যন্ত অন্যায় জানিয়াও তাহা পরিত্যাগে অসমর্থ। আর অপরাধী কখনও ঐ সকলকে অন্যায়ই বিবেচনা করেন না। তিনি যাহা করেন ও যাহা বুঝেন, তাহাই ভাল; বরং প্রকৃত সাধুরই বুঝা ভুল হইয়াছে, এরূপ মনে করেন! সাধু সকামের মন রাখিয়া বা অপরাধিশ্রেণীর রুচির অনুযায়ী কথা বলেন না বলিয়া এক শ্রেণীর প্রাকৃতসহজিয়া-সম্প্রদায় ভগবচ্চরণে অপরাধ অপেক্ষাও গুরুতর অপরাধ অর্থাৎ বৈষ্ণবাপরাধ করিয়া বসেন! দুর্ব্বল ব্যক্তি কামনাকে আদর ও রুচির সহিত গ্রহণ না করিয়া গর্হণ করিতে করিতে পরিত্যাগ করিবেন, তাহা হইলেই তাঁহার প্রতি কৃষ্ণকৃপালেশ হইতেছে জানা যাইবে। নতুবা কৃষ্ণকৃপা হইতে বঞ্চিত হইয়া কৃষ্ণমায়ার কপটকৃপালাভই তাঁহার আদর্শ হইয়াছে, প্রমাণিত হইবে। এজন্য শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—

"জাতশ্রদ্ধো মৎকথাসু নির্ব্বিণ্ণঃ সর্ব্বকর্ম্মসু।
বেদ দুঃখাত্মকান্ কামান পরিত্যাগেঽপ্যনীশ্বরঃ।।
ততো ভজেত মাং প্রীতঃ শ্রদ্ধালুর্দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
জুষমাণশ্চ তান্ কামান্ দুঃখোদর্কাংশ্চ গর্হয়ন্।।
প্রোক্তেন ভক্তিযোগেন ভজতো মাসকৃন্মুনঃ।
কাম্য হৃদয্যা নশ্যন্তি সর্ব্বে ময়ি হৃদি স্থিতে।।
ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি ময়ি দৃষ্টেঽখিলাত্মনি।।

তস্মান্মদ্ভক্তিযুক্তস্য যোগিনো বৈ মদাত্মনঃ।
ন জ্ঞানং ন চ বৈরাগ্যং প্রায়ঃ শ্রেয়ো ভবেদিহ।।
যৎকর্ম্মভির্যত্তপসা জ্ঞানবৈরাগ্যতশ্চ যৎ।
যোগেন দানধর্ম্মেণ শ্রেয়োভিরিতরৈরপি।।
সর্ব্বং মদ্ভক্তিযোগেন মদ্ভক্তো লভতেঽঞ্জসা।
স্বর্গাপবর্গং মদ্ধাম কথঞ্চিদ্ যদি বাঞ্ছতি।।"

(ভাঃ ১১।২০।২৭-৩৩)

[মদীয় চরিত-কথায় শ্রদ্ধাযুক্ত, কর্ম্মান্তরে উদ্‌বিগ্ন পুরুষ বিষয়বাসনা-রাশিকে দুঃখাত্মক জানিয়াও তৎপরিত্যাগে অশক্ত হইলে "মদ্‌ভক্তি-দ্বারাই সর্ব্ববিষয়ে সিদ্ধিলাভ হইবে",—এইরূপ দৃঢ়নিশ্চয়-সহকারে দুঃখপরিণামক বিষয়-ভোগের সহিত তাহাতে অপ্রীত হইয়া প্রীতির সহিত আমার আরাধনা করিবেন।

পূর্ব্বোক্ত ভক্তিযোগে যিনি নিরন্তর আমার সেবা করেন, তাঁহার হৃদয় আমার প্রতি একাগ্রভাবে অবস্থিত হইলে হৃদয়স্থিত যাবতীয় বিষয়-বাসনা বিনষ্ট হইয়া থাকে।

সর্ব্বান্তর্যামী পরমাত্মরূপী আমার সাক্ষাৎকার লাভ হইলে জীবের অহঙ্কার বিনষ্ট সর্ব্ব-সংশয় ছিন্ন এবং কর্ম্মরাশি ক্ষীণ হইয়া থাকে।

অতএব মদ্‌গতচিত্ত মদ্‌ভক্তিযুক্ত যোগিপুরুষের পক্ষে জ্ঞান বা বৈরাগ্য ইহ সংসারে শ্রেয়ঃসাধনরূপে গণ্য হয় না।

কর্ম্ম, তপস্যা, জ্ঞান, বৈরাগ্য, যোগ, দান, ধর্ম্ম বা অন্যান্য শ্রেয়ঃসাধনসমূহদ্বারা জগতে যাহা কিছু লব্ধ হয়, মদীয় ভক্ত ভক্তিযোগ-দ্বারা অনায়াসেই তৎসমুদয় প্রাপ্ত হইয়া থাকেন এবং যদি কখনও প্রার্থনা করেন, তাহা হইলে স্বর্গ, অপবর্গ, এমন কি বৈকুণ্ঠলোক ও লাভ করিয়া থাকেন।]

ভগবদ্ভক্তি সকাম হইলেও অন্যাবিলাষ, কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, ব্রতাদি চেষ্টা হইতে অনন্ত গুণে শ্রেষ্ঠ ও ক্রম-মঙ্গলপ্রসু, ইহা জানাইবার জন্যই শ্রীমদ্ভাগবতে বা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের 'সনাতন-শিক্ষা'য়,— 'অন্যকামী যদি করে কৃষ্ণের ভজন' প্রভৃতি কথা বলা হইয়াছে। যে কোন প্রকারে ভক্তি অর্থাৎ ভগবৎসেবার দিকে যদি চিত্ত ধাবিত করান' যায়, তাহা হইলে জীব অন্যাভিলাষ হইতে মুক্ত হইয়া ক্রমমঙ্গলের পথে চলিবার সুযোগ লাভ করিতে পারেন।

"মুক্তি-ভুক্তি-সিদ্ধিকামী সুবুদ্ধি যদি হয়।
গাঢ়ভক্তিযোগে তবে কৃষ্ণেরে ভজয়।।"

(চৈঃ চঃ মঃ ২২।৩৫)

"অকামঃ সর্ব্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্।।"

(ভাঃ ২।৩।১০)

পূর্ব্বে অকামই থাকুক, সর্ব্বকামই থাকুক বা মোক্ষকামই থাকুক, উদারবুদ্ধি হইবামাত্র মানুষ তীব্র শুদ্ধভক্তিযোগে পরম-পুরুষ কৃষ্ণের যজন করিবেন।

"সত্যং দিশত্যর্থিতমর্থিতো নৃণাং' (ভাঃ ৫।১৯।২৬) শ্লোকের টীকার শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর বলিয়াছেন,—"ততশ্চানভীপ্সিতামপি সিতশর্করাং পিতুঃ সকাশাৎ প্রাপ্য শিশবো যথা মৃদি স্পৃহাং ত্যজন্তি তথৈব কামানপীত্যর্থঃ। অতএব 'অকামঃ সর্ব্বকামো বা" ইত্যাদৌ তীব্রেণ জ্ঞানকর্ম্মাদ্যমিশ্রেণ ভক্তিযোগেন যজেতেত্যুক্তম্। অত্র নিষ্কামাণাং সকামানাঞ্চভক্তানামন্ততঃ পাদপল্লব-প্রাপ্তাবপি নৈব সর্ব্বথা ঐক্যরূপং ভাবনীয়ম্; ন হি জাত্যৈব শুদ্ধং বলাৎ শোধিতঞ্চ বস্তুতুল্যমূল্যং ভবত্যতো ধ্রুবাদিভ্যঃ সকাশাদ্ধনূমদাদীনামুৎ কর্ষঃ পরম এব দৃশ্যত ইতি।"

তাৎপর্য্য এই—শিশুগণ যেরূপ অনভীপ্সিত শর্করা পিতার নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়া মৃত্তিকা-ভক্ষণের স্পৃহা পরিত্যাগ করে, সেইরূপ মূঢ় অজ্ঞান অথচ অকপট ব্যক্তিগণ কৃষ্ণভজনকালে কামনার বশবর্ত্তী হইলেও কৃষ্ণ-কৃপায় অনভীপ্সিত কৃষ্ণ-সেবা-শর্করার আস্বাদন পাইয়া মাটিয়া জড়কাম পরিত্যাগ করিয়া থকেন। এই জন্যই "অকামঃ সর্ব্বকামঃ" শ্লোকে "জ্ঞান-কর্ম্মাদির আবরণ-রহিত তীব্রভক্তি যোগের দ্বারাই পরমেশ্বরকে সেবা করিতে হইবে" ইহা উক্ত হইয়াছে। এই স্থানে নিষ্কাম ও সকাম উভয় প্রকার ভক্ত চরমে ভগবানের পাদপল্লব প্রাপ্ত হইলেও উভয়কে একই রূপ ভাবিতে হইবে না। যাহা স্বভাবতঃই শুদ্ধ আর যাহা বলপ্রয়োগ শোধিত হয়, এই উভয় বস্তুর একমূল্য হয় না। এজন্য ধ্রুবাদি হইতে প্রেমভক্ত হনুমানাদির অধিকতর উৎকর্ষ দৃষ্ট হয়।

ধ্রুব শ্রীহরির কৃপায় পরমপদ লাভ করিয়াও আপনাকে অপরিপূর্ণকাম মনে করিয়াছিলেন,—

"সোঽপি সঙ্কল্পজং বিষ্ণোঃ পাদসেবোপসাদিতম্।
প্রাপ্য সঙ্কল্পনির্ব্বাণং নাতি প্রীতোঽভ্যগাৎ পুরম্।।"

(ভাঃ ৪।৯।১৭)

তাৎপর্য্য—ধ্রুব শ্রীহরির পাদপদ্মসেবা প্রাপ্ত হইলেন। ঐ পাদসেবা লাভ হইলে জীবের যাবতীয় বহির্ম্মুখ সঙ্কল্পের সমাপ্তি হইয়া যায়। ধ্রুব স্বীয় মনোঽভীষ্ট লাভ করিলেন বটে; কিন্তু তথাপি তাঁহার চিত্ত সুপ্রসন্ন হইল না। তিনি অনতিপ্রীতিচিত্তে পিতৃভবনাভিমুখে প্রত্যাগমন করিলেন।

ধ্রুব তাঁহার দশা অনুভব করিয়া পরে অনুতপ্ত হইয়া বলিয়াছিলেন,—

"অহো বত মমানাত্ম্যং মন্দভাগাস্য পশ্যতঃ।
ভবচ্ছিদঃ পাদমূলং গত্বা যাচে যদন্তবৎ।।"

(ভাঃ ৪।৯।৩১)

অহো, আমি বড়ই মন্দভাগ্য। আমার মূঢ়তা দর্শন কর! আমি সংসার-বিনাশক শ্রীহরির পাদমূলে উপস্থিত হইয়াও বিনশ্বর বস্তু প্রার্থনা করিয়াছি!

"মতির্বিদুষিতা দেবৈঃ পতদ্ভিরসহিষ্ণুভিঃ।
যো নারদবচস্তথ্যং নাগ্রহীষমসত্তমঃ।।"

(ভাঃ ৪।৯।৩২)

বোধ হয়, দেবতাগণ আমা অপেক্ষা নিম্নলোক প্রাপ্ত হইতেছিলেন, তাই তাঁহারা অসহিষ্ণু হইয়াই আমার বুদ্ধি বিকৃত করিয়া দিয়া থাকিবেন; তাহা না হইলে আমার ন্যায় অসত্তমব্যক্তি দেবর্ষিনারদের হিতকর বাক্য অগ্রাহ্য করিবে কেন?

"ময়েতৎ প্রার্থিতং ব্যর্থং চিকিৎসেব গতায়ুষি।
প্রসাদ্য জগদাত্মানং তপসা দুষ্প্রসাদনম্।
ভবচ্ছিদমযাচেঽহং ভবং ভাগ্যবিবর্জ্জিতঃ।।"

(ভাঃ ৪।৯।৩৪)

জগতের আত্মস্বরূপ সংসারনিবর্ত্তক ভগবান্‌কে তপস্যাদ্বারা প্রসন্ন করাও দুঃসাধ্য; কিন্তু আমি তাঁহাকে প্রসন্ন করিয়াও তাঁহার নিকট আবার সেই অসৎ সংসারই প্রার্থনা করিতেছি! **গতায়ুব্যক্তির চিকিৎসা** যেমন **নিষ্ফলা হয়,** তদ্রূপ আমার **প্রার্থিত বিষয়ও নিরর্থক** হইল।

"স্বরাজ্যং যচ্ছতো মৌঢ্যান্মানো মে ভিক্ষিতো বত।
ঈশ্বরাৎ ক্ষীণপুণ্যেন ফলীকারানিবাধনঃ।।"

(ভাঃ ৪।৯।৩৫)

হায়! যেমন নির্ধনব্যক্তি **চক্রবর্ত্তী ভুপতির নিকট সতুষ তণ্ডুলকণা প্রার্থনা** করে, তদ্রূপ আমিও এমন দুষ্কৃতিশালী যে, শ্রীহরির নিকট অকিঞ্চিৎকর অসদ্বস্তু প্রার্থনা করিলাম! শ্রীহরি আমাকে সেবানন্দ প্রদান করিতে উদ্‌গ্রীব ছিলেন; কিন্তু আমি মূঢ়তা বশতঃ তাঁহার নিকট অভিমান প্রার্থনা করিয়াছি!!

এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীমৈত্রেয় বিদুরকে বলিয়াছিলেন,—

"ন বৈ মুকুন্দস্য পদারবিন্দয়ো রজোজুষস্তাত ভবাদৃশা জনাঃ।
বাঞ্ছন্তি তদ্দাস্যমৃতেঽর্থমাত্মনো যদৃচ্ছয়া লব্ধমনঃসমৃদ্ধয়ঃ।।"

(ভাঃ ৪।৯।৩৬)

শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন,—বৎস বিদুর, তোমাদিগের ন্যায় যে সকল ব্যক্তি শ্রীমুকুন্দের পাদপদ্মপরাগরেণু ভজনা করেন, তাঁহারা সেই ভগবানের নিত্যদাস্য ব্যতীত অন্য কিছুই প্রার্থনা করেন না; কারণ তাঁহারা যদৃচ্ছাক্রমে যে বস্তু উপস্থিত হয়, তাহাকেই শ্রীহরির প্রসাদ জ্ঞান করিয়া পূর্ণ চিত্ত-প্রসাদ লাভ করিয়া থাকেন।

বৃহদ্‌ভাগবতামৃতের গোলোক-মাহাত্ম্যে শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু দেখাইয়াছেন,—

"ভক্তা ভগবতো যে তু সকাম্য স্বেচ্ছয়াঽখিলান্।
ভুঞ্জানাঃ সুখভোগাংস্তে বিশুদ্ধা যান্তি তৎপদম্।।
বৈকুণ্ঠং দুর্লভং মুক্তেঃ সান্দ্রানন্দচিদাত্মকম্।
নিষ্কামা যে তু তদ্ভক্তা লভন্তে সদ্য এব তৎ।।"

(২য় খণ্ড ১ অধ্যায় ৩য়-৪র্থ শ্লোক)

তৃতীয় শ্লোকের টীকায় শ্রীল সনাতন গোস্বামী লিখিয়াছেন,—"সকামা ভক্তা যে খলু ভোগাভিলাষেণ ভগবন্তং ভজন্ত ইত্যর্থঃ। **স্বেচ্ছয়েত্যনেন কর্ম্মপারতন্ত্র্যাদিকং নিরস্তম্‌।** অখিলানিত্যনেন ত্রৈলোক্যে মহর্লোকাদৌ অর্চ্চিরাদিষ্বপি তথা প্রপঞ্চান্তর্গত-শ্বেতদ্বীপরমাপ্রিয়াদি-বৈকুণ্ঠেষ্বপি বর্ত্তমানা ভোগাঃ গৃহীতাঃ। সুখময়ান্ ভোগানিত্যনেন চ ত্রৈলোক্যান্তর্গত-ভোগস্থিদোষদুঃখাদিকং নিরাকৃতম্। বিশুদ্ধাঃ সংচ্ছিন্ন-ভোগ-বাসনকাঃ সন্তঃ। ভুঞ্জানা ইতি বর্ত্তমান-নির্দ্দেশেন ভোগকাল এব ভগবদ্ভক্তিপ্রভাবেন বিশুদ্ধিরুদ্দিষ্টা তস্য ভগবতঃ পদং স্থানং যান্তি লভন্তে।"

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর টীকার অনুসরণে নিম্নলিখিত যে বিবৃতিটি লিখিয়াছেন, তাহা হইতেও আমাদের প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয়ের মীমাংসা পাওয়া যায়।

"ভোগাবিলাষের সহিত যাঁহারা ভগবদ্ভজন করেন, তাঁহারা সকামভক্ত। তাঁহারা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক ত্রৈলোক্য, মহর্লোকাদিতে, অর্চ্চিরাদিমার্গে এবং প্রপঞ্চান্তর্গত শ্বেতদ্বীপ ও লক্ষ্মীপতির বৈকুণ্ঠ অর্থাৎ গর্ভোদকশায়ি-বিষ্ণুলোকে যে সমস্ত ভোগ আছে, তাহা আস্বাদন করিতে করিতে বিশুদ্ধ ভগবৎসেবাকাম হইয়া সবিশেষ পরমপদরূপ পরব্যোম নামক বৈকুণ্ঠে গমন করেন। অন্যাভিলাষিতাশূন্য, কর্ম্মজ্ঞানাদি-কর্ত্তৃক অনাবৃত আনুকুল্যের সহিত কৃষ্ণানুশীলনই ভক্তি বা ভজন। সে স্থলে ভোগাভিলাষের সহিত ভজনের কিরূপ সঙ্গতি হয়, এই আশঙ্কায় 'স্বেচ্ছাপূর্ব্বক' এই শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে। তাৎপর্য্য এই যে, **যাঁহারা স্বেন্দ্রিয়-তর্পণরূপ ভোগাভিলাষের দ্বারা চালিত হইয়া তত্তদ্ ভোগপ্রাপক কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা কর্ম্মনিষ্ঠ।** সুতরাং কর্ম্ম পরন্ত্র; **কিন্তু যাঁহারা ভোগবিলাসরূপ অনর্থকে 'অনর্থ' জানিয়া তাহাকে নিন্দা করিতে করিতে শুদ্ধভক্তির অনুষ্ঠান করেন এবং ত্যাগাক্ষমতাবশতঃ ভোগ করেন, তাঁহারা ভক্ত।** তাঁহাদের সেই সেই অনুষ্ঠান 'কর্ম্ম' নয়। **ভক্তহৃদয় পবিত্র করিবার জন্য ভগবান্ কৃপাপূর্ব্বক সেই সেই ভোগদ্বারা তাঁহাদিগকে**

শুদ্ধান্তঃকরণ করতঃ স্বপাদপদ্ম অর্পণ করেন; সুতরাং কর্ম্মপারতন্ত্র্যগত কর্ম্মভোগাদি তাঁহাদের নাই। তাঁহারা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক ভোগ করিতে করিতে সাধনবলে স্বীয় অনর্থরূপ অসত্তৃষ্ণা দূর করেন। ইহাই ভক্তি-তত্ত্বের এক রহস্য। শ্রদ্ধা-ক্রমে সাধুসঙ্গ, সাধুসঙ্গে শুদ্ধভজন এবং শুদ্ধভজন-ক্রমে ভক্তের চিত্তৈকদেশস্থিত অনর্থ দূর হয়, পরে নিষ্ঠা জন্মে। ভগবদ্ভক্তদিগের এইরূপ উন্নতিক্রমে চিদ্বিশেষরূপ বৈকুণ্ঠে-গমন হয়।

সম্পূর্ণরূপে অন্যাভিলাষ-রহিত ভক্তগণ সদ্যঃ সেই বৈকুণ্ঠ লাভ করেন। সকাম ভক্তদিগের বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তি ক্রমমুক্তির ন্যায় বিলম্ব-সাধ্য। নিষ্কাম ভক্তগণ দেহত্যাগ করিবামাত্র সেই পরমপদ লাভ করেন।

শ্রীরূপশিক্ষায় শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছে,—

"কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম, অতএব শান্ত।
ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধি-কামী—সকলই অশান্ত।।"

(চৈঃ চঃ মঃ ১৯।১৪৯)

ভক্তিলতার সঙ্গে যদি উপশাখার উদগম হয়, তবেই ভোগ-মোক্ষবাঞ্ছা সাধকের হৃদয় উদিত হইয়া থাকে,—

'কিন্তু যদি লতার সঙ্গে উঠে উপশাখা।
ভুক্তি-মুক্তি-বাঞ্ছা যত অসংখ্য তার লেখা।।

(চৈঃ চঃ মঃ ১৯।১৫৮)

'প্রথমেই উপশাখার করয়ে ছেদন।
তবে মূলশাখা বাড়ি' যায় বৃন্দাবন।।
প্রেমফল পাকি' পড়ে, মালী আস্বাদয়।
লতা অবলম্বি' মালী কল্পবৃক্ষ পায়।।"

(চৈঃ চঃ মঃ ১৯।১৬১, ১৬২)

শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই শ্রীমুখবাণী হইতে জানা যায়, সাধনপথের বৈষ্ণবাপরাধরূপ সর্ব্বপ্রধানবিঘ্ন হইতেই সাধকের হৃদয়ে ভোগ-মোক্ষাদি বাঞ্ছার উদয় হইয়া থাকে। সর্ব্বাগ্রে সেই উপশাখার ছেদন না করিলে মুলশাখা বৃদ্ধি পাইতে পারে না এবং বৃন্দাবন পর্য্যন্ত পৌঁছিয়া কৃষ্ণচরণ-কল্পবৃক্ষে আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারে না।

শ্রীমন্মহাপ্রভু জানাইয়াছেন যে, একমাত্র শুদ্ধভক্তি হইতেই ব্রজপ্রেমের উদয় হয়। সেই শুদ্ধভক্তির লক্ষণ এইরূপ,—

'শুদ্ধভক্তি হৈতে হয় প্রেমা উৎপন্ন।
অতএব শুদ্ধভক্তির কহিয়ে লক্ষণ।।
অন্য বাঞ্ছা, অন্য পূজা, ছাড়ি' জ্ঞানকর্ম্ম।
আনুকুল্যে সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন।।
ভুক্তি-মুক্তি-আদি বাঞ্ছা যদি মনে হয়।
সাধন করিলে প্রেম উৎপন্ন না হয়।।

(চৈঃ চঃ মঃ ১৯।১৬৬, ১৬৮, ১৭৫)

ভুক্তি-মুক্তি-বাঞ্ছা হৃদয়ে উদিত হইলে সাধন করিলেও 'প্রেম' উৎপন্ন হয় না। সকাম ভক্ত—যেমন ধ্রুবাদি ভগবৎ কৃপায় কামনা-নির্ম্মুক্ত হইয়া কোনও উচ্চলোক বা বৈকুণ্ঠ পর্য্যন্ত গমন করিতে পারেন; কিন্তু গোলোকে কৃষ্ণপ্রেমসেবা লাভ করিতে হইলে হৃদয় স্বাভাবিক ও অহৈতুক অপ্রাকৃত কৃষ্ণানুরাগে রঞ্জিত হওয়া আবশ্যক। রাগাত্মিকজন যেরূপ সর্ব্বেন্দ্রিয় সর্ব্বতোভাবে কৃষ্ণসেবায় স্বাভাবিক লৌল্য-বিশিষ্ট, রাগানুগ-জনেরও সেইরূপ ভোগ-মোক্ষ-বাঞ্ছা ত' দূরের কথা, কোন প্রকার কামনা ত' দূরের কথা, ভগবানের ঐশ্বর্য্য পর্য্যন্ত তাঁহাদিগের আকর্ষণ বা সেবার কারণ হয় না, ভগবানের 'ঐশ্বর্য্য' আছেন বলিয়াও তাঁহারা ভগবানের সেবা করেন না; তিনি কামনা পরিপূরণ করিবেন বা মোক্ষদান করিবেন, এইরূপ বণিগ বৃত্তির দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাতে ভক্তি (?) করা ত' দূরের কথা! কৃষ্ণের স্বাভাবিক ব্যক্তিত্ব ভক্তগণের আকর্ষক। হেতু-রহিত অশুল্কসেবাবৃত্তিই যাঁহাদের নিত্য স্বভাব, তাঁহারাই কৃষ্ণপ্রেমের অধিকারী।

অতএব 'কাম লাগি' কৃষ্ণ ভজে, পায় কৃষ্ণরসে'—এই উক্তি ব্রজপ্রেমের প্রেমিক ভক্তগণের প্রতি উদ্দিষ্ট হয় নাই। মথুরাবাসিনী কুব্জা নিজ-কাম-চরিতার্থের লালসায় কৃষ্ণের বস্ত্র আকর্ষণ করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহা একমাত্র অধোক্ষজ কৃষ্ণে পর্য্যবসিত হওয়ায় তাহা সাধারণী-রতির মধ্যে গণিত হইয়াছে মাত্র। কৃষ্ণকে ভোগ করাইবার সম্বন্ধ-গন্ধলেশ থাকায় একেবারে প্রাকৃত বারবনিতার কামের ন্যায় গণ্য হয় নাই, এই মাত্র বিশেষ; কিন্তু ইহার সহিত ব্রজগোপীর প্রেম সমান নহে—আকাশ-পাতাল প্রভেদ। ব্রজগোপীর প্রেমের আদি, অন্তে বা মধ্যে আত্মকামের কোন প্রকার বিন্দু-বিসর্গও নাই। এই জন্যই কবিরাজ গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—

"গোপীগণের প্রেমের 'রূঢ়ভাব' নাম।
বিশুদ্ধ নির্ম্মল প্রেম, কভু নহে কাম।।
'প্রেমৈব গোপরামাণাং কাম ইত্যগমৎ প্রথাম্।
ইত্যুদ্ধবাদয়োঽপ্যেতং বাঞ্ছন্তি ভগবৎপ্রিয়াঃ।।"

কাম, প্রেম,—দোঁহাকার বিভিন্ন লক্ষণ।
লৌহ আর হেম যৈছে স্বরূপে বিলক্ষণ।।
আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি-বাঞ্ছা তারে বলি 'কাম'।
কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছা ধরে 'প্রেম' নাম।।
কামের তাৎপর্য্য—নিজ-সম্ভোগ কেবল।
কৃষ্ণসুখ তাৎপর্য্য মাত্র প্রেম ত' প্রবল।।
লোকধর্ম্ম, বেদধর্ম্ম, দেহধর্ম্ম-কর্ম্ম।
লজ্জা, ধৈর্য্য, দেহসুখ, আত্মসুখ-মর্ম্ম।।
দুস্ত্যাজ্য আর্য্যপথ, নিজ পরিজন।
স্বজনে করয়ে যত তাড়ন-ভৎর্সন।।
সর্ব্বত্যাগ করি' করে কৃষ্ণের ভজন।
কৃষ্ণসুখহেতু করে প্রেম সেবন।।
ইহাকে কহিয়ে কৃষ্ণে দৃঢ় অনুরাগ।
স্বচ্ছ ধৌতবস্ত্রে যৈছে নাহি কোন দাগ।।
অতএব কাম-প্রেমে বহুত অন্তর।
কাম—অন্ধতমঃ, প্রেম—নির্ম্মল ভাস্কর।।
অতএব গোপীগণের নাহি কামগন্ধ।
কৃষ্ণসুখ লাগি' মাত্র কৃষ্ণ সে সম্বন্ধ।।
'যত্তে সুজাতচরণাম্বুরুহং স্তনেষু
ভীতাঃ শনৈঃ প্রিয় দধীমহি কর্কশেষু।
তেনাটবীমটসি তদ্ব্যথতে ন কিং স্বিৎ
কুর্পাদিভির্ভ্রমতিধীর্ভবদায়ুষাং নঃ।।'
আত্ম-সুখ-দুঃখে গোপীর নাহিক বিচার।
কৃষ্ণ-সুখ-হেতু করে সব ব্যবহার।।
কৃষ্ণ লাগি আর সব করি' পরিত্যাগ।
কৃষ্ণসুখ-হেতু করে শুদ্ধ অনুরাগ।।

'এবং মদর্থোজ্ ঝিতলোকবেদ-
স্বানাং হি বো মর্য্যনুবৃত্তয়েঽবলাঃ।
ময়া পরোক্ষং ভজতা তিরোহিতং
মাসূয়িতুং মার্হথ তৎপ্রিয়ং প্রিয়াঃ।।''
কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা কে আছে পূর্ব্ব হৈতে।
যে যৈছে ভজে, কৃষ্ণ তারে ভজে তৈছে।।
'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ।।
সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হৈল গোপীর ভজনে।
তাহাতে প্রমাণ কৃষ্ণ-শ্রীমুখবচনে।।
'ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজাং
স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ
যা মাভজন্ দুর্জ্জয়গেহশৃঙ্খলাঃ
সংবৃশ্চ্য তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা।।''
তবে যে দেখিয়ে গোপীর নিজদেহে প্রীত।
সেহো ত' কৃষ্ণের লাগি' জানিহ নিশ্চিত।।
'এই দেহ কৈলুঁ আমি কৃষ্ণে সমর্পণ।
তাঁর ধন, তাঁর এই সম্ভোগ-কারণ।।
এ দেহ-দর্শন-স্পর্শে কৃষ্ণ-সন্তোষণ।
এই লাগি' করে অঙ্গের মার্জ্জন-ভূষণ।।
'নিজাঙ্গমপি যা গোপ্যো মমেতি সমুপাসতে।
তাভ্যঃ পরং ন মে পার্থ নিগূঢ়প্রেমভাজনম্।।'
আর এক অদ্ভুত গোপীভাবের স্বভাব।
বুদ্ধির গোচর নহে যাহার প্রভাব।।
গোপীগণ করেন যবে কৃষ্ণ দরশন।
সুখবাঞ্ছা নাহি, সুখ হয় কোটিগুণ।।

গোপিকা-দর্শনে কৃষ্ণের যে আনন্দ হয়।
তাহা হৈতে কোটিগুণ গোপী আস্বাদয়।।
তাঁ সবার নাহি নিজসুখ-অনুরোধ।
তথাপি বাড়য়ে সুখ, পড়িল বিরোধ।।
এ বিরোধের এক মাত্র দেখি সমাধান।
গোপিকার সুখে কৃষ্ণসুখ-পর্য্যবসান।।
গোপিকা-দর্শনে কৃষ্ণের বাড়ে প্রফুল্লতা।
সে মাধুর্য্য বাড়ে, যার নাহিক সমতা।।
আমার দর্শনে কৃষ্ণ পাইল এত সুখ।
এই সুখে গোপীর প্রফুল্ল অঙ্গমুখ।।
গোপী-শোভা দেখি' কৃষ্ণের শোভা বাড়ে যত।
কৃষ্ণ-শোভা দেখি' গোপীর শোভা বাড়ে তত।।
এই মত পরস্পর পড়ে হুড়াহুড়ি।
পরস্পর বাড়ে, কেহ মুখ নাহি মুড়ি।।
কিন্তু কৃষ্ণের সুখ হয় গোপী-রূপ-গুণে।
তাঁর সুখে সুখবৃদ্ধি হয় গোপীগণে।।
অতএব সেই সুখ কৃষ্ণ-সুখ পোষে।
এই হেতু গোপীপ্রেমে নাহি কাম-দোষে।।
উপেত্য পথি সুন্দরীততিভিরাভিরভ্যর্চ্চিতং
স্মিতাঙ্কুরকড়ম্বিতৈর্নটদপাঙ্গভঙ্গীশতৈঃ।
স্তনস্তবকসঞ্চরন্নয়নচঞ্চরীকাঞ্চলং
ব্রজে বিজয়িনং ভজে বিপিনদেশতঃ কেশরম্।।'
আর এক গোপীপ্রেমের স্বাভাবিক চিহ্ন।
যে প্রকারে হয় প্রেম কামগন্ধহীন।।

গোপীপ্রেমে করে কৃষ্ণ-মাধুর্য্যের পুষ্টি।
মাধুর্য্য বাড়ায় প্রেম হঞা মহাতুষ্টি।।
প্রীতিবিষয়ানন্দে তদাশ্রয়ানন্দ।
তাঁহা নাহি নিজ সুখবাঞ্ছার সম্বন্ধ।।
নিরুপাধি প্রেম যাঁহা, তাঁহা এই রীতি।
প্রীতিবিষয়সুখে আশ্রয়ের প্রীতি।
নিজ-প্রেমানন্দে কৃষ্ণ-সেবানন্দ বাধে।
সে আনন্দের প্রতি ভক্তের হয় মহাক্রোধে।।
অঙ্গস্তম্ভারম্ভমুত্তুঙ্গয়ন্তং প্রেমানন্দং দারুকো নাভ্যনন্দৎ।
কংসারাতের্বীজনে যেন সাক্ষাদক্ষোদীয়ানন্তরায়ো ব্যধায়ি।।'
'গোবিন্দ-প্রেক্ষণাক্ষেপিবাষ্পপূরাভিবর্ষিণম্।
উচ্চৈরনিন্দদানন্দমরবিন্দবিলোচনা।।'
আর শুদ্ধভক্ত কৃষ্ণপ্রেম সেবা বিনে।
স্বসুখার্থ সালোক্যাদি না করে গ্রহণে।।
'মদগুণশ্রুতিমাত্রেণ ময়ি সর্ব্বগুহাশয়ে।
মনোগতিরবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাম্ভসোঽম্বুধৌ।।
লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নির্গুণস্য হ্যুদাহৃতম্।
অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে।।
সালোক্য সার্ষ্টি-সারূপ্য-সামীপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ।।
মৎসেবয়া প্রতীতং তে সালোক্যাদিচতুষ্টয়ম্।
নেচ্ছন্তি সেবয়া পূর্ণাঃ কুতোঽন্যৎ কালবিপ্লুতম্।'
কামগন্ধহীন স্বাভাবিক গোপী-প্রেম।
নির্ম্মল, উজ্জ্বল, শুদ্ধ যেন দগ্ধহেম।।”

(চৈঃ চঃ আঃ ৪।১৬২-২০৯)

সেবার খতিয়ান

তের বৎসরের অধিককাল হইল, যে মহেন্দ্রক্ষণে শ্রীগুরুপাদপদ্মের বাণী কর্ণকুহরে প্রথম প্রবিষ্ট হইয়াছিল, সেই মুহূর্ত্ত হইতেই অবিরত শুনিয়া আসিতেছি, 'সেবা' শব্দের অর্থ—একমাত্র অধোক্ষজ স্বরাট্ পরাৎপরতত্ত্ব কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়-তর্পণ, তাহাতে আত্মেন্দ্রিয়-তৃপ্তির কোন প্রকার ছলনা, কপটতা বা ছদ্মবেশ নাই। আত্মেন্দ্রিয়-তৃপ্তি-বাঞ্ছার প্রতি এইরূপ তীব্রতম কষাঘাত ও তৎসঙ্গে কৃষ্ণেন্দ্রিয়তৃপ্তির মুক্ত-প্রগ্রহ বৃত্তি পরিচালনা করিবার অনুপ্রেরণা-দায়িনী বীর্য্যবতী-বাণী অসংখ্য তথাকথিত ধর্ম্মগুরুর উপদেশের মধ্যে পাই নাই বলিয়াই শ্রীচৈতন্যবাণী হৃদয় আকর্ষণ করিয়াছিল। তাহাতে এবং সতীর্থগণের আদর্শ আচর ও প্রচারে বুঝিতে পারিয়াছিলাম—সেবাই আমার নিত্য ধর্ম্ম। সেই সেবা তথাকথিত জীব সেবা নহে, তথাকথিত আর্ত্ত-সেবা নহে নিজের খেয়ালের সেবা নহে, মনোধর্ম্মের সেবা নহে, কপটতার সেবা নহে, পরোপদেশে পাণ্ডিত্যসূচক উচ্চ বাগবৈখরীর সেবাও নহে, চালিয়াতি ও জালিয়াতির সেবা নহে;—উহা বাস্তবসত্য, অদ্বিতীয় ভোক্তা, নিরঙ্কুশ স্বেচ্ছাময় এক পরাৎপর পুরুষের সেবা। সেই সেবামন্ত্র লাভের সঙ্গে সঙ্গে ইহাও শুনিয়াছিলাম, —জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে সেব্যের দ্বারা কোনপ্রকার অন্যাভিলাষ চরিতার্থ করিবার অভিসন্ধিতে যে সেবার বাহ্যাকৃতি, তাহাও সেবা নহে, বরং তাহা সেবার চরণে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অপরাধ।

সরস্বতী সেই বীণা-বীর্য্য যে-দিন কর্ণে আহিত হইল, সেই একদিন, আর আজ প্রায় চৌদ্দ বৎসর পরে আর এক দিন! আজ দেখিতেছি, মহাদেবের তেজোময় সেই চেতনবীর্য্যকে আমি কর্ণে ধারণ করিতে পারি নাই, ফেলিয়া দিয়াছি। জগতের অপদেবতা, কুদেবতা, ভূতপ্রেতের মাটিয়া ধাতুই আমার কর্ণে যোগ্যস্থান পাইয়াছে!

সেবামন্দিরে প্রবেশের প্রথম মুখে সাধন-পথের মন্ত্র পাঠ করিয়াছিলাম,—"উৎসাহান্নিশ্চয়াদ্ধৈর্য্যাৎ তত্তৎকর্ম্ম প্রবর্ত্তনাৎ সঙ্গত্যাগাৎ" প্রভৃতি। সরস্বতীকে কর্ণ হইতে ঝাঁটাইয়া (!) ফেলিয়া দিয়া ভূতপ্রেতের কুমন্ত্রণায় এই মন্ত্রগুলিকে আমার ইন্দ্রিয়তৃপ্তির কাজে লাগাইতে ত্রুটী করি নাই। 'উৎসাহ' আমি খুবই প্রদর্শন করিতেছি! আমার উৎসাহ ও উদ্যমের আবেগে ধরিত্রীর জীবকুল, স্বর্গের দেবগণ ত্রস্ত হইয়া উঠে! পুরাণে পাঠ করিয়াছিলাম, হিরণ্যকশিপু, হিরণ্যাক্ষ, রাবণ প্রভৃতি অসুরগণের উৎসাহ, উদ্যম, নিশ্চয়, ধৈর্য্য প্রভৃতি গুণপণায় স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের দেবতা ও জীব ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিতেন। সেই আদর্শের খানিকটা ছাপ আমারও অঙ্গে লাগিয়াছে।

কিন্তু এই উদ্যম কিসের জন্য? এত উৎসাহ কেন? এরূপ আকাশ-পাতাল আলোড়ন করিবার অদম্য চেষ্টাই বা কোথা হইতে আসিল? হিরণ্যকশিপু, হিরণ্যাক্ষ, খোলাখুলিভাবে বিষ্ণুবিদ্বেষ ও কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা-আহরণের জন্য মহাউদ্যম প্রদর্শন করিয়াছিল; কিন্তু আমি ত' বিষ্ণু বিদ্বেষী নহি, আমি বৈষ্ণব, —ইহা অন্তরে অন্তরে অনুভব করি। আমি হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবাপ্রাণ, গুরুসেবার জন্য আমার রাত্রিতে

নিদ্রা নাই, ভোজনের সময় নাই, সংসারের দিকে দৃক্‌পাত নাই, স্ত্রী-পুত্রের শিক্ষা দীক্ষার দিকে তাকাইবার অবসর নাই, আত্মীয় স্বজনের রোগ-শোকে সান্ত্বনা বা পরিচর্য্যার সময় ত' আদৌ নাই-ই। আমার এই অমানুষী সেবা- বৃত্তি দেখিয়া সংসারত্যাগী বৈষ্ণবগণ গুরুসেবকের সেবা করিবার জন্য সংসারের যে সকল সেবা ছাড়িয়াছেন, সেই সকল সেবা পুনরায় আবাহন করিতেও প্রস্তুত। গুরু-সেবায় আমার এত উৎসাহ, এত উদ্যম্, এত আপ্রাণ চেষ্টা!

সংসারের বিশ্বাসঘাতকতায় মর্ম্মাহত হইয়া সাময়িক বিরাগী সাজিয়াছিলাম। প্রচার-কার্য্যে আমার কত উৎসাহ, বক্তৃতা ও ব্যাখ্যায় কত উদ্যম দেখাইয়াছি। আমি অবৈতনিক প্রচারক, অভিজ্ঞ সম্পাদক, পরিপক্ক লেখক, উচ্চ সাহিত্যিক, বহু প্রশংসাপত্রপ্রাপ্ত বাগ্মী, প্রতিষ্ঠানের মুলস্তম্ভগণের অন্যতম, বলিয়া গর্ব্ব করিয়া থাকি। এই চৌদ্দ বৎসরের মধ্যে একদিনও একমুহূর্ত্তের জন্য সময় করিয়া লইয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মের বাণীর কষ্টিপাথরে যাচাইয়া দেখিয়াছি কি আমার এই উদ্যম কিসের জন্য? ইহা কি আমার সেবা-চেষ্টা, না সেব্যের সমগ্রতাদ্বারা আমার প্রতিষ্ঠাবাঞ্ছা, আমার কনক-স্পৃহা ও আমার কামিনীলাভের সেবা-সমৃদ্ধি করাইয়া লইবার উদ্যম?

আধুনিক যান্ত্রিক যুগের সভ্যতা সর্ব্বত্রই উদ্যমের যে বিপুল আড়ম্বর প্রকাশ করিতেছে, তাহা দেখিয়া জাগতিক মনীষিগণও একবাক্যে বলিয়াছেন যে, পুরুষজাতিকে বিপুল কর্ম্মোদ্যমের শক্তি সঞ্চার করিয়াছে প্রধানতঃ কামিনীজাতি, তারপর জাতরূপ ও যশোলিপ্সা। কামিনীকে সুখী করিবীর জন্য যান্ত্রিক সভ্যতার যন্ত্রারূঢ়ব্যক্তিগণ কামানের গোলার সম্মুখীন হইতেছেন, জলের অতলগর্ভে প্রবেশ করিতেছেন, আকাশচারী হইতেছেন, কত কি করিতেছেন! তাহাতে প্রতিষ্ঠা আছে, পশ্চাতে অর্থ আছে। অর্থ থাকুক আর না-ই থাকুক, প্রতিষ্ঠা তাহাতে যে প্রাণসঞ্চার করিয়াছে, তাহাতে মৃতব্যক্তিও জাগিয়া উঠিতে পারে। সভ্যজাতি স্ত্রীজাতিকে এই জন্য ''শক্তিজাতি'' নামে ভূষিত করিয়াছেন। কারণ যতকিছু জড়শক্তির প্রেরণা, মনীষিগণ বলেন, উহার মূল ভাণ্ডার মহামায়ার অংশভাগিনীগণের নিকটই নাকি গচ্ছিত।

কোন এক প্রত্যক্ষদর্শী লেখক বলিয়াছেন যে, যুদ্ধকালে সৈনিকগণের হস্ত হইতে যখন ভয়ে ও বিভীষিকায় অস্ত্র-শস্ত্র স্খলিত হইয়া যায়, তখন কোন সুন্দরী কামিনী যদি সেই স্থানে আগমন করিয়া সৈনিকগণের করমর্দ্দন করেন, তখনই সৈনিকগণের হৃদয়ে বিদ্যুৎসঞ্চার হয়। তাহারা নববল ও নবোৎসাহের সহিত যুদ্ধে বিপুল উদ্যম প্রকাশ করিতে থাকে! শক্তি-জাতির নিকট হইতে সম্মান পাইবে বা তাঁহাদের মনস্তুষ্টি করিবে, এই যে প্রচ্ছন্ন রিরংসা, তাহাই সংসারের যুদ্ধক্ষেত্রে বহির্ম্মুখ, ত্যাগী ও ভোগী উভয় প্রকার মানবকে উদ্যমী, উৎসাহী, অদম্য কর্ম্মনিপুণ, কর্ম্মবিচক্ষণ করিয়া তোলে। হয়ত অনেকে একথা অস্বীকার করিবেন, ইহার ভীষণ প্রতিবাদও করিবেন; কিন্তু আমাদের ভোগোন্মুখ বা ত্যাগোন্মুখ বিচারবুদ্ধির অজ্ঞাতসারে ছদ্মবেশী মায়া এই সকল ঘটনা মুহূর্ত্তের মধ্যে সঙ্ঘটিত করিয়া থাকে। তাই দেখিতে পাই, এই প্রচ্ছন্ন পিপাসার

উত্তেজনা যে উৎসাহ ও উদ্যমের আকাশ পাতালভেদিনী ধ্বজা উড্ডীন করিয়া গর্ব্বস্ফীতবক্ষে জয়ডঙ্কা বাজাইয়াছিল, তাহা প্রতিষ্ঠা, কনক বা কামিনী হইতে বঞ্চিত করাইবার অগ্নিপরীক্ষার সময়ই তাহার আত্মস্বরূপ প্রকাশ করিয়া ফেলে। প্রতিষ্ঠাধারা pump করিতে করিতে যতক্ষণ আমাকে ফুলাইয়া রাখা যায়, ততক্ষণই আমি মহা উদ্যমী, মহাসেবক, গুরুসেবার আদর্শ, প্রাণপাতপরিশ্রমী, মস্ত প্রচারক, বক্তা বলিয়া নিজেকে জাহির করিতে পারি; কিন্তু যে মুহূর্ত্তে প্রতিষ্ঠাটি কমিয়া যায়, তন্মহূর্ত্তেই আমার সেই কর্ম্মের উদ্যম ম্লান হইয়া পড়ে। প্রতিষ্ঠার লাঘব যাহাতে বিন্দুমাত্রও হয়, সেইরূপ বাক্য আমার নিকট অমোঘবাণের ন্যায় যন্ত্রণাদায়ক হয়। আমি আত্মসাফাই করিবার ছলনায় সেই প্রতিষ্ঠার সামান্য লাঘবকে সুদে আসলে ক্ষতিপূরণ করিবার জন্য কখনও অভিমান, কখনও কর্ম্ম- বিরতি, কখনও নিজশক্তি সামর্থ্যের প্রত্যক্ষ সাক্ষ্যসমূহ অস্ত্রশস্ত্ররূপে বাহির করিয়া ফেলি। তাই চৌদ্দবৎসর পরে ভাবিতেছি, আমার উদ্যম ও উৎসাহ প্রভৃতি কি সত্য সত্যই গুরুসেবা, না আর কিছু! কি করিতে আসিয়াছিলাম, কি করিয়াছি, ইহার হিসাব-নিকাশ ত' একদিনও নিরপেক্ষ ও সুস্থ হৃদয়ে করিলাম না!

আমি সতীর্থগণকে বলি, ''তোমাদের সমালোচনা কেবল হিংসা-মূলক। তোমরা বৈষ্ণবাপরাধী!''—ইহা হয়ত' আমি স্বয়ং মুখে না বলিলেও আমার স্তাবকসম্প্রদায়-দ্বারা আকারে ইঙ্গিতে বলাইয়া থাকি এবং তাহাদের ঐরূপ চেষ্টার গুপ্ত অনুমোদন করি এবং স্বয়ং দৈন্যের ছদ্মবেশ বা অস্ত্র লইয়া তদ্দ্বারা সমালোচকগণকে বাহ্যতঃ পরাভূত করিতে চেষ্টা করি। ইহাতে আমার ''বৈষ্ণবতা''ও বজায় থাকে!

আমার মৌন প্রতিবাদের ও নিজ-পক্ষ-সমর্থনের আর একটি প্রধান অবলম্বন আমার মতে স্বয়ং শ্রীগুরু-পাদপদ্ম! আমি মনে করি, শ্রীগুরুদেব যখন আমাকে সমর্থন (?) করেন বা আমার বিরুদ্ধে যখন আমার সম্মুখে বা কাগজে কলমে বাহিরে কিছু প্রকাশ করেন না, তখন নিশ্চয়ই যে সকল কার্য্য করি, তিনি তাহার অনুমোদক ও সমর্থক। তাই স্বয়ং 'চিফ্‌জাষ্টিস্' আমার পক্ষে ব্যারিষ্টারী করিবেন জানিয়া আমি আমার স্তাবকসম্প্রদায়ের দ্বারা আমাকে সমালোচকগণের ব্যূহ হইতে নিরাপদ্ রাখিতে পারি এবং ''আমি যাহা বুঝিয়াছি, তাহাই ঠিক'' ইহা জানিয়া উদ্যম, উৎসাহ, নিশ্চয়, ধৈর্য্য ও তত্তৎকর্ম্ম-প্রবর্ত্তনের ধ্বজা উড়াইয়া আমার অভিলাষ-পূরণের অভিযানে অগ্রসর হইয়া থাকি।

শুনিয়াছি, আমার স্তাবক সম্প্রদায় সংবাদপত্রের cuttings সংগ্রহের ন্যায় আমার প্রশংসা-সূচক যাবতীয় প্রমাণের cutting গুলি সংগ্রহ করিয়া এখন হইতেই file রাখিতেছেন। ঐগুলি নাকি আমার সমালোচকগণের সহিত যুদ্ধ করিবার পক্ষে বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎকালে আমার স্তাবকসম্প্রদায়ের পাশুপত অস্ত্র হইবে! যাহা হউক, আমি যদি নিত্য-সরস্বতী শ্রবণ করিবার পরিবর্ত্তে সরস্বতীর কৃত (?) স্তুতিকেই আমার রক্ষামাদুলী মনে করিয়া থাকি, অর্থাৎ সরস্বতীর সেবা করিবার পরিবর্ত্তে তাঁহাকে আমার প্রতিষ্ঠা ও অন্যাভিলাষ চরিতার্থ করিবার অমোঘ বর্ম্মরূপে পরিণত করিতে চেষ্টা করি, তাহা হইলে আমি চৈতন্য-

সরস্বতী শ্রবণ করিলাম কি? না, অচৈতন্য সরস্বতীর মন্ত্র কাণে তুলিয়া লইলাম? আমার স্তাবক সম্প্রদায়ের ক্রীড়া-পুত্তলি হইয়া যাওয়া কি আমার শ্রীচৈতন্যবাণীর সেবা? হয়ত বলিব, ''উাহারা আমার স্তাবক বলিয়া আমি তাঁহাদের পক্ষপাতী নহি, তাঁহারা আমার শ্রীগুরু পাদপদ্মের সেবা করেন বলিয়াই আমি তাঁহাদিগের অনুমোদক।'' আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি, তাঁহারা কি বাণীর সেবক, না বপুর সেবক? যদি তাঁহারা বাণী-বধির হইয়া থাকেন, তাহা হইলে সরস্বতীর অবস্থান-ভূমিকা হইতে তাঁহারা কতদূরে অবস্থিত, তাহা সত্য সত্যই আমি হৃদয়ে সকল সময়ে দেদীপ্যমান রাখিয়াছি কি? হয়ত' আমার বিচার আমাকে পরামর্শ দিবে, '' কেবল 'বাণী-বাণী' করিয়া চীৎকার করিলেই ত হইবে না, জগতে কাজ করিতে হইলে বপু লইয়া যাঁহারা কারবার করেন, এরূপ দুই চারিজন লোককেও সাঙ্গোপাঙ্গের মধ্যে গ্রহণ করিতে হইবে!'' আমার এই কৌশলী বুদ্ধি সত্য সত্যই প্রশংসনীয়া; কিন্তু বপু-সেবকগণের স্তাবকতা যদি বাণীর আচার প্রচার ও আদর্শ হইতে ক্রমে ক্রমে আমাকে অন্য আচার প্রচার ও আদর্শে স্থানচ্যুত করিয়া ফেলে—অনবদ্যা বাণীর সঙ্গে যদি তাহাদের মিল না হয়, তবে কি মনে করিব? তখন কি ইহাই প্রমাণিত হইবে না যে, সরস্বতী বা বাণীর সম্যক্ গমনরূপ 'সঙ্গ' ত্যাগ করিয়া বাণী-বধিরগণের সঙ্গকেই ''সঙ্গ-ত্যাগাৎ'' বাক্যের আদর্শ করিয়া ফেলিয়াছি?

সরস্বতী নৃসিংহদেবের বাগ্‌বিলাসিনী। নৃসিংহদেব ভক্তিবিঘ্নবিনাশক, কৃষ্ণসেবা-সিদ্ধিদাতা, বিন্দুমাত্রও কোনপ্রকার অন্যাভিলাষ প্রশ্রয় দিবার ইঙ্গিত সরস্বতীতে নাই। সরস্বতী ঐকান্তিসেবাময়ী। সরস্বতীর মধ্যে আপোষ বা গোঁজামিল নাই। সরস্বতী সর্ব্বেন্দ্রিয়ে সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বক্ষণ একমাত্র অধোক্ষজ কৃষ্ণ-সেবানুসন্ধানের জন্য জীব-কর্ণে বাণীবীর্য্য আধান করেন। কোন বিষয়ের বাহ্য আকার ইঙ্গিত, স্থূল আচার-ব্যবহার, সেবার বাহ্য আকৃতি, বেশ-আবেশ সমূহের সহিত যদি সেই অনবদ্যা সরস্বতীর মিল না হয়, তাহা হইলে জানিতে হইবে না কি, সরস্বতী আমাকে বঞ্চনা করিয়াছেন, না হয় সরস্বতীকেই আমি বঞ্চনা করিবার চেষ্টা করিয়াছি?

অনেক সময় সরস্বতী দ্ব্যর্থ-সূচক বলিয়া মনে হয়। তখন আমাদের বঞ্চিত হওয়া কিছু আশ্চর্য্য-জনক নহে। তবে একথাও সত্য, স্বরূপের সঙ্গেই 'ছায়া' থাকে। আমি যদি অন্যাভিলাষ চাহি, তাহা হইলে ছায়া-সরস্বতীকেই বরণ করি। সরস্বতীর অনবদ্য ঐকান্তিক ও সর্ব্বোপাধি-বিনির্মুক্ত কৃষ্ণ সেবার সন্দেশ ব্যতীত যদি অন্য কোন প্রকার দ্ব্যর্থ-সূচক বাক্‌চাতুর্য্য আমার নিকট উপস্থিত হয়, তখন আমি অকপটে গুরুকৃপা প্রার্থনা করিতে করিতে বলিব, ''প্রভো ভক্তিবিনোদবাণী ব্যতীত যেন আমি বঞ্চনাবাণীতে মুগ্ধ না হই। যে বাণী আমার অকৃত্রিম সেবা গ্রহণ করিবার পরিবর্ত্তে আমাকে 'সেব্য' সাজাইবে, যে বাণী ভক্তিবিঘ্ন বিনাশ করিবার পরিবর্ত্তে লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠাদি বিঘ্নগুলিকে আমার বরণীয় করিয়া তুলিবে, প্রভো, সেই বাণী ভক্তিবিনোদবাণী নহে—তাহা শুদ্ধ সরস্বতী নহে।''

যে শুদ্ধা সরস্বতীতে কোনপ্রকার তটস্থ অন্যাভিলাষের প্রশ্রয় নাই, কোন প্রকার বঞ্চনার সমন্বয় নাই, —সেই সরস্বতী-দ্বারা ব্যারিষ্টারী করাইয়া আমি কি অন্যাভিলাষের বিন্দুবিসর্গও রক্ষা করিতে পারি? আমি হয় ত' বলিতে পারি, ''আমার অধিকার এত উচ্চ যে, লোকের নিকট অক্ষজজ্ঞানে যাহা অসামঞ্জস্যকর, তাহা আমাতে দোষ আনয়ন করিতে পারে না। আমি তেজীয়ান্, সাপ লইয়া খেলিতে পারি, তাহা সকলের অনুকরণীয় নহে, তাহা আমারই একচেটিয়া। কৃষ্ণের ন্যায় আচার ও প্রচারের মধ্যে অসামঞ্জস্য আমাতে একচেটিয়া করিতে গেলে আমি শ্রীগৌরসুন্দরের ঔদার্য্যময়ী আচার্য্যলীলার সেবা হইতে—শ্রীচৈতন্যবাণী হইতে কি আমাকে দূরে রাখিলাম না?

''আচার প্রচার নামের কর দুই কার্য্য।
তুমি সর্ব্বগুরু তুমি জগতের আর্য্য।।''

—ইহাই অনবদ্যা শ্রীচৈতন্যবাণী। সম্ভোগ-বিগ্রহ কৃষ্ণ যখন ঔদার্য্যময়ী গৌরলীলা প্রকাশ করিয়াছেন, তখন তাঁহার সেই বাণীকে আবৃত করিলে চলিবে কেন? আমার দুর্ব্বলতা ও অন্যাভিলাষকে 'তেজীয়সাং না দোষায়' বলিয়া কৃষ্ণের যথেচ্ছাচারিতার সজ্জায় আবৃত করিলে কি আমিই বঞ্চিত হইব না? তাহাতে কি আমার কল্যাণ হইবে, না জগতের কল্যাণ হইবে? আমি যদি চৈতন্যবাণীর সংসার পাতিয়া থাকি, তাহা হইলে আমাকে সেই সংসারের পাল্যবর্গের দিকে তাকাইয়াও আচার ও প্রচারে অকৃত্রিম সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে হইবে। আমি নির্জ্জন ভজনানন্দী নহি, আমি কৃষ্ণের বৃহৎ সংসারের সংসারী, আমি প্রচার প্রতিষ্ঠানের মুখপত্রের সম্পাদক। আমার দুর্ব্বলতা থাকিতে পারে ও আছে; কিন্তু উহাকে সকল সময়ই মহাভাগবতের বা কৃষ্ণের একচেটিয়া যথেচ্ছাচারিতার পোষাকে সজ্জিত ও সমর্থিত করাইলে তদ্দ্বারা কি সেবা-প্রতিষ্ঠানের আদর্শ চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যাইবে না?

মুখর পরচর্চ্চককে মূক করিয়া দেওয়া বা নিজের মনকে ফাঁকি দিবার জন্য কর্ণকে বধির করিয়া রাখা বা 'সমালোচক মাত্রই আমার শত্রু' ভাবা এবং তাহা ভাবিয়া তাহাদের দল বৃদ্ধি করিবার সহায়তা করা বা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক চালিয়াতি ও কৌশল-দ্বারা আত্মগোপন করাই কি সরস্বতীর সেবার কুশলতা? সরস্বতীর অভ্যর্থনার জন্য যদি কর্ণের দ্বার সর্ব্বক্ষণ অকপটে উন্মুক্ত রাখিতে না পারি, তাহা হইলে বাহিরে স্থূলতঃ সরস্বতীর বপুর বিপুল অভ্যর্থনা, অভিনন্দনের মহা আড়ম্বর দেখাইয়াও কি আমি বঞ্চিত হইব না?

বলভদ্র ভট্টাচার্য্য, কৃষ্ণদাস বিপ্র, বাউলিয়া বিশ্বাস প্রভৃতি কি সাক্ষাৎ ভগবান্ শ্রীমন্ মহাপ্রভুর স্থূল সেবার কম উদ্যম দেখাইয়াছিলেন? শ্রীবল্লভভট্ট সাক্ষাৎ ভগবান্ শ্রীমদ্ গৌরসুন্দরকে নিজ-গৃহে লইয়া গিয়া সবংশে মহাপ্রভুর সেবা করিয়া ধন্যাতি-ধন্য হইয়াছিলেন; কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভু সেই শ্রীপাদ বল্লভভট্টকেও সত্যকথা বলিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হন নাই। প্রতিষ্ঠাশা ভগবদ্ভক্তিলাভের কিরূপ অন্তরায়, তাহা মহাপ্রভু স্পষ্টভাষায় জানাইয়াছিলেন।

সেই প্রাচীনকালের কথা ছাড়িয়াই দিই, বৈষ্ণব সার্ব্বভৌম ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজ, ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজ প্রভৃতি মহাজনগণের বপুসেবায় (?) যে সকল ব্যক্তি বিপুল চেষ্টা দেখাইয়াছেন, **অথচ কর্ণদ্বারা অকপটে তাঁহাদেব বাণীর পরিচর্য্যা করেন নাই,** তাঁহারা ভবিষ্যৎ জীবনে বাহ্য বিষয়ে কে কতটা জড়বিষয়ে আকৃষ্ট, অভিভূত, এমন কি পাষণ্ডতার চরমসীমার উপনীত হইয়াছিলেন বা হইয়াছেন, তাহা কি সরস্বতী আমাদিগকে অনন্তকোটিবার বলিয়া দেন নাই?

কএক বৎসর ধরিয়া ব্যাসপূজার অভিনন্দনে বাক্যবাগীশতার বছর প্রদর্শন করিয়া নিজেকে কতই ত' জাহির করিলাম। অহৈতুক অকপট গুরুসেবায় কতটা অগ্রসর হইলাম বা হইয়াছি বা সেইজন্য কতটা আন্তরিক যত্নবান আছি, তাহা একবারও সুস্থচিত্তে ভাবিয়াছি কি? না, ব্যাসপূজার প্রত্যভিভাষণ বা ধাম-প্রচারিণী সভার ধন্যবাদ জ্ঞাপন, উপাধি-বিতরণের মধ্যে আমার প্রশংসার ভাগ কতটা কম-বেশী হইল, অবৈতনিক সেবক আমি, সম্বৎসরের গুরুসেবার শুল্করূপে উহারই প্রতীক্ষা করিয়াছি? শ্রেষ্ঠ শুল্কটি আমার ভাগে না হইলে আমার মন উঠে নাই,—গুরুবৈষ্ণবগণ আমার মন পান নাই! আমি ঐসকল প্রশংসা আদৌ চাহিনা জানাইয়া বস্তুতঃ প্রতিষ্ঠাকেই চাহিয়াছি! তবে, উহা ষোল আনারও কিছু বেশী হইলেই ভাল হয়, ইহাই আমার গুপ্ত আকাঙ্ক্ষা।

এই প্রবন্ধ লিখিবার সময়, ইহা দেখিয়া আমার এক সরলপ্রাণ সতীর্থ বন্ধু বলিলেন, ''সরস্বতীর বপু ত' তাঁহার বাণী হইতে অভিন্ন। অপ্রাকৃত বস্তুতে ত' দেহ-দেহি ভেদ নাই। বপু-সেবা বাণী-সেবারই ফল-স্বরূপ। তবে আপনি 'বপু'র প্রতি এত বিমুখ কেন?" আমি 'বপু' বলিতে কি বুঝিয়াছি, তাহা এখানে না বলিলে হয় ত' আমার ঐ বন্ধুর ন্যায় অনেকেই আমার বক্তব্য বিষয়টি ধরিতে পারিবেন না, এই জন্য এখানে বলিয়া রাখি,—অপ্রাকৃত বাণী ও অপ্রাকৃত বপুতে কোন ভেদ নাই, ইহাই শ্রীচৈতন্যবাণী। যেখানে এই ভেদ-দর্শনের যবনিকার আবির্ভাব, তাহাকেই আমি 'বপু' বলিয়াছি। শ্রীগুরুদেবের শ্রীঅঙ্গ-সেবা আমার উদ্দিষ্ট বপু-সেবার উদাহরণ নহে। **শ্রীগুরুদেবের শ্রীঅঙ্গ সেবা করিলে তাঁহার বাণীর প্রতি আমরা বধির হই না,** আর বাণী-বধির হইয়া যে বপুসেবার বিপুল আড়ম্বর, তাহাতে নিশ্চয়ই অন্যাভিলাষ প্রবিষ্ট। **আবার নিরন্তর বাণী-শ্রবণের অভিনয়েও যে জড়ের প্রতি আকর্ষণ, তাহাও স্থূল বপুর বিক্রম।** শ্রীচৈতন্যবাণী যাহাতে 'opaque' বলেন, তাহাই আমার কথিত বপুর দৃষ্টান্ত। Nonconductor বস্তুটিই বপু অর্থাৎ আমার স্বতন্ত্রতার অপব্যবহারের ধাতুতে গঠিত আমার মনোরম আবরণ, যাহার মধ্য দিয়া শ্রীচৈতন্যবাণী আমাদের হৃদয়ে সেবাচেতনতার বিজলী সঞ্চার করেন না; আমার স্বকৃত এই আবরণই অপ্রাকৃত বপুর ন্যায় প্রতিভাত আমার বিবর্ত্ত। ইহাকেই আমি 'বপু' বলি। আশা করি, ইহাতে আমার কোন ভুল থাকিলে গুরুবৈষ্ণবগণ সংশোধন করিয়া দিবেন।

আমি বলি—''কাজ! কাজ! কাজ! চাই কাজ!!'' যাঁহারা শারীরিক উদ্যম-উৎসাহ দেখাইতে না পারেন, বাক্যের বহ্বাড়ম্বর, শরীরের বহ্বাড়ম্বরের প্রদর্শনী খুলিতে না পারেন, তাঁহাদিগকে অলস, জড়, রুগ্ন, বোকা, অকর্ম্মণ্য মনে করিয়া নিম্নাধিকারী সেবক বলি বা সেবকের তালিকা হইতেই খারিজ করিয়া থাকি। আমি মনে করি, আমার প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষা বা কনকাদি-চেষ্টার সহিত যিনি বা যাঁহারা প্রতিযোগিতা করিতে পারেন, তাঁহাকে বা তাঁহাদিগকেই মৌখিকভাবে কিছু ''কাজের লোক'' বলা যাইতে পারে! আর যিনি বা যাঁহারা আমার প্রতিষ্ঠা, আমার কনক-কামিনী-স্পৃহা-সমৃদ্ধির সহায়তার জন্য বিপুল উদ্যম-উৎসাহ দেখাইতে পারেন, তিনি বা তাঁহারাই কাজের লোক! আমার 'সেরেস্তা' হইতে তাঁহারাই আন্তরিক ও অযাচিত ভাবে প্রশংসা-প্রত্র পাইয়া থাকেন।

শ্রীচৈতন্যবাণী যে মহেন্দ্রক্ষণে অনাবিলভাবে আমার কর্ণে সঞ্চারিত হইয়াছিল, তাহাতে কিন্তু এই টুকুই শ্রবণ করিয়াছিলাম যে, —'শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষায়, ভাগবতধর্ম্মের নৈষ্কর্ম্ম্যবাদে **'কাজ' বলিতে এক অনাবিল হরিকথা শ্রবণ ও শ্রুতবিষয়ের অনুকীর্ত্তন**। ভাগবতধর্ম্মে অন্য কোন কাজই নাই। সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর-কলি এই চারি যুগে—অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতে **শ্রবণ ও কীর্ত্তনই মুখ্য কাজ**। শ্রবণ কীর্ত্তন-ছাড়িয়া অথবা শ্রবণ-কীর্ত্তনকে কার্য্যতঃ আচ্ছাদিত করিয়া, সরস্বতী সূর্য্যের প্রগতি স্তম্ভিত বা আবৃত করিয়া কার্য্যের বিপুল আড়ম্বর সেবা নহে, তাহা ভাগবতধর্ম্মের নৈষ্কর্ম্ম্যবাদ নহে। তাহা কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠালাভের সাধক কর্ম্মবাদ মাত্র। শ্রবণ কীর্ত্তনের ছদ্মবেশ বা নামাবলী গায় দিয়া অন্তরে অন্যাভিলাষের আগ্নেয়গিরি হইতে যে কর্ম্মাড়ম্বরের উদ্যম সজীবতার (?) অগ্নিবৃষ্টি করে, তাহা কিছুদিন পরেই নির্ব্বাপিত হইয়া যায়।''

শ্রীচৈতন্যবাণী সেইরূপ সাময়িক উত্তেজনার কথা বলেন না। সারস্বত-শ্রবণ-সদনে যে শ্রবণ কীর্ত্তনের অবিশ্রান্ত প্রবাহ ও প্রতিষ্ঠা, তাহাই শ্রীগৌড়ীয়মঠ-প্রতিষ্ঠান—ইহা ইট্‌পাট্‌কেলের বাহ্য বপু নহে। শ্রীশ্রীরূপ সনাতনের প্রাণের ঠাকুর শ্রীশ্রীগোবিন্দ-মদনমোহনের মন্দিরের যে বিপুল বপু শ্রেষ্ঠিসম্প্রদায় নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন, বিধর্ম্মীয় তাহাতে ঈর্ষা হইয়াছিল, সেই বাহ্য বপুর চূড়া তাঁহারা ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলেন; কিন্তু শ্রীরূপের ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, শ্রীসনাতনের ভাগবতামৃত, বৈষ্ণবতোষণী প্রভৃতি যাহাতে শ্রীচৈতন্য-সরস্বতী নিত্যপ্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন, শত শত বিধর্ম্মীর দল, অসংখ্য কালাপাহাড় ঐসকল উন্নততম চূড়া ভাঙ্গিতে পারিবে না। ইট্-পাট্‌কেলের স্থূল বপুর মধ্যে চর্ম্মচটিকার বাসস্থান বা গঞ্জিকা-সেবকগণের বিশ্রামস্থান বা অক্ষক্রীড়াগার হইতে পারে বা হইয়াছে; কিন্তু রসামৃতসিন্ধুর বাণীতে—বৈষ্ণবতোষণীর সরস্বতীতে কলি বা মায়ার কোন স্থান নাই। তাহাতে আছে—এক অদ্বিতীয় ভোক্তা, এক নিরঙ্কুশ স্বেচ্ছাময়, এক স্বরাট্ লীলাপুরুষোত্তম কৃষ্ণের কনক, কামিনী ও প্রতিষ্ঠার জন্য অকৃত্রিম শ্রবণ-কীর্ত্তনের উৎসাহ ও উদ্যম।

'সব প্রতিষ্ঠা আমার চাই'; 'সব কনক আমারই প্রয়োজন'—এইরূপ বুদ্ধি লইয়া সেবার উদ্যম বা সেবায় উৎসাহ-প্রকাশ কি সেবা, না কৃষ্ণের অভিনয়ের পাঠ গ্রহণের আন্তরিক পিপাসা? বাহ্য উদ্যম ও উৎসাহ

দেখিয়াই বৈষ্ণবগণ আমার সেবার বিপুলত্ব সিদ্ধান্ত করিয়া লইবেন না। কতটা নিষ্কপটে সরস্বতীর কীর্ত্তন করি, সেই শ্রবণ-কীর্ত্তনের জন্য কতটা আন্তরিক ব্যাকুল ও প্রয়াসী হই, শ্রবণ-কীর্ত্তনের ফলে আমার হৃদয়ে চেতন বিলাসের নূতন নূতন কতটা স্ফূর্ত্তি কীর্ত্তনের মধ্যে দিয়া প্রকাশিত হয়, তাহা দেখিয়াই বৈষ্ণবগণ আমাকে সরস্বতীর সেবক বিচার করিবেন। সরস্বতীর বঞ্চনায় কতটা বঞ্চিত হইয়া তাঁহা দ্বারা নিজের সেবা করাইয়া লইয়াছি ও লইতেছি, কয়ঝুড়ি প্রশংসা-পত্র ভেট পাইয়াছি, কতগুলি উপাধি ও উপায়ন পাইয়াছি, কতটা লোকপূজা, সাদর সম্বর্দ্ধনা লাভ করিয়াছি, কতটা জাগতিক সিদ্ধি বা অসিদ্ধি লাভ করিয়াছি, তাহা দেখিয়া বৈষ্ণবগণ আমাকে সরস্বতীর সেবক বিচার করিবেন না। রুগ্ন হই, সুস্থ হই, জাগতিক হিসাবে নিতান্ত অকর্ম্মণ্য হই বা কর্ম্মনিপুণ হই, মূর্খ হই বা পণ্ডিত হই—"সরস্বতী" বলিতে যাহা, সেই নৃসিংহ-বাগ্‌বিলাসিনী, বাগীশা—সেই শ্রীচৈতন্যবাণী, তাহা যতটা নিষ্কপটভাবে শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিব, তজ্জন্য যত আন্তরিক উৎসাহ, নিশ্চয় ধৈর্য্য ও তত্তৎকর্ম্মপ্রবৃত্ত হইব, ততটাই আমি সরস্বতীর প্রকৃত সেবক। যে সরস্বতী আমার কর্ণে এই মন্ত্রবীর্য্য দান করিয়াছেন, তাঁহাকে যেন কর্ণ হইতে ঝাড়িয়া না ফেলি। আজ চৌদ্দ বৎসর পরে বৈষ্ণবগণের চরণে, সতীর্থগণের পাদপদ্মে এবং শ্রীগুরুদেবের অশোক, অভয়, অমৃতাধার কোটিচন্দ্র-সুশীতল শ্রীচরণারবিন্দে এই প্রার্থনা।

প্রায় চৌদ্দ বৎসর যাবৎ শুনিয়া আসিতেছি, আমি নাকি গোত্রান্তরিত হইয়াছি। এ জন্য তথাকথিত সামাজিকগণের সহিত কতই না বাগ্‌যুদ্ধ ও মসীযুদ্ধ করিতে হইয়াছে। চৌদ্দ বৎসর কাল স্বামিসেবার ফলেও যদি সুসন্তান-সম্ভাবনা না হয়, তবে কি জানিতে হইবে? পুরুষাভিমানের প্রাবল্যই ইহার মূল কারণ নহে কি? ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতিতে শুনিয়াছিলাম,—

"ছোড়ত পুরুষ, অভিমান।
কিঙ্করী হইলুঁ আজি কান।।
বরজ বিপিনে সখী-সাথ।
সেবন করবুঁ রাধানাথ।।"

কিন্তু পুরুষাভিমান লইয়া মাথুরমণ্ডলে শ্রীগুরুপাদপদ্মের বিতরিত ব্রজভজনের কথা কেবলমাত্র বিচার-বুদ্ধির সাহায্যে বুঝিতে পারিয়াছি, মনে করিয়াছি। বরং অন্যান্য বিচারের কথা অপেক্ষা অর্থ-প্রবৃত্তির কথা অধিকতর বুদ্ধিগম্য বলিয়াই মনে ভাবি! এইরূপ প্রবল পুরুষাভিমান লইয়াই কি অষ্টকাললীলার প্রবেশাধিকার পাইব? প্রতিষ্ঠাপয়ঃ প্রণালীতে পতিত থাকিয়া কি 'সিদ্ধ প্রণালী'র সন্ধান পাইব? কনক-কামিনী প্রতিষ্ঠা-বিষ্ঠার ধূর বহন করিয়া কি গান্ধর্ব্বিকার স্বযুথে শ্রীললিতার গণে গণিত হইতে পারিব? কি করিয়াই বা শ্রীরূপমঞ্জরীর অনুগা যাবটগ্রাম-বাসিনী চিদানন্দময়ী কৃষ্ণযোষিৎ হইতে পারিব? সিদ্ধ-দেহ, সিদ্ধ-নাম-রূপ-বয়সাদি একাদশটি পর্ব্ব কি করিয়াই বা প্রকাশিত হইবে? প্রাকৃত নামের (প্রতিষ্ঠার) ভজন হইতে মুক্ত

না হইতে পারিলে কি করিয়াই বা 'মঞ্জরী' নাম প্রাপ্ত হইব? জড় হাড়-মাংসের রূপমুগ্ধ থাকিলে কি করিয়াই বা শ্রীরূপের পাল্য কৃষ্ণকামোদ্দীপক সেবাময়-রূপ প্রকাশিত হইবে? আমি ক্রমে ক্রমে এত কুরূপ-গ্রস্ত হইতেছি যে, কৃষ্ণকামের পরিবর্ত্তে নিজেই প্রাকৃতকামে জর্জ্জরিত হইয়া পড়িতেছি। আমি এতকাল কি আত্মবঞ্চনা ও কৃষ্ণবঞ্চনাই করিলাম? কোথায় প্রাকৃত আর্য্যজন-বঞ্চনা করিতে হইবে, তৎপরিবর্ত্তে কি আচার্য্য-বঞ্চনা করিলাম? কোথায় প্রাকৃত পতি-বঞ্চনা করিতে হইবে, তৎপরিবর্ত্তে কি কৃষ্ণবঞ্চনা করিয়া চিরবঞ্চিত হইলাম?

আমার দিন কি চিরকাল এভাবেই যাইবে? আখেরের যতই পাকা বন্দোবস্ত করিয়া থাকি না কেন, চালাকি দ্বারা কি চেতন-রাজ্য জয় করিতে পারিব, সরস্বতীকে কি বোকা বানাইতে পারিব? আমার বিমুখতা ও তাঁহাকে বঞ্চনা করিবার জন্য আমার অতিচালাকি দেখিয়া ভক্তিবিনোদ বাণী যেন ক্রমে ক্রমে স্তব্ধভাব ও জড় ভাব অবলম্বন করিতেছেন। ভক্তিবিনোদ প্রভু একদিন এই লীলা প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

"শ্রীগৌর-বিমুখভাব, রাধাকৃষ্ণ-প্রেমাভাব,
ভকতিবিনোদ দেখে যবে।
সংসারের দেখি গতি, কৃষ্ণভক্তিহীন মতি,
বাতব্যাধি-ছলে মৌনী তবে।।
অবলম্বি' জড় ভাব, জড়ত্যাগে ব্রজলাভ,
অনুক্ষণ এই কথা মুখে।
কৃষ্ণভক্তি-শূন্য ধরা, দেখি প্রকাশিল জরা,
অন্তর দশায় ভজে সুখে।।"

আমি চালকলার গল্প, কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠার সন্দেশ চাহি দেখিয়া তিনি সেই সকল কথা ও তৎসাধক উপায় ও উপেয় দ্বারাই আমাকে বঞ্চনা করিয়া স্বীয় বীর্য্যবতী চেতনময়ী বাণীকে সংগোপন করিতেছেন। আমি যখন মুক্তপ্রাণ ও মুক্তপিপাসা লইয়া প্রথম আসিয়াছিলাম, তখন আমার নিকট তাঁহার এই আত্মগোপন-ভাব প্রকাশিত হয় নাই—আমার মন-রাখা-কথা, দুনিয়ার সহিত আপোষ করিয়া চলিবার কথা কোন দিনই তাঁহার অনবদ্যা বাণীতে শ্রবণ করি নাই।

সাবধান! অমানিশা ঘনাইয়া আসিতেছে! 'সাধু সাবধানে'র ধ্বনিতে যেন পূর্ব্বের ন্যায় মুক্তপ্রাণে দিতে পারিতেছি না। কেন না, নিজেই অসাবধান হইয়া পড়িয়াছি। ভুলিয়া গিয়াছি সেই সতর্কবাণী—"Take care swindlers, thieves, pick-pockets are abundant." সূর্য্য অস্তমিত হইলেই দস্যু, তস্কর, পকেটমার, বাটোয়ার যাহারা আমার অতিনিকটে চতুস্পার্শ্বেই লুকাইয়া রহিয়াছে, তাহারা মুহূর্ত্তমধ্যে আসিয়া গলা টিপিবে। কত পাষণ্ডতা, কতপ্রকার নাস্তিকতা, কতপ্রকার কপটতা, কতপ্রকার কুটিনাটি,

কত অসংখ্যপ্রকারের লাভ পূজা প্রতিষ্ঠাশার মূর্ত্তি, কত প্রকার লাম্পট্য-সুবিধাবাদ কেবল আচার্য্য-ভাস্করের অস্তাচল-গমনের প্রতীক্ষা করিয়া যেন পিপাসিত প্রাণে মুখব্যাদান করিয়া রহিয়াছে। গোলোকের যে কৃপারশ্মি আমার ন্যায় কুলাঙ্গারের ভাগ্যদোষে অস্তাচলে আরোহণ করিয়াছেন, তাঁহার সেই সতর্কসঙ্কেত দিনান্তেও আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে কি? কেবল ত' কাজে ব্যস্ত, না হয় আলস্যে প্রমত্ত! এ কাজই বা কেন, আর আলস্যই বা কেন? কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাশার প্রেরণায় কর্ম্মতৎপরতা ও কর্ম্মজড়ত্ব—উভয়ই এক নহে কি? শ্রীচৈতন্যবাণীর সেই মনঃশিক্ষার বড় আদরের গানটি, যাহা আমারই জন্য রচিত হইয়াছিল, তাহা কি এত অল্প সময়ের মধ্যেই ভুলিয়া গেলাম? শ্রীল রঘুনাথের শিক্ষামন্ত্রত' বহু আগেই জলে ভাসাইয়া দিয়াছি!

"**প্রতিষ্ঠাশা ধৃষ্টাধম, চণ্ডালিনী হৃদে মম**
যতকাল করিবে নর্ত্তন।।
কাপট্য তদুপপতি, না ছাড়িবে মম মতি,
শ্বপচিনী যাহে হয় দূর।
তদর্থে যতন করি, প্রভুপ্রেষ্ঠ পদ ধরি',
সেবা তুমি কর প্রচুর।।
তেঁহ-প্রভু সেনাপতি, বিক্রম করিয়া অতি,
শ্বপচিনী-সঙ্গ ছাড়াইয়া।
রাধাকৃষ্ণ-প্রেম ধনে, দিবে কবে অকিঞ্চনে,
বলে ভক্তিবিনোদ কাঁদিয়া।।"

'তদর্থে যতন'কে 'কৃষ্ণার্থে যত্ন' না বুঝিয়া যদি 'শ্বপচিনীর অর্থে যত্ন' বুঝি, তাহা হইলে প্রভুপ্রেষ্ঠের পদ ধারণ করিতে পারিব না। প্রভু-সেনাপতির বিপুল বাহ্য সেবার ছলে তাঁহার বাণীতে উদাসীন হইলে তাঁহার বিক্রম আমার অনর্থরোগ বিদূরিত করিবে না। আমাকে অকপটে ক্রন্দন করিতে হইবে; কাঁদিয়া কাঁদিয়া ভক্তিবিনোদ বাণীর নিকট আমার মঙ্গল যাচ্ঞা করিতে হইবে—বাণী শ্রবণ করিতে হইবে।

আমার কপটতার খতিয়ান আংশিকভাবে আজ এখানেই শেষ করিলাম। তের বৎসরের হিসাব একনিঃশ্বাসে শেষ করা অসম্ভব। তারপর মায়াদেবীর অনেক চর আছে, যাহারা খতিয়ান প্রস্তুত করিবার সময় আমার কপটতাগুলিকে আচ্ছাদন করিবার অনেকপ্রকার পরামর্শ দিয়াছে। তাহাদের প্রভাবে কতটা প্রভাবান্বিত হইয়াছি, বলিতে পারি না।

এবার আর একটি কথা বলিয়া আমার খতিয়ান বন্ধ করিব। সময় সময় আমাকে কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, আমি নাকি ব্যক্তিগত দৈন্যের ছলনায় এই জাতীয় প্রবন্ধ লিখিয়া অপরব্যক্তিগণের উপর অগ্নিবর্ষণ

করিয়া থাকি। তাঁহাদের এই উক্তি আমার প্রতিষ্ঠাশার প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে আরও ঈন্ধন প্রদান করে। অর্থাৎ আমি লোকের নিকট আমাকে ঐ সকল দোষ হইতে মুক্ত বলিয়া স্থাপন করিতে পারি এবং চালাকিদ্বারা অন্যের ঘাড়ে দোষগুলি চাপাইয়া আমার অভীষ্ট সিদ্ধি করিতে পারি। কিন্তু আজ বড় দুঃখে, বড় ব্যথিত হৃদয়ে এই কথাগুলি বলিতেছি। আমার যশোলিপ্সা-রোগের লক্ষণ আমাকে ঐরূপ অনেক চালাকি শিক্ষা দিয়াছে বটে; তবে আমার যে সকল অনর্থরোগের লক্ষণ আমাতে বর্ত্তমান আছে ও ভবিষ্যতে প্রকাশিত হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে, তাহা আমার শুভানুধ্যায়ী গুরুবর্গ, ঐকান্তিক ভক্তিবিনোদবাণীর একনিষ্ঠ সেবকগণ আমাকে ধরাইয়া দিয়াছেন। তাহা হয়ত গোপন করিয়া রাখিলে আমি ঐসকল কথা ভুলিয়া যাইতে পারি কিম্বা লোকের নিকট 'সাধু' সাজিয়া অপরের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ ও নিজকেও বঞ্চনা করিতে পারি,—এই জন্যই আমার স্বরূপ প্রচার করিয়া দিলাম। তোমারা সকলে জানিয়া রাখ, আমি এইরূপ কুৎসিতরোগের রোগী, আমার ঐসকল রোগকে 'বৈষ্ণবতা' মনে করিয়া ভ্রান্ত হইও না। আমার দুর্ব্বলতা—কেবল দুর্ব্বলতা নহে, সঞ্চিত ও সযত্নে লালিত, পালিত, বর্দ্ধিত ও পরিপুষ্ট অমার্জ্জনীয় অপরাধ ও পাপগুলি যেন ভক্তিবিনোদবাণীর আদর্শকে খর্ব্ব না করে। যদি এই সেবাটুকুও আমি পরোক্ষভাবে করিতে পারি, তবে আমি আমার এই খতিয়ান লেখা সার্থক হইল মনে করিব।

আর একটি কথা বলি, আমার কুৎসিত রোগ দেখিয়া তোমাদের গুরুসেবা হইতে বিন্দুমাত্রও নিরুৎসাহ হইবার কিছু নাই। বরং গৌড়ীয়-হাসপাতালে চৌদ্দবৎসরকাল ঔষধ পথ্য গ্রহণের অভিনয়কারীও নিষ্কপট না হইলে মায়াদেবীর বঞ্চনা হইতে রক্ষা পাইতে পারে না, ইহা জানিয়া মঙ্গলকামিগণ কোটিগুণ উৎসাহে গুরু-গৌড়ীয়ের সেবা করিবেন। বাস্তব সত্যে দোষ নাই—চেতনে অচেতনের ক্রিয়া নাই;—দোষ আমার নিজের স্বতন্ত্রতার অপব্যবহারের। অচেতনতা আমার অনাদি-বহির্ম্মুখতার উপরই প্রভাব বিস্তার করে। এই পরম সত্যটি উপলব্ধি করিতে পারিলেই জীব কোটি অমঙ্গল, বিঘ্ন ও কণ্টকরাশির মধ্যে সেবায় উৎসাহহীন হন না, বরং সেবার প্রগতি তাঁহাতে আরও প্রবলতরভাবে উচ্ছলিত হইয়া উঠে। সুতরাং ভোগী ও অসুর-স্বভাব-সম্পন্ন ব্যক্তিগণের ন্যায় আমি যেন পাষণ্ড ও নাস্তিক না হইয়া পড়ি, আমি যেন অতিবাড়ী না হই, আমি যেন 'হাম্‌খোদাই' মত অবলম্বন না করি, শাসনের পথ ছাড়িয়া আমি যেন নিজে স্বতন্ত্র দলপতি হইবার বিন্দুমাত্রও পাষণ্ডতা হৃদয়ের কোণে স্থান না দিই। তোমরা সকলে মিলিয়া আমাকে আশীর্ব্বাদ কর, যেন আমি কোটিগুণ বাস্তব অকৃত্রিম উৎসাহে অনবদ্য ভক্তিবিনোদবাণীর সেবা করিতে পারি। বাণীর সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া অন্য সঙ্গে যেন আমার উৎসাহ বা উদ্যম বর্দ্ধিত না হয়। লোক দেখাইবার জন্য আমার কোন চেষ্টা যেন ধাবিত না হয়। আর বিনোদবাণীকে যেন আমি আমার ইন্দ্রিয়-বিনোদনের কার্য্যে না লাগাই! আজ এই আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা ও সকাতর প্রার্থনাটুকু লইয়াই আমি আমার খতিয়ানের মঙ্গলাচরণ করিতেছি।

গৌড়ীয়

[১৯৩৫-৩৭ খৃষ্টাব্দ]

'বড় আমি' ও 'ভাল আমি'

চেতনের ধর্ম্মের নির্ব্বিকাশক্রমে জীবের 'বড় আমি'র প্রগতি লাভজনক বলিয়া শ্রুতিশাস্ত্র গান করেন। আধ্যক্ষিকগণ তাঁহাদের ভোগ বা ত্যাগের বিচারে 'বড় আমি'কে ভোক্তা বা ভোগ-রহিত বলিয়া বিচার করেন। আর নিগমকল্পতরুর গলিত ফল ভাগবতার্কমরীচিমালা 'বড় আমি'র বিচার ভোগে বা ত্যাগে নিযুক্ত না করিয়া 'ভাল আমি'র বিচার ব্যক্ত করেন। সেই বিচার অনুসরণ করিতে গিয়া 'তৃণাদপি সুনীচ আমি' জড়জগতে 'ছোট আমি'র দৌর্ব্বল্য-বাণে বিদ্ধ হয়। প্রাকৃত-বিচারে 'ছোট আমি'র আদর নাই; 'রহিত আমি'র আদরমূলে অনুভূতিরাহিত্যই 'ক্লিষ্ট আমি'র পরিণামে কর্ত্তব্য বলিয়া গীত হয়। কিন্তু শ্রীগৌরসুন্দর ঐরূপ 'আর্ত্ত আমি'কে অধোক্ষজ-সেবা-পরায়ণের অনুগমন করিতে সুযোগ দিয়াছেন।

আধ্যক্ষিকতা ও অনাধ্যক্ষিকতা উভয় বিচারই বাস্তবসত্যজ্ঞানের ব্যাঘাতকারক বলিয়া অধোক্ষজ ভগবান্ মহাবদান্যরূপে কৃষ্ণপ্রেম প্রদান করিয়াছেন। 'ভাল আমি'র বুদ্ধিদাতা মুণ্ডকশ্রুতি বলেন—সেই বস্তু বৃহৎ হইতেও অতি বৃহৎ, সূক্ষ্ম হইতেও অতিসূক্ষ্ম। আধ্যক্ষিকের বিচার আত্ম-প্রতারিত হইয়া বৃহত্ত্ব ও পূর্ণত্বের অবৈধ অধিকার-লাভে প্রযত্নবান্; আর 'ভাল আমি'র বিচারপ্রণালীতে তৃণাদপি সুনীচ, তরোরপি সহিষ্ণু, অমানী ও মানদ-ধর্ম্ম জীবের অমঙ্গল নাশ করিয়া বদ্ধ বিচার হইতে মুক্ত করে। এই জন্যই শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের নিকট গানকালে বলেন যে,—"ভক্ত্যা মামভিজানাতি"। এ জন্যই অজ্ঞতা-পরিহারকল্পে বিজ্ঞন্মন্যের নিকট বেদান্তের প্রকৃত ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—"তচ্ছৃণ্বন্ সুপঠন্ বিচারণপরো ভক্ত্যা বিমুচ্যেন্নরঃ" এই বিচাররহিত ব্যক্তিগণ বিচারের কৈতব আবাহন করিয়া ও অভক্তিপথে স্বীয় রোচমানা প্রবৃত্তি দেখাইয়া মায়াবাদী সাজেন; তাঁহারা শ্রীচৈতন্যদেবের চরণাশ্রয়ে বিচরণ করিলে নিজ স্বরূপের সুষ্ঠু উপলব্ধি করিতে পারেন।

কেবল-চেতনের কেবল-চেতনসেবা কেবল-চেতনের সুসূক্ষ্মানুভূতি হইতে উদিত হয় বলিয়া ইংরাজী ভাষায় "Immanent" শব্দ বা সংস্কৃত ভাষায় "অন্তর্যামী" শব্দ প্রত্যেক অণুচিৎ-এর আশ্রয়ে আত্মস্বরূপ জ্ঞাপন করেন। সুতরাং 'ভাল আমি'র পরিবর্ত্তে যদি 'বড় আমি'র জন্য জড়ের প্রতি ধাবিত হওয়া যায়, তবে আধ্যক্ষিক-জ্ঞান পরবিদ্যার অনুসন্ধান দিবে না।

পরবিদ্যাবধূর জীবনস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন মুক্তজীবহৃদয়ে প্রাকট্য-লাভ না করিলে বৈকুণ্ঠ হইতে মধুপুরীর মহিমা অত্যধিক—ইহা বুঝা যাইবে না। 'ভাল আমি' হইতে পারিলে বৈকুণ্ঠ-বাস, নতুবা মায়া-বাস মাত্র লভ্য হইবে। তখন আমাদের মুখে বাক্যবেগের বশবর্ত্তী হইয়া মায়াবাদ-বিচার প্রবল হয়, সুতরাং মনের

চাঞ্চল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় কায়বেগ আমাদিগকে প্রাকৃত-সহজিয়া করিয়া ফেলে, অবৈদান্তিক করিয়া ফেলে অথবা কর্ম্মরাজ্যের আলানে মনঃকুঞ্জরকে আবদ্ধ থাকিবার জন্য উৎকণ্ঠিত করে। মাপারাণীর মহারাজ হইবার জন্য 'বড় আমি' নিজত্বকে লীন করায়। তখন রাধারাণীকে বড় জড়াভিমানে শূদ্রামাত্র-জ্ঞানে তাঁহার সেবিকার বৃত্তি আমাদের ভাল লাগে না বলিয়া 'ভাল আমি'র তদীয় জ্ঞান আমাদিগকে চিরদিনের জন্য পরিত্যাগ করিয়া বিক্ষিপ্ত তারকার ন্যায় তমিস্রভোগের দিকে পরিণামে ত্যাগ-তমিস্রের দিকে ধাবিত করায়। তখন আমরা ঈশোপনিষদের মন্ত্র পাঠ করিয়া নিজ স্কন্ধারূঢ় ভূতকে তাড়াই।

'বড় আমি'র চাকরাণ ভোগীদিগের বেইমানি-বিচারে নানারূপ বে-আদবী ছাড়িয়া দিয়া যদি রাধারাণীর মন্দিরের সৌন্দর্য্যদর্শনে 'ভাল আমি'র বা আমার চিত্ত আকৃষ্ট হয়, তাহা হইলেই আমি শ্যামসুন্দরের আকর্ষণ অচিরেই লাভ করিব। তখনই আমি 'ভাল আমি' হইবার জন্য 'মাপারাণী'র প্রভু হইবার পরিবর্ত্তে রাধারাণীর দাস্যে আত্মনিয়োগ করিব। অপৌরুষেয় শ্রুতিগুলি আধ্যক্ষিকতার বা প্রচ্ছন্নতর্কের গোলামিতে নিযুক্ত হওয়ায় যে-প্রকার শ্রুতিব্যাখ্যা-দ্বারা মায়াবাদি-সম্প্রদায় জগজ্জঞ্জাল উপস্থিত করিয়াছেন, নৈমিষারণ্যের আরণ্যকসমূহ আমাদিগকে পরমহংসী-সংহিতার মঠে আশ্রয় দিয়া অধোক্ষজের সেবায় নিযুক্ত করিবে। এ জন্যই শ্রীনারদোপদিষ্ট ভক্তিপথাবলম্বী শুনিয়াছেন—"অনর্থোপশমং সাক্ষাদ্ ভক্তিযোগমধোক্ষজে"।

আমাদের বৈষ্ণববন্ধু ভারতী স্বামী আমার মঙ্গলবিধানের জন্য শ্রুতিমৌলিরত্নমালা বা ভাগবতার্ক-মরীচিমালা গাঁথিবার জন্য পরামর্শ দিয়াছেন। কাষ্ঠের মার্জ্জার যেরূপ সেতুবন্ধনে অসমর্থ, বামনের চন্দ্রধারণ যেরূপ অসম্ভব, আমারও শ্রুতিসার-সেবা ভাগবতার্কোদয়-কিরণে আলোকিত হইবার প্রয়াস তদ্রূপ। যাহা হউক, "আজ্ঞা গুরূণাং হ্যবিচারণীয়া" বিচার অনুসরণ করিয়া 'ভাল আমি'র দলের শ্রৌতদর্শন, শ্রৌতশ্রবণ, শ্রৌতঘ্রাণ, শ্রৌত-আস্বাদন, শ্রৌতস্পর্শন ও শ্রৌত-মননের অনুগমন-চেষ্টা করিব।

পরম-কারুণিক-গৌরসুন্দর জগতে কৃষ্ণপ্রেম প্রদান করিয়াছেন। সেই প্রেমের কথা কি আমাদের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইবে না? শুনিয়াছি—কলিকাল দোষসমুদ্র। কিন্তু এই সমুদ্রের একটি মহাগুণ আছে। কীর্ত্তনবিহারী শুকদেব প্রভু শ্রীসূতদেবকে ভাগবতী কথা বলিয়াছিলেন। সেই ভাগবতী কথাই তৃতীয় অধিবেশনে নৈমিষারণ্যে—যেস্থানে ব্রহ্মার নেমি বিশীর্ণ হইয়াছিল, সেই অধোক্ষজ ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করিতে গিয়াই শ্রীব্যাসের কৃপা আমরা যাহাতে লাভ করিতে পারি—ইহাই ভরসা।

স্যমন্তপঞ্চকে দিশাহারা ব্রজবাসিগণ দিক্ লাভ করিয়াছিলেন। যোগমায়ার কৃপায় তাঁহার পুরপীঠে কি কীর্ত্তনের অভাব হইবে? গোদ্রুমবিহারী সুবর্ণবিহারে তাঁহার যে রুক্মবর্ণের বিগ্রহলীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন, আমরা কি সেই শ্রুতির ব্যাখ্যায় আলোকিত হইতে পারিব না? "যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্। তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি।।" সেই আধ্যক্ষিকতা ঘুচাইয়া আমরা কি অধোক্ষজ সুবর্ণবিহারীর সেবক হইতে পারিব না? গোদ্রুমবিহারী কি আমাদের শুকমুখে ভাগবতার্থ দিয়া নিগমকল্পতরুর গলিতফলের কথা কর্ণের দ্বারা পান করাইবেন না? অন্তর্দ্বীপে একদিন ব্রহ্মা যে গোবিন্দ-

স্তব করিয়াছিলেন, সেই ব্রহ্মসংহিতার গোবিন্দস্তবের গান কি আমাদের কর্ণে প্রবিষ্ট হইবে না? সেই দিন কি আমরা পরমেশ্বরের অনাদিত্ব, আদিত্ব, সর্ব্বকারণ-কারণত্ব, সচ্চিদানন্দবিগ্রহত্ব ও স্বয়ংরূপত্ব উপলব্ধি করিতে পারিব না? কেবলই কি আমরা বৃথা বাগাড়ম্বরে ব্যস্ত থাকিয়া মৌখিক রূপানুগত্ব প্রদর্শন করিয়া আত্মবঞ্চনা করিতে থাকিব? শ্রবণাখ্য সীমন্তবিজয় প্রভু কি আমাদিগকে শ্রবণের অধিকার দিবেন না? মধ্যদ্বীপবিহারী স্বীয়রূপমূর্ত্তি অধোক্ষজসেব্যমূর্ত্তি দেখাইয়া কি প্রহ্লাদানুগত্যে 'ভাল আমি' হইয়া স্মরণ করিতে দিবেন না? ভক্তবৎসল নৃপঞ্চাস্য আমাদিগকে কি বিষ্ণুস্বামীর আনুগত্য ভুলাইয়া দিবেন? আমরা কি কোলদ্বীপে লক্ষ্মী-দেবীর আনুগত্যে শেষশায়ীর পদসেবনে অসমর্থ হইব? মহাকারুণিক শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীরূপানুগসেবক আমাদিগকে যে শ্রীগোষ্ঠবিহারীর সেবা করিবার জন্য উপদেশ দিয়াছেন, শ্রীলক্ষ্মীর প্রসাদে আমরা কি তাহাতে প্রবেশ করিতে চিরদিনই বাধাপ্রাপ্ত হইব? দীর্ঘ বকারদ্বয়ের প্রথম বকারে গোলোকোপরিস্থিতি বুঝিতে না পারিয়া কেবল বাধাই পাইতে থাকিব? দ্বিতীয় দীর্ঘ বকারের আঁকশী বা আকর্ষণী আমাদিগের স্কন্ধে আরোপিত হইয়া গরুড়বাহনের কৃপাক্রমে বাধা অতিক্রম করাইয়া মাপারাণীর প্রভু-সাজ হইতে রাধারাণীর পরম সৌন্দর্য্য-ময়ী পদনখশোভা কৃষ্ণকর্ণামৃতের আদিম শ্লোক কি আমাদের বোধগম্য হইবে না? পদসেবা করিতে করিতেই ত' ঋতুদ্বীপে আমাদের পৃথু মহারাজের গৌরব-পূজন হৃদ্দেশ অধিকার করিবে। তখন কি আমরা জহ্নুদ্বীপে অক্রূরের পাদপদ্মাশ্রয়ে কৃষ্ণসান্নিধ্য লাভ করিতে পারিব না? পাদসেবন, অর্চ্চন ও বন্দনপরিণতি কৃষ্ণাপ্তি কি আমাদের সুদূরপরাহত বিষয় হইবে? মোদদ্রুমদ্বীপে কপিপতির দাস্য ও রুদ্রদ্বীপে দ্বাদশগোপালের সখ্য কি আমাদিগকে অন্তর্দ্বীপে আত্মসমর্পণে বলির চরণানুগত্য হইতে বঞ্চিত করিয়া ইতর পিপাসায় ধাবিত করাইবে? আমরা কি যোগমায়ার পুরপীঠের সন্নিহিত প্রদেশে কুণ্ডতীরবাসে চিরবঞ্চিত হইব?

শুনিয়াছি—আধ্যক্ষিকগণ-বঞ্চিত ব্যক্তিরই কৃষ্ণপ্রাপ্তি সহজলভ্য। আমরা কি ক্ষেত্রমণ্ডলের শোভায় জগন্নাথবল্লভের লেখকের রাধাগোবিন্দ-মিলনের কথা বুঝিতে পারিব না? দৃঢ়ভাবে জানিয়াছি যে,—"অনর্থোপশমং সাক্ষাদ্ ভক্তিযোগমধোক্ষজে"। সুতরাং শ্রীধামসেবা কি শ্রুতিমৌলিরত্নমালাদ্যুতিনীরাজিত পাদপঙ্কজান্ত হরিনাম হইতে পৃথক্ বস্তু? তাহা ত নহে!! নবধাভক্তির অঙ্কুর বিষ্ণুপুরী হইতে মাধবেন্দ্রপুরীর প্রেমাঙ্কুর শ্রীচৈতন্যপাদপদ্মকল্পবৃক্ষের প্রপক্ব ফল পাওয়া যায়। অন্য প্রকারে কৃষ্ণপ্রীতির কোন সুগম পথ বা বর্ত্মের কথা কেহই আবিষ্কার করিতে পারিব না। সুতরাং শ্রীচৈতন্যচরণাশ্রয়েই শিক্ষামন্ত্রের তৃতীয় মন্ত্র লাভ করিয়া ভগবদ্ভজনে আশাবন্ধ-অবস্থা আমাদিগের নিত্যকল্যাণ বিধান করুক্। আমি বড় হ'ব না, ভাল হ'ব, তবেই ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণ বুঝিতে পারিব—শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনে। সুতরাং সুবর্ণবিহারীর জয়গান—ভাগবতার্কমরীচিমালা আমাদের অবলম্বনীয় হউন।

ভক্তভাব

জড় জগতে অস্থায়িভাবের আদর্শসমূহ দেখিতে পাওয়া যায়। আর অপ্রাকৃত রাজ্যে নিত্যসিদ্ধ স্থায়িভাব সেবকগণে প্রকাশিত হয়। সেবকের দিক্ হইতে যে ভাব, তাহা ভক্তভাব। আর সেবক হইতে সেব্যের সেবাগ্রহণের জন্য যে নিত্যসিদ্ধ ভাব, তাহা ভগবদ্ভাব।

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র তাঁহার ঔদার্য্যময়ী লীলায় ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়া ভগবানের সেবা শিক্ষা দিয়াছেন। তিনি পঞ্চতত্ত্বাত্মক ঔদার্য্যবিগ্রহ গৌররূপে স্বয়ং দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই চারিরসে কিরূপে অখিলরসামৃতমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিতে হয়, তাহা তত্তদ্রসের বিভিন্ন ভক্তগণকে জানাইয়াছেন। তাঁহারই প্রকাশতত্ত্ব শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু বাৎসল্য, দাস্য ও সখ্য—এই তিনভাবে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের সহায় হইয়া নিজ অনুগত ভক্তবৃন্দের নিত্যসিদ্ধভাবের ঔজ্জ্বল্য বিধান করিয়াছেন। অবতারী শ্রীগৌরসুন্দরের ভক্তাবতার শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু দাস্য ও সখ্য এই দুইভাবে নিজ অনুগবৃন্দকে কৃষ্ণসেবা শিক্ষা দিয়াছেন। শ্রীবাসাদি শুদ্ধভক্ত, শ্রীগদাধর পণ্ডিতাদি অন্তরঙ্গ ভক্তগণ নিজ নিজ বিশিষ্ট এক একটি রসে শ্রীকৃষ্ণসেবা করিয়াছেন। অতএব ভক্তলীলা অঙ্গীকারকারী স্বয়ংরূপ শ্রীমন্মহাপ্রভুর চারিটি ভক্তভাব—দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর; স্বয়ংপ্রকাশ প্রভুতত্ত্ব শ্রীনিত্যানন্দের দাস্য, সখ্য ও বাৎসল্য—তিন ভক্তভাব এবং ভক্তাবতার প্রভুতত্ত্ব শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভুর দাস্য, সখ্য—এই দুইটি ভক্তভাব। ইঁহারা তিনজনেই ভগবদ্বস্তু হইয়াও ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে শ্রীগৌরসুন্দর—মহাপ্রভু বা স্বয়ংরূপ এবং দুইজন প্রভু যথাক্রমে স্বয়ংপ্রকাশ ও স্বাংশ মহাবিষ্ণুর অবতার। পঞ্চতত্ত্বের অন্যতম শক্তিতত্ত্ব ও ভক্ততত্ত্ব শক্তিমজ্জাতীয় বা বিষয়জাতীয় তত্ত্ব নহেন, তাঁহারা আশ্রয়তত্ত্ব। শ্রীগদাধর পণ্ডিত, শ্রীস্বরূপদামোদর, শ্রীরামানন্দ, শ্রীরূপাদি শক্তিতত্ত্বসমূহ মধুররসে কৃষ্ণসেবা করেন। তাঁহাদের প্রত্যেকেরই একটি রস, মহাপ্রভু বা প্রভুতত্ত্বের ন্যায় একাধিক রস নাই। শ্রীবাসাদি শুদ্ধভক্তের একমাত্র দাস্যরস, তাঁহাদেরও একাধিক রস নহে।

শুদ্ধভক্ত ও অন্তরঙ্গ ভক্ত বলিতে ইহা মনে করিতে হইবে না যে, শ্রীবাসাদি বহিরঙ্গ ভক্তমাত্র। অন্তরঙ্গা স্বরূপশক্তি শ্রীমতী রাধিকা মধুররসের মূর্ত্ত্যবিগ্রহ। গদাধর, স্বরূপ, রামানন্দ, শ্রীরূপাদিতে সেই শ্রীরাধিকার অনুরূপ বা অনুগত মধুররস নিত্যসিদ্ধভাবে বর্ত্তমান বলিয়া তাঁহাদিগকে অন্তরঙ্গভক্ত মধ্যে গণনা করা হইয়াছে। আর শ্রীবাসাদির শুদ্ধ দাস্যরস বলিয়া তাঁহারা শুদ্ধভক্তের আদর্শরূপে গণিত হইয়াছেন।

মহাপ্রভু বা নিত্যানন্দপ্রভু বিষয়তত্ত্ব হইলেও তাঁহারা যথাক্রমে চার, তিন ও দুই "ভক্তভাব" দেখাইয়াছেন। ঔদার্য্যময়ী লীলায় ভগবদ্ভাবে ভক্তগণের নিকট হইতে রসাস্বাদনের লীলা অর্থাৎ মাধুর্য্যময়ী কৃষ্ণলীলার আদর্শ প্রকাশ না করায় মহাপ্রভুকে গৌরনাগরী সাজাইবার ভোগবুদ্ধি নিরস্ত হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যভাগবতকার শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিষ্ণুখট্টায় আরোহণ, রামনৃসিংহবরাহাদির রূপপ্রদর্শন-প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া শ্রীচৈতন্যাবতারের ভক্তভাবময়-লীলার কথা জানাইয়াছেন। সুতরাং অবতারী স্বয়ংরূপের রাসাদি লীলা বা পারকীয়া

রসাস্বাদনলীলা ঔদার্য্যময়ী গৌরলীলায় প্রকাশিত হয় নাই, তাহা মাধুর্য্যময়ী কৃষ্ণলীলারই বৈশিষ্ট্য। তাই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু লিখিয়াছেন,—

যশোদানন্দন হইলা শচীর নন্দন।
চতুর্ব্বিধ ভক্তভাব করে আস্বাদন।।

* * * *

বাৎসল্য, সখ্য, দাস্য—তিন ভাবময়।
সেই নিত্যানন্দ—কৃষ্ণচৈতন্য-সহায়।।
অদ্বৈত আচার্য্য গোসাঞি ভক্ত-অবতার।
কৃষ্ণ অবতারিয়া কৈলা ভক্তির প্রচার।।
সখ্য, দাস্য—দুইভাব সহজ তাঁহার।
কভু প্রভু করেন তাঁরে গুরু-ব্যবহার।।
শ্রীবাসাদি যত মহাপ্রভুর ভক্তগণ।
নিজ নিজ ভাবে করেন চৈতন্য-সেবন।।
পণ্ডিত-গোসাঞি আদি যাঁর যেই রস।
সেই সেই রসে কৃষ্ণ হয় তাঁর বশ।।
তিঁহ শ্যাম,—**বংশীমুখ, গোপবিলাসী।**
ইঁহ গৌর,—**কভু দ্বিজ, কভু ত' সন্ন্যাসী।।**
অতএব আপনে প্রভু গোপীভাব ধরি'।
ব্রজেন্দ্রনন্দনে কহে ''প্রাণনাথ'' করি''।।

(চৈঃ চঃ আ ১৭শ ২৭৫, ২৯৫-৯৬, ২৯৮-৩০৩)

শ্রীগৌরসুন্দর পারকীয় গোপললনাগণের কামোদ্দীপক শ্যামরূপ, বংশীমুখ বা বিলাসিনাগর নহেন। পরন্তু তিনি সেই অপ্রাকৃত কামদেবের মূল আশ্রয়বিগ্রহ শ্রীরাধিকার স্বাভাবিক গৌররূপ এবং সর্ব্বপ্রকার বিলাসিতাবর্জ্জিত দ্বিজ ও সন্ন্যাসিরূপধারী। তাঁহার এই নিত্যরূপের ও নিত্যভাবের বৈশিষ্ট্য ধ্বংস করিবার চেষ্টা হইতেই গৌরকৃষ্ণে ভোগবুদ্ধিময় অশ্রৌত 'গৌরনাগরী' মতবাদ কল্পিত হয়।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব, শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু পরমেশ্বর বা বিষয়তত্ত্ব বলিয়া তাঁহাদের মধ্যে একাধিক ভাবের আদর্শ আছে। কিন্তু শক্তিতত্ত্ব বা আশ্রয়তত্ত্বের একাধিকভাবের যুগপৎ অবস্থান সম্ভব নহে। আশ্রয়তত্ত্বগণ যাঁহাদের যেই ভাব, সেই ভাবই পূর্ণ ও সর্ব্বোত্তম—এই উপলব্ধিতে সেই ভাবাশ্রয়ে কৃষ্ণসেবা

করিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবে চারিটি ভক্তভাবের আদর্শ আছে বলিয়া তাঁহার অনুগত ভক্তগণে চারিটি সেবকোচিত নিত্যসিদ্ধভাব দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন, শ্রীবাসাদিতে দাস্যভাব, শ্রীনিত্যানন্দাদিতে সখ্যভাব, পুরীগোস্বামী প্রভৃতিতে বাৎসল্যভাব, গদাধর-স্বরূপ-রামানন্দাদিতে মধুরভাব। শ্রীনিত্যানন্দে তিনটি ভাব আছে বলিয়া তাঁহার অনুগমণ্ডলীতে দাস্য-সখ্য-বাৎসল্য—এই তিনরসে ভগবৎসেবার আদর্শ দেখিতে পাওয়া যায়।

শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের অনুগমণ্ডলীর মধ্যে দাস্য ও সখ্যরস দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীঅচ্যুতানন্দ শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামী প্রভুর শাখায় প্রবিষ্ট হওয়ায় তাঁহাতে তাঁহার নিত্যসিদ্ধ মধুররসে কৃষ্ণসেবার আদর্শ প্রকাশিত হইয়াছিল।

ব্রজের সখা ও দ্বাদশগোপালের অন্যতম শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিতের শিষ্য হৃদয়ানন্দের শিষ্যসূত্রে সখ্যভাব এবং শ্রীরূপানুগ শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুর গণে প্রবিষ্ট হওয়ায় মধুরভাব যুগপৎ শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভুর সেবা-আদর্শে প্রকাশিত হইয়াছিল। শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুকে ঈশ্বরকোটির মধ্যে গণ্য করা হয়। এ জন্য তাঁহাতে যুগপৎ একাধিক ভাবের অবস্থান অসম্ভব নহে।

জড়বিশেষরহিত যে শান্তভাব নির্ব্বিশেষবাদী ব্যক্তিগণে দেখিতে পাওয়া যায়, অথবা ভগবদপরাধী অসুরগণ যে প্রস্তরাদি অচেতনগতি লাভ করে, শান্তভাবের ভক্তগণের গতি তদ্রূপ নহে। পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিগণ লীলার বিরোধী; কিন্তু শান্তভাবাপন্ন ভগবদ্ভক্তগণ লীলার অনুকূল। চিন্মাত্রবাদী মায়াবাদী বা অচিন্মাত্রবাদী বৌদ্ধের প্রাপ্য অবস্থার সহিত শান্তভাবের ভক্তগণের অবস্থাকে সমান মনে করিলে বিশেষ অপরাধে পতিত হইতে হইবে এবং তাহা সিদ্ধান্ত ও যুক্তিসম্মতও নহে। যমুনার জল, যমুনার বালি, কৃষ্ণের হাতের বেত্র, বলদেবের শিঙ্গা প্রভৃতি জড় বা অচিৎ পদার্থ নহে। তাঁহারা চিন্ময় ও কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তর্পণসেবার অনুকূল। দাস্যরসে যে মমতা, তাহা শান্তরসে পরিস্ফুট নহে—ইহাই পার্থক্য। কিন্তু মমতা পরিস্ফুট না হইলেও তাঁহারা অখণ্ডকালে অনুক্ষণ কৃষ্ণসেবার আনুকূল্য বিধান করিতেছেন। তাঁহাদের পদবী অত উন্নত বলিয়াই ব্রহ্মা, উদ্ধবাদি ব্রজে তৃণগুল্মলতা হইয়া জন্মগ্রহণ করিবার অভিলাষ করিয়াছেন।

আসামহো চরণ-রেণুজুষামহং স্যাং বৃন্দাবনে কিমপি গুল্মলতৌষধীনাম্।
যা দুস্ত্যজং স্বজনমার্য্য পথঞ্চ হিত্বা ভেজুর্মুকুন্দ-পদবীং শ্রুতিভির্বিমৃগ্যাম্।।

(ভাঃ ১০।৪৭।৬১)

যাঁহারা দুস্ত্যজ পতিপুত্রাদি আত্মীয়জন এবং লোকমার্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রুতিসমূহের অন্বেষণীয় শ্রীকৃষ্ণ-পদবীর অনুসন্ধান করিয়াছেন, অহো, আমি বৃন্দাবনে সেই গোপীগণের চরণ-রেণুভাক্ গুল্মলতাদির মধ্যে কোন একটি স্বরূপে জন্ম লাভ করিব।

শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভু তাঁহার ব্রজবিলাসস্তবে বলিয়াছেন—

যৎ কিঞ্চিৎ তৃণগুল্মকীকটমুখং গোষ্ঠে সমস্তং হি তৎ
সর্ব্বানন্দময়ং মুকুন্দদয়িতং লীলানুকূলং পরম্।
শাস্ত্রৈরেব মুহুর্মুহুঃ স্ফুটমিদং নিষ্টঙ্কিতং যাচ্ঞয়া
ব্রহ্মাদেরপি সস্পৃহেণ তদিদং সর্ব্বং ময়া বন্দ্যতে।। (ব্রঃ স্তব ১০২)

গোষ্ঠে যাহা কিছু তৃণ-গুল্ম-কীট-পতঙ্গাদি, তৎসমস্তই সর্ব্বানন্দময়, মুকুন্দের প্রিয় ও তাঁহার লীলার বিশেষ অনুকূল। শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্রে ব্রহ্মা উদ্ধবাদির প্রার্থনাতে ইহা পুনঃ পুনঃ সুস্পষ্টভাবে প্রতিপাদিত হইয়াছে। আমি তৎসমস্ত বস্তুর বন্দনা করি।

গোলোকে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই পঞ্চভাব এবং বৈকুণ্ঠে শান্ত, দাস্য ও গৌরবসখ্য—এই আড়াই প্রকার রস আছে। সখ্যের দুইটি ভাগ—একটি গৌরব সখ্য, অপরটি বিশ্রম্ভ সখ্য। গৌরব সখ্যে সখা ভগবানের স্কন্ধে আরোহণ বা নিজ উচ্ছিষ্টাদি প্রদান করিতে পারেন না—গৌরব বুদ্ধিতে সখ্যভাব প্রকাশ করিয়া থাকেন। এ জন্য সখ্যের উত্তরার্দ্ধ একমাত্র গোলোক বা ব্রজেই দেখা যায়, বৈকুণ্ঠের সখাগণে তাহা নাই। অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ দর্শন করিবার পর কৃষ্ণকে সখা প্রভৃতি বলায় বা তাঁহার দ্বারা সারথ্য করায় অর্জ্জুনের অপরাধ হইয়াছে—বিচার করিয়াছিলেন। কিন্তু ব্রজের সখাগণের কৃষ্ণের প্রতি সেরূপ গৌরবভাব উদিত হয় না। বৈকুণ্ঠের শান্ত-দাস্য হইতে ব্রজের শান্ত-দাস্যের বৈশিষ্ট্য আছে। ব্রজের শান্ত-দাস্য অধিকতর চমৎকারিতাময় ও ঐশ্বর্য্য-গন্ধহীন। নারায়ণের বহু ঐশ্বর্য্য আছে দেখিয়া বৈকুণ্ঠের দাসগণ নারায়ণের দাস্যে আকৃষ্ট। কিন্তু গোপেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের গোধনের সেবা ও অন্যান্য ঐশ্বর্য্য-বিহীন সেবাকার্য্যে রক্তক, পত্রক, চিত্রকাদি ব্রজস্থ দাসগণের কৃষ্ণদাস্যের স্বাভাবিক অনুরাগ। কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যহীন ব্যক্তিত্বই আকর্ষক—অন্য কিছু নহে।

বৈকুণ্ঠ ও গোলোকে কিম্বা ব্রজের মধ্যেই বিভিন্ন রসের ও ভাবের যে বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য আছে, তাহা তত্তদ্রসিকগণের প্রত্যেকের নিকটই পূর্ণ। কেবল তটস্থ হইয়া বিচার করিলে অর্থাৎ তৃতীয় ব্যক্তির নিকট তারতম্যের অনুভব হয়। বৈকুণ্ঠে অপ্রাকৃত দেহের নাভির ঊর্দ্ধদেশ হইতে উন্নতাঙ্গের দ্বারা নারায়ণের সেবা এবং ব্রজে অপ্রাকৃত দেহের নাভির নিম্নাঙ্গ প্রদেশের দ্বারাও সেবা, অর্থাৎ অপ্রাকৃত আনখকেশাগ্র সর্ব্বাঙ্গের দ্বারা কৃষ্ণ-সেবার বৈশিষ্ট্যবিচার থাকিলেও ইহা মনে করিতে হইবে না যে, বৈকুণ্ঠের সেবকগণ নাভির নিম্নদেশ হইতে পদদেশ পর্য্যন্ত অঙ্গসমূহ নিজের ভোগকার্য্যে নিযুক্ত রাখিয়াছেন। যেখানে কুণ্ঠ-ধর্ম্ম বিগত হইয়াছে, সেখানে আত্মভোগের কোন কথা নাই। তবে বৈকুণ্ঠের সেবকগণের মর্য্যাদা-বিচারের মধ্যে নিম্নাঙ্গের দ্বারা সেবার আদর্শ প্রকাশিত নহে। যাহারা জড়মায়াবদ্ধ কর্ম্মফলবাধ্য জীব, তাহাদের জন্যই বৈকুণ্ঠস্থ সেবকগণ নিম্নাঙ্গের দ্বারা বা সর্ব্বাঙ্গের দ্বারা আত্মভোগের আদর্শ কুণ্ঠরাজ্যে সংরক্ষিত করিয়াছেন। যাহারা স্বরূপবিভ্রান্ত হইয়া গোলোকে স্বরূপের অবস্থান বিদিত নহে, তাহারাই সর্ব্বাঙ্গকে মায়িক জগতের ভোগকার্য্যে নিযুক্ত রাখিয়াছে।

"কোঽসি ?"

"কোঽসি" আরও একটু বিশ্লেষণ করিয়া বলিলে—ত্বং কঃ অসি ?—আপনি কে? কোন নূতন লোক দেখিলেই সাধারণতঃ আমরা এই প্রশ্ন করিয়া থাকি, কারণ অজ্ঞাতকুলশীলের সহিত বাস বা মিত্রতা করিতে নাই, অজ্ঞাতকুলশীল বিশ্বাযোগ্যও নহেন। কিন্তু রূপানুগবরের শ্রীমুখে হরিকথা-শ্রবণের পর যে ভাব প্রকাশার্থ বিষয়টি আলোচিত হইতেছে, তাহার কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। জীবের স্বরূপ মহাপ্রভুর শ্রীমুখ হইতে প্রকাশ করিবার জন্য শ্রীরূপাগ্রজ শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের নিকট প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"কে আমি?" ইহার উত্তরে মহাপ্রভু বলিয়াছিলেন—

"জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।
কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি ভেদাভেদ-প্রকাশ।।
সূর্য্যাংশু-কিরণ, যেন অগ্নিজ্বালাচয়।"

"কোঽসি?' প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইলে ক্ষুদ্রভাবাপন্ন মায়াবাদী হয় ত' এক নিঃশ্বাসে উত্তর করিবেন—"সোঽহম্"। ভগবান্, ভক্ত ও ভক্তির বৈশিষ্ট্য-বিলোপ-সাধনকারী এই ব্যক্তির উত্তর শ্রবণ করিয়া বিজ্ঞগণ নিশ্চয়ই একটু মৃদুহাস্য করিবেন। কারণ যেখানে প্রশ্নকর্ত্তা ও উত্তরদাতার অস্তিত্ব দেখা যাইতেছে, সেখানে সাধারণ জ্ঞানেও ঐ উত্তর উপহাসাস্পদ। "কোঽসি" জীবসম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইলে মহাপ্রভুর জীবতত্ত্ব-সম্বন্ধে প্রকাশিত উপরি উক্ত ছত্রত্রয়ই উক্ত প্রশ্নের সুষ্ঠু উত্তর। কিন্তু জীব-সম্বন্ধ ব্যতীত অপর সম্বন্ধেও প্রশ্নটি জিজ্ঞাসিত হইতে পারে। কিন্তু কৃষ্ণের শক্তিকে সম্বোধন করিয়া যদি বলা হয়—"ভবতি! ত্বং কাঽসি?" তদুত্তরে তৎপক্ষীয় জনগণ উত্তর করিবেন—

"কৃষ্ণের স্বাভাবিক তিন-শক্তি-পরিণতি।
চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি, আর মায়াশক্তি।।"

অন্তরঙ্গা শক্তি

উক্ত শক্তিত্রয়ের মধ্যে অন্তরঙ্গা স্বরূপশক্তি অচ্ছেদ্যভাবে শক্তিমানের আশ্রিত—

[মৈত্রেয়ের প্রশ্নের উত্তরে পরাশর বলিয়াছেন—হে তাপসশ্রেষ্ঠ, সমস্ত ভাবের অচিন্ত্যজ্ঞানগোচর শক্তি-সকল ব্রহ্মে বর্ত্তমান। এই কারণে সেই ব্রহ্মশক্তিসকল সৃষ্ট্যাদিভাব-শক্তিরূপে ক্রিয়া করে। অগ্নির যেরূপ উষ্ণতা-ধর্ম্ম স্বতঃসিদ্ধ, শক্তিসকলও ব্রহ্মে সেইরূপ স্বতঃসিদ্ধ ধর্ম্ম।]

শ্রীকৃষ্ণের অন্তরঙ্গা শক্তির তিনটি রূপ—(১) আনন্দ বা রসাস্বাদ-দান, (২) কর্ত্তৃত্বপরিচালন বা ভোক্তৃত্ব-সম্পাদন, (৩) সত্তা-প্রকাশন বা অস্তিত্ব বিধান। ঐ রূপত্রয়ের কার্য্যানুসারে অন্তরঙ্গা শক্তি যথাক্রমে হ্লাদিনী, সম্বিৎ ও সন্ধিনী নামে পরিচিতা হন।

হ্লাদিনী সন্ধিনী সম্বিত্ত্বয্যেকা সর্ব্বসংস্থিতৌ।
হ্লাদতাপকরী মিশ্রা ত্বয়ি নো গুণবর্জ্জিতে।। (বিষ্ণুপুরাণ)

সন্ধিনীর কার্য্য—

সন্ধিনীর সার অংশ 'শুদ্ধসত্ত্ব' নাম।
ভগবানের সত্তা হয় যাহাতে বিশ্রাম।।
মাতা, পিতা, স্থান, গৃহ, শয্যাসন আর।
এ সব কৃষ্ণের শুদ্ধসত্ত্বের বিকার।।

সম্বিচ্ছক্তির কার্য্য—

কৃষ্ণে ভগবত্তা-জ্ঞান সম্বিতের সার।
ব্রহ্মজ্ঞানাদিক সব তার পরিবার।।

হ্লাদিনীর পরিচয়—

হ্লাদিনী করায় কৃষ্ণে আনন্দাস্বাদন।
হ্লাদিনীর দ্বারা করে কৃষ্ণের পোষণ।।

* * * *

হ্লাদিনীর সার 'প্রেম', প্রেমসার ভাব।
ভাবের পরম-কাষ্ঠা নাম 'মহাভাব'।।
মহাভাব-স্বরূপা শ্রীরাধা ঠাকুরাণী।
সর্ব্বগুণখনি কৃষ্ণকান্তা-শিরোমণি।।
কৃষ্ণপ্রেমভাবিত যাঁর চিত্তেন্দ্রিয়কায়।
কৃষ্ণ-নিজশক্তি রাধা ক্রীড়ার সহায়।।

তটস্থা জীবশক্তি

যয়া ক্ষেত্রজ্ঞশক্তিঃ সা বেষ্টিতা নৃপ সর্ব্বগা।
সংসারতাপানখিলানবাপ্নোত্যত্র সন্ততান্।।
তয়া তিরোহিতত্বাচ্চ শক্তিঃ ক্ষেত্রজ্ঞসংজ্ঞিতা।
সর্ব্বভূতেষু ভূপাল তারতম্যেন বর্ত্ততে।।

এই শ্লোকের তাৎপর্য্য এই যে, ক্ষেত্রজ্ঞ জীবশক্তি মায়াদ্বারা আবৃত হইয়া চিচ্ছক্তিবৃত্তি হইতে দূরে থাকে এবং সংসারের ত্রিতাপ ভোগ করে। এই অবস্থায় কর্ম্মচক্রে উচ্চ নীচ অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এহেন দুর্দ্দশাগ্রস্ত জীবকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায়—কোঽসি? সে মোহমদিরায় আচ্ছন্ন থাকিলে উত্তর করিবে—"আমি রাজা, প্রজা, জলচর, ভূচর, খেচর, মনুষ্য, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাসী, স্বর্গবাসী, মহ-জন-তপঃ-সত্য-লোকবাসী প্রভৃতি। আর যদি নিজের অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করে, তাহা হইলে বলিবে—"সংসারাসক্তো মায়াপদতাড়িত-বর্ত্তলোঽহম্।"

জীবশক্তি যদি স্বরূপে অবস্থিত থাকেন, তাহা হইলে উত্তরে বলিবেন—গোপীভর্ত্তুঃপদকমলয়োর্দাস-দাসানুদাসোঽহম্।"

বহিরঙ্গা-শক্তি

ক্ষিতি, জল, তেজ, বায়ু ও আকাশ—এই পঞ্চভূতরূপ স্থূল জগৎ এবং মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কাররূপ লিঙ্গ জগৎ। এই অষ্টপ্রকারে বিভক্ত প্রকৃতি—অপরা বা জড়া। ইহার নাম মায়া প্রকৃতি। এই মায়া-প্রকৃতি স্বরূপা বা অন্তরঙ্গা শক্তি হইতে পৃথক্ অথচ তাঁহার ছায়ার ন্যায় প্রতীয়মান। স্থূল ও লিঙ্গময় জড় ব্রহ্মাণ্ড এই বহিরঙ্গা মায়াশক্তি-প্রসূত। এই শক্তির আরও পরিচয়—

বিলজ্জমানয়া যস্য স্থাতুমীক্ষাপথেঽমুয়া।
বিমোহিতা বিকত্থন্তে মমাহমিতি দুর্ধিয়ঃ।।

(শ্রীমদ্ভাগবত ২।৫।১৩)

ঐ বহিরঙ্গা মায়া কৃষ্ণের দর্শনপথে থাকিতে বিলজ্জমানা হয়—মোটেই থাকিতে পারে না। সেই মায়া কর্ত্তৃক বিমোহিত হইয়া দুর্ব্বুদ্ধি ব্যক্তিগণ 'আমি'-'আমার' এই প্রকার বহুবিধ বাগ্‌জাল প্রকাশ করিয়া থাকে।

রহস্য

এই জিজ্ঞাস্য—"কোঽসি" কি ভগবানকে জিজ্ঞাসা করিতে পারা যায় না? উত্তর—হ্যাঁ, পারা যায়। তবে সকলের পক্ষে তাহা সম্ভবপর নহে। সম্মুখে না পাইলে ত এই প্রশ্ন করা যায় না? সংসারাসক্ত জীবের সম্মুখীন তিনি হন না; সুতরাং তাঁহার পক্ষে ইহা জিজ্ঞাসার বিষয় হইতে পারে না। গৌরববিচারযুক্ত-সেবকগণ সম্মুখে ভগবানকে পাইয়াও তাহা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন না। তাঁহাকে যিনি সম্মুখে পান, তিনি ত' তাঁহাকে জানিতেই পারিলেন, তবে আর জিজ্ঞাসার প্রয়োজনীয়তা কি? —এই পূর্ব্বপক্ষ কেহ কেহ করিতে পারেন। এই প্রশ্নজিজ্ঞাসা-দ্বারা যে মাধুর্য্যরসাশ্রয়-বিগ্রহের সেবা হয়, তাহা যে পর্য্যন্ত আমাদের বোধগম্য না হয়, সে পর্য্যন্ত ঐ প্রশ্ন স্বাভাবিক। ভগবৎপক্ষে "কোঽসি" প্রশ্নের যে উত্তর হইবে, তাহা শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে শ্রীসনাতন-শিক্ষায় বিশদ্‌ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। আমরা সে বিষয় অদ্য এস্থলে আলোচনা করিব না। বিষয়বিগ্রহ ভগবান্ আশ্রয়জাতীয়া সেবিকাগণের সহিত লুকোচুরি খেলিবার জন্য নিজকে গুপ্তভাবে

রাখিয়া যে রহস্যের সৃষ্টি করেন, তাহারই আভাস আমরা উপসংহারে প্রদান করিতেছি। একবার তিনি রাসস্থলী হইতে অন্তর্হিত হইয়া চতুর্ভুজরূপ ধারণ করতঃ বৃষভানুসুতা ব্যতীত অপর সকল গোপীকেই বঞ্চনা করিয়াছেন। ক্ষেত্রমণ্ডলে চতুর্ভুজ শ্রীআলালনাথজী দর্শন করিয়া এবং বার্ষভানবীদেবীর ভাবে বিভাবিত মহাপ্রভুর 'অনবসর'-সময়ে জগন্নাথ দর্শন না পাইয়া তথায় যাইবার লীলা সেবাবৃত্তির সহিত আলোচনা করিয়া রূপানুগগণ শ্রীকৃষ্ণের ঐ লুকোচুরি খেলাই দেখিতে পান। এই লুকোচুরির বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহা আমাদের সহিত নহে—আরও অধিক বিশ্রম্ভিগণের সহিত। শ্রীকৃষ্ণের এই লীলা যাঁহাদের সহিত হইয়াছে, তাঁহারা মধুর-রসসেবার আশ্রয়বিগ্রহ, সুতরাং তাঁহাদের স্থান সর্ব্বোপরি।

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধিকার ভাবে অন্তঃকরণ এবং কান্তিতে অঙ্গ আচ্ছাদিত করিয়া শ্রীগৌররূপে প্রকটিত হন। এই তপ্তকাঞ্চনকায় যখন ব্রজে গমন করেন, তখন গোপীগণ তাঁহাকে চিনিতে না পারিয়া অথবা চিনিতে পারিয়াও আচ্ছাদিত বেষ দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"কোহসি"?

যাঁহারা ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা করিয়াছেন, তাঁহারা অবশ্যই 'কোহসি' স্থানটির নাম জানেন; কিন্তু উহার ঐ প্রকার নামকরণ হইবার কারণ কেহ অনুসন্ধান করিয়াছেন কি? অনুসন্ধান করিলেও প্রকৃত তথ্য—অপ্রাকৃত তথ্য প্রাকৃতজ্ঞানের গোচরীভূত হইবার নহে। আশ্রয়শিরোমণির হৃদয়েই 'উদ্দীপন' কার্য্য করে—সকলের হৃদয়ে নহে। বন দেখিলেই সকলের হৃদয়ে বৃন্দাবনের স্ফূর্ত্তি হয় না, নদী দেখিলেই সকলের হৃদয়ে বৃন্দাবনের স্ফূর্ত্তি হয় না, নদী দেখিলেই কালিন্দী জ্ঞান হয় না, গিরি দেখিলেই 'গোবর্দ্ধন'-স্মৃতির উদয় হয় না, সরসী দেখিলেই রাধাসরসীর কথা স্মৃতিপটে জাগে না। উপযুক্ত পাত্রেই অপ্রাকৃতভাব স্বীয় মহিমা বিস্তার করে। "কোহসি?" রহস্য জানিতে হইলে শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্টস্থাপকবরের শ্রীচরণ আশ্রয় করিতে হইবে। তাঁহার কৃপায় ঐ প্রসঙ্গে সঙ্কেতবিহারীর লীলা-চমৎকারিতা জানিবার সুযোগ হইবে।

সাহিত্যিকতা

অনেকে বলেন, দেশ বা সমাজের নাড়ীর স্পন্দন সাহিত্যের মধ্যেই পরিস্ফুট হয়, অর্থাৎ দেশের ও সমাজের চিন্তাস্রোত, নৈতিকগতি বা ধর্ম্মের ভাবনা কোন্ দিক্ দিয়া চলিয়াছে, কোন্ পথে প্রধাবিত হইয়াছে, তাহা সাহিত্য-দর্পণের মধ্যে যত সহজে প্রতিফলিত হয়, তত আর কিছুতেই নহে। এ কথাটা অনেকাংশে সত্য।

সাহিত্যিকতা জিনিষটি একদিকে যেমন মনোহারিণী, অপরদিকে বিপথে চালিত হইলে, তেমনই ভয়ঙ্করী। প্রচলিত সভ্যতার ন্যায় পার্থিব সাহিত্যিকতাও কপটতাময়ী এবং স্বৈরিণীর ন্যায় বিশ্বাসঘাতিনী; আবার তথাকথিত স্বাদেশিকতার ন্যায় ভুবনমোহন বেশে সজ্জিত হইয়া অলক্ষ্যে অসংখ্য অহিতকারিণী। 'বিষকুম্ভ-পয়োমুখ' বলিয়া যে কথাটি আছে, আধুনিক গ্রাম্য-সাহিত্যিকতা ঠিক সেই উপাধিতে বিভূষিত হইবার যোগ্য। পুষ্টিতুষ্টিসাধক পবিত্র দুগ্ধভ্রমে লোকে যখন সেই গ্রাম্য সাহিত্যরসপানে প্রলুব্ধ হয়, তখন উহার

অন্তরে যে কালকূট রহিয়াছে, তাহা ধরিতে পারে না। বরং ধীরে ধীরে সেই বিষে অভ্যস্ত হইয়া অকৃত্রিম দুগ্ধের সরসতা চিরতরে ভুলিয়া যায়।

কপটতাই যেন গ্রাম্য-সাহিত্যিকতার আবাসভূমি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। নিজের স্বরূপ গোপনপূর্ব্বক বায়সের ময়ূরপুচ্ছ ধারণের ন্যায় আমরা সাহিত্যিকতার নয়নমনোরঞ্জন পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া সমাজের আসরে উপস্থিত হই এবং সেইরূপ ভাবে কপটতার অনুশীলন ও অভ্যাস শিক্ষা করিয়া লোকের 'বাহবা' অর্জ্জন করাই জীবনের সার্থকতা মনে করি। বাল্যকালে আমরা একজন অতি সৌখীন মিউনিসিপ্যাল মেথরকে দেখিয়াছিলাম, সে সারাদিন পুরীষ ঘাঁটিত, কিন্তু সন্ধ্যার পরে সে এমন ফিট বাবু সাজিয়া বিলাস-ব্যসনে বহির্গত হইত যে, কেহই তাহাকে কোন জমিদারের বিলাসী পুত্র বেং সময়োচিত সভ্যতা-বিজ্ঞানে অভিজ্ঞ না বলিয়া ভাবিতেই পারিত না। কিন্তু যাঁহারা একটু বিচক্ষণ ছিলেন, তাঁহারা তাহার সেই সাময়িক কৃত্রিম সজ্জার ভিতরেও তাহার দৈনন্দিন কর্ম্মের পূতিগন্ধ পাইতেন। আমাদের সাহিত্যিকতাও অনেকটা সেইরূপ। আমাদের ব্যক্তিগত দৈনন্দিন চরিত্র ও অন্তরের নিত্যস্বভাব যতই পূতিগন্ধময় হউক না কেন, আমরা 'সভায়াং বৈষ্ণবোমতঃ' এই ন্যায়ের অনুকরণ করিয়া সাহিত্যিকতার কলমে যে সকল চিত্র ও 'পরোপদেশে পাণ্ডিত্য' ফুটাইয়া থাকি, তাহাতে সাধারণ লোক আমাদের চরিত্রের অন্তঃপুর দর্শন করিতে পারে না। কেবল অপ্রাকৃত সাহিত্যিকগণ আমাদের সেই কৃত্রিম ও সাময়িক পরিচ্ছদের ব্যূহ ভেদ করিয়া সেই অসূর্য্যস্পৃশ্যা কপটতাকে দেখিয়া ফেলেন।

কেবল গ্রাম্য সাহিত্যিকতার কথাই বা বলি কেন, অনেক সময় পারমার্থিক সাহিত্যিকতার নামে আমরা কপটতাকে দুধ কলা দিয়া পুষিয়া থাকি। সে দিন আমাদের কোন নিষ্কপট আদর্শ-চরিত্র সদাচারবান বৈষ্ণববন্ধু কোন পারমার্থিক পত্রিকার নিয়মিত লেখকের প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া বলিতেছিলেন যে, সেই ব্যক্তি কাগজ-কলমে যেরূপ বৈষ্ণবতা তথা বিষ্ণু-বৈষ্ণব-সেবা-প্রাণতা এবং গুরুভক্তির উচ্চ আদর্শ প্রতিফলিত করিয়া থাকেন, সেই আদর্শের শতাংশের একাংশও যদি তাঁহার চরিত্রের অন্তঃপুরে তিনি দেখিতে পাইতেন, তাহা হইলে তিনি সাহিত্যিকতাকেও এত ভয় করিতেন না। আমাদের বৈষ্ণববন্ধুবর আরও বলিয়াছিলেন যে, উক্ত কবিতা বা প্রবন্ধলেখকের সঙ্গে কএকদিন একত্র বাস করিয়া তিনি তাঁহার যে অধ্যবসায়যুক্ত গৃহমেধিতার পরিচয় পাইয়াছেন, তাহাতে তাঁহার (বৈষ্ণববন্ধুর) অধিকাংশ প্রবন্ধ-লেখকের প্রতিই যেন আস্থাহীনতা আসিয়া পড়িয়াছে। অর্থাৎ ইঁহাদের চরিত্র অতঃপুরে একপ্রকার আর আসরে আর একপ্রকার। প্রবন্ধ বা কবিতা লিখিবার সময় ইঁহারা গৃহব্রত-ধর্ম্ম এবং বৈষ্ণব-সেবা-বিমুখতার ছাপ্পান্ন পুরুষ উদ্ধার করিয়া থাকেন, কিন্তু যখন নিজেদের চরিত্রে সেই আদর্শ প্রকাশ করিবার প্রয়োজন হয়, তখন তাঁহারা তাঁহাদের লিখিত প্রবন্ধের সহিত নিজেদের আচরণ ঠিক রাখিতে পারেন না।

গত চৌদ্দ বৎসর ধরিয়া কত সহস্র প্রবন্ধই ত লিখিলাম, 'বাহবা'ও অনেক পাইলাম, বৈষ্ণবগণের নিকট হইতে 'উৎসাহ'ও অনেক লাভ করিলাম; কিন্তু 'গৌড়ীয়ে'র একটি প্রবন্ধের একটি কথার মতও কি আমার

নিত্যস্বভাব উদিত হইয়াছে? না, কেবল পরোপদেশে পাণ্ডিত্য ফলাইয়া নিজের সম্মুখে যবনিকা টানিয়া দিয়াছে? এই জন্য বলিতেছিলাম—সাহিত্যিকতা জিনিষটা ভয়ঙ্করী, অনেক সময় বিশ্বাসঘাতিনী।

রায় গুণাকর তাঁহার পূর্ব্বজীবনে অপ্রাকৃত সাহিত্যিকগুরু শ্রীল রূপের উজ্জ্বলনীলমণি, বিদগ্ধমাধবাদি নাটক শ্রীল কবিরাজপ্রভুর গোবিন্দলীলামৃতাদি মহাকাব্য পাঠ করিবার পর কবিত্ববিজ্ঞানকে অদ্বিতীয় সাহিত্য-নায়ক শ্রীরাধামাধবের ইন্দ্রিয়-তর্পণে নিযুক্ত না করিয়া বিদ্যাসুন্দরের রসমঞ্জরী প্রভৃতি গ্রাম্য-সাহিত্য-সেবায় নিযুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। শুনা যায়, বৈষ্ণব-ভিক্ষুকের বেশ পরিত্যাগ করিয়া সম্ভোগবাদের তপোবনে (?) বা নিধুবনে পুনরায় দীক্ষিত হইয়াছিলেন। প্রচ্ছন্ন আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণময়ী সাহিত্যিকতার এরূপ পরিণাম কিছু আশ্চর্য্যজনক নহে।

শ্রীস্বরূপ দামোদর প্রভু গ্রাম্য ও অপ্রাকৃত—এই দুই শ্রেণীর সাহিত্যিকতার কথা আমাদিগকে জানাইয়াছেন। শ্রীরূপানুগ শ্রীজীবগোস্বামী প্রভু শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণের টীকায় 'সাহিত্য' শব্দের বিশ্লেষণ করিতে যাইয়া 'সহিতা' শব্দের অর্থ করিয়াছেন—'ভক্তি'। বস্তুতঃ যাহাতে কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণ হয়, তাহাই 'সাহিত্য'। কৃষ্ণ সেই সাহিত্যের একচেটিয়া অদ্বিতীয় ভোক্তা। কিন্তু বর্ত্তমানে সাহিত্য-শব্দের তাৎপর্য্য ঠিক বিপরীত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যাহা দ্বারা জনেন্দ্রিয়-তর্পণ হয়, তাহাই 'সাহিত্য'! আধুনিক সাহিত্যকগণের ভাষায়ই—'ছাগসাহিত্য' বা 'Bath room literature' প্রভৃতি অনেক শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। সে সকল সাহিত্যের কথা ছাড়িয়াই দিই, কেন না, তাহা যে পূতিগন্ধময়—ইহা নাবালক বালকেও বুঝিতে পারে। কিন্তু এমন কতকগুলি চিন্তাধারা আধুনিক বিশ্বসাহিত্যভাণ্ডারকে প্লাবিত করিয়াছে যে, জনসাধারণের যাঁহারা পুরোহিত, তাঁহারাও ঐ সকল সাহিত্যিকতার ভাণ্ডারে যে কিরূপ বিষকুম্ভ-পয়োমুখের কপটতা লুক্কায়িত রহিয়াছে, তাহা ধরিয়া উঠিতে পারেন না। বরং তাঁহারাই সেই সকল সাহিত্যের রচয়িতা, উৎসাহদাতা, পরিপোষ্টা; এমন কি, সেই সকল সাহিত্যই সমাজের ধর্ম্ম-কর্ম্ম ও নীতিশিক্ষার মেরুদণ্ড হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কোমলমতি শিশুগণকে তাহাদের শৈশবকাল হইতে সেই সকল সাহিত্যের মধ্য দিয়া নীতি ও ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ আদর্শ শিক্ষা দেওয়া হয়। সেই সকল সাহিত্য শিশুগণের, এমন কি, যুবা, প্রৌঢ় ও বৃদ্ধগণেরও শ্রেয়ঃসাধক স্বাধীন চিন্তা-স্রোতের গতি রোধ করিয়া থাকে। ভোগ বা ত্যাগময় চিন্তাস্রোত সেই সকল সাহিত্যের জন্মভূমি। প্রেয়ঃ-সাধন সেই সকল সাহিত্যের মূল মন্ত্র। শ্রেয়ঃ-সাধনের প্রতিজ্ঞা কেবল মৌখিকতা।

অনেক সময় আধুনিক-সাহিত্যিকগণও গ্রাম্য-সাহিত্য হইতে পারমার্থিক সাহিত্যের পার্থক্য প্রদর্শন করিয়া থাকেন; কিন্তু তাঁহাদের পরমার্থের ধারণা প্রকৃত 'সাহিত্য' যে অর্থে ব্যবহৃত হয়, তাহা হইতে ভ্রষ্ট। রাহিত্য বা নির্ব্বিশেষ-চিন্তা-স্রোতই জগতের শতকরা প্রায় শতজনেরই বিচারে পরমার্থ। কাজেই তাঁহাদের কথিত পারমার্থিক সাহিত্য গ্রাম্য-সাহিত্য অপেক্ষাও অধিকতর বিপজ্জনক। তাঁহাদের কথিত পারমার্থিক সাহিত্য (?) গ্রাম্য সাহিত্যের নিন্দা করিলেও 'Out of the frying pan into the fire' এই ইংরেজী প্রবাদের ন্যায় ব্যষ্টি ও সমষ্টিকে ফাঁসী কাষ্ঠে ঝুলাইয়া চিরশান্তির আকাশকুসুম দেখাইয়া থাকে।

আমরা ঐ জাতীয় সাহিত্যের কএকটি নমুনা আধুনিক বদ্ধ-সাহিত্য-ভাণ্ডার হইতে উদ্ধার করিয়া যুগ-সাহিত্যের (?) গতি পরিস্ফুট করিবার চেষ্টা করিব। অবশ্য ঐ জাতীয় সাহিত্যের সঙ্গে আধুনিক নবীন ও প্রবীণ পাঠকমাত্রেরই নিত্য সাক্ষাৎকার ঘটে; কিন্তু সেই সকল সাহিত্য যে কিরূপ ভীষণাদপি ভীষণ সংক্রামক রোগের দূষিত জীবাণু বহন করিতেছে, তাহা বোধ হয় আধুনিক শতকরা প্রায় শতজন ব্যক্তিমাত্রেরই ভাবনার বিষয় হয় না। যদি হইত, তাহা হইলে শিক্ষক হইয়া ছাত্রের হস্তে, পিতা হইয়া পুত্রের হস্তে, স্নেহময়ী মাতা হইয়া সন্তানের হস্তে, জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠের হস্তে, গুরু শিষ্যের হস্তে সেই প্রচ্ছন্ন বিষের ভাণ্ড সাদরে ও সযত্নে তুলিয়া দিতেন না।

আধুনিক শিক্ষার পুরোহিত-সম্প্রদায় যে-সকল সাহিত্য মহামূল্য রত্নজ্ঞানে আহরণ করিয়াছেন, তাহাকে দোষের আকর প্রমাণ করিতে গেলে অনেকেরই অপ্রিয়ভাজন হইতে হইবে,—একথা বুঝি। অনেকে হয়ত' বলিলেন,—বিশ্বদরবারে যাঁহারা একচেটিয়া মনীষী, মহাপুরুষ ও শিক্ষক বলিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের বিচারে ভুল প্রদর্শন করিতে যাওয়া তোমার ন্যায় নগণ্য ব্যক্তির মূর্খতামাত্র। কিন্তু আমি অতি নগণ্য হইলেও এবং বহু লোকের অপ্রিয়ভাজন হইবার বিপদ্ বরণ করিলেও যে এক অদ্বিতীয় অপ্রতিদ্বন্দ্বী বাস্তব-সাহিত্য-কল্যাণকল্পতরুর পাদমূলের আশ্রয়াভাস লাভ করিয়া তথাকথিত বিশ্বসাহিত্যের বহির্ম্মুখতার সঙ্গত্যাগে সৎসাহসী হইবার চেষ্টা করিতেছি, তাহার নাম ভাগবত-সাহিত্য। নিত্যসিদ্ধ ভাগবতগণ, অমল পরমহংসগণ, নির্ম্মৎসর সাধুগণ সেই বাস্তব সাহিত্যের চর্চ্চা করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ তাহাই একমাত্র 'সাহিত্য'-পদবাচ্য। কেননা, যিনি সাহিত্যের অপ্রতিদ্বন্দ্বী নায়ক, সেই অদ্বিতীয় পরাৎপর তত্ত্বের পূর্ণ তুষ্টিই সেই সাহিত্যের সাধনা ও প্রয়োজন। যেখানে লোকপ্রিয়তা সাহিত্যানুশীলনের মুখ্য প্রয়োজন, সেখানে বহুরূপী কপটতার প্রচ্ছন্ন নাট্য থাকিবেই থাকিবে।

কোন আধুনিক সাহিত্যিক লিখিয়াছেন,—"ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণ ও সন্ন্যাসী চিরদিন লোকশিক্ষণের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন; তাঁহারা সকলেই সংসারবিরাগী। তাঁহারা বলিতেন, এই যে জগৎ, ইহা মিথ্যা, সত্যের আভাসমাত্রও এখানে পাইবে না। স্ত্রী-পুত্র-কন্যাও মিথ্যা, তাহাদের মায়ারজ্জুতে আবদ্ধ হইও না। যদি চক্ষুর সম্মুখে অনাহারে দুঃখকষ্ট ভোগ করিয়া তাহারা মরে, তবুও বিচলিত হইও না, চিত্তের শান্তি ক্ষুব্ধ হইতে দিও না, শান্ত-সমাহিত হইয়া কেবল ভগবানের নামকীর্ত্তন কর। **অনাহারে ক্লিষ্ট পুত্র কলত্রের করুণ ক্রন্দনধ্বনি মৃদঙ্গ ও করতালের বাদ্যে ডুবাইয়া দেও।** উপবাস? উপবাসে ভয় পাইও না, ইহকালে উপবাস কর, পরকালে ইন্দ্রপুরীতে যাইয়া, পরিজাতের মালা পরিয়া, পেট ভরিয়া অমৃত খাইবে।"

উক্ত সাহিত্যের লেখক তাঁহার লেখনীতে যে জাতীয় ধর্ম্মের উপদেশ প্রচার করিয়াছেন, তাহা প্রকৃত পারমার্থিক ভারতের বা ভাগবত-সাহিত্যের উপদেশ নহে। বর্ত্তমানে তথাকথিত শিক্ষিত ও অশিক্ষিত সমাজ বা তথাকথিত ধর্ম্মপ্রচারকগণ সকলেই ন্যূনাধিক ভোগ ও ত্যাগধর্ম্মের সাহিত্যের খবর রাখেন। ঐ উভয় সাহিত্যের খিচুড়ি-মহোৎসবে যোগাদন করিয়া বর্ত্তমানে অনেকেরই এত বদহজম হইয়াছে যে, ভোগ

ও ত্যাগ—এই মনোধর্ম্মদ্বয়ের পূতিগন্ধপূর্ণ নানাপ্রকার উদ্‌গার সাহিত্যের মধ্য দিয়া সর্ব্বত্রই প্রকাশিত হইতেছে। ইহা দেখিয়া ভাগবত-সাহিত্যিকগণ দূরে থাকিয়া মৃদুহাস্য করেন।

ভাগবত-সাহিত্যিক-সম্প্রদায় সম্ভোগবাদী নহেন। তাঁহারা ইহকালে বা পরকালে ইন্দ্রপুরী-বাস, পারিজাতের মালাধারণ বা পেট ভরিয়া অমৃত পানের টোপ দেখিয়া কোন দিনই লুব্ধ হন না। অধিক কি, জগতের সকল ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের একমাত্র কাম্য মুক্তিকামনাকেও তাঁহারা নরক বা পিশাচীর ন্যায় পরিত্যাগ করেন। "ভুক্তিমুক্তিস্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে। তাবৎ ভক্তসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ।।"—ইহাই ভাগবত-সাহিত্যিকের কথা। কাজেই সম্ভোগবাদীর বা সম্ভোগবাদের তিক্ত অভিজ্ঞতা সংগ্রহকারীর অনাহারে ক্লিষ্ট পুত্র-কলত্রের করুণ ক্রন্দন-ধ্বনি মৃদঙ্গ ও করতালের বাদ্যে ডুবাইয়া দিবার চেষ্টার ন্যায় কোন কৃত্রিম বৈরাগ্য বা প্রচ্ছন্ন ভোগ-চেষ্টা ভাগবতগণের অপ্রাকৃত সহজ সাহিত্যময় জীবনে নাই।

পূর্ব্বোক্ত সাহিত্যিক আরও লিখিয়াছেন,—**"করতালের শব্দে পেট ভরে না। তুলসীর পাতা যতই পবিত্র হউক না, তাহার কাষ্ঠে রান্না হয় না। আম, কাঁঠাল, কলা প্রভৃতির মত তাহাতে সুস্বাদু ফল ফলে না।"**

দুঃখের বিষয়, এই জাতীয় সাহিত্যও বিচক্ষণ নিখিল বঙ্গীয় শিক্ষক-সমিতি কর্ত্তৃক তরুণ-সাহিত্যিকগণের শিক্ষার জন্য সযত্নে চয়ন করা হইয়াছে! পরমার্থপ্রাণ ভারতবর্ষের তরুণ সন্তানগণকে নূতন যুগোচিত করিয়া গড়িয়া তুলিবার জন্যই কি তাহাদের সুকুমার বয়স হইতেই শিক্ষা দেওয়া হইতেছে যে,—পেটই যথাসর্ব্বস্ব? পেট ভরিলেই যেন সব কিছু হইয়া গেল! বলিতে কি, পেটই পরমার্থের স্থান অধিকার করিয়াছে! তুলসীর পাতার দ্বারা 'কৃষ্ণের ভোগ হয়', কিন্তু 'আমার ভোগ হয় না' বলিয়া তুলসীর পাতায় আমার প্রয়োজন নাই! তুলসীর কাষ্ঠে বিষ্ণুনৈবেদ্য-রন্ধনের কথা হরিভক্তিবিলাসাদি বৈষ্ণবস্মৃতি-নিবন্ধগ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। তুলসী ব্যতীত কোন বস্তুই অর্চ্চাবতারের ভোগ লাগে না—ইহাই আমরা বেদানুশাস্ত্র-সমূহে দেখিতে পাই। গুরুগৃহে শিক্ষালাভার্থী তরুণ-সম্প্রদায়কেও ভারতের প্রাচীন সাহিত্য ইহাই শিক্ষা দিয়াছে; কিন্তু আধুনিক সাহিত্য তরুণ-শিক্ষার্থিগণের মস্তকে বাল্যকাল হইতেই পেট ভরিবার চিন্তা ঢুকাইয়া দিতেছে! কাজেই বর্ত্তমানে 'পেটসাহিত্য'-চর্চ্চার ফলে 'ছাগসাহিত্য', না হয় 'নাস্তিকসাহিত্য' বা রাহিত্যেরই প্রগতি হইতেছে। যতই ধর্ম্মশিক্ষা, যতই নীতিশিক্ষা দেওয়া যাউক না কেন, আধুনিক পুরোহিতগণের শিক্ষার আদর্শে তরুণগণ ইহাই শিক্ষা করিতেছে যে, পেটপালনই তাহাদের পরমধর্ম্ম! সেই পেটের পুষ্টির জন্যই ধর্ম্মকর্ম্ম, শিক্ষা-দীক্ষা ও যত কিছু। যদিও আধুনিক সাহিত্যের মধ্যে 'বুনো রামনাথের গল্প' প্রভৃতি দেখিতে পাওয়া যায়, তথাপি সেই সকল কেবল 'আঙ্গুর ফল টক'—এই শার্গালী-নীতি পোষণের জন্য ও ঈশ্বর-বিশ্বাসহীন কল্পিত সন্তোষ বা নাস্তিকতা পরিবর্দ্ধনের জন্য।

কোন আধুনিক ব্রাহ্মণ আমাদের এক বৈষ্ণব-বন্ধুর গলদেশে তুলসীর মালিকা দেখিতে পাইয়া বলিয়াছিলেন,—"আপনি তুলসীর মালা কণ্ঠে ধারণ করিয়া তুলসীকাষ্ঠের সার্থকতা বিধান করিতেছেন; কারণ, এই কাষ্ঠের দ্বারা অন্য কোন বিশেষ প্রয়োজনীয় কার্য্য হয় না; তবে ইহা কণ্ঠে ধারণ করিলে তৎফলে কফরোগ

বিনষ্ট হয়।" কেহ কেহ ম্যালেরিয়া-নাশক বলিয়া তুলসীকে আদর করেন; অর্থাৎ যেন এই বিনশ্বর পচা দেহটার পোষণ-তোষণই জীবের সর্ব্বস্য, ইহাই বর্ত্তমানের চিন্তাস্রোত। সুতরাং সাহিত্যের নাড়ি-স্পন্দন দেখিয়া আমরা সমাজের অবস্থা বেশ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছি।

নিম্নলিখিত সাহিত্যের অংশটিও জনসাধারণের এতই প্রিয় হইয়া পড়িয়াছে যে, নবীন ও প্রবীণগণের কণ্ঠে কণ্ঠে, বিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তকে—সর্ব্বত্রই ইহা গীত ও উদ্ধৃত হইয়া থাকে,—

"করিলাম কত নৃত্য প্রফুল্ল আশ্রমে,
রাধাশ্যামে নিরখিয়া হইয়া উতলা
গীতগোবিন্দের শ্লোক গাহিয়া গাহিয়া,
ভ্রমিলাম কুঞ্জে কুঞ্জে, পাণ্ডারা আসিয়া
গলে পরাইয়া দিল বরগুঞ্জামালা।
তবু ভরিল না চিত্ত! সর্ব্বতীর্থসার,
তাই মা তোমার পাশে এসেছি আবার।"

অর্থাৎ লেখক তীর্থ ভ্রমণ করিতে করিতে নানা স্থান দর্শন করিয়া তত্তৎস্থানের ভাবে বিভাবিত হইয়া কত নৃত্য-কীর্ত্তন করিলেন। অবশেষে নিজ জন্মভূমি বা মাতার নিকট ফিরিয়া আসিয়া দেখিতে পাইলেন যে, কাশীবৃন্দাবনাদি তীর্থ অপেক্ষাও তাঁহার জননী ও জন্মভূমি অধিকতর শান্তিদায়ক। তাঁহার স্বদেশ ও জননীই সকল তীর্থের সার। এ স্থানে ব্যাখ্যায় কোন প্রথিতনামা সাহিত্যিক লিখিয়াছেন যে, 'জননীর পদতলে গয়া-গঙ্গা-বারাণসী সকল তীর্থই বিরাজিত'।

ঐ জাতীয় সাহিত্যিকতায় সম্ভোগবাদের প্রচ্ছন্ন পূঁতিগন্ধ পাইয়া ভাগবত-সাহিত্যিকগণ দূর হইতে হাস্য করিবেন। যাঁহারা শান্তির নামে প্রচ্ছন্ন সম্ভোগ-পিপাসায় প্রমত্ত হইয়া নৃত্য-কীর্ত্তন বা অনন্তকোটি তীর্থ ভ্রমণ করেন, তাঁহাদের তিক্ত অভিজ্ঞতা ইহাই শিক্ষা দেয় যে, 'জড়নিষ্ঠাই জীবন-মরণে কাম্যবস্তু—দেশাত্মবোধের নামে নিতান্ত গর্হণযোগ্য জড়াত্মবোধ, দেহাত্মবোধ বা গৃহমেধিতাই যথাসর্ব্বস্ব।' জননীর নিকট হইতে আমরা আমাদের অনেক কামনা দোহন করিতে পারি বলিয়া, জননী আমাদের এত প্রিয়। ভারতের পরমার্থশাস্ত্র শ্রুতি ইহাই শিক্ষা দিয়াছেন এবং পূর্ব্বকালে তরুণগণও গুরুগৃহে বাস করিয়া এই শিক্ষাই লাভ করিয়াছেন; কিন্তু আধুনিক সাহিত্যিকতা জন্মভূমি বা জননীপ্রীতির নামে জড়মৃত্তিকা ও জড়-রক্তমাংসকেই আঁকড়াইয়া ধরিয়া আত্মানুশীলনের কথা হইতে সমাজকে বঞ্চনা করিতেছে। প্রাচীন ভারতে মুক্তকুলের রচিত সাহিত্য বা অপৌরুষেয় সাহিত্য পঠিত হইত। কিন্তু বর্ত্তমানে সেই সকল সাহিত্যিকে নির্ব্বাসিত করিয়া বা তাহার কদর্থ বা দোষ দর্শন করিয়া বদ্ধজীবগণের লিখিত আপাতচিত্তরঞ্জক সাহিত্যই শিক্ষা ও কৃষ্টির বাহন হইয়াছে!

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী" বাক্যে জড়ভোগারাম ক্ষয়িষ্ণু স্বর্গ হইতে মাত্র জননী ও জন্মভূমিকে শ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে। কিন্তু বর্ত্তমানে কাশী বৃন্দাবনাদি বৈকুণ্ঠতীর্থ-সেবা হইতেও প্রচ্ছন্ন-সম্ভোগবাদকে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ করিবার জন্য সাধনা আরম্ভ হইয়াছে! সম্ভোগময় চিত্তবৃত্তিতে কাশীবৃন্দাবনাদি তীর্থভ্রমণ ভাগবত জীবনের আদর্শ নহে। ঐরূপ জননী ও জন্মভূমিপ্রীতির মূলে যে কপটতাময়ী ভোগচেষ্টা লুক্কায়িত রহিয়াছে, তাহা একমাত্র ভাগবত-সাহিত্যিকগণই ধরিতে পারেন।

কোন প্রথিতনামা সাহিত্যিক লিখিয়াছেন,—"জড় পাষাণ-বিগ্রহে ভগবান্ আছেন, অথচ জীবন্ত মনুষ্যের মধ্যে তিনি নাই,—এই ভ্রান্তবুদ্ধি পোষণ করিলে ভগবানকে হারাইতে হয়। এ সংসারে ভগবান্ দীন-দরিদ্রের সাজেই ঘুরিয়া বেড়ান। নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দিলেই ভগবান্ মন্দিরে থাকেন।"

এই জাতীয় সাহিত্য শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মোপদেশের নামে বঙ্গদেশ প্লাবিত করিয়াছে। সে দিন নিম্নলিখিত কএকটি পদ্য কোন ধনবান্ ব্যক্তির গৃহে কাচাধারে শোভিত দেখিতে পাইয়াছিলাম—

"ঈশ্বরের সেবায় যদি সাধ থাকে মনে।
মানবের সেবা আগে শিখহ যতনে।।"

"বহুরূপে সমমুখে তোমার ছাড়ি' কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?
জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।"

দরিদ্রনারায়ণ, মানুষের জয়ন্তী, মেথর-মুদ্দাফরাসের বহির্ম্মুখতা ও তত্তদভিমান পূর্ণমাত্রায় সংরক্ষণ করিয়া তাহাদিগের 'হরিজন'-নামকরণ প্রভৃতি ব্যাপার ও শব্দগুলি আধুনিক সাহিত্যিকতার যুগধর্ম্ম হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ঐ সকল সাহিত্যে বিন্দুমাত্রও অন্য অন্যায় আছে কল্পনা করা দূরে থাকুক, উহা শ্রেষ্ঠ নীতি ও ধর্ম্মসাহিত্য বলিয়া জগতে প্রায় শতকরা শতজন ব্যক্তির নিকটই সমাদৃত হইতেছে! কিন্তু শ্রুতি-সাহিত্য, ভাগবত-সাহিত্য পূর্ব্বকথিত সাহিত্যকে কোথায় স্থান দিয়াছেন, উহাদের সম্বন্ধে কি বিচার করিয়াছেন, তাহা আধুনিক সাহিত্যকতায় একেবারে ধামা-চাপা পড়িয়াছে। আধুনিক সাহিত্যকতা বাস্তব-সাহিত্য-বিরোধী পরিণামে নির্ব্বিশেষবিচারপর কতকগুলি বাউলিয়া ও সহজিয়া সাহিত্যকে বৈষ্ণব-সাহিত্য বলিয়া আহরণ করিয়া "সবার উপরে মানুষ বড়" প্রভৃতি বাক্যগুলির কদর্থ করিতেছে।

শ্রীচৈতন্যদেব ও শ্রীভাগবত-সাহিত্য বজ্রগম্ভীরস্বরে জানাইলেন,—'জীবসেবা' বা 'জীবে প্রেম' কথাটি হয় না। 'পরমেশ্বর প্রেম', 'পরমেশ্বরের ঐকান্তিক ভক্ত বা বৈষ্ণবের সেবা' আর 'বদ্ধজীব বা বালিশের প্রতি দয়া'। "নামে রুচি, জীবে দয়া, বৈষ্ণব-সেবা"—ইহাই মহাপ্রভুর কথা। কিন্তু বর্ত্তমান সাহিত্যিকতা প্রথমেই পরমেশ্বরকে নিত্য নাম-রূপ-হীন বলিয়া ঠিক করিয়া রাখিয়াছে। বর্ত্তমান সাহিত্যিকতা বিশেষ দয়া করিয়া মানবের রুচির অনুকূল কল্পিত ঈশ্বরের কল্পিত নাম ও রূপের অনুমোদন করিয়াছে। আর এদিকে যত নাম-রূপ-ক্রিয়া প্রভৃতি বদ্ধজীবজগতের জন্যই যেন তাহাদের সর্ব্ব-স্বত্ব সংরক্ষণ করিয়াছে বলিয়া তদুপরি

মুদ্রা অঙ্কিত করিয়া দিয়াছে; সাধু ভক্তগণকে উপবাসী ও অনিকেত করাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে! তবে যদি তাঁহারা বহির্ম্মুখ-সমাজের কিছু খিদ্‌মদগারি করিয়া দেন, তবে তাঁহাদের জন্য দয়া করিয়া কিছু দান-দক্ষিণার অনুমোদন করিয়াছে। এই জাতীয় চিন্তাস্রোতের প্লাবনকে ভিত্তি করিয়া আধুনিক সাহিত্যিকতার মনোহর সৌধ গড়িয়া উঠিয়াছে। কাজেই বদ্ধজীবকে 'শিব' কল্পনা করিয়া মায়াবদ্ধ-জীবের সেবা করিবার সাহিত্য পরিবর্দ্ধিত হইতেছে। জড়-সাহিত্যের উদ্‌গমে শ্রীচৈতন্য-সাহিত্য আত্মগোপন করিয়াছেন।

সে দিন এইরূপ একটি সাহিত্য বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়াছে—''জীবে দয়া—থূ, থূ, জীব-সেবা! শিব-জ্ঞানে জীবসেবা।''

শ্রীচৈতন্যদেব ও তদনুগসাহিত্যে 'জীবে দয়া' কথাটি পাওয়া যায়, কিন্তু উপরি-উক্ত সাহিত্যে সেই উপদেশের প্রতি 'থূ থূ' নিক্ষেপ করিবার চেষ্টা হইয়াছে! আমরা জানি,—আকাশের প্রতি 'থূ থূ' নিক্ষেপ করিলে নিজের মুখে 'থূ থূ' পড়ে; সুতরাং ঐ জাতীয় উপদেশকে কি করিয়া পারমার্থিক সাহিত্য বলা যায়? যাঁহারা শিবজ্ঞানে জীবসেবা করিতে চান, তাঁহারা অনেকেই বা সকলেই ''শিবোঽহং'' অর্থাৎ 'আমিই শিব'—এইরূপ মন্ত্রের জপকারী। তাহা হইলে দেহারামতাই তাঁহাদের কল্পিত জীবসেবা হইয়া দাঁড়ায় না কি? দ্বিতীয়তঃ, যদি আমরা জগজ্জননী-বিচারে মহামায়াকে 'মা' বলিয়া সম্বোধন করি, আবার ''শিবোঽহং'' মন্ত্র জপ করিতে করিতে নিজেরাই চরমে 'শিব' হইয়া যাই বা অপরকে 'শিব' সাজাই, তাহা হইলে আমরা শেষ-পর্য্যন্ত মাতৃসম্মান বজায় রাখিতে পারিব কি? সন্তান কি করিয়া মাতার ভর্ত্তা হয়! মা কি করিয়া আবার বামা হন? শ্রীচৈতন্যদেব ত' তাঁহার নবদ্বীপ-লীলায় দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতের ঐরূপ 'ভবানীভর্ত্তা'-শব্দমূলক সাহিত্যকে পরিবর্জ্জন করিয়াছিলেন।

সেব্যের প্রীতিবিধানের নাম 'সেবা'। সাধারণ গ্রাম্যসাহিত্যে শরীরচর্য্যার নাম 'সেবা'। তাহাও সেব্যের প্রীতিবর্দ্ধনমূলক। বদ্ধ জীবের সৌখ্যবিধান করাই যদি সেবা হয়, মাতালকে মদ যোগাইয়া দেওয়াই যদি সেবার আদর্শ হয়, তাহা হইলে 'সেবা' শব্দটি পৃথিবী হইতে উঠিয়া যাওয়াই ভাল। ভগবদিচ্ছায় কার্য্যতঃ তাহাই হইয়াছে। জগতে সেবার আদর্শ প্রায় নাই; আধুনিক সাহিত্যে যে সেবার কথা শুনিতে পাওয়া যায়, তাহা প্রচ্ছন্ন কাম। ভাগবতসাহিত্য ও শ্রীচৈতন্যদেব বলেন,—সেবা একমাত্র অদ্বিতীয় সেব্য সচ্চিদানন্দবিগ্রহ পরমেশ্বর ও তাঁহারই অভিন্ন তনু নিত্যশুদ্ধ চেতন ভগবজ্জনগণেরই জন্য সর্ব্বস্বত্ব-সংরক্ষণ করিয়াছে। জাগতিক দীনদুঃখীকে ভগবৎপ্রসাদাদি দ্বারা দয়া করিলে তাহাদেরও মঙ্গল সম্ভাবনা। তাহাদের কেবল দৈহিক ও মানসিক ভোগসম্ভার যোগাইলে ও উহাকেই সেবা বলিয়া চালাইতে তদ্দ্বারা কোন পক্ষেরই নিত্যমঙ্গল হইবে না, উভয়েই জড়নিষ্ঠ ও প্রচ্ছন্ন নাস্তিক হইয়া পড়িবে।

মূলে পরমেশ্বরের নিত্যবিগ্রহ নাই, নিত্য-ভগবৎপার্ষদ নাই, নিত্য তদ্রূপবৈভব বা ধাম নাই, নিত্য ভগবল্লীলা নাই—এইরূপ প্রচ্ছন্ন নাস্তিকতা হৃদয়ের অভ্যন্তরে লুক্কায়িত থাকিলে 'মানুষের সেবা' অর্থাৎ কর্ম্মফলবাধ্য বদ্ধজীবের সৌখ্যবিধানই 'পরমেশ্বরের সেবা', বহির্ম্মুখতা বজায় রাখিয়াই মেথর মুদ্দাফরাসের

আপেক্ষিক সুবিধা করিয়া দেওয়াকেই 'হরিজনের (?) সেবা', নশ্বর জড়দেহের নশ্বর জন্মভূমির সেবার নামে প্রচ্ছন্ন ভোগকেই কাশীবৃন্দাবনাদিধাম-সেবা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ সেবা এবং প্রচ্ছন্ন রিরংসামূলে কর্ম্ম-প্রবৃত্তিকেই নিষ্কাম কর্ম্মবীরত্ব প্রভৃতি বলিয়া ভ্রান্তি হয়! এই জাতীয় ব্যাপক ভ্রান্তি ও বহির্ম্মুখতা যখন কোন দেশ বা সমাজকে প্লাবিত করে, তখনই সাহিত্যের মধ্য দিয়া পূর্ব্বোক্ত নানাপ্রকার প্রলপিত বাক্য প্রকাশিত হয়।

ভাগবত সাহিত্য বৈষ্ণব-সেবা বা বৈষ্ণব-শ্রেষ্ঠ শিবের সেবার কথাই বলিয়াছেন; কিন্তু শিবের আসন সকলকে প্রদান করেন নাই। যে কোন লোককে শিবের আসনে বসাইয়া শিবের নামের দোহাই দিয়া সেবা বা সহানুভূতির ছলনায় 'ভোক্তা আমি'র ইন্দ্রিয়তর্পণ করিয়া লইব,—ভাগবত-সাহিত্য এইরূপ কপটতাকে সর্ব্বতোভাবে নিরাস করিয়াছেন। যে উমাধব শিব মস্তকে বিষ্ণু-পাদবাহিনী গঙ্গাকে ধারণ করিয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করেন, সেই গঙ্গাকে, সেই শিবের ধামকে কখনও ভাগবত-সাহিত্য প্রাকৃত জননী বা জড় জন্মভূমির সেবিকা বলিয়া ভ্রমেও কল্পনা করিতে পারেন নাই।

আধুনিক সাহিত্যের আর কতশত উদাহরণ উদ্ধার করিব! কারণ এ জাতীয় সাহিত্যে বঙ্গসাহিত্য প্লাবিত হইয়াছে। কোন এক লোকপ্রিয় খ্যাতনামা সাহিত্যিক লিখিয়াছেন যে, সঙ্কীর্ত্তন অপেক্ষা কর্ত্তব্যসাধন শ্রেষ্ঠ। উদাহরণ-স্বরূপ প্রসঙ্গান্তরে তিনি লিখিয়াছেন,—"যদি তুমি সঙ্কীর্ত্তনে প্রমত্ত হইয়া থাক, আর এমন সময় কেহ আসিয়া তোমাকে সংবাদ দেয় যে, তোমার প্রতিবেশীর কলেরা হইয়াছে, তুমি যদি তৎক্ষণাৎ সঙ্কীর্ত্তন পরিত্যাগ করিয়া সেই প্রতিবেশী-নারায়ণের সেবায় না যাও, ভগবান্ তোমার নামকীর্ত্তনে সন্তুষ্ট হইবেন না।'

জগতের প্রায় বোধ হয় শতকরা শতজন লোকই এই জাতীয় সাহিত্যে শ্রেষ্ঠধর্ম্মোপদেশ দেখিতে পাইবেন। বিদ্যালয়ের সুকুমারমতি তরুণগণ এই সকল সাহিত্য মুখস্থ করিয়া পরীক্ষাগারে তাহা উদ্‌গীরণ করিয়া আসে। ঐ সাহিত্যের প্রতিবাদ করিয়া পরীক্ষার খাতায় কেহ কিছু লিখিলে তাহার ভাগ্যে পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রগণের তালিকার মধ্যে স্থান ঘটিবে না বলিয়া কোন কোন ছাত্রও আমাদের নিকট সরলভাবে দুঃখ প্রকাশ করিয়াছে। সুতরাং বর্ত্তমানে শিক্ষালয়সমূহ 'ধর্ম্মশিক্ষায় নিরপেক্ষ'—এরূপ উক্তি প্রচার করিলেও আধুনিক সাহিত্যিকতা সাধারণ সামাজিকগণের অজ্ঞাতসারে নাস্তিক্যধর্ম্মই শিক্ষা দিতেছে।

অহিন্দু-সম্প্রদায়ের কেহ কেহ বলেন যে, বর্ত্তমান বঙ্গসাহিত্য গুপ্তভাবে হিন্দুনীতি ও হিন্দুধর্ম্ম শিক্ষা দিয়া থাকে; কিন্তু আমরা উপরে যে সাহিত্যের মর্ম্মটুকু উদ্ধার করিলাম, তাহা কোন বিশেষ উচ্চপদারূঢ় বঙ্গসাহিত্যের অহিন্দু অধ্যাপকের দ্বারাই তরুণগণের সাহিত্যে চয়ন করা হইয়াছে। ইহাতে কোন সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের গন্ধ নাই বলিয়া বোধ হয় তিনি মনে করিয়া থাকিবেন এবং ঐরূপ নীতি সার্ব্বজনীন বলিয়াই বোধ হয় তিনি বিচার করিয়া থাকিবেন। কারণ হরিসঙ্কীর্ত্তন জিনিষটা আধুনিক ধারণায় সাম্প্রদায়িক! আর প্রতিবেশীর রোগ-সেবা—ইহা সার্ব্বজনীন সমাদরের ধর্ম্ম!

এইরূপ ধারণারও বিশেষ কোন ক্ষতি নাই, কিন্তু ইহার অভ্যন্তরে চিত্তরঞ্জনবেশ পরিধান করিয়া কোথায় কপটতাময়ী ভুবনমোহিনী নাস্তিকতা লুক্কায়িত রহিয়াছে, তাহা আমরা অনেকেই ধরিতে পারি না—ইহাই পরম দুঃখের বিষয়।

যাঁহাদের বিচারে হরিসঙ্কীর্ত্তন নিজের বা অপরের ইন্দ্রিয়তর্পণের বিষয়, তাঁহাদের পক্ষে সঙ্কীর্ত্তন ছাড়িয়া কলেরা রোগীর সেবা করা ভাল। কারণ, তাঁহারা এক মানুষের ইন্দ্রিয়তর্পণ ছাড়িয়া আর এক মানুষের ইন্দ্রিয়তর্পণ বা প্রচ্ছন্ন ব্যক্তিগত ইন্দ্রিয়তর্পণই করিতে যাইতেছেন। কিন্তু যাঁহারা একমাত্র হরির ইন্দ্রিয়তর্পণের জন্য কীর্ত্তন করেন, তাঁহারা হরির সেবা ছাড়িয়া অন্য কোন কার্য্যে যাইতে পারেন না, প্রচ্ছন্ন নাস্তিকসমাজ ঐ কার্য্যকে যতই শ্রেষ্ঠধর্ম্মের পোষাকে সাজাইয়া দিউন না কেন। যেখানে কলেরা রোগীর সেবা বড় হইয়া দাঁড়াইল বা কর্ম্মফলবাধ্যরোগী বা ভোগীকে 'নারায়ণ' কল্পনা করা হইল, সেখানে কল্পিত হরির নামসঙ্কীর্ত্তন-মূলে যে সম্ভোগবাদ বা নাস্তিকতা ছিল, তাহা স্বতঃই আত্মপ্রকাশ করিয়া দেয়। যাহারা কলেরা সারাইবার জন্য হরিকীর্ত্তনের নামে অপরাধ করে, তাহাদের পক্ষে কীর্ত্তনাপরাধ পরিত্যাগ করিয়া কলেরা রোগীর সেবা করাই ভাল। কিন্তু কলেরা রোগীকে 'নারায়ণ' সাজাইয়া আবার মায়াবাদ-অপরাধ আসিয়া গ্রাস করে। আধুনিক সাহিত্যিকতা অন্য সকল সময়ই যুক্তিবিচারের দোহাই দিয়া থাকে—কেবল যাহাতে পরমেশ্বরের সেবার আনুকূল্য হয়, সেই স্থানে উহা বিচারযুক্তিতে প্রবেশ করিতে নারাজ!

বর্ত্তমানযুগের শুদ্ধভক্তিসাহিত্যের গুণমুগ্ধ কোন কোন শিক্ষিত ব্যক্তি অনেক সময় দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলেন যে, ভক্তিবিনোদ-সাহিত্য বা গৌড়ীয়মঠের সাহিত্য যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকাদিতে প্রকাশ হইয়া পঠিত ও আলোচিত হইত, তবে তরুণ ও প্রবীণ সকল পাঠকেরই বিশেষ মঙ্গল হইতে পারিত। আমাদের বিচার কিন্তু একটু স্বতন্ত্র। ভক্তিবিনোদ-সাহিত্যের বা শ্রীগৌড়ীয় মঠের সাহিত্যের অনুগ অধ্যাপকগণের নিকট সেই সকল অতিমর্ত্ত্য সাহিত্য যৎকিঞ্চিৎ আলোচনার ফলে আমরা সেই সাহিত্যের একটি বৈশিষ্ট্য মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়াছি যে, ঐ সাহিত্যের এমনই একটা প্রভাব এই যে, তাহা সর্ব্বপ্রকার অসৎসঙ্গের সহিত সমন্বয়-চেষ্টাকে শতযোজন দূরে রাখে। নানা মনোধর্ম্মপর গ্রাম্য ও প্রচ্ছন্ন নাস্তিক-সাহিত্যের সঙ্গে গৌড়ীয়মঠের সাহিত্য সমান আসনে স্থান পাইলে তদ্দ্বা গুরু-সাহিত্যের অবমাননাই হইত। 'শ্রীচৈতন্যভাগবত' ও 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত'—এই গ্রন্থদ্বয় কি বঙ্গের দুইটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ উপাধি-পরীক্ষার পাঠ্যতালিকায় গৃহীত হয় নাই? চণ্ডীদাস—বিদ্যাপতির নাম করিয়া অনেক প্রাকৃতসহজিয়া-সাহিত্যও ত' আধুনিক পাঠ্যপুস্তকে স্থান পাইয়াছে; আবার তৎসঙ্গে কোন কোন প্রাচীন মহাজনের পদও চয়ন করা হইয়াছে। কিন্তু তাহাদের কদর্থ ও গ্রাম্য সাহিত্যের সহিত সমন্বয়-চেষ্টাই সেই সকল সাহিত্যচর্চ্চার ফল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। একসময় শিশিরকুমারের লোকপ্রিয় মতের সহিত ভক্তিবিনোদ-সাহিত্য পার্থক্য স্থাপন করিয়া বলিয়াছিল,—"কাণা-গরু অপেক্ষা শূন্য গোয়ালই ভাল।" সত্যের একজন অকৃত্রিমগ্রাহক থাকিলেই তদ্দ্বারা প্রকৃত বিশ্বমঙ্গল হইতে পারে। পাঁচমিশালি-সত্যগ্রহণের অভিনয়ে বাস্তবসত্য লাভ হয় না।

আমাদের আচার্য্যদেবের শ্রীমুখে শত-সহস্রবার শুনিয়াছি যে, তিনি তাঁহার বাল্যকাল হইতে কখনও কোন প্রাকৃত সাহিত্যিকের সাহিত্য পড়িয়া বিদ্যাশিক্ষা করেন নাই। তিনি চিরকাল সেই সকল সাহিত্যকে শতযোজন দূরে রাখিয়াছেন। তাঁহার পঠদ্দশায়ও শ্রীচৈতন্য-ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, ঠাকুর মহাশয়ের প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা প্রভৃতি পারমার্থিক সাহিত্যগ্রন্থই তাঁহার বঙ্গসাহিত্য-পুস্তকের স্থান অধিকার করিয়াছিল। শ্রীরামপুরে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ 'শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত' রচনা করিয়া সেই গ্রন্থ তদানীন্তন বিদ্যালয়ের ছাত্র সরস্বতী ঠাকুর প্রভৃতিকে পড়াইতেন। সেই সকল সাহিত্য পড়িয়াই তাঁহার বিদ্যালাভের অভিনয় এবং স্বতঃসিদ্ধ অপ্রাকৃত সারস্বত সাহিত্যভাণ্ডার প্রকাশিত হইয়াছে। কাজেই সেই সাহিত্য সর্ব্বতোভাবে জাগতিক ভোগপর ও ত্যাগপর সাহিত্য হইতে নিজ-স্বতন্ত্রতা সংরক্ষণ করিয়াছে।

প্রচলিত বঙ্গসাহিত্যের গুরু পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বোধোদয়ে লিখিত ''ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ'' বাক্যের প্রতিবাদ ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার পূর্ব্ব অধ্যাপক বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভবনে বিদ্যাসাগর মহাশয়েরই নিকটে সাক্ষাদ্ভাবে উপস্থাপিত করিয়াছিলেন। বালক সরস্বতী ঠাকুরও সেই সময় উপস্থিত থাকিয়া আধুনিক যুগের পারমার্থিক ও আর্থিক সাহিত্যগুরুদ্বয়ের বিচার শ্রবণ করিয়াছিলেন।

''Educate men without religion and you make them but clever devils''
মনীষী ডিউক্ অব্ ওয়েলিংটনের এই নীতি আমরা অনেক সময় উদ্ধার করিলেও আমাদের অর্থ বা পরমার্থের আদর্শে ভুল অর্থাৎ গোড়ায়ই গলদ থাকায় আমরা ধর্ম্ম-জগতে নিরপেক্ষতা সংরক্ষণের নাম করিয়া নির্ব্বিশেষ-বিচারপর অপসাম্প্রদায়িকতারই পক্ষপাতিত্ব করিয়া সাহিত্যের নামে রাহিত্যবিচারকেই বহুমানন করি। গণমনোমোহিনী পঞ্চায়েতী সাহিত্যকতা এ জন্য বিশ্বাসঘাতিনী ও প্রচ্ছন্ননাস্তিকতার জননী।

চটকপৰ্ব্বত

পুরীর সমুদ্রতীরে যে সকল বালুর পাহাড় (বৃহৎ স্তূপ) আছে, তাহাকে 'চটকপৰ্ব্বত' বলে—(অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য—মধ্য ২।৯)। যমেশ্বর মহাদেবের মন্দিরের দক্ষিণে ও টোটাগোপীনাথের মন্দিরের সম্মুখে যে একটি সুবৃহৎ বালুকা-স্তূপ রহিয়াছে, তাহাই এখানে ''চটকপৰ্ব্বত'' নামে সুপ্রসিদ্ধ আছে। এই চটকপৰ্ব্বতে মহাপ্রভু ব্রজমণ্ডলের কৃষ্ণলীলাস্থলী গোবৰ্দ্ধন দর্শন করিতেন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু লিখিয়াছেন,—

'' 'চটকপৰ্ব্বত দেখি' গোবৰ্দ্ধন-ভ্রমে।
(মহাপ্রভু) ধাঞা চলে আর্ত্তনাদ করিয়া ক্রন্দনে।।''

(চৈঃ চঃ মধ্য ২।৯)

নীলাচলে অবস্থান-কালে একদিন মহাপ্রভু সমুদ্রাভিমুখে যাইতে যাইতে দূর হইতে অকস্মাৎ 'চটকপৰ্ব্বত'

দর্শন করিলেন। অমনি গোবর্দ্ধন-শৈলের স্মৃতিতে উদ্দীপ্ত হইয়া শ্রীমদ্ভাগবতের এই শ্লোকটি উচ্চারণ করিতে করিতে চটকপর্ব্বতের দিকে ধাইয়া চলিলেন—

"হন্তায়মদ্রিরবলা হরিদাসবর্য্যো
যদ্ রামকৃষ্ণচরণ-স্পরশ-প্রমোদঃ।
মানং তনোতি সহ-গোগণয়োস্তয়োর্যৎ
পানীয়-সূযবস-কন্দর-কন্দমূলৈঃ।।

(ভাঃ ১০।২১।১৯)

হে সখীগণ, আহা! এই গিরি নিশ্চয়ই হরিদাসগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ; যেহেতু ইনি বলরাম ও কৃষ্ণের চরণ-স্পর্শানন্দে উৎফুল্ল হইয়া তৃণাদির উদ্‌গমের দ্বারা রোমাঞ্চ প্রকাশ করিতেছেন, পানীয় ও কন্দমূলাদি খাদ্যদ্বারা গোপগণের সহিত রামকৃষ্ণের তর্পণ বিধান করিতেছেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন ব্রজমণ্ডলে উপস্থিত হইয়া গোবর্দ্ধন-দর্শন-লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তখনও ঐ শ্লোকটি কীর্ত্তন করিতে করিতে প্রেমাবিষ্ট হইয়াছিলেন (চৈঃ চঃ মধ্য ১৮।৩৩)। নীলাচলে মহাপ্রভু ঐ শ্লোক পাঠ করিতে করিতে সমুদ্রতীরস্থ চটকপর্ব্বতের দিকে বায়ুবেগে ধাবিত হইতে লাগিলেন, প্রভুর নিত্যসেবক ও সঙ্গী গোবিন্দও প্রভুর পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন; কিন্তু মহাপ্রভুর 'লাগ' পাইলেন না। ভক্তগণ প্রমাদ গণিয়া উচ্চরব করিতে লাগিলেন। যিনি যেখানে ছিলেন, সকলেই মহাপ্রভুর পশ্চাতে ধাবিত হইলেন—শ্রীল স্বরূপদামোদর প্রভু, শ্রীল পণ্ডিত জগদানন্দ, শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী, শ্রীরামাই, শ্রীনন্দাই, শ্রীপণ্ডিত শঙ্কর, শ্রীপুরী ও শ্রীভারতী গোস্বামী, আচার্য্য শ্রীভগবান্ খঞ্জ সকলেই সমুদ্রতীরে আসিয়া উপনীত হইলেন।

এদিকে পথে ধাবিত হইতে হইতে মহাপ্রভুর অঙ্গে যুগপৎ অষ্টসাত্ত্বিক বিকারের আবির্ভাব হইল, মূর্চ্ছিত হইয়া মহাপ্রভু ভূমিতে পড়িলেন। গোবিন্দ জল সেচন ও ব্যজন করিয়া প্রভুর চৈতন্য-সম্পাদনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। শ্রীস্বরূপাদি ভক্তগণ ক্রমে সেই স্থানে আসিয়া প্রভুর অবস্থা দর্শনে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। মহাপ্রভুর অঙ্গের অষ্টসাত্ত্বিক বিকার দর্শনে ভক্তগণ পরম বিস্মিত হইলেন। গোবিন্দ জলসেচন ও ভক্তগণ উচ্চ সংকীর্ত্তন করিতে থাকিলে ক্রমশঃ মহাপ্রভু অর্দ্ধবাহ্যদশায় অবতরণ করিয়া শ্রীস্বরূপগোস্বামী প্রভুকে বলিতে লাগিলেন,—

"গোবর্দ্ধন হৈতে মোরে কে ইঁহা আনিল?
পাঞা কৃষ্ণের লীলা দেখিতে না পাইল।।
ইহাঁ হৈতে আজি মুই গেনু গোবর্দ্ধনে।
দেখোঁ,—যদি কৃষ্ণ করেন গোধন-চারণে।।

গোবর্দ্ধনে চড়ি' কৃষ্ণ বাজাইলা বেণু।
গোবর্দ্ধনের চৌদিকে চরে সব ধেনু।।
বেণুনাদ শুনি আইলা রাধা-ঠাকুরাণী।
সব সখীগণ-সঙ্গে করিলা সাজনি।।
রাধা লঞা কৃষ্ণ প্রবেশিলা কন্দরাতে। *
সখীগণ চাহে কেহ ফুল উঠাইতে।।
হেনকালে তুমি-সব কোলাহল কৈলা।
তাঁহা হৈতে ধরি' মোরে ইহাঁ লঞা আইলা।।
কেনে না আনিলে মোরে বৃথা দুঃখ দিতে।
পাঞা কৃষ্ণের লীলা, না পাইনু দেখিতে।।"

(চৈঃ চঃ অন্ত্য ১৫।১০৫-১১১)

"শ্রীচৈতন্যস্তবকল্পবৃক্ষে" শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভু শ্রীগৌরসুন্দরের চটকপর্ব্বত-গমনের কথা বর্ণন করিয়া লিখিয়াছেন,—

সমীপে নীলাদ্রেশ্চটকগিরিরাজস্য কলনা-
দয়ে গোষ্ঠে গোবর্দ্ধনগিরিপতিং লোকিতুমিতঃ।
ব্রজন্নস্মীত্যুক্ত্বা প্রমদ ইব ধাবন্নবধৃতো
গণৈঃ স্বৈর্গৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি।।

(স্তবকল্পবৃক্ষ ৮ম শ্লোক)

তাৎপর্য্য—নীলাদ্রির সমীপে চটকগিরিরাজ দর্শন করিয়া নিজ-গণ-পরিবেষ্টিত যিনি তাঁহাদিগকে বলিয়াছিলেন, "ওহে স্বরূপাদি ভক্তগণ! আমি গোবর্দ্ধনগিরিরাজ দর্শনের জন্য এই স্থান হইতে গমন করি"; ইহা বলিয়া যিনি দিব্যোন্মাদে উন্মত্তের ন্যায় ধাবিত হইয়াছিলেন, সেই শ্রীগৌরসুন্দর আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া আমাকে নন্দিত করিতেছেন।

শ্রীগোবর্দ্ধনের অতিমর্ত্ত্য মহিমা শ্রীস্বরূপরূপানুগবর শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভু তাঁহার "গোবর্দ্ধনাশ্রয়-দশকম্" ও "গোবর্দ্ধন-বাস-প্রার্থনাদশকম্" গ্রন্থে গ্রথিত করিয়াছেন। গোবর্দ্ধন—গোকুলবান্ধব, ব্রজেন্দ্র-নন্দনের বিশ্রাম-স্থান। গোবর্দ্ধন—অসংখ্য তীর্থের আশ্রয়-ক্ষেত্র। ইনি কোটিগঙ্গা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ-

* কন্দরাতে—গুহাতে।

পাদপদ্ম-সম্ভূত শ্যামকুণ্ড এবং শ্রীরাধাকুণ্ডমণিকে বহন করিয়া মহাদেব অপেক্ষাও শ্রীকৃষ্ণের অতিশয় প্রিয় ও ভক্তগণপূজ্য হইয়াছেন। এই গিরিরাজ শৃঙ্গার-রসের সিংহাসন-স্বরূপ। এখানে শ্রীকৃষ্ণ মধুমাসে শ্রীরাধিকার সহিত রাসক্রীড়া করেন। ইহার নিভৃত গুহায় শ্রীরাধিকার সহিত মাধব কন্দর্প-কেলি করেন। ইনি শ্রীরাধা-গোবিন্দের দানক্রীড়ার সাক্ষী-স্বরূপ। গোবর্দ্ধনগিরি শ্রীকৃষ্ণের ভুজ-দণ্ডে ছত্রত্ব লাভ করিয়াছেন অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের নিজ-জনগণের চির-আশ্রয়-দাতা।

গিরিরাজকে সাক্ষাৎ ভগবৎস্বরূপ বা হরিদাসবর্য্য ভাগবতস্বরূপ-বিচারে মহাপ্রভু শ্রীপণ্ডিত জগদানন্দকে গোবর্দ্ধনের উপরে আরোহণ করিয়া গোপাল দর্শন করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন, এমন কি মহাপ্রভু স্বয়ং ভক্তাভিমান করিয়া গোবর্দ্ধনের উপরে আরোহণপূর্ব্বক শ্রীগোপাল-দর্শনে বিরত হইয়াছিলেন (চৈঃ চঃ মধ্য ১৮শ পঃ) শ্রীসনাতন-রূপও গোবর্দ্ধনের উপরে আরোহণ করিয়া গোপাল দর্শন করেন নাই।

শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধের পুত্র—বজ্রের সময় হইতে বিষয়বিগ্রহ শ্রীগোপালদেব ও শ্রীহরিদেব শ্রীগোবর্দ্ধন পর্ব্বতের উপর সেবিত হইতেছিলেন। শ্রীগোপাল শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদকে স্বপ্ন প্রদান করিয়া বলিয়াছিলেন,—

'শ্রীগোপাল' নাম মোর—গোবর্দ্ধনধারী।
বজ্রের স্থাপিত আমি, ইহাঁ অধিকারী।।
শৈল-উপরি হৈতে আমা কুঞ্জে লুকাঞা।
ম্লেচ্ছ-ভয়ে সেবক মোর গেল পলাঞা।।
গ্রামের লোক আনি' আমা কাঢ়' কুঞ্জ হৈতে।
পর্ব্বত-উপরি লঞা রাখ ভাল মতে।।
এক মঠ করি' তাহাঁ করহ স্থাপন।
বহু শীতল জলে কর শ্রীঅঙ্গ মার্জ্জন।।

(চৈঃ চঃ মধ্য ৪র্থ)

শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদ শ্রীগোপালকে পুনরায় গোবর্দ্ধন-গিরিরাজের উপর স্থাপন এবং অন্নকূট মহা-মহোৎসবের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন—এই প্রসঙ্গ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের পাঠকমাত্রেই জানেন। সেই সময় কেবল শ্রীল পুরীপাদ নহেন, বিভিন্ন স্থানের অংসখ্য লোক শ্রীগোপালদেবের দর্শন ও সেবা করিবার জন্য গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের উপর আরোহণ করিয়াছিলেন। ''একজন মহাধনী ক্ষত্রিয়" পর্ব্বতোপরি শ্রীগোপালদেবের শ্রীমন্দির, পাকশালা, ভাণ্ডারগৃহ ও প্রাকারাদি নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন। শ্রীল পুরীপাদ দুইজন ত্যক্তগৃহ গৌড়দেশীয় ব্রাহ্মণকে শিষ্য করিয়া তাঁহাদিগকে গোপালের সেবা সমর্পণ করিয়াছিলেন।

এখানে সাধারণের মনে একটি সমস্যার উদয় হইবার সম্ভাবনা। যে শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীল পুরীপাদের আচরণকে প্রমাণ* বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, তিনিই আবার পুরীপাদের আচার ও আদর্শের বিপরীত কথা প্রচার করিলেন কেন?

যিনি স্বয়ং ব্রজেন্দ্রনন্দন অভিন্ন বিষয়-তত্ত্ব আর যাঁহার অন্তরঙ্গ নিজ-জনগণকে স্বয়ং ব্রজেন্দ্রনন্দন অনুক্ষণ স্কন্ধে ও মস্তকে রাখেন, তাঁহাদের ঐরূপ আদর্শ-প্রকাশের গূঢ় উদ্দেশ্য আছে। কতকগুলি লোক ''গোপালোঽহং'' ''বাসুদেবোঽহং'' প্রভৃতি বিচারে অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা হইয়া মায়াবাদ-অপরাধে পতিত হয়। কেহ কেহ শ্রীজগন্নাথ-দর্শনের (?) আস্পর্দ্ধা প্রদর্শন করিয়া ''মণিকোঠায়'' (শ্রীজগন্নাথের মূল মন্দিরের গৃহ, যেখানে শ্রীজগন্নাথ বিরাজিত) প্রবেশ (?) করে, 'শ্রীজগন্নাথের পদদেশ স্পর্শ করিয়া ফেলিয়াছি' মনে করে, কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেব গরুড়-স্তম্ভের পশ্চাতে থাকিয়া অর্থাৎ অপ্রাকৃত বিষ্ণুপার্ষদবর গরুড়ের অনুগত হইয়া শ্রীজগন্নাথ-দর্শনের আদর্শ প্রকাশ করিয়াছেন।

আমাদের আচার্য্যদেবের আচরণেও দেখিয়াছি, তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরণ অনুসরণ করিয়া স্বয়ং গরুড়-স্তম্ভের পশ্চাতে থাকিয়া শ্রীজগন্নাথ দর্শনের আদর্শ ও শিক্ষা প্রচার করেন এবং মহাপ্রভুর বিচারানুসারে ব্রজমণ্ডলেও গোবর্দ্ধন-পর্ব্বতের প্রতি সেরূপ মর্য্যাদাময় বিচার শিক্ষা দিয়াছেন। শ্রীব্রজমণ্ডলপরিক্রমা ও কএকবৎসর শ্রীব্রজমণ্ডলে কার্ত্তিকব্রত উদ্‌যাপনকালে সকলেই শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেই শিক্ষার অনুসরণ করিয়াছেন।

চটক পৰ্ব্বতে শ্রীপুরুষোত্তম মঠ স্থানান্তরিত হইয়াছেন। তথায় শ্রীশ্রীগৌরগদাধর ও শ্রীশ্রীবিনোদমাধবের শ্রীমন্দির, পাকশালা ও ভাণ্ডার গৃহাদি এবং শ্রীশ্রীগৌরগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের সেবকগণের আবাস-স্থান নির্ম্মিত হইয়াছে। তদুপরি প্রদেশে ''চটককুটীরে'' গত বৎসর শ্রীব্যাসপূজার সময় শ্রীব্যাসদেব, শ্রীমন্ মধ্বাচার্য্য ও আচার্য্যগণের আসন হইয়াছে। তদুপরি প্রদেশে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীরাধারাণীর শ্রীমন্দির-নির্ম্মাণের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন।

যে চটকপৰ্ব্বত-দর্শনে শ্রীমন্মহাপ্রভু গোবর্দ্ধন-বিচার হইত, তথায় মঠ বা আচার্য্যবৃন্দ কিংবা হরিগুরু-বৈষ্ণবগণের আবাসস্থান নির্ম্মিত হওয়া সঙ্গত কি? আমাদের ন্যায় একদেশীয় ভ্রান্তবিচারকগণের হৃদয়ের ঐরূপ সংশয় জানিতে পারিয়াই বোধ হয় অন্তর্য্যামী শ্রীআচার্য্যদেব গত ১৭ই চৈত্র (১৩৪২) প্রাতঃকালে চটকপৰ্ব্বতে শ্রীরাধারাণীর শ্রীমন্দির নির্ম্মাণের পরিকল্পনার প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া বলেন—'শ্রীগোবর্দ্ধন গিরিরাজের সন্নিকট-প্রদেশেই শ্রীরাধাকুণ্ড। সেই কুণ্ডস্মৃতির উদ্দীপনা লাভের জন্যই আমরা এস্থানে আসিয়াছি।

---

* ধর্ম্মস্থাপন-হেতু সাধুর ব্যবহার।
পুরী-গোসাঞির যে আচরণ, সেই ধর্ম্ম সার।। —চৈঃ চঃ মধ্য ১৭।১৮৫

'দীব্যদ্বৃন্দারণ্যকল্পদ্রুমাধঃ
শ্রীমদ্রত্নাগারসিংহাসনস্থৌ।
শ্রীশ্রীরাধা-শ্রীল-গোবিন্দদেবৌ
প্রেষ্ঠালীভিঃ সেব্যমানৌ স্মরামি।।'

প্রেষ্ঠসখীগণের দ্বারা সেবিত শ্রীরাধাগোবিন্দের কীর্ত্তনমুখে স্মরণই আমাদের অষ্টকালীয় কৃত্য। 'আমার ভক্তের পূজা আমা হইতে বড়'। বিষয়-বিগ্রহের মন্দির হইতেও আশ্রয়বিগ্রহগণের মন্দির অত্যুন্নত প্রদেশে বিরাজিত হওয়া আবশ্যক। চটকপর্ব্বতের কিঞ্চিৎ নিম্নপ্রদেশে শ্রীগৌর-গদাধরের শ্রীমন্দির, তদুপরি প্রদেশে শ্রীব্যাস ও শ্রীমধ্বাচার্য্যাদি আশ্রয়বিগ্রহ আচার্য্যাদির স্থান। তত্ত্ববাদিসম্প্রদায়ে শ্রীব্যাস বিষয়বিগ্রহরূপে বিচারিত হইলেও ব্রহ্মমাধ্ব-গৌড়ীয়গণ তাঁহাকে আশ্রয়বিগ্রহরূপেই সিদ্ধান্ত করেন। **মূল আশ্রয়বিগ্রহ শ্রীরাধারাণীর শ্রীমন্দির চটকপর্ব্বতের সর্ব্বোন্নতপ্রদেশে নির্ম্মিত হইবে।** তথায় শ্রীবার্ষভানবী নিজগণের সহিত অবস্থান করেন। **শ্রীগোবিন্দদেব** সগণ-বৃষভানুজার সঙ্গলোভে **সেস্থানে না আসিয়া থাকিতে পারিবেন না।** বৃষভানুজার সেবা করিবার জন্য তাঁহার নিজগণও তাঁহারই সঙ্গে সেই উন্নত প্রদেশে থাকেন। বিশ্রম্ভ-সেবা করিবার জন্য সেবক সেব্যের ঘাড়েও চড়িতে পারেন। অপ্রাকৃত সেবকের কোনও প্রকার ব্যক্তিগত ইন্দ্রিয়-তর্পণ-চেষ্টা না থাকায়, তাঁহার সকল চেষ্টাই কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণে পর্য্যবসিত।

'গোবিন্দ কহে আমার সেবা সে নিয়ম।
অপরাধ হউক, কিংবা নরকে গমন।।
সেবা লাগি' কোটি অপরাধ নাহি গণি।
স্ব-নিমিত্ত অপরাধাভাসে ভয় মানি।।"

(চৈঃ চঃ অন্ত্য ১০।৯৫-৯৬)

সাগর-সমীরণ উপভোগ বা কোনও না কোনপ্রকার আত্মেন্দ্রিয়তর্পণ বা জৈনধর্ম্মাবলম্বিগণের বিচার অনুসরণ করিবার জন্য পর্ব্বতে আরোহণ করিলে আত্মমঙ্গল হয় না। সুবর্ণবিহারে রাধাগোবিন্দ-মিলিততনু রুক্মবর্ণ গৌরহরি বসিয়াছেন।

বিপ্রলম্ভবিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দরের চটকপর্ব্বতের সন্নিহিতপ্রদেশে আসিলেই শ্রীরাধাকুণ্ডের বিচার উদিত হইত; আর সমুদ্রোপকূলের দিকে গমন করিলে যামুনবিচার উপস্থিত হইত। চটকপর্ব্বতে শ্রীরাধার সখী-মঞ্জরীগণের অবস্থান। এখানে আমরা মাধ্যাহ্নিক লীলাক্ষেত্রের স্মৃতিতে উদ্দীপনা লাভের জন্য আসিয়াছি। **আচার্য্যদাসাভিমানে আচার্য্যগণের সেবা করিবার জন্য আমরা উপরে উঠিয়াছি।**

শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—

হরিদয়িতমপূর্ব্বং রাধিকাকুণ্ডমাত্ম-
প্রিয়সখমিহ কণ্ঠে নর্ম্মণালিঙ্গ্য গুপ্তঃ।
নবযুবযুগ খেলাস্তত্র পশ্যত্রহো মে
নিজ-নিকট-নিবাসং দেহি গোবর্দ্ধন ত্বম্।।

(গোবর্দ্ধনবাসপ্রার্থনাদশকম্—৫ম শ্লোক)

হে গোবর্দ্ধন, তুমি শ্রীকৃষ্ণের প্রেষ্ঠ অপূর্ব্ব নিজপ্রিয়সখা রাধাকুণ্ডকে প্রেমভরে স্বীয় কণ্ঠে (সানুদেশে) আলিঙ্গনপূর্ব্বক গুপ্তভাবে বর্ত্তমান আছো। সেই কুণ্ডতটে গোপনে নবযুবযুগলের অপ্রাকৃত ক্রীড়া দেখিতে থাকিব, সেই আমাকে দয়া করিয়া তোমার নিজ নিকটে (কুণ্ডতটে) নিত্য-বাস দান কর।

ব্রজলীলার সত্যভামা, ঐশ্বর্য্যভাব-মিশ্রিত ভক্ত শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিতকে শ্রীগৌরসুন্দর বলিয়াছিলেন,—

শীঘ্র আসিহ, তাঁহা * না রহিহ চিরকাল।
গোবর্দ্ধনে না চড়িহ দেখিতে গোপাল।।

(চৈঃ চঃ অন্ত্য ১৩।৩৯)

এ স্থানে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিয়াছেন,—'যাঁহারা রাগমার্গ প্রাপ্ত হন নাই, তাঁহাদের ব্রজে বাস করা উচিত নয়, ব্রজদর্শনপূর্ব্বক শীঘ্র চলিয়া আসাই ভাল।' অথচ গৌর-রামানন্দ-সংবাদে দেখা যায়—

সর্ব্বত্যজি' জীবের কর্ত্তব্য কাঁহা বাস?
শ্রীবৃন্দাবনভূমি—যাঁহা নিত্য-লীলারাস।।

(চৈঃ চঃ মধ্য ৮।২৫৪)

জীবের নিত্য-সেব্য-বাসস্থান শ্রীধাম-বৃন্দাবনে (ভৌম-বৃন্দাবনে) অধিক দিন বাস না করাই কি মহাপ্রভুর অভিপ্রেত? তাহা হইলে শ্রীরূপ-সনাতনাদি গোস্বামিবৃন্দ মহাপ্রভুর আদেশেই শ্রীবৃন্দাবনে বাস-লীলা প্রকাশ করিলেন কেন?

শ্রীগোবর্দ্ধন-গিরিরাজ—সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন, আর শ্রীরাধাকুণ্ড—শ্রীমতী বার্ষভানবী। রাগমার্গীয় সখী ও মঞ্জরীগণ শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনের উপরে আরোহণ করিয়াও কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তর্পণময়ী সেবা করেন। কিন্তু মর্য্যাদা-ভাবমিশ্র সত্যভামা শ্রীকৃষ্ণকে উল্লঙ্ঘন করিতে সঙ্কোচ বোধ করেন। তাঁহার সম্ভ্রমবিচার প্রবল।

'রাধার কৃষ্ণের' উপাসনাই অনুকূল কৃষ্ণানুশীলন। পাঁচমিশালী ভক্তগণের জন্য কমলনয়ন শ্রীজগন্নাথ রত্নাকরতটে বিরাজিত আছেন। তিনি গৌড়ীয়-ভক্তগণের দর্শনে সম্বন্ধাধিদেবতা শ্যামসুন্দর মদনমোহন।

---

* শ্রীধাম বৃন্দাবনে।

এখনও তিনি মদনমোহন-বিজয়-বিগ্রহরূপে চন্দন যাত্রাদিতে গমন করিয়া থাকেন। আর এদিকে শ্রীল পণ্ডিত গদাধরের সেবিত প্রয়োজনাধিদেবতা শ্রীগোপীনাথ। চটকপর্ব্বতে শ্রীরাধারাণীর শ্রীমন্দিরে 'রাধার হরি' শ্রীরূপের প্রাণধন অভিধেয়দেবতা গোবিন্দ আসিবেন। শ্রীরাধার কিঙ্করীগণ রাধার কৈঙ্কর্য্যের জন্য—শ্রীরাধা-গোবিন্দের মিলন-সুখ-বিধানের জন্য তৎসঙ্গেই অবস্থান করেন। শ্রীকুণ্ডতটে শ্রীরাধার বিভিন্ন সখীগণের কুঞ্জ বর্ত্তমান, এখানেও রাধাসখীগণের কুঞ্জ আছে।

ভক্তাভিমান বা ভজনকারীর অভিমান আর আচার্য্যাভিমান বা আচার্য্যদাসাভিমানর মধ্যে কিছু বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য আছে। ভজনকারীর অভিমানে 'আমি দয়ার প্রার্থী' এইরূপ বিচার আর আচার্য্যাভিমানে 'আমি জীবে দয়া করিয়া ভগবানের প্রীতিবিধান করিব'—এই বিচার প্রবল। যদিও উভয়-বিচারই কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণ-তাৎপর্য্যপর, তথাপি একটি মাধুর্য্য ও অপরটি ঔদার্য্যভাব-প্রধান। শ্রীমন্মহাপ্রভু বা শ্রীরূপ-সনাতনাদি বিষয়-বিগ্রহ ও আশ্রয়বর্গ ভক্তাভিমান করিয়া গোবর্দ্ধনে আরোহণ করেন নাই। শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদ আচার্য্যাভিমানে গোপালদেবের আদেশে তাঁহার সেবার জন্য গোবর্দ্ধনে আরোহণ করিয়াছেন। **চটকপর্ব্বতে** আচার্য্যগণের আসন হইয়াছে। **তাঁহাদের সেবকাভিমানে তথায় আচার্য্য ও আচার্য্যসেবকগণ আরোহণ করেন।**"

অপরাধী

আধুনিক চিজ্জড়-সমন্বয়-বাদের আখড়া হইতে বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রতি একটি অনধিকারচর্চ্চামূলক মূর্খতাব্যঞ্জক কটাক্ষপাত হইয়াছিল। তাঁহারা বৈষ্ণবধর্ম্মকে দোষারোপ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, খৃষ্টধর্ম্মে যেমন পাপের "শুচিবাই" আছে, তেমন বৈষ্ণবধর্ম্মেও প্রতি পদবিক্ষেপে অপরাধের আতঙ্ক দেখিতে পাওয়া যায়। বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রত্যেক কথায় কথায় অপরাধের ভয়! ঠাকুরের সেবা করিতে যাইবে, পান হইতে চূণ নড়িলেই সেখানেও অপরাধ—সেবাপরাধ, নামাপরাধ, ধামাপরাধ—কত কি অপরাধ!

চিজ্জড় সমন্বয়বাদীর ঐ উদারতার উক্তিতে যথেচ্ছাচারিতাই ধর্ম্ম বলিয়া সমাদৃত হইতেছে। অপরাধ ও পাপের বাস্তব অস্তিত্বকে অন্ততঃ মুখে ডিনামাইট দিয়া উড়াইয়া না দিলে যথেচ্ছাচারিতার ধর্ম্ম অবাধগতিতে চলিতে পারে না। যাহাদের মতে মুড়ি ও মিশ্রি, সাধু ও অসাধু, সত্য ও মিথ্যা, বিষ্ঠা ও চন্দন উভয়ই এক, তাহাদের মুখে ঐরূপ বিচার কিছু অযৌক্তিক নহে। কোন কোন ধর্ম্ম-সম্প্রদায় গোমাংস-ভক্ষণকে 'ধর্ম্ম' বলিয়া থাকেন। চিজ্জড়-সমন্বয়বাদী 'সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয়' করিতে গিয়া উভয়কেই সমান আসনে স্থাপন করেন, অর্থাৎ গো-খাদক ও তাহা হইতে নিবৃত্ত ব্যক্তিগণ উভয়েই তাঁহাদের মতে বিভিন্ন পথে ধর্ম্মই যাজন করিতেছেন, কাজেই তাঁহাদের বিচারে সে ক্ষেত্রে পাপ বলিয়াও কিছুই নাই। এই সকল চিন্তাস্রোত পরিবর্দ্ধিত হওয়ায় আধুনিক নারী-প্রগতির দিনে কেহ কেহ প্রকাশ করিয়াছেন যে, 'স্ত্রী-জাতি কোন একটি বিশেষ

পুরুষে আবদ্ধ হইয়া না থাকিলে তাহার অধর্ম্ম হইবে, এরূপ গোঁড়ামির ধর্ম্ম আমরা স্বীকার করিব না,— ইহা সেকেলে কুসংস্কার ও গোঁড়ামি-মাত্র। ধর্ম্ম হইবে সার্ব্বজনীন ও উদার, অর্থাৎ যথেচ্ছাচারিতা।

পাশ্চাত্ত্য দেশের কোন কোন সান্ধ্য-ভ্রমণের ময়দানে বা পার্কে নারী-প্রগতির ঐরূপ উদার আদর্শ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাচ্য-চক্ষু ঐরূপ পরপুরুষ ও পররমণীয় প্রকাশ্য মিলনকে অধর্ম্মের চক্ষে দেখিতে সেখানকার উদারধর্ম্মমন্ত্রে দীক্ষিত ব্যক্তিগণ বলিয়া থাকেন, উহা 'স্বর্গীয়প্রেম'!

যাহা হউক, ঐরূপ উদার ধার্ম্মিকগণ পাপ ও অপরাধ, স্বর্গ ও বৈকুণ্ঠ, এই উভয়ের পার্থক্য উপলব্ধি করিতে না পারায় সাত্বত-ধর্ম্মবিদ্‌গণের ভাণ্ডারে সাত্বতধর্ম্মের গুহ্য সম্পূট সংরক্ষিত রহিয়াছে। বৈষ্ণবধর্ম্মে কোন পাপের আবাহন নাই। পাপ ও পুণ্যের অতীত না হইলে বৈষ্ণবধর্ম্মে সুষ্ঠু দীক্ষালাভ হয় না। ভগবদ্ভক্ত স্বভাবতঃই নিষ্পাপ ও পরম পবিত্র। পাপ ও পুণ্যের সহিত প্রকৃতির সম্বন্ধ আছে, কিন্তু প্রকৃত বৈষ্ণব অপ্রাকৃত। স্বর্গ—প্রাকৃত ভোগময় নশ্বর স্থান; আর বৈকুণ্ঠ—অপ্রাকৃত হরিসেবাময় অবিনশ্বর ধাম। অপর-ধর্ম্মের পাপবিচার ও শুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্মের হরিসেবার প্রতিবন্ধক দূরীকরণাভিলাযে 'অপরাধ' বা অনর্থবিচার সম্পূর্ণ পৃথক্।

পাপ হইতে অপরাধ স্বতন্ত্র বস্তু, অপরাধ জিনিষটি আত্মধর্ম্মযাজনে অনর্থ বা বাধা; কাজেই সাধনাবস্থায় যাঁহারা অপরাধকে গায়ের জোরে উড়াইয়া দিতে চাহেন, তাঁহাদের যথেচ্ছাচারিতা ভুবনমোহিনী মায়ারাণীরই চেড়ী মাত্র। সম্ভোগবাদী বা কৃষ্ণাপরাধী মায়াবাদী বস্তুতঃ অমার্জ্জনীয় অপরাধে অপরাধী হইয়াও আপনাকে "অপরাধী" ধারণা করিতে পারে না। কিন্তু বিপ্রলম্ভভজনবিজ্ঞগণ সর্ব্ব অপরাধ হইতে নিত্যসিদ্ধভাবে চিরবিমুক্ত হইয়াও দৈন্যভরে আপনাদিগকে "অপরাধী" জ্ঞান করেন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভুর "জগাই মাধাই হৈতে মুঞি সে পাপিষ্ঠ" প্রভৃতি উক্তিই ইহার প্রমাণ।

আমার নিত্য অর্থ বা প্রয়োজন যে কৃষ্ণসেবাসুখতাৎপর্য্যরূপ ভগবৎপ্রেম, সেই প্রেমের পথে যে সকল অর্গল, যবনিকা বা প্রতিবন্ধক আমি চেতনজীবসূত্রে স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার করিয়া নিজেই আনয়ন করিয়াছি, তাহাই আমার অপরাধ। আমি অপরাধী—ভোগী ও ত্যাগী সাজিয়া আমি অপরাধী হইয়াছি। অপকট সেবক হইতে পারিলে আর সেই অপরাধ বা প্রতিবন্ধক নাই।

কর্ম্মমার্গের লোক নিত্য পঞ্চসূনা পাপ করিয়া থাকে, কিন্তু আমি ভক্তিমার্গ-প্রবেশের ছলনা করায় পাঁচ প্রকার অপরাধ করিতেছি। কৃষ্ণের গরু, কৃষ্ণের ভোগের বাতাস, জল, ফল বা পঞ্চভূত এগুলিকে কৃষ্ণের সেবায় নিযুক্ত না করিয়া মাঝপথে আমি আমার নিজের ভোগের জন্য আটক করিয়াছি। কৃষ্ণের গরুর দুধ পান করিয়া—কৃষ্ণের ভোগ্য আকাশ, বাতাস, আলোক উপভোগ করিয়া আমি কৃষ্ণসেবা-বিমুখ জীবন নির্ব্বাহে কোমর বাঁধিয়া লাগিয়াছি, সুতরাং আমি কৃষ্ণের শান্তরসের সেবক গো-বেত্রাদির নিকট অপরাধী।

সকলেই স্বরূপতঃ কৃষ্ণের নিত্য দাস, দেবদেবীগণও স্বরূপতঃ কৃষ্ণের নিত্য ভৃত্য, কিন্তু আমি কৃষ্ণের সেবকসম্প্রদায়কে নিজের বহির্ম্মুখ দাস্যে নিযুক্ত করিয়াছি। ভগবানের গৃহের ভৃত্য আমার পদপ্রক্ষালনের

জল যোগাইতেছে, আমি তাহাদিগের নিকট হইতে নানাভাবে পরিচর্য্যা আদায় করিতেছি, দেবদেবীগণকে দিয়া আমার বহির্ম্মুখ সংসারের সুখ-সুবিধার নফরগিরি করাইয়া লইতেছি, সুতরাং আমি রক্তক, পত্রক, চিত্রকাদির চরণে অপরাধী।

কতকগুলি লোককে আমার সখা বা বয়স্য সাজাইয়া লইয়াছি। প্রহ্লাদের আদর্শের আনুগত্যে বয়স্যগণকে হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তন-সেবার সুযোগ দানের পরিবর্ত্তে তাহাদিগের সহিত গ্রাম্য-রহস্যে দিন কাটাইতেছি। তাহারা আমার ইন্দ্রিয়-যজ্ঞের ইন্ধন যোগাইতেছে, আমি কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণ-যজ্ঞ ভুলিয়া গিয়াছি, কাজেই আমি শ্রীদাম, সুদামাদির চরণে অপরাধী।

কোন মাতা বা পিতার সন্তানরূপে পৃথিবীতে আসিয়া তাঁহাদের নিকট হইতে আমার বহির্ম্মুখ জীবন-যাপনের উপযোগী স্তন্য ও দ্রবীণ অনুক্ষণ দোহন করিতেছি, নিজে কৃষ্ণসেবায় সমর্পিতাত্মা হইতে পারি নাই বলিয়া তাঁহাদিগকেও কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত করিতে পশ্চাৎপদ হইতেছি। নিজের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি পোষণের জন্য তাঁহাদেরও অন্যাভিলাষকে পোষণ করিতেছি, সুতরাং আমি শ্রীযশোদা ও শ্রীনন্দের চরণে অপরাধী।

আমি গৃহস্থ সাজিবার ইচ্ছায় বৈধপত্নী গ্রহণ করিয়াছি, মনে করিতেছি যে, আমি যখন অবৈধ ইন্দ্রিয়-চালনায় রত নহি, তখন আমার কোন অসুবিধা নাই, আমি পুণ্যবান্; কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতের কথা ভুলিয়া গিয়াছি, —হরিসেবার অন্যমনস্ক ব্যক্তির নিকট বৈধপত্নীরূপিণী মায়া শুশ্রূষাদি ছলে ধীরে ধীরে স্কন্ধে আরোহণ করিয়া পুরুষাভিমানীর পাতিত্য সঙ্ঘটন করায়; যেমন পথিক পথে তৃণাচ্ছাদিত কূপের অস্তিত্ব জানিতে না পারিয়া সুকোমল নবদুর্ব্বাদল-শোভিত তৃণের উপর পদসংস্পর্শলালসায় চলিবার সময় অকস্মাৎ অজ্ঞাতসারে অন্ধকূপে পতিত হইয়া যায়, হরিসেবায় অন্যমনস্ক আমারও সেই অবস্থাই হইয়াছে। আমি বৈধপত্নীর পুণ্যময় সহবাস ও শুশ্রূষা গ্রহণ করিতে গিয়া একপত্নীব্রতধর ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের চরণে অপরাধী হইয়াছি। আবার পরোঢ়া ও অনূঢ়া কামিনীগণের দর্শনে যখন আমার চিত্ত সম্ভোগরসের প্লাবনে উদ্বেলিত হয়, তখন আমি অদ্বিতীয়—গোপবধূ-লম্পট শ্রীকৃষ্ণের চরণে অপরাধ করিয়া বসি। ভুলিয়া যাই আমার স্বরূপ, ভুলিয়া যাই আমার নিত্যধর্ম্ম, আর ভুলিয়া যাই আমার নিত্য-সেব্য বস্তুর কথা। একচেটিয়া যাঁহার জন্য সমস্ত ইন্দ্রিয়তর্পণ—যিনি অপ্রাকৃত সম্ভোগরসের অদ্বিতীয় বিগ্রহ, আমি তাঁহার সম্ভোগযজ্ঞের একটি ইন্ধন মাত্র, আমি ত' সম্ভোগী নহি।

শ্রীগুরুপাদপদ্মের বীর্য্যবতী বাণী সেবোন্মুখচিত্তে ধারণ না করিলেই বলদেবের বলকে হারাইয়া ফেলি; তখন নানাভাবে অপরাধী হইয়া বসি, তখনই সেবকাভিমানের পরিবর্ত্তে সেব্যাভিমান আমাকে অজ্ঞান করিয়া ফেলে। প্রত্যেক বস্তু ও প্রত্যেক জীব যখন আমাকে সেবা করিবার প্রলোভন দেখায়, তখন যদি আমি তাঁহাদিগের সেই বৃত্তিকে শ্রীগোবিন্দের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আরাধিকা শ্রীমতীর কৃপাবৃত্তিরূপে দর্শন করিয়া তৎপ্রতি আমার নমস্কার বিধান না করি, অর্থাৎ আমাকে হরিকীর্ত্তনময়ী ভগবৎসেবায় নিযুক্ত করিয়া সকলকে হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনের সহায়করূপে বরণ না করি, তাহা হইলে আমার অমঙ্গল ও পতন অবশ্যম্ভাবী। যাঁহারা আমার

প্রতি সেবার প্রলোভন দেখান, তাঁহারা বস্তুতঃ আমার ন্যায় পশুপ্রকৃতিকে কষাঘাত করিয়া—আমার চক্ষে অঙ্গুলী প্রদান করিয়া আমার অনর্থগুলিকে দেখাইয়া দিতেছেন। তাঁহারা এই শিক্ষাই দিতেছেন,—"পঞ্চ-প্রকারে কৃষ্ণের চরণে অপরাধী হইও না, তুমি স্বরূপতঃ হরি-গুরু-বৈষ্ণবের নিত্যদাস, তোমার স্বরূপের সেবাব্রত গ্রহণ কর।"

শ্রীগুরুপাদপদ্মে আমি অকপটে কবে নিবেদন করিতে পারিব? —

মত্তুল্যো নাস্তি পাপাত্মা নাপরাধী চ কশ্চন।
পরিহারেঽপি লজ্জা মে কিং ব্রুবে পুরুষোত্তম।।
ভূমৌ স্খলিতপাদানাং ভূমিরেবাবলম্বনম্।
ত্বয়ি জাতাপরাধানাং ত্বমেব শরণং প্রভো।।

নরক

অনেকেই প্রশ্ন করিয়া থাকেন যে, "নরক" বা "স্বর্গ" নামক কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান বা দেশ-বিদেশের অস্তিত্ব আছে কি না, অথবা পৃথিবীতে যে সকল যাতনা এবং সুখৈশ্বর্য্য-ভোগের আদর্শ দেখিতে পাওয়া যায়, ঐগুলিই নরক ও স্বর্গ?

আধুনিক জড়বৈজ্ঞানিক উন্নতির যুগে অনেকে নরক ও স্বর্গকে ধর্ম্মভীরু লোকের প্রতি "সেকেলে" শাস্ত্রকারগণের প্রদর্শিত "জুজুর ভয়" বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। কেহ কেহ বা মনে করেন, বিংশ শতাব্দীতে নরক বা স্বর্গের গল্পগুলি অচল মুদ্রা মাত্র। আধুনিক যুগেই যে কেবল এই জাতীয় চিত্তবৃত্তি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা নহে; পূর্ব্বযুগের চার্ব্বাকাদি দার্শনিকগণও 'নরক' ও 'স্বর্গে'র অস্তিত্বের বিরুদ্ধে প্রবল বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছেন। নরকের অস্তিত্বকে ধামাচাপা না দিলে যথেচ্ছ ও অপ্রতিহত ভোগ ও নানাপ্রকার লাম্পট্যে কোমর বাঁধিয়া নামা যায় না। দস্যুতস্কর বা ব্যভিচারী ব্যক্তিগণ রাজার বিচারলয় বা রাজদণ্ডসমূহকে যে ধরাপৃষ্ঠ হইতে বিলুপ্ত করিবার ইচ্ছা করিবে, ইহাতে যুক্তিবিরুদ্ধও কিছুই নাই। বদ্ধমানবের নির্জীব বিবেক পাপের প্রতি সময় যে অতি ক্ষীণ যুযুৎসা প্রকাশ করে, সেই বিবেক-বুদ্ধিটুকুকে নির্য্যাতিত ও সম্পূর্ণ চলচ্ছক্তি-রহিত দিতে হইলে নরকের অস্তিত্ব অস্বীকার ব্যতীত গত্যন্তর নাই। শাস্ত্র নরকাদির ভয় দেখাইয়া অত্যন্ত ভগবদ্বহির্ম্মুখ ও পাপকার্য্যে রুচিবিশিষ্ট ভোগী ব্যক্তিগণকে যে শাসন করিয়াছেন, সেই শাসন অমান্য করিতে হইলে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের সুযোগ লইয়া নরকাদির অস্তিত্ব অস্বীকার করাই ভোগী শাস্ত্রবিদ্রোহীগণের একমাত্র অস্ত্র। নাস্তিকতা ও জগতের প্রত্যক্ষ জ্ঞানের প্রতি আস্থা এবং ভোগপিপাসার উদ্দামপ্রবৃতি যতই প্রবল হইবে, ততই ঐ সামান্য শাস্ত্র-শাসনটুকুর প্রতিও মানুষ বিদ্রোহী হইয়া উঠিবে অর্থাৎ নরকাদির অস্তিত্বকে অস্বীকার করিবে।

মহারাজ পরীক্ষিত জিজ্ঞাসা করিলেন,—"হে ভগবন্, নরকসকল এই পৃথিবীর কোন স্থান-বিশেষে, অথবা ত্রিলোকের বহির্ভাগে কিম্বা অন্তরালে অবস্থিত? তদুত্তরে শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন,—

"শ্রীঋষিরুবাচ—অন্তরাল এব ত্রিজগত্যাস্তু দিশি দক্ষিণস্যামধস্তাদ্ ভূমেরুপরিষ্টাচ্চ জলাদ্ যদ্যামগ্নিষ্বাত্তাদয়ঃ পিতৃগণা দিশি স্বানাং গোত্রাণাং পরমেণ সমাধিনা সত্যা এবাশিষ আশাসানা নিবসন্তি। যত্র হ বাব ভগবান্ পিতৃরাজো বৈবস্বতঃ স্ববিষয়ং প্রাপিতেষু স্বপুরুষৈর্জন্তুষু পরেতেষু যথা-কর্ম্মাবদ্যং দোষমেবানুল্লঙ্ঘিত-ভগবচ্ছাসনঃ সগণো দমং ধারয়তি।" (ভাঃ ৫।২৬।৫-৬)

শ্রীঋষি (শুকদেব) কহিলেন,—নরকসমূহ—ত্রিলোকীর অন্তরালে অবস্থিত। দক্ষিণদিকে ভূতলের অধোভাগে এবং জলের উপরিভাগে নরকসমূহের অবস্থান। ঐদিকে অগ্নিষ্বাত্তা প্রভৃতি পিতৃগণ পরম সমাধি-যোগে ভগবানের ধ্যান এবং স্ব-স্ব-গোত্রোদ্ভব ব্যক্তিগণের মঙ্গল কামনা করিয়া বাস করিতেছেন।

ঐস্থানে পিতৃরাজ ঐশ্বর্য্যশালী রবিপুত্র যম সপার্ষদে পরমেশ্বরের আজ্ঞা উল্লঙ্ঘন না করিয়া মৃত্যুর পর (তাঁহার দূতগণের দ্বারা) তাঁহার অধিকার-মধ্যে আনীত প্রাণিগণের স্ব-স্ব-কর্ম্মানুসারে দোষাদোষের বিচার-পূর্ব্বক দণ্ড প্রদান করিতেছেন।

বিভিন্ন নরকের বিভিন্ন সংস্থান ও তাহাদের নাম ও সেই সকল নরকে পাপিব্যক্তিকে যে যে যাতনা প্রদান করা হয়, শ্রীমদ্ভাগবতে তাহারও বিস্তারিত বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায় ঃ—

'তত্র হৈকে নরকানেকবিংশতিং গণয়ন্তি। অথ তাংস্তে রাজন্ নামরূপলক্ষণতোঽনুক্রমিষ্যামঃ। তামিস্রোঽন্ধতামিস্রো রৌরবো মহারৌরবঃ কুম্ভীপাকঃ কালসূত্রমসিপত্রবনং শূকরমুখমন্ধকূপঃ কৃমিভোজনঃ সন্দংশস্তপ্তশূর্ম্মির্বজ্রকণ্টকশাল্মলী বৈতরণী পূয়োদঃ প্রাণরোধো বিশসনং লালাভক্ষঃ সারমেয়াদনমবীচিরয়ঃ-পানমিতি। কিঞ্চ ক্ষারকর্দ্দমো রক্ষোগণভোজনঃ শূলপ্রোতো দন্দশূকোঽবটনিরোধনঃ পর্য্যাবর্ত্তনঃ সূচিমুখ-মিত্যষ্টাবিংশতির্নরকা বিবিধযাতনাভূময়ঃ।" (ভাঃ ৫।২৬।৭)

সেই-স্থানে কেহ কেহ নরকের সংখ্যা একবিংশতি বলিয়া বর্ণন করিয়া থাকেন। হে মহারাজ, আমি নাম, রূপ ও লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়া আপনার নিকট সেই সকল নরকের কথা বর্ণন করিতেছে, শ্রবণ করুন;—'তামিস্র', 'অন্ধতামিস্র', 'রৌরব', 'মহারৌরব', 'কুম্ভীপাক', 'কালসূত্র', 'অসিপত্রবন', 'শূকরমূখ', 'অন্ধকূপ'., 'কৃমিভোজন', 'সন্দংশ', 'তপ্তশূর্ম্মি', 'বজ্রকণ্টকশাল্মলী', 'বৈতরণী', 'পূয়োদ', 'প্রাণরোধ', 'বিশসন', 'লালাভক্ষ', 'সারমেয়াদন' 'অবীচি' ও 'অয়ঃপান',—এই একবিংশতি নরক। এতদ্ভিন্ন 'ক্ষারকর্দ্দম', 'রক্ষোগণভোজন', 'শূলপ্রোত', 'দন্দশূক', 'অবটনিরোধন', 'পর্য্যাবর্ত্তন' এবং 'সূচিমুখ' নামে আরও সাতটি নরক আছে। সর্ব্বসাকুল্যে এই অষ্টাবিংশতি নরক—নানাবিধ যন্ত্রণার স্থান।

শ্রীমদ্ভাগবতের ৩য় স্কন্ধে (৩।৩০।২৯) শ্রীকপিলদেব দেবহূতিকে জানাইয়াছেন,—

অত্রৈব নরকঃ স্বর্গ ইতি মাতঃ প্রচক্ষ্যতে।
যা য়াতনা বৈ নারক্যস্তা ইহাপ্যুপলক্ষিতাঃ।।

হে মাতঃ, এই স্থানেই নরক, এই স্থানেই স্বর্গ—

তত্ত্ববিদ্‌গণ ইহাই কহিয়া থাকেন। নরকে যে সকল যাতনা ভোগ করিতে হয়, তাহা এইজগতেও দেখিতে পাওয়া যায়।

উপরি-উক্ত বাক্যের দ্বারা কপিলদেব জানাইয়াছেন যে, নরক ও স্বর্গের যেরূপ নির্দ্দিষ্ট লোক বা স্থান আছে, তদ্রূপ এই পৃথিবীতেও নানা যাতনা ও ভোগসুখের মধ্যে সেইসকল নরক ও স্বর্গলোকের ক্লেশাদির চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ বা মাতৃকুক্ষিতেই নানা ক্লেশে ক্লিষ্ট হইয়া মৃত্যুগ্রস্ত হয়, কেহ বা মাতৃগর্ভ হইতে নিষ্ক্রমণকালে অসহ্য ক্লেশ ভোগ করিয়া আজন্ম উপদংশ, গলিতকুষ্ঠ বা নানা ক্লেশকর ব্যাধিতে পীড়িত হয়, কেহ বা জ্ঞান লাভ করিয়া মানসিক তাপে চিরকাল তপ্ত থাকে, কেহ বা অত্যন্ত দরিদ্রের ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়া খাদ্যাদির অভাবে শিশুকালেই ক্লেশ পাইতে থাকে, কেহ বা পেগু ও কোয়েটার ভূমিকম্পে, কেহ বা হিংস্রজন্তুর মুখ-বিবরে, কেহ বা জলপ্লাবনে, দুর্ভিক্ষে, মহামারীতে, এরোপ্লেন ও ট্রেন, মোটরযানাদির সংঘর্ষে নানা প্রকারে ক্লিষ্ট হইয়া থাকে।

কর্ম্মফলবাধ্যজীব মাতৃকুক্ষিতেই নরক ভোগ করে। মাতৃগর্ভে কিরূপে নরক-ক্লেশ ভোগ হয়, তৎসম্বন্ধে দেবহূতিনন্দন কপিল দেবহূতিকে এবং শচীনন্দন গৌরহরি শচীমাতাকে যে সকল কথা বলিয়াছিলেন, তাহা শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীচৈতন্যভাগবত (ম ১।২০৩-২৪০) বর্ণিত আছে;—

মাতুর্জগ্ধান্নপানাদ্যৈরেধদ্ধাতুরসম্মতে।
শেতে বিণ্মূত্রয়োর্গর্ত্তে স জন্তুর্জন্তুসম্ভবে।।
কৃমিভিঃ ক্ষতসর্ব্বাঙ্গঃ সৌকুমার্য্যাৎ প্রতিক্ষণম্।
মূর্চ্ছামাপ্নোত্যুরুক্লেশস্তত্রত্যৈঃ ক্ষুধিতৈর্মুহুঃ।।
কটুতীক্ষ্ণোষ্ণলবণ-ক্ষারাম্লাদিভিরুল্বণৈঃ।
মাতৃভুক্তৈরুপস্পৃষ্টঃ সর্ব্বাঙ্গোত্থিতবেদনঃ।।
উল্বেন সংবৃতস্তস্মিন্নন্ত্রৈশ্চ বহিরাবৃতঃ।
আস্তে কৃত্বা শিরঃ কুক্ষৌ ভুগ্নপৃষ্ঠশিরোধরঃ।।
অকল্যঃ স্বাঙ্গচেষ্টায়াং শকুন্ত ইব পঞ্জরে।।
তত্র লব্ধস্মৃতির্দৈবাৎ কর্ম্ম জন্মশতোদ্ভবম্।
স্মরন্ দীর্ঘমনুচ্ছ্বাসং শর্ম্ম কিং নাম বিন্দতে।।
আরভ্য সপ্তমান্মাসাল্লব্ধবোধোঽপি বেপিতঃ।
নৈকত্রাস্তে সূতিবাতৈর্বিষ্ঠাভূরিব সোদরঃ।।

(ভাঃ ৩।৩১।৫-১০)

সেই জীব মাতৃভুক্ত অন্নপানাদির দ্বারা পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে। সুতরাং তাহার অনভিপ্রেত হইলে তাহাকে প্রাণিগণের উৎপত্তিস্থান মলমূত্রগর্ত্তে শয়ন করিয়া থাকিতে হয়। সেই গর্ত্তমধ্যে তত্রস্থ ক্ষুধার্ত্ত কৃমি-সকল সুকুমার দেহখানি পাইয়া ঐ জীবের সর্ব্বাঙ্গ নিয়ত ক্ষত-বিক্ষত করিতে থাকে; তাহাতে সে নিরতিশয় ক্লেশপ্রাপ্ত হইয়া মুহুর্মুহুঃ মূর্চ্ছিত হইতে থাকে। গর্ভধারিণী দুঃসহ কটু, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, লবণ, রুক্ষ, অম্লাদি যেসকল রস ভক্ষণ করেন, সেই সকলের সহিত গর্ভস্থ জীবের দেহ সংযুক্ত হওয়াতে তাহার সর্ব্বাঙ্গে বেদনা জন্মে। সে ভিতরে জরায়ু-দ্বারা বেষ্টিত এবং বাহিরে নাড়ী-দ্বারা বিশেষরূপে আবদ্ধ হইয়া পৃষ্ঠ ও গ্রীবাদেশ কুঞ্চিত করিয়া কুক্ষিদেশে মস্তক স্থাপনপূর্ব্বক অবস্থান করে। সুতরাং পিঞ্জরস্থ পক্ষীর ন্যায় স্বীয় অঙ্গ সঞ্চালন করিতে অসমর্থ হইয়া সেই গর্ভ-মধ্যেই বাস করিয়া থাকে। ঐ গর্ভ মধ্যে ঐ জীবের দৈবক্রমে পূর্ব্ব পূর্ব্ব কৃতকর্ম্মের স্মৃতি উদিত হয়। তখন ঐ জীব শত শত জন্মের পাপকর্ম্মসমূহ স্মরণ করিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতে থাকে। এইরূপে জীব যখন সপ্তমমাসে পদার্পণ করে, তখন তাহার জ্ঞানোদয় হয়। কিন্তু প্রসব-কারণ বায়ুদ্বারা পরিচালিত হইয়া সমানোদর-জন্মা বিষ্ঠাজাত কৃমির ন্যায় একস্থানে স্থির হইয়া অবস্থিত হয় না।

জন্মের পূর্ব্বে বদ্ধজীবের মাতৃগর্ভে অবস্থানকালে যেরূপ নরক ভোগ করিতে হয়, হরিসেবাবিহীন ও জড়বিষয়ে আসক্ত হইয়া এই জগৎ হইতে চলিয়া যাইবার কাল্যে সেইরূপ যাতনা ভোগ করিতে করিতে নরক গমন করিতে হয়। জড়াসক্ত জীব কিরূপে প্রেরিত হয়, তাহার চিত্রও শ্রীমদ্ভাগবত প্রদান করিয়াছেন,—

এবং কুটুম্বভরণে ব্যাপৃতাত্মাজিতেন্দ্রিয়ঃ।
ম্রিয়তে রুদতাং স্বানামুরুবেদনয়াস্তধীঃ।।
যমদূতৌ তদা প্রাপ্তৌ ভীমৌ সরভসেক্ষণৌ।
স দৃষ্ট্বা ত্রস্তহৃদয়ঃ শকৃন্মূত্রং বিমুঞ্চতি।।
যাতনা-দেহ আবৃত্য পাশৈর্ব্বদ্ধা গলে বলাৎ।
নয়তো দীর্ঘধ্বানং দণ্ড্যং রাজভটা যথা।।
তয়োর্নিভিন্নহৃদয়স্তর্জ্জনৈর্জাতবেপথুঃ।
পথি স্বভির্ভক্ষ্যমাণ আর্ত্তোঽঘং স্বমনুস্মরন্।।
ক্ষুত্তৃট্পরীতোঽর্কদবানলানিলৈঃ
সন্তপ্যমানঃ পথি তপ্তবালুকে।
কৃচ্ছেণ পৃষ্ঠে কষয়া চ তাড়িত-
শ্চলত্যশক্তোঽপি নিরাশ্রমোদকে।।

তত্র তত্র পতন্ শ্রান্তো মূর্চ্ছিতঃ পুনরুত্থিতঃ।
পথা পাপীয়সা নীতস্তমসা যমসাদনম্।।
যোজনানাং সহস্রাণি নবতিং নব চাধ্বনঃ।
ত্রিভির্ম্মুহূর্ত্তৈর্দ্বাভ্যাং বা নীতঃ প্রাপ্নোতি যাতনাঃ।।
আদীপনং স্বগাত্রাণাং বেষ্টয়িত্বোল্মুকাদিভিঃ।
আত্মমাংসাদনং ক্বাপি স্বকৃত্তং পরতোপি বা।।
জীবতশ্চান্ত্রাভ্যুদ্ধারং শ্বগৃধ্রৈর্যমসাদনে।
সর্পবৃশ্চিকদংশাদ্যৈর্দশদ্ভিশ্চাত্মবৈশসম্।।
কৃন্তনঞ্চাবয়বশো গজাদিভ্যো ভিদাপনম্।
পাতনং গিরিশৃঙ্গেভ্যো রোধনঞ্চাম্বুগর্ত্তয়োঃ।।
যাস্তমিস্রান্ধতামিস্র-রৌরবাদ্যাশ্চ যাতনাঃ।
ভুঙক্তে নরো বা নারী বা মিথঃ সঙ্গেন নিম্মিতাঃ।।

(ভাঃ ৩।৩০।১৮-২৮)

কুটুম্বভরণে ব্যাপৃতচিত্ত, অজিতেন্দ্রিয় গৃহব্রত ব্যক্তি এই অবস্থাতেও রোরুদ্যমান আত্মীয়স্বজনের সাতিশয় দুঃখ সন্দর্শন করিয়া অধীর হয়; অবশেষে সে নষ্ট-বুদ্ধি হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করে।

তাহার মৃত্যু-সময়ে সক্রোধনেত্র ভয়ঙ্কর যমদূতদ্বয় আসিয়া উপস্থিত হয়। ঐ ব্যক্তি উহাদিগকে দর্শন করিয়াই ত্রস্ত-হৃদয় হয় এবং ভয়ে পুনঃ পুনঃ মলমূত্র পরিত্যাগ করিতে থাকে।

অনন্তর ঐ যমদূতদ্বয় ঐ গৃহব্রত ব্যক্তিকে স্থূল দেহ হইতে যাতনা-দেহে নিরুদ্ধ করিয়া বলপূর্ব্বক তাহার গলদেশে পাশ বন্ধন করে এবং যেরূপ রাজপুরুষেরা দণ্ডনীয় ব্যক্তিকে পাশবদ্ধ করিয়া লইয়া যায়, যমরাজের কিঙ্করগণও সেইরূপ তাহাকে লইয়া দীর্ঘপথে প্রস্থান করিতে থাকে।

যমদূতগণের তিরস্কার-বাক্যে ঐ পুরুষের হৃদয় বিদীর্ণ হইতে থাকে এবং সর্ব্বশরীরে কম্প উপস্থিত হয়। পথিমধ্যে কুক্কুরসকল তাহাকে ভক্ষণ করিতে থাকে; তাহাতে ঐ ব্যক্তি যাতনায় অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া আপন পাপ স্মরণ করিতে করিতে চলিতে থাকে। যমদূতেরা তাহাকে যে পথ দিয়া লইয়া যায়, তাহা প্রতপ্ত বালুকা পরিপূর্ণ; তথায় কোন বিশ্রামস্থল বা পানীয় জল নাই; ঐব্যক্তি ক্ষুধায় প্রপীড়িত এবং সূর্য্য ও দাবানলদ্বারা সন্তপ্ত হইয়া চলিতে নিতান্ত অসমর্থ হইলেও যমদূতেরা তাহার পৃষ্ঠদেশে কশাঘাত করিতে থাকে; সুতরাং সে অতিকষ্টে চলিতে বাধ্য হয়।

শ্রান্তিবশতঃ সেই ব্যক্তি যাইতে যাইতে পথিমধ্যে পদস্খলিত ও বারম্বার মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে; আবার চেতনতা লাভ করিয়া পাপ-বহুল অন্ধকারময় পথদ্বারা যমসদনে নীত হয়।

যে পথে যমগৃহে যাইতে হয়, তাহার পরিমাণ নিরানব্বই সহস্র যোজন। যমদূতেরা কোন কোন ব্যক্তিকে বা দুই মুহূর্ত্তের মধ্যে ঐ দীর্ঘপথ অতিক্রম করাইয়া থাকে। সুতরাং সেই পাপী ব্যক্তি যখন যমসদনে উপস্থিত হয়, তখন সে দেখিতে পায়—কোথায়ও জ্বলন্ত অঙ্গার দ্বারা গাত্র বেষ্টিত করিয়া পাপীর দেহ দগ্ধ হইতেছে, কোথায়ও বা অপরের দ্বারা, আবার কোথায়ও বা আপন মাংস আপনিই ছিন্ন করিয়া সেই মাংস ভোজন করিতেছে; জীবন থাকিতেই যমালয়স্থ কুক্কুর, গৃধ্র প্রভৃতি জীবগণ নাড়ী সকল টানিয়া বাহির করিতেছে; কেহ বা সর্প, বৃশ্চিক ও দংশক প্রভৃতি জন্তুগণের দংশনে অতিশয় বেদনা অনুভব করিতেছে; কাহারও অঙ্গপ্রত্যঙ্গসকল খণ্ড খণ্ড করিয়া ছেদন করিতেছে, কাহাকেও বা পর্ব্বত-চূড়া হইতে নিক্ষেপ করিতেছে, কাহাকেও বা জল ও গর্ত্তের মধ্যে অবরুদ্ধকরিয়া রাখিয়াছে—এই সকল যাতনা সে ভোগ করিয়া থাকে।

অন্ধতামিস্র, রৌরব প্রভৃতি যতপ্রকার নরক-যন্ত্রণা পরস্পরের পাপ-সংসর্গ-জন্য নির্ম্মিত হইয়াছে, ঐ মৃত গৃহব্রত ব্যক্তি পুরুষই হউক আর নারীই হউক, সেই সকল যাতনা ভোগ করিতে বাধ্য হয়।

সিদ্ধদেহ

যাঁহারা নিত্যসিদ্ধ রাগাত্মিক ব্রজজনের রাগময়ী কৃষ্ণসেবায় গুরুকৃপায় স্বাভাবিকভাবে প্রলুব্ধ হন, সেই সকল নিবৃত্তানর্থ রাগানুগ ভক্ত সাধকদেহ ও সিদ্ধদেহে রাগানুগা ভক্তির দ্বিবিধ অনুশীলন করিয়া থাকেন।

বাহ্য, অভ্যন্তর—ইহার দুইত সাধন।
বাহ্যে সাধকদেহে করে শ্রবণ-কীর্ত্তন।।
মনে নিজ-সিদ্ধদেহ করিয়া ভাবন।
রাত্রিদিন করে ব্রজে কৃষ্ণের সেবন।।

এই "সিদ্ধদেহ" কথাটি লইয়া অনুকরণপ্রিয় প্রাকৃত সাহজিক সম্প্রদায়ে নানাপ্রকার বিকৃত ধারণা ও বিপত্তি ঘটিয়াছে। উপরি-উক্ত বাক্যকে বিকৃতভাবে গ্রহণ করিয়া কেহ কেহ ভোগাসক্ত মনের কল্পনা বা আরোপাদিকে সিদ্ধ দেহ মনে করিয়া লইতেছেন। এরূপ কল্পনার প্রশ্রয় দিবার গুরুব্রুব-সম্প্রদায়েরও উদ্ভব হইয়াছে। বৃন্দাবন ও নবদ্বীপ প্রভৃতি স্থানে দু'চার আনা খরচ করিলে সিদ্ধপ্রণালী প্রদান করিবার অনেক গুরু (?) পাওয়া যায়। ইহারা কখনও অশিক্ষিত, কখনও বা অনুস্বার-বিসর্গের প্রাকৃত পাণ্ডিত্যে গর্ব্বিত। ইহারা আপনাদিগকে গৌড়ীয় বৈষ্ণব বা রাগানুগ বিচার-পরায়ণ বলিয়া আত্ম-প্রকাশ করিলেও ইহারা কোন-না-কোন প্রকার সম্ভোগ-বিচারপর অনর্থযুক্ত জীব। ব্রজমণ্ডলের (?) সর্ব্বত্রও এরূপ জাতীয় প্রাকৃত-

সহজিয়া-সম্প্রদায়, এমন কি, ধাতুপাত্রাদি-স্পর্শ-পরিত্যাগের প্রতিষ্ঠায় স্ফীত—বিরক্তব্রুব বা সিদ্ধব্রুব অনেক ব্যক্তিকে ঐরূপ অনর্থে প্রপীড়িত দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা রুচিশব্দের বিকৃত অর্থ করিয়া থাকে। ইহারা বলে যে, মানুষের ইচ্ছাই লোভ বা রুচির লক্ষণ। কিন্তু অনর্থযুক্ত ব্যক্তির ইচ্ছার মধ্যে সম্ভোগের স্পৃহা যে বহুরূপিণী প্রচ্ছন্নমূর্ত্তিতে বিরাজিত থাকে, ইহা তাহারা ধারণা করিয়া উঠিতে পারে না। ভোগাসক্ত বা বিরক্তাভিমানী মন 'সিদ্ধদেহ' ভাবনা করিতে পারে না। নিজের কল্পনাবলে বা পুস্তকাদি দেখিয়া তাহা হইতে কোন আদর্শ অনুকরণ করিয়া কেহ সিদ্ধদেহ সৃষ্টি করিতে পারে না। রূপানুগবর পরমমুক্ত শ্রীগুরুপাদপদ্মই জীবের অনর্থের অপগমে যথাকালে নির্ম্মল চেতনের সেবার নিত্যসিদ্ধ স্বাভাবিক স্বরূপ সাধকের সিদ্ধদেহ-রূপে প্রদর্শন করিয়া থাকেন। দিব্যজ্ঞান বা দীক্ষার সিদ্ধিতে এই নিত্যসিদ্ধ সিদ্ধদেহ গুরুপাদপদ্মের দ্বারা প্রদর্শিত হইয়া থাকে। তখনই সাধক সেই সিদ্ধদেহের ভাবনায় যোগ্যতা লাভ করেন এবং বাহ্যে সাধকদেহে অনুক্ষণ শ্রীগুরু ও বৈষ্ণবের শ্রীমুখে শ্রীভগবানের শ্রীনাম-গুণ-লীলাদি শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিতে নিজের অভীষ্ট কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুপাদপদ্মের অনুগত হইয়া অনুক্ষণ অর্থাৎ অষ্টকালীন কৃষ্ণসেবা করিয়া থাকেন। সেইরূপ অবস্থায় সাধকের ব্রজ-সেবানুভূতি-ব্যতীত মুহূর্ত্তের জন্যও অন্য অনুভূতি থাকে না। কখনও সেই অনর্থমুক্ত সাধক গুরুপাদপদ্মের আনুগত্যে হরিনাম শ্রবণ কীর্ত্তন করিতে করিতে ভৌম ব্রজমণ্ডলে বাস করেন, কখনও বা ব্রজমণ্ডলের অভিন্ন-বপুজ্ঞানে গৌড়মণ্ডলে বাস করিয়াও ব্রজভূমির অস্মিতা ও উদ্দীপনায় বিভোর থাকেন, কখনও বা সাধারণের বাহ্য দৃষ্টিতে স্থূল শরীরে ব্রজবাস না করিলেও বিশুদ্ধচিত্তে কৃষ্ণসেবাপর ব্রজভূমিতে বাস করিয়া ২৪ ঘন্টার মধ্যে ২৪ ঘন্টাই শ্রীহরিনাম-সঙ্কীর্ত্তনমুখে কৃষ্ণসেবা করিয়া থাকেন। এই সময় তাঁহার কোনপ্রকার জড়ীয় রাগদ্বেষ বা ইতর বাসনার অস্মিতা থাকে না।

শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর বলিয়াছেন—

আনের হৃদয় মন, মোর মন বৃন্দাবন,
মনে বনে এক করি' মানি।
তাহে তোমার পদদ্বয়, করাহ যদি উদয়,
তবে তব পূর্ণ কৃপা মানি।।

রূপানুগবর শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ও গাহিয়াছেন,—

বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হবে মন।
কবে হাম হেরব শ্রীবৃন্দাবন।।

উপরিউক্ত দুইস্থানে যে শুদ্ধ মনের কথার উল্লেখ আছে এবং যে শুদ্ধমন বৃন্দাবনের সহিত অভিন্ন, তাহা অনর্থযুক্ত ব্যক্তির সংকল্প-বিকল্পাত্মক জড়-ভোগ ও জড়-ত্যাগ-ধর্ম্মাপর অচিদাবরণে আবৃত চিদাভাস মন নহে। তাদৃশ মনে সিদ্ধদেহ ভাবনা করা যায় না। এই কথাটি প্রাকৃত-সহজিয়াগণের 'মেটে' মস্তকে

প্রবেশ করে না। তাই তাহারা সগুণ পঞ্চোপাসকের 'সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপ-কল্পনা'র ন্যায় সিদ্ধদেহ-কল্পনার চেষ্টা দেখাইয়া দ্বিতীয় প্রকার পৌত্তলিকতার আবাহন করিয়া থাকে।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ এই সিদ্ধদেহ-প্রকাশের ক্রম আরও স্পষ্টতর ভাষায় জানাইয়াছেন—

শ্রীরূপগোসাঞি শ্রীগুরুরূপেতে
শিক্ষা দিল মোর কাণে।
জান মোর কথা, নামের কাঙ্গাল,
রতি পাবে নাম-গানে।।
কৃষ্ণনাম-রূপ- গুণ-সুচরিত,
পরম যতন করি'।
রসনা মানসে করহ নিয়োগ
ক্রমবিধি অনুসরি'।।
ব্রজে করি' বাস রাগানুগ হঞা
স্মরণ-কীর্ত্তন কর।
এ নিখিল কাল করহ যাপন
উপদেশ-সার ধর।।
হা রূপ গোঁসাই দয়া করি' কবে
দিবে দীনে ব্রজে বাসা।
রাগাত্মিক তুমি, তব পদানুগ,
হইতে দাসের আশা।।

* * * * *

গুরুদেব! কবে মোর সেই দিন হ'বে?
মন স্থির করি' নির্জ্জনে বসিয়া
কৃষ্ণনাম গাব যবে।
সংসার-ফুকার কাণে না পশিবে,
দেহ-রোগ দূরে রবে।।

* * * * *

নিষ্কপটে হেন দশা কবে হবে,
নিরন্তর নাম গাব।
আবেশে বহিয়া দেহযাত্রা করি'
তোমার করুণা পাব।।
গৌড়-ব্রজবনে ভেদ না দেখিব,
হইব বরজবাসী।
ধামের স্বরূপ স্ফুরিবে নয়নে,
হইব রাধার দাসী।।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ সিদ্ধদেহ বা গোপীগর্ভে জন্ম গ্রহণের স্বাভাবিক ক্রম বর্ণন করিয়া লিখিয়াছেন যে, শ্রীগুরুদেবের কৃপায় গৌর-ব্রজবনে ভোগ্য ভেদ-দর্শন রহিত হইয়া ব্রজবাসী হইতে পারিলে তখন ধামের স্বরূপ নয়নে স্ফূর্ত্তি-প্রাপ্ত হইবে এবং শ্রীরাধার পাল্য কিঙ্করীত্বে লোভ হইবে। ধামের স্বরূপ—

দেখিতে দেখিতে ভুলিব বা কবে
নিজ স্থূল পরিচয়।
নয়নে হেরিব ব্রজপুর-শোভা
নিত্য চিদানন্দময়।।
বৃষভানুপুরে জনম লইব,
যাবটে বিবাহ হবে।
ব্রজগোপীভাব, হইবে স্বভাব
আনভাব না রহিবে।।
নিজ সিদ্ধদেহ, নিজ সিদ্ধনাম,
নিজরূপ, স্ববসন।
রাধাকৃপা-বলে লভিব বা কবে
কৃষ্ণপ্রেম-প্রকরণ।।

উপরি-উক্ত পদাবলী হইতে জানা যায় যে, 'সিদ্ধদেহ' বা অপ্রাকৃত ব্রজগোপীভাব চেতনবৃত্তির পূর্ণ নির্ম্মলতা অর্থাৎ পূর্ণ সেবোন্মুখতার সঙ্গে সঙ্গেই প্রকাশিত হয় এবং তাহা শ্রীবার্ষভানবীর অভিন্নতনু শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপাবলেই লাভ হইয়া থাকে। ইতরভাব বিদূরিত হইয়া নিজ-সিদ্ধদেহের নিত্যসিদ্ধ

ব্রজগোপীভাব স্বভাবরূপে প্রকটনই গোপীগর্ভে জন্মলাভ। তাহাই নিজসিদ্ধদেহ, সিদ্ধনাম ও সিদ্ধরূপ, সিদ্ধবসনাদি সিদ্ধসেবার বিবিধ পর্ব্ব-প্রাপ্তির ভূমিকা।

কেহ কেহ শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের বাক্যের কদর্থ করিয়া গোপীগর্ভে জন্মগ্রহণের তাৎপর্য্য বিপর্য্যয় করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ এই জন্মেই শ্রীগুরুকৃপাবলে গোপীগৃহে জন্মলাভ সম্ভব। যেমন ব্রাহ্মণগৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াও দ্বিতীয় সংস্কারের দ্বারা সংস্কৃত হইয়া ইহ জন্মেই দ্বিজ না হওয়া পর্য্যন্ত বেদপাঠে অধিকার হয় না অথবা যেমন দৈক্ষ্যজন্মলাভ না হওয়া পর্য্যন্ত শ্রীশালগ্রাম-পূজায় অধিকার হয় না, তদ্রূপ ইহজন্মে গোপীগৃহে জন্ম লাভ না করা পর্য্যন্ত শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবায় অধিকার-লাভ হয় না। অর্চ্চনমার্গে যেরূপ ভূতশুদ্ধি-লাভের পর অর্চ্চনাধিকার, অপ্রাকৃত ভাবমার্গেও তেমন ইতরভাব পরিত্যাগপূর্ব্বক ব্রজগোপীভাব লাভ বা গোপীগৃহে জন্ম লাভ না করা পর্য্যন্ত শ্রীরাধাগোবিন্দের ভাবসেবার অধিকার-লাভ হয় না।

'গুপ্' ধাতুর অর্থ রক্ষা করা। কৃষ্ণ নির্ম্মল চেতনের নিত্যসিদ্ধ বৃত্তিকে সংরক্ষণ করেন বলিয়া অর্থাৎ চেতনের নিত্যসেবা-প্রবৃত্তির বিষয় হন বলিয়া তিনি গোপীনাথ এবং নির্ম্মল চেতনের সেবাবৃত্তির বিগ্রহসমূহ গোপী। সেই গোপীর গর্ভে অর্থাৎ কৃষ্ণের একমাত্র সংরক্ষিত-সত্ত্বস্বরূপ সেবা বৃত্তির অন্তরে জীবের চেতনবৃত্তি অবস্থিত না হইলে কেহ রাধামাধবের সেবায় অধিকার পাইতে পারেন না।

''জন্মান্তরাপেক্ষা বর্ত্ততে''—দুর্গম-সঙ্গমনীর এই দুর্গম বাক্য বুঝিতে না পারিয়া এক শ্রেণীর স্মার্ত্ত ও প্রাকৃত সাহজিক সম্প্রদায় যেরূপ ''তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুঃ'' এই ভাগবত বাক্যের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিয়া শ্রীহরিনাম-গ্রহণকারীকে পিষ্ট-পেষণ-ন্যায়ের অধীন করাইবার ইচ্ছা করেন এবং হরিনাম আশ্রয়কারী পরম মুক্তপুরুষকে পুনরায় সংসারে জন্ম গ্রহণ করাইয়া তাঁহাকে সাবিত্র সংস্কারের অধিকারী করাইতে চাহেন; তদনুরূপ ভ্রম হইতেই 'স্থূল বা মর্ত্ত্য গোপীগর্ভে জন্ম গ্রহণ না করা পর্য্যন্ত সিদ্ধদেহ লাভ হয় না'—কেহ কেহ শ্রীচক্রবর্ত্তী ঠাকুরের বাক্যের দোহাই দিয়া ঐরূপ বিপর্য্যস্ত সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন। কিন্তু এই সকল ভজন-রহস্য সাধারণ পুস্তকে, সাধারণ বা অসাধারণ বিদ্যাবুদ্ধিতে বুঝা যায় না। রূপানুগ গুরু-পারম্পর্য্যেই এই সকল রহস্য সংরক্ষিত আছে।

সিদ্ধদেহ, সিদ্ধনাম, সিদ্ধরূপ প্রভৃতি অনর্থযুক্ত ব্যক্তিমাত্রেরই লভ্য বা করায়ত্ত নহে। তাহা যে কোন গুরুব্রুব বণিকের দোকান হইতে জাগতিক দ্রবিণ বা কপটতার বিনিময়ে ক্রয় করা যায় না। সম্ভোগবাদী জীবের প্রচ্ছন্ন রিরংসাজাত সম্ভোগেচ্ছা-লৌল্যের বেশে সজ্জিত হইয়া আত্মবঞ্চনা ও পরবঞ্চনা করিলেই তাহা অনর্থনির্ম্মুক্ত রাগানুগের রুচি নহে।

আমরা শুনিয়াছি, যখন ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী প্রভু কুলিয়া-নবদ্বীপের ধর্ম্মশালায় কৃপাপূর্ব্বক অবস্থান করিতেছিলেন, তখন শ্রীল সুন্দরানন্দ ঠাকুরের শ্রীপাট হইতে *** গোস্বামী নামক এক ব্যক্তি শ্রীল গৌরকিশোর প্রভুর নিকট সিদ্ধপ্রণালী ও অষ্টকালীয় ভজন শিক্ষালাভের আশায় উক্ত ধর্ম্মশালায় আগমন করিয়াছিলেন। ভজনশিক্ষাকামী উক্ত গোঁসাইজী শ্রীল গৌরকিশোর প্রভুর নিকট সিদ্ধ-

প্রণালী পাইবার অভিলাষ জ্ঞাপর্ন করিলে প্রথম দিন শ্রীল বাবাজি মহারাজ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, ''আজ আমার অবসর নাই।'' দ্বিতীয় দিন উক্ত গোঁসাইজি আবার সেই প্রস্তাব উত্থাপন করিলে বাবাজি মহারাজ ঠিক সেই কথাই বলিলেন। এইরূপ যতবার উক্ত গোঁসাইজি বাবাজি মহারাজের নিকট সেই প্রস্তাব উপস্থিত করিতেন, ততবারই বাবাজি মহারাজ বলিতেন, "আমার অবসর নাই, অবসর হইলে বলিব।" অবশেষে উক্ত গোঁসাইজি বিরক্ত হইয়া সেই স্থান পরিত্যাগ করিলেন। যেদিন গোঁসাইজি চলিয়া গেলেন, সেইদিন রাত্রে বাবাজি মহারাজ নিজে নিজে বলিতে লাগিলেন,—''একটা কাণাকড়ি হারাইলে তজ্জন্য যাহার প্রাণ উদ্বিগ্ন হইয়া পড়ে, এইরূপ জড়াসক্ত ব্যক্তি 'সিদ্ধপ্রণালী' ও 'অষ্টকাল'-ভজন শিক্ষা করিতে আসিয়াছে! অষ্টকাল ভজনের কথা পুস্তক দেখিয়া শিক্ষা (?) করিলেই বা সে কিরূপে 'সিদ্ধদেহ' পাইবে? **পুস্তক দেখিয়া কেহ 'সিদ্ধদেহ' নির্ম্মাণ করিতে পারে না।** হাটে বাজারে এই সকল কথা 'বানিয়ারা' (ধর্ম্মব্যবসায়িগণ) প্রকাশ করায় জগতের অত্যন্ত অপকার হইতেছে। ইহারা সিঁড়ি চাহিয়া লইয়া আমার কৃষ্ণের দোতালার ছাদে উঠিবে (?) আর সেখানে পুরীষ উৎসর্গ করিবে! রাধাগোবিন্দের কুঞ্জসেবার নাম করিয়া ইহারা কুঞ্জ দূষিত করিবার ইচ্ছাই অন্তরে পোষণ করে! **ইঁচড়ে পাকা বানিয়া গুরু ও বানিয়া শিষ্যের মধ্যে আজকাল সিদ্ধপ্রণালী লইয়া যে ব্যবসা চলিয়াছে, তাহাতে সর্ব্বনাশ হইতেছে।** তোমরা যদি মঙ্গল চাও, তবে সর্ব্বক্ষণ আমার কাছে বসিয়া হরিনাম কর। নিজের মতলবে; কিছু করিতে চাহিলেই মায়াপিশাচী ঘাড়ে চাপিবে। আমার কাছে কত লোকই ত' আসিল! সকলেই আমাকে ঠকাইতে আসে!"

শ্রীল গৌরকিশোর প্রভুর এই সৎসিদ্ধান্ত-পূর্ণ কথা শুনিয়া কোন কোন ইঁচড়েপাকা ধর্ম্মব্যবসায়ী প্রা *** প্রভৃতি সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। কেন না, শ্রীল গৌরকিশোর প্রভু প্রেয়ঃকথা না বলিয়া অনুক্ষণ শ্রেয়ঃকথা বলিয়াছেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন,—

দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ।
সেইকালে কৃষ্ণ তারে করে আত্মসম।।
সেই দেহ করে তার চিদানন্দময়।
অপ্রাকৃত-দেহে তাঁর চরণ ভজয়।।

—চৈঃ চঃ অন্ত্য ৪র্থ পঃ ((১৯২-১৯৩)

সর্ব্বাত্মসমর্পণ ও দিব্যজ্ঞানের সিদ্ধিতে এই অপ্রাকৃত দেহ বা চিদানন্দময় সিদ্ধদেহের প্রকাশ হয়। **প্রাকৃত দেহ অপ্রাকৃত হয় না। জড় কখনও চিৎ হয় না;** পরন্তু স্বরূপদেহের প্রকাশ হইয়া থাকে। কেহ কেহ কুক্কুর-শৃগাল-ভক্ষ্য পুরুষদেহকে সখীদেহ বা সিদ্ধদেহ সাজাইবার প্রয়াস করিয়াছে। ইহারা 'সখীভেকি' নামে প্রচারিত। বস্তুতঃ জড়মানসদেহকে সিদ্ধদেহ সাজান' যেরূপ ভগবৎসেবার বিরুদ্ধবিচার, জড়স্থূলদেহকে 'সখী' সাজান' তদ্রূপই সেবাবিরুদ্ধ প্রাকৃত-সম্ভোগবাদ। স্থূলদেহ বা সূক্ষ্মদেহের প্রাকৃত সজ্জা, প্রাকৃত

আরোপ কখনও কৃষ্ণসেবার সিদ্ধদেহ নহে; বিশেষতঃ কুক্কুর-শৃগাল ভক্ষ্য জড়পুরুষ বা জড়স্ত্রীদেহকে 'সখী' সাজাইবার পূর্ব্বে শ্রীরূপানুগবর শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভুর সিদ্ধান্ত আলোচনা করা কর্ত্তব্য। যাহারা শ্রীরূপানুগ-সিদ্ধান্ত-ভাবধারা শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে লাভ করে নাই, তাহারা শ্রীল রঘুনাথের এই শ্লোকটি বুঝিতে পারে না।

পাদাব্জয়োস্তব বিনা বরদাস্যমেব
নান্যৎ কদাপি সময়ে কিল দেবি যাচে।
সখ্যায় তে মম নমোঽস্তু নমোঽস্তু নিত্যং
দাস্যায় তে মম রসোঽস্তু রসোঽস্তু সত্যম্।।

স্তবাবলী (বিলাপকুসুমাঞ্জলিঃ ১৬শ শ্লোক)

হে ঈশ্বরি, তোমার পাদপদ্মযুগলের শ্রেষ্ঠ দাস্য ব্যতীত আমি কখনও অন্য কোন প্রার্থনা করি না। আমি তোমার সখীত্বও প্রার্থনা করি না। তোমার সখীত্বের প্রতি আমার নিত্য নমস্কার থাকুক, নমস্কার থাকুক এবং আমি সত্য করিয়া বলিতেছি, একমাত্র তোমার দাস্যের প্রতি আমার অনুরাগ হউক, আমার অনুরাগ হউক।

যাঁহারা প্রাকৃত পুরুষদেহকে বাহ্য বেষ ভুষা দ্বারা সখীদেহ বা গোপীদেহ সাজাইতেছেন, তাঁহারা কেবল যে জড়কে 'চেতন', প্রাকৃতকে 'অপ্রাকৃত' বলিয়া ভীষণ অপরাধ ও অনর্থের প্রশ্রয় দিতেছেন তাহা নহে, তাঁহারা অহংগ্রহোপাসনা বা মায়াবাদরূপ ভীষণ অপরাধও আবাহন করিয়াছেন। শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর বিচারানুসারে শ্রীরাধার দাস্যের সৌভাগ্যের জন্য অকপটে ব্যাকুল না হইয়া তাঁহারা স্বয়ং সখীত্বই (?) প্রার্থনা করিতেছেন! শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভু ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর টীকায় ইহাকে 'অহংগ্রহোপাসনা' বলিয়াছেন। ঐ সকল চেষ্টায় ভক্তি দূরে থাকুক, ভক্তি লোপ করিবার চেষ্টাই পূর্ণমাত্রায় দেদীপ্যমান।

কুঞ্জেরা

মদীয় আচার্য্যদেব ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদের অনুগমনে শ্রীরাধাকুণ্ডে উর্জ্জব্রত পালনকালে 'কুঞ্জেরা'-নামক কৃষ্ণলীলাস্থল দর্শন করিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল। উপদেশক শ্রীপাদ শিবদ-বাস্তববিগ্রহ-দাস বিদ্যারত্ন প্রভু ও পণ্ডিতপ্রবর শ্রীপাদ নন্দলাল কাব্যতীর্থ বিদ্যাসাগর বি-এ মহাশয়ের একাদশবর্ষীয় জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীমান্ সচ্চিদানন্দ দাস ব্রহ্মচারীর সহিত গত ২৪শে অক্টোবর অপরাহ্ণে আমরা কুঞ্জেরা দর্শনে গমন করিয়াছিলাম।

শ্রীরাধাকুণ্ড হইতে পশ্চিম-উত্তরকোণে প্রায় দুই মাইল দূরে কুঞ্জেরা গ্রাম। মাল্যহারকুণ্ড ও শ্রীকুণ্ডস্থ প্রাচীন শ্রীরাধাকৃষ্ণ-শ্রীবিগ্রহের যে বাগান আছে, তন্মধ্যবর্ত্তী কাঁচা পথ দিয়া এবং কাশবনের 'পাগ্‌দণ্ডী'র

(পায়ের রাস্তা) মধ্য দিয়া প্রায় অর্দ্ধমাইল অতিক্রম করিলে গভর্ণমেন্টের জলসেচন-বিভাগের নহর অর্থাৎ জলপ্রবাহের শুষ্ক খাত পাওয়া যায়। তাহার তীরে তীরে প্রায় দেড়মাইল অগ্রসর হইলে কুঞ্জেরা গ্রাম পাওয়া যায়। কথিত হয় যে, শ্রীরাধাকুণ্ডের কুঞ্জসমূহের সীমা এখান হইতে আরম্ভ হইয়াছে বলিয়া ইহার নাম 'কুঞ্জেরা' হইয়াছে; যথা ভক্তিরত্নাকরে,—

এই কুঞ্জে নবগ্রাম দেখহ অগ্রেতে।
শ্রীকুণ্ডের কুঞ্জসীমা হয় এথা হৈতে।।
এবে লোক কহয়ে কুঞ্জেরা নামে গ্রাম।
এথা রাধাকৃষ্ণের বিলাস অনুপাম।। (৫ম তরঙ্গ)

আবার কেহকেহ বলিয়া থাকেন,—এখানে শ্রীরাধিকা ললিতাদি অষ্টসখীর সহিত কুঞ্জর অর্থাৎ হস্তীর আকার ধারণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে তদুপরি আরোহণ করাইয়াছিলেন। এই লীলা 'নরনারীকুঞ্জর-লীলা' নামে অভিহিত।শ্রীকৃষ্ণ সরাধিকা সখীগণের কৌশল-দর্শনে পরম সন্তুষ্ট হইয়া সেই নবনারীকুঞ্জরকে 'কুঞ্জররাজ' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন। তদনুসারে সেই স্থানের নাম কুঞ্জররাজ এবং তাহার অপভ্রংশ-শব্দ 'কুঞ্জরা' বা 'কুঞ্জেরা' হইয়াছে।

কুঞ্জেরা গ্রামে দাউজী শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছেন। স্থানীয় অধিবাসিগণ বলিয়া থাকেন,—এই শ্রীমূর্ত্তি বজ্রনাভের স্থাপিত। শেষনাগের মধ্যে দণ্ডায়মান দ্বিভুজাকার শ্রীবলদেব শ্রীমূর্ত্তি—কৃষ্ণপ্রস্তরময়ী। পূর্ব্বে যে মন্দিরে এই শ্রীমূর্ত্তি ছিলেন, সেই পুরাতন মন্দিরের ভগ্নাবশেষ বর্ত্তমান মন্দিরের চতুষ্পার্শ্বেই দৃষ্ট হয়। বর্ত্তমান মন্দির বিশেষ পুরাতন নহে বলিয়া মনে হয়। নূতন মন্দিরটি প্রস্তরের নির্ম্মিত একটি গৃহ এবং তৎসম্মুখে বারান্দা বা জগমোহন। মন্দিরে কোন গম্বুজ বা চূড়া নাই। দাউজীর মন্দির একটি অসমান দীর্ঘিকা বা কুণ্ডের তীরে অবস্থিত, তাহা 'ক্ষীরসাগর' নামে পরিচিত। মন্দিরের সেবায়ে ত একজন ব্রজবাসী গৃহস্থ ব্রাহ্মণ। তিনি আপনাকে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের অন্তর্গত বলিয়া পরিচয় দিলেন। ব্রাহ্মণটি খুব সরল ও অমায়িক। ইনি শ্রীবৃন্দাবনের শ্রীশ্যামসুন্দর-মন্দিরের শিষ্য বলিয়া পরিচয় দিলেন; কিন্তু নিজ গুরুদেবের নাম বলিতে পারিলেন না। সেবায়েত ব্রাহ্মণটির নাম—মতিরাম। তিনি প্রায় সত্তর বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধ। তাঁহার পিতা দেবকীনন্দন ও পিতামহ জীবনদাস ও দাউজীর সেবায়েত ছিলেন। মতিরামের দুই পুত্র—পুরুষোত্তম ও গ্যাসিরাম।

সেবার জন্য কি বন্দোবস্ত আছে, জিজ্ঞাসা করিলে সেবক মতিরাম জানাইলেন যে, যদিও প্রায় ৪।৫ বিঘা জমি আছে, তথাপি তাহা হইতে বিশেষ কিছু ফসল উৎপন্ন হয় না। তিনি বস্তি হইতে আটা ভিক্ষা করিয়া ঠাকুরের সেবা করিয়া থাকেন।

ক্ষীরসাগরের তীরের একদিকে ক্ষুদ্র গম্বুজাকার একটি প্রস্তর ও ইষ্টক-নির্ম্মিত গৃহ এবং অপর দিকে আর একটি ইষ্টক-নির্ম্মিত গৃহ আছে। শুনা গেল,—ঐ স্থানে দুই জন নবাগত বাঙ্গালী গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-নামে

পরিচিত ব্যক্তি ভজনপ্রয়াসী হইয়া অবস্থান করিতেছেন। তাঁহাদের নাম জানিতে চাহিলে এক ব্যক্তি বলিলেন যে, নবাগত ব্যক্তিদ্বয়ের এখনও নামকরণ হয় নাই। তদ্‌বিপরীত দিকে অবস্থিত গৃহ বা সমাধি-মন্দিরে বিহারী দাস নামক গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-পরিচয়-প্রদানকারী এক ব্যক্তি বাস করেন। তাঁহার নিকট হইতে জানা গেল যে, সেই স্থানে অবস্থিত দুইটি সমাধি-মধ্যে একটি কাল্‌নার ভগবান্ দাস বাবাজী মহাশয়ের শিষ্য গৌরচরণ দাসের সমাধি এবং তৎপার্শ্বে অবস্থিত দ্বিতীয়টি গৌরচরণ দাসের শিষ্য গোপালদাসের সমাধি। বিহারীদাস গোপাল দাসের শিষ্য কলিকাতার স্বধামগত সূর্য্যকুমার কারফরমা উক্ত গৌরচরণ দাসের শিষ্য ছিলেন। তিনিই ঐ সমাধি-মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছেন। পূর্ব্বে কারফরমা মহাশয় ৫/- করিয়া মাসিক সাহায্য করিতেন, এখন সে সাহায্য পাওয়া যায় না, শুনা গেল। উক্ত সমাধি মন্দিরের বারান্দায় একটি চিত্রে পূর্ব্বোক্ত নরনারীকুঞ্জর অঙ্কিত আছে। অষ্টসখী এবং শ্রীমতী রাধিকা প্রত্যেকে এমন করিয়া অবস্থান করিয়াছেন যে, যেন দেখিতে হাতীর মত আকার হইয়াছে, তাহার উপর শ্রীকৃষ্ণ মাহুত হইয়া বসিয়া রহিয়াছেন এবং পার্শ্বে শ্রীমতী পৃথগ্‌ভাবে আরোহীরূপে আছেন।

কুঞ্জেরা গ্রামের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র মৃন্ময় কুটীর শ্রীরাধামাধবের মন্দির বলিয়া পরিচিত। এখানে শ্রীরাধা-মাধব-বিগ্রহ প্রকাশিত ছিলেন। কিন্তু বর্ত্তমানে কেবল শ্রীরাধামূর্ত্তি আছেন। কোন কারণে শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ বর্ত্তমানে প্রকাশিত নাই। কুর্দ্দন নামক এক ব্রজবাসী ব্রাহ্মণ ইহার সেবাইত। ইনি আপনাকে বল্লভ-সম্প্রদায়ের বলিয়া পরিচয় দিলেন এবং জানাইলেন যে, নন্দগ্রাম হইতে নন্দ মহারাজ কুঞ্জেরা গ্রামে আসিয়া কিছুদিন বাস করিয়াছিলেন।

গ্রামে প্রবেশের মুখে কটি প্রস্তর-নির্ম্মিত দ্বিতল অট্টালিকা দৃষ্টিপথে পতিত হয়। জানা গেল, ঐ দালানটি কুঞ্জেরা গ্রামের অন্যতম জমিদার গোবর্দ্ধন সিংহের দালান। গোবর্দ্ধন সিং ও সোনপর সিং কুঞ্জেরা গ্রামের জমিদার। গত ১০ই অক্টোবর—যেদিন শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীকুঞ্জবিহারী মঠের শ্রীমন্দিরের কার্য্য আরম্ভ করাইবার জন্য মঠস্থ ভূমির প্রাঙ্গণে উপস্থিত ছিলেন, সেই সময় কুঞ্জেরা গ্রামের জমিদার গোবর্দ্ধন সিং শ্রী শ্রীল প্রভুপাদের দর্শনার্থ কুঞ্জবিহারী মঠের প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইয়া আচার্য্য-বন্দনা করিয়াছিলেন। আমরা যখন কুঞ্জেরা গ্রামে গোবর্দ্ধনজীর অট্টালিকায় উপস্থিত হইলাম, তখন তিনি তথায় উপস্থিত ছিলেন না। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা রঘুনাথ সিংহের সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হইল। তিনি আমাদিগকে বাঙ্গালী জানিয়া উক্ত অট্টালিকায় অবস্থিত গৌরদাস-নামক অল্পবয়স্ক একজন গৌড়ীয়বৈষ্ণব-নামে পরিচয় প্রদানকারী ব্যক্তির নিকট লইয়া গেলেন। গৌরদাস আপনাকে তথায় নবাগত এবং গদাধর-পরিবারের অন্তর্গত নবদ্বীপের কোন ব্যক্তির শিষ্য বলিয়া পরিচয় দিলেন। উক্ত গৌরদাস মাধুকরী করিবার পরিবর্ত্তে তাঁহার বাসস্থানের সংলগ্ন কোন ব্রজবাসী গৃহস্থের বাটীতেই ভোজনাদি করেন। তিনি বলিলেন,—ব্রজবাসী তাঁহাকে ভালবাসেন বলিয়া মাধুকরী করিতে দেন না।

কুঞ্জেরা গ্রাম বেশ নির্জ্জন-স্থান এবং প্রকৃত ভজনকারীর ভজনের অনুকূল। কিন্তু কপট ও অন্যাভিলাষ অনর্থযুক্ত ব্যক্তিগণের পক্ষে ভজনের পরিবর্ত্তে নানাপ্রকার বিঘ্নেরই যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। অনর্থযুক্ত অপক্ক সাধকগণ অনুক্ষণ নিয়ামক শ্রীগুরুপাদপদ্মের কীর্ত্তন শ্রবণ ও তাঁহার অধীনে বাস না করিয়া নির্জ্জনতা-ভোগের প্রচ্ছন্ন অভিলাষে যে ভজনের আনুকরণিক চেষ্টা প্রদর্শন করে, তদ্দ্বারা তাহাদের সমূহ অমঙ্গলই হইয়া থাকে। ব্রজের বিভিন্ন স্থানে প্রাকৃত-সহজিয়া, গৌরবাদী, সখীভেকী, মর্কটবৈরাগী নামাপরাধী, পাষণ্ডী সম্প্রদায়ের মধ্য হইতে বহু ব্যক্তি ভজনের অভিনয় করিতেছে। বলিতে ঘৃণা ও লজ্জা বোধ হয়,—কএকজন প্রত্যক্ষদর্শী আমাদিগকে স্বমুখে জানাইয়াছেন যে, শ্রীরাধাকুণ্ড প্রভৃতি স্থানে নির্জ্জন-ভজনানন্দীর মধ্যে এমন ব্যক্তিগণও প্রত্যক্ষ দেখিতে পাওয়া গিয়াছে—যাহারা অবৈধ লাম্পট্যের টোপের অনুসন্ধানে অনুক্ষণ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। কেহ কেহ এমনও জানাইয়াছেন যে, অল্পবয়স্কা মহিলা বা বিধবা পথিমধ্যে গমনকালে কোন কোন নির্জ্জন-ভজনানন্দী ঐ সকল রমণীকে ভগবন্নির্ম্মাল্য বা প্রসাদাদি-প্রদানের ছলে তাঁহাদের হস্তে প্রেমপত্র, দশ টাকা পাঁচ টাকার নোট প্রভৃতি প্রদান করিয়া কৌশলে পারকীয় প্রেম যাজ্ঞা করিয়া থাকে। অনাথা অবলা, বিশেষতঃ যদি দরিদ্রা বা দুর্ব্বলচিত্তবৃত্তিবিশিষ্টা হয়, তাহা হইলে তাহারা ঐ সকল প্রলোভনে অতি সহজেই প্রলুব্ধ হইয়া পড়ে। নির্জ্জন ভজনের ছলনা বা পরমহংসের বেষ গ্রহণ করিয়া এবং ধামবাসের ছল করিয়াও এই সকল অনর্থের প্রাবল্য দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা দেখিয়া এক শ্রেণীর নৈতিক ব্যক্তি নির্ম্মল বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রতি পর্য্যন্ত বীতস্পৃহ হইয়া পড়েন। সুতরাং ঐ সকল আনুকরণিক প্রাকৃত-সহজিয়া সম্প্রদায় কেবল যে নিজেকে নরকে পাতিত করিতেছে বা তাহাদের কবলে কবলিত কএকজনের সর্ব্বনাশ করিতেছে, তাহা নহে; পরন্তু তাহারা জগতে শুদ্ধ-বৈষ্ণবধর্ম্ম-প্রচারের পক্ষে প্রধান শত্রু হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সাধারণ লোক ঐ সকল ব্যক্তির আদর্শ দেখিয়া বৈষ্ণবধর্ম্ম বলিতে ব্যভিচার ও লাম্পট্যের ধর্ম্মই ভাবিয়া লইতেছেন। সুতরাং সেরূপ ধর্ম্ম হইতে বিরত থাকিয়া হরিসেবাহীন জাগতিক উপকার বা নাস্তিক্যধর্ম্মগুলি আধুনিক বাজারে সর্ব্বচিত্তাকর্ষক পরমধর্ম্ম হইয়া পড়িয়াছে। এজন্য শ্রীল গৌরকিশোর-দাস গোস্বামী প্রভু হরিভজনেচ্ছু ব্যক্তিগণকে সর্ব্বদা বলিতেন,— "আমার নিকট বসিয়া উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম কর, কৃত্রিমভাবে লীলা-স্মরণাদি করিতে গেলে অনর্থের ভূত ও মায়াপিশাচী আরও ভাল করিয়া তোমাদের ঘাড়ে চাপিয়া বসিবে।" তিনি আরও বলিতেন "আজকাল লোকগুলি শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুকে মুখ ভ্যাংচাইবার জন্য 'ভেকী' লইবার অভিনয় করে; ইহারা ভেক ত নেয় না, 'বেঙ্' সাজিয়া থাকে; বেঙের ন্যায় মায়ার কোলাহল করিতে করিতে লম্ফঝম্প ভাববিকার প্রভৃতি দেখাইয়া লাফাইতে লাফাইতে মায়াসর্পের গ্রাসে পতিত হয়।"

সংসার ও ভক্তি

অনেকে সংসারে অনাসক্তভাবে বাসের উপদেশ দিয়া থাকেন। কেহ বা বহির্ম্মুখ-সংসারকেই ভগবানের আদিষ্ট কর্ত্তব্য-পালনের স্থান মনে করিয়া মুখে ভগবানের দোহাই মাত্র দিয়া মনকে সান্ত্বনা প্রদান পূর্ব্বক সংসারের নানা প্রকার জ্বালা-যন্ত্রণা-সত্ত্বেও সংসার-ভোগেই প্ররোচিত করিয়া থাকেন। লৌকিক ব্যক্তিগণের নিকট হইতে সংসারে অধিকভাবে অভিনিবিষ্ট হইবার উপদেশের ছলে এই সকল প্ররোচনা পাওয়া যায়। আবার মায়াবাদি-সম্প্রদায় সংসারের সকল জিনিষের অনিত্যতা প্রতিপাদন করিয়া কৃষ্ণ ও কৃষ্ণসংসারেরও অনিত্যতা প্রচার করিয়া থাকে। যাহারা এই উভয় প্রকার চিন্তাস্রোতের ঘূর্ণিপাকে পতিত, তাহারা সংসারাবর্ত্ত হইতে কোন দিন উদ্ধার লাভ করিতে পারে না, তাহাদের ভক্তিলাভ ত' হয়ই না। সংসারের জ্বালা-যন্ত্রণায় ব্যথিত হইয়া খট্টাভঙ্গে ভূমি-শয্যা অবলম্বনের ন্যায় কেহ কেহ যে সাময়িক সংসার-বৈরাগ্য বা শ্মশান-বৈরাগ্য প্রদর্শন করিয়া থাকে, তাহার প্রতিক্রিয়া সংসারের প্রতি প্রবল আসক্তিই জন্মাইয়া দেয়। সৌভরি প্রভৃতি ঋষি সংসারে বৈরাগ্য প্রদর্শন করিবার পরও সংসার ভোগের পুনরাসক্তি দেখাইয়াছিলেন। কৃষ্ণে আসক্তি ব্যতীত—কৃষ্ণের সহিত নিত্যসম্বন্ধ-স্থাপন ব্যতীত অনাসক্তির ছলনাও দ্বিতীয় প্রকার সংসার বা নাস্তিকতা। নিরীশ্বর নাস্তিকগণ বা তথাকথিত সেশ্বর কর্ত্তব্য-পালন-বাদিগণ সংসার-আবর্ত্তে পতিত দুর্গত জীব।

সংসারাসক্তি জীবের স্বাভাবিক ধর্ম্ম; সংসার-প্রবৃত্তি প্রত্যেক জীবেই স্বাভাবিক। সেই স্বাভাবিক বৃত্তি বা স্বাভাবিক ধর্ম্মকে কখনও উচ্ছেদ করা যাইতে পারে না। স্বভাবের যে বিকৃতি বা বিপথ-গমন, তাহারই মোড় ফিরাইয়া দিলে অকৃত্রিম স্বভাব নিত্য স্বাস্থ্য ও মঙ্গল আনয়ন করে। আমাদের চেতনের বৃত্তিতে যে কৃষ্ণ-সংসারের সংসারী হওয়ার—কৃষ্ণ-সংসারে আসক্ত হওয়ার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি রহিয়াছে, তাহাই বর্ত্তমানে বিকৃত ও অনিত্যবস্তুতে নিযুক্ত হইয়া বন্ধদশার উদয় করাইয়াছে। মুক্তগণই কৃষ্ণ-সংসারে আসক্ত বা কৃষ্ণ-সংসারে আসক্তিই প্রকৃত মুক্তি।

ঈহা যস্য হরের্দ্দাস্যে কর্ম্মণা মনসা গিরা।
নিখিলাস্বপ্যবস্থাসু জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে।।

কৃষ্ণের অপ্রাকৃত নিত্য যোষিৎ গোপীগণ কৃষ্ণ-সংসারে আসক্ত। তাঁহাদের সংসারের ভৃত্যানুভৃত্য হইবার জন্য মহাযোগী শিব-ব্রহ্মাদি দেবতা, এমন কি উদ্ধব পর্য্যন্ত আকাঙ্ক্ষা করেন। সেই গোপীগণ কুরুক্ষেত্রের স্যমন্তপঞ্চকে কি বলিয়াছিলেন? (ভাঃ ১০।৮২।৪৮)—

আহুশ্চ তে নলিননাভ পদারবিন্দং
যোগেশ্বরৈর্হৃদি বিচিন্ত্যমগাধবোধৈঃ।
সংসার-কূপ-পতিতোত্তরণাবলম্বং
গেহং জুষামপি মনস্যুদিয়াৎ সদা নঃ।।

গোপীগণ ধ্যানযোগিগণের ন্যায় কৃত্রিম ধ্যানপরায়ণ নহেন; কেন না, কৃষ্ণ তাঁহাদের নিকট দূরের বিষয় নয় তাই তাঁহারা কৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন,—

চিত্ত কাঢ়ি' তোমা হৈতে, বিষয়ে চাহি লাগাইতে,
যত্ন করি, নারি কাঢ়িবারে।

গোপীগণের দেহ-স্মৃতিই নাই, তাঁহাদের আর কিরূপে সংসার থাকিবে? দেহই ত' সংসারের মূল। কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণ চেষ্টাই তাঁহাদিগকে আত্মসাৎ করিয়াছে। তাই তাঁহারা বহুদিনের পর স্যমন্তপঞ্চকে কৃষ্ণকে পাইয়া বলিয়াছিলেন,—

দেহ-স্মৃতি নাহি যা'র, সংসারকূপ কাঁহা তা'র,
তাহা হৈতে না চাহে উদ্ধার।
বিরহ-সমুদ্র-জলে কাম-তিমিঙ্গিলে গিলে,
গোপীগণে নেহ' তা'র পার।।
(চৈঃ চঃ ম ১৩।১৪২)

কৃষ্ণ-সংসার-সেবায় সুতীব্র বাসনা ও নিষ্ঠাই—ভক্তি, আর তৎপ্রতি উদাসীনতা, নিরপেক্ষতা বা বিরাগই —অভক্তি বা মায়ার সংসার। সাধারণের নিকট 'ভক্তি' শব্দের বিকৃত অর্থ প্রচারিত। ভক্তির সংজ্ঞা প্রদান করিতে গিয়া কোন কোন জড়সংসার-বদ্ধ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ভক্তিকে কাম-ক্রোধের ন্যায় বৃত্তিবিশেষ বলিয়াছেন। কাম-ক্রোধাদি যেরূপ হৃদয়ের সাময়িক উচ্ছ্বাস ও উত্তেজনা, ভক্তিও সেইরূপ কোন উচ্ছ্বাস-বিশেষ বা ভাব-প্রবণতাবিশেষ বলিয়াই অভক্তি-রাজ্যে পতিত গণ-মতের ধারণা। ভাব-প্রবণতা-ব্যঞ্জক আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া-কলাপ বা মানসিক ব্যাপারগুলি সাধারণের নিকট ভক্তি বলিয়া বিদিত; কিন্তু ভক্তিদেবী অব্যবিচারিণী। এক অখিলরসামৃতসিন্ধু কৃষ্ণপাদপদ্ম ব্যতীত উত্তমা ভক্তি আর কাহাকেও স্বীকার করে না। ভক্তির মূল মহাজন শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে ভক্তির এই সংজ্ঞা দিয়াছেন,—

সর্ব্বোপাধি-বিনির্ম্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলম্।।
হৃষীকেণ হৃষীকেশ-সেবনং ভক্তিরুচ্যতে।।

সমস্ত জড় উপাধি হইতে সর্ব্বতোভাবে মুক্তি, কৃষ্ণপরতাহেতু নির্ম্মলতা, সমস্ত ইন্দ্রিয়-দ্বারা ইন্দ্রিয়াধিপতি কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তর্পণই ভক্তি। অনেকে কৃষ্ণদাসাভিমানকেও উপাধি মনে করিয়া থাকেন এবং কৃষ্ণদাসাভিমান পরিত্যাগ করিতে যাঁহারা প্রস্তুত নহেন, তাঁহাদিগকে জড়-উপাধিতে অভিনিবিষ্ট মনে করেন। বস্তুতঃ কৃষ্ণ-দাস্যাভিমানকে জড় উপাধির ন্যায় জ্ঞানই মায়ার সংসার ও অভক্তি। কৃষ্ণপর না হইয়া যে নির্ম্মলতার অভিনয়, তাহারও কোন মূল্য নাই। কৃষ্ণ-সেবকই প্রকৃত-প্রস্তাবে নির্ম্মল।

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু উত্তমা ভক্তির লক্ষণে বলিয়াছেন,—

অন্যাভিলাষিতা-শূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম।
আনুকুল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা।।

কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণেচ্ছা ব্যতীত অন্য অভিলাষ-শূন্যতা, নির্ভেদজ্ঞান, স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত নিত্য-নৈমিত্তিকাদি কর্ম্ম, বৈরাগ্য, যোগ, সাংখ্যাভ্যাস প্রভৃতি পরিত্যাগ-পূর্ব্বক অনুকূল-ভাবে যে কৃষ্ণানুশীলন, তাহাই উত্তমা ভক্তি।

ভক্তির সহিত কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদির মিশ্রণ-চেষ্টা বা গোঁজামিল দিবার যাঁহারা পক্ষপাতী, তাঁহাদের উদারতার ছলনা অনর্থযুক্ত দুর্ব্বল পক্ষের ওকালতী মাত্র। বস্তুতঃ ভক্তি নিরপেক্ষা, সবলা, অহৈতুকী, অপ্রতিহতা ও নিত্যা। তাহা নিত্য, মুক্ত, শুদ্ধ আত্মার অহৈতুকী বৃত্তি, জীবের পরম ধর্ম্ম।

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি।।

(ভাঃ ১।২।৬।)

দুগ্ধের সহিত কিঞ্চিৎ চুণগোলা বা ভেজাল মিশাইবার পক্ষপাতিত্ব করিয়া ভেজাল-দুগ্ধ-বিক্রয়কারিগণের প্রতি উদারতা দেখাইলে খাঁটি দুগ্ধ-পানের ফল দেখা যাইবে না।

জয়দেব কবি গীতগোবিন্দে গাহিয়াছেন,—

কংসারিরপি সংসারবাসনাবদ্ধ-শৃঙ্খলাম্।
রাধামাধায় হৃদয়ে তত্যাজ ব্রজসুন্দরীঃ।।

(গীতগোবিন্দ ৩ সঃ ১)

শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা—যাহা অপ্রাকৃত কামদেব কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি বা সম্ভোগের জন্য বিহিত, সেই রসের মূল আশ্রয়ই শ্রীরাধা। 'সং' অর্থে—সম্যক্, সারভূতা যে রাসলীলা বাসনা, তাহা দ্বারা আবদ্ধ যে শৃঙ্খলরূপ শ্রীরাধিকা, তাঁহাকেই হৃদয়ে লইয়া শ্রীকৃষ্ণ অন্যান্য ব্রজসুন্দরীকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন।

কৃষ্ণ-সেবার মূর্ত্তিমান্ বিগ্রহ যিনি, সেই শ্রীমতী বৃষভানু নন্দিনীর আনখকেশাগ্র কৃষ্ণসেবার উপায়ন। তিনি কৃষ্ণময়ী, অন্তরে বাহিরে তাঁহার কৃষ্ণেন্দ্রিয়তৃপ্তি-বাঞ্ছা; এই জন্যই তাঁহার নাম রাধা। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামি প্রভুর ভাষায় বলা যায়,—

কৃষ্ণবাঞ্ছা-পূর্ত্তিরূপ করে আরাধনে।
অতএব রাধিকা নাম পূরাণে বাখানে।।

এই কৃষ্ণবাঞ্ছা-পূর্ত্তিই যাঁহার একমাত্র ব্রত, তাঁহার অনুগত জনগণের অনুগত হইয়া যে কৃষ্ণ-সংসারে প্রবেশ, তাহাই রূপানুগ-গণের ভক্তি।

বহির্ম্মুখ-সংসারে 'সং' অর্থাৎ অভিনয়ই সার, তথায় বাস্তবতা কিছুই নাই। এই সংসারের তিক্ত অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া অনেকে ইহাকে 'দিল্লীর লাড্ডু'র সঙ্গে তুলনা করিয়া থাকেন। কেহ কেহ ইহার তিক্ত অভিজ্ঞতার অনেক ছড়াও রচনা করিয়াছেন।

কৃষ্ণের সংসার সম্যক্ সারভূতা কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণ-চেষ্টায় পরিপ্লুত। তাহাতে তাহা পরম বাস্তব বস্তু। শ্রীরূপানুগবর গুরুপাদপদ্মের কৃপায় একান্ত সৌভাগ্যশালী ব্যক্তিরই শ্রীরাধাগোবিন্দের কুঞ্জসেবার সংসারে প্রবিষ্ট হওয়া যায়।

যাঁহারা কৃষ্ণসেবার সংসারের সন্ধান পান নাই, সেই সকল অন্যাভিলাষিব্যক্তি নিরীশ্বর ও সেশ্বরনৈতিক হইয়া এই সংসার ভোগ করিবার জন্য নানাপ্রকার পাটোয়ারী বুদ্ধি আঁটিয়া থাকেন। কেহ কেহ বলেন,—নীতি-পালন বা কর্ত্তব্যপালনই ধর্ম্ম, ইহাই ঈশ্বরের সেব্য; সুতরাং সংসারে সুখে বাস করিতে হইলে অর্থাৎ অন্যভাষায় বলিতে গেলে—সংসার ভোগ করিতে হইলে সামাজিক নীতিগুলি পালন না করিলে অপরের সহিত সংঘর্ষ উপস্থিত হয় এবং তদ্দ্বারা সংসারিক সুখ-ভোগের বিঘ্ন ঘটে। সুতরাং তাঁহারা কর্ত্তব্য ও নীতিপালনকে সংসারভোগের বাহন করিয়া নিরীশ্বরনৈতিকরূপে সংসারের অবশ্যম্ভাবী শত শত বাধা-বিঘ্নগুলির সহিত সংগ্রাম করিয়া জীবনের অবসান করিয়া থাকেন।

আর একশ্রেণীর ব্যক্তি সেশ্বরনৈতিক সাজিয়া বলিয়া থাকেন,—এই সংসার ভগবান্ই দিয়াছেন। স্ত্রী, পুত্র, পরিবার, লৌকিক আত্মীয়-স্বজন, দেশ, সমাজ—সকলই ভগবানের সৃষ্টি। সেই সকলের সেবা না করিলে—সেই সকল রক্ষা না করিলে ভগবানের আদেশ ও ইচ্ছা অমান্য করা হয়। কেহ কেহ প্রবৃত্তিধর্ম্মের বশীভূত হইয়া বলেন,—"যাঁহারা নিবৃত্তজীবন লাভ করিয়াছেন বা যাঁহারা লৌকিক সংসারে উদাসীন, তাঁহারা ভগবানের অভীপ্সিত সৃষ্টিরক্ষাকার্য্যে বাধাপ্রদানকারী"; সুতরাং ঈশ্বরের দোহাই দিয়া সংসারধর্ম্ম পালনের নামে সংসারভোগ, ঈশ্বরের সৃষ্টিরক্ষা বা সংসার প্রবাহরূপ ব্রহ্মা বা দক্ষের কার্য্যসংরক্ষণরূপ ধর্ম্ম পালন করিবার দোহাই দিয়া তাঁহারা স্ত্রীসঙ্গাদি কার্য্যে লিপ্ত হন। সংসারের ঘূর্ণিপাকে পতিত হইলে নানাপ্রকার ক্লেশ ও আশঙ্কা আছে দেখিয়া ইহারা সেই ক্লেশ এড়াইয়া সংসারভোগের আকাশ-কুসুমের উদ্যান রচনা করিবার জন্য অনেক প্রকার নীতি ও মতলব অবলম্বন করেন। কেহ কেহ জনকরাজার দোহাই দেন, কেহ বা হাতে তেল মাখিয়া কাঁঠাল ভাঙ্গিবার দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেন ইত্যাদি। কিন্তু এই সকল চিত্তবৃত্তির অন্দরমহলে হানা দিলে দেখিতে পাওয়া যায়,—সংসার ও ভোগ-পিপাসাই সেখানে পাটরাণী হইয়া বিরাজিত রহিয়াছে। সংসারভোগ-ব্রতই ইহাদের চরম লক্ষ্য, সংসারকে চিরদিন বজায় রাখিতে হইবে,—এই গৃহমেধী বুদ্ধিই ইহাদের মূল মন্ত্র; এই জন্য তাঁহারা 'সংসারে থাকিয়া কিরূপে ভক্তি করা যায়'—এইরূপ এই ছলনাময়ী কথা-দ্বারা আত্মবঞ্চনা ও লোকবঞ্চনা করিয়া থাকেন। তাই এই সকল লোকের মুখেই 'গৃহীর ব্রহ্মচর্য্য' 'সংসারীর সাধনা' প্রভৃতি অনেক প্রকার অন্যাভিলাষগর্ভ ধর্ম্মের উপদেশ শুনিতে পাওয়া যায়। এইরূপ কপটতাযুক্ত সংসারভোগপিপাসা থাকিলে কোন দিন মঙ্গল লাভ হয় না। এইরূপ কপটব্যক্তি কখনও

অনাসক্ত হইতে পারে না। কৃষ্ণসংসারে যাঁহাদের আসক্তি নাই, অথচ যাঁহারা জনক রাজার দোহাই বা হাতে তেল মাখিয়া কাঁঠাল ভাঙ্গিবার দোহাই দিয়া তাঁহাদের অনাসক্তির বিজ্ঞাপন প্রচার করেন, তাঁহারা অত্যন্ত কপট, অন্যাভিলাষী, দুর্দ্দমনীয়া সংসারভোগ পিপাসা আক্রান্ত জীব।

ঐ দুইপ্রকার নিরীশ্বর ও সেশ্বর সংসারভোগী ব্যতীত সংসারত্যাগের অভিনয়কারী কএক প্রকার প্রচ্ছন্ন সংসার ভোগী জীবও আছেন। কেহ কেহ সংসারের তিক্ত অভিজ্ঞতায় ক্ষুব্ধ হইয়া 'খট্টাভঙ্গে ভূমিশয্যা'-নীতি অবলম্বনপূর্ব্বক বৈধ সংসার ত্যাগ করেন; কিন্তু ঐরূপ ত্যাগ কেবল অতৃপ্ত ভোগবাসনার প্রতি ক্রোধ অর্থাৎ সংসারাসক্তিরই বিকার-বিশেষ বলিয়া তাঁহারা বনবাসী হইয়াও গীতার সংসার বা অবৈধ-সংসার পাতিয়া থাকেন। বান্তাশী বা বমনভোজী হইয়া কেহ কেহ সংসারে পুনরায় প্রবেশ করেন। রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের আদর্শে দেখিতে পাওয়া যায়,—কৌপীনধারী বৈষ্ণবের অভিনয় করিয়াও অপক্কাবস্থায় 'উজ্জ্বলনীলমণি' পাঠ করিবার অভিনয় করিয়া জীবের পুনরায় বিদ্ধশাক্তধর্ম্ম অর্থাৎ বহির্ম্মুখ-সংসারভোগ পিপাসায় রুচি হয়। তখন অপ্রাকৃত কামদেবের অপ্রাকৃত আদিরসকে, হৃদ্‌রোগবিনাশনী হরিলীলাকে বিকৃত প্রতিফলনে প্রতিফলিত করিয়া জীব সংসারভোগে প্রমত্ত হইয়া পড়ে। প্রাকৃত-সহজিয়াগণের ন্যায় চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতির পদাবলীসমূহ, রাইকানুর অপ্রাকৃতরসময়ী সংসারলীলা তখন সেই লীলার চরণে অপরাধ-ফলে অবৈধ সংসারভোগের যন্ত্র হইয়া পড়ে। বিদ্ধশাক্ত বা বহির্ম্মুখ শাক্তধর্ম্ম এই সংসারপ্রবৃত্তির প্রেরণা ও উত্তেজনাবর্দ্ধনের জন্যই ভগবন্মায়ার দ্বারা কল্পিত হইয়াছে; আর দেহস্মৃতিরূপ সংসারকূপে পতিত হইয়া অপ্রাকৃত কামদেবের লীলাভোগচেষ্টারূপ অপরাধ হইতে প্রাকৃত-সহজিয়াধর্ম্মরূপ সংসার-প্রবৃত্তির উদয় হইয়াছে।

অনেকে সহধর্ম্মিণীর ভক্তির প্রশংসা ও দোহাই দিয়া এবং তাঁহাকেই ভক্তিশিক্ষার গুরুরূপে বরণ করিয়া কৃষ্ণের সংসারের সংসারী বলিয়া আত্মপ্রচার করিয়া থাকেন; ইহাতে ভোগি-সম্প্রদায়কে ভোগা দেওয়া যায়, নিজের ভোগ-পিপাসাকেও ঐরূপ ভোগা দেওয়া যায়, কিন্তু ভক্তি, ভক্ত ও ভগবান্‌কে ভোগা দেওয়া যায় না।

যাঁহারা নিষ্কিঞ্চন মহাপুরুষের পাদপদ্ম আশ্রয় করিয়া অনুক্ষণ ভগবৎকথায় জীবন যাপন না করেন—ভগবৎসেবার অনুশীলন না করেন, তাঁহারা যত বড়ই হউন না কেন, সংসার হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারেন না। এই কথা শ্রীমদ্ভাগবত পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন।

আর একটি বিষয় জ্ঞাতব্য এই যে, কেবল বহির্ম্মুখ সংসার-নিবৃত্তিই চরম কথা নয়। সংসার-নিবৃত্তির পরে কৃষ্ণসংসার-প্রবৃত্তিই জীবের চরম প্রয়োজন। অন্যান্য ধর্ম্মে সংসার-নিবৃত্তি পর্য্যন্ত প্রয়োজন বা লক্ষ্যের কথা আছে। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতধর্ম্ম বা শ্রীগৌরসুন্দর সংসারনিবৃত্তির পরে কৃষ্ণ-সংসার-প্রবৃত্তির নানাপ্রকার চমৎকারিতার কথা জানাইয়াছেন। পণ্ডিত শ্রীবাস, রামানন্দ বসু প্রমুখ কুলীনগ্রামবাসিগণ, রঘুনন্দনাদি শ্রীখণ্ডবাসিগণ, শিবানন্দ সেনাদি, শ্রীদময়ন্তী দেবী বা বৈষ্ণব-গৃহিণীগণ যে সংসার করিবার আদর্শ জগতে

প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা বহির্ম্মুখ সংসার-নিবৃত্তির পর কৃষ্ণসংসার-প্রবৃত্তির আদর্শ। শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার গৃহস্থ-লীলায় যে আদর্শ প্রদর্শন করিযাছেন, তাহাও কৃষ্ণ-সংসার-প্রবৃত্তির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ। তাঁহার গৃহস্থ-লীলা বা সংসার-লীলায় আর একটি বিশেষ শিক্ষণীয় বিষয় আছে। সংসারাশ্রমে চিরদিন জীবের থাকিবারও অধিকার নাই। নিবৃত্ত-জীবনের আদর্শে হরিভজন করিবার আদর্শ জীবের প্রকাশিত হওয়া উচিত। সংসার আসক্তিতে জন্ম, আর সংসারাসক্তির মধ্যে মৃত্যু—এইরূপ জীবন শ্রেয়স্কামী ব্যক্তির জীবন নহে; তাই শ্রীমন্মহাপ্রভু লোকশিক্ষাকল্পে সংসারী জীবের আদর্শ প্রকাশ করিয়াও সন্ন্যাস-লীলা আবিষ্কার করিলেন।

কেহ কেহ বলিতে পারেন,—শ্রীজগন্নাথ মিশ্র, শ্রীশচীমাতা বা বসুদেব-দেবকী, কিংবা নন্দ-যশোমতী—ইঁহারা ত' বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত, এমন কি শেষ জীবন পর্য্যন্ত সংসারেই বাস করিয়াছিলেন? "পঞ্চাশোর্দ্ধং বনং ব্রজেৎ"—এই স্মৃতিবাক্য পালন করিবার প্রয়োজন তাঁহাদের হয় নাই; কেন না, বহির্ম্মুখ সাধক জীবের প্রতি যে দণ্ড ব্যবস্থিত, তাঁহারা সেই দণ্ডের আসামী নহেন। তাঁহাদিগের নিত্যসিদ্ধ সংসার। সেইরূপ সংসারের তৃণ-গুল্ম-লতা-জীবনও প্রত্যেক জীবের কাম্য। তাঁহারা কি কৃষ্ণকে ছাড়িয়া বনে যাইবেন? কৃষ্ণের সেবা ছাড়িয়া কৃষ্ণবিমুখ জীবের বৈরাগ্য প্রদর্শন করিবেন? তাঁহাদের সেই নিত্যসিদ্ধ ভাবেরই অবৈধ অনুকরণ ও বিকৃত প্রতিফলন এই জগতের ভোগাসক্ত জীবে দেখিতে পাওয়া যায়। অত্যন্ত ভোগাসক্ত সংসারী জীব অতি বৃদ্ধকাল পর্য্যন্ত এই সংসারেই আসক্ত হইয়া বাস করে। পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র প্রভৃতির বৃথা মায়ায় মুগ্ধ হইয়া শেষ নিঃশ্বাস বহির্ম্মুখ গৃহে ও সংসারে নিযুক্ত করিয়া থাকে। ইহা সেই সকল অপ্রাকৃত বাৎসল্য-রস-রসিক নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণ-সেবক শ্রীজগন্নাথ মিশ্রে বা শ্রীনন্দে নিত্য প্রকাশিত।

গর্ভস্থ জীবের হরি-স্তুতি

শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধের ৩১শ অধ্যায়ে কপিলদেব মাতা দেবহূতিকে এবং শ্রীচৈতন্যভাগবতের মধ্যখণ্ডের ১ম অধ্যায়ে শ্রীগৌরসুন্দর শচীমাতাকে গর্ভস্থ জীবের সপ্তম মাসে জ্ঞানোদয়ের পরে যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের পাপস্মরণপূর্ব্বক অনুতাপ ও ভগবৎস্তুতির কথা বলিয়াছেন, সেইরূপ জীবের ভূমিষ্ঠ হইবার পর ভগবদ্‌বিস্মৃতি ও সংসারে অভিনিবেশ কিরূপেই বা সম্ভব, তদ্বিষয়ে অনেকেরই হৃদয়ে সন্দেহ উপস্থিত হইয়া থাকে। শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধের ৩১শ অধ্যায়ের ১২শ হইতে ২১শ শ্লোকে গর্ভস্থ জীব স্তুতি-সহকারে যে-সকল তত্ত্বকথা বলিয়াছে, সেইরূপ জীবের স্বরূপভ্রম ও সংসারদশা-প্রাপ্তি অসম্ভব ব্যাপার বলিয়াই মনে হয়। কোন কোন সিদ্ধান্তে ঐ সময়ে গর্ভস্থ জীব ক্ষণিক ভগবদ্দর্শনও লাভ করিয়া থাকে।

শ্রীমদ্ভাগবতেও দেখা যায় যে, ঐরূপ শরণাগত স্তুতিকারী জীব দশমাসে ভূমিষ্ঠ হইয়া পূর্ব্বস্মৃতি-ভ্রষ্ট হয়। (ভাঃ ৩।৩১।২২-২৩)

ভগবৎস্তুতিকারী শরণাগত জীবের বা ভগবদ্দর্শনকারী জীবের পক্ষে একান্ত হরিবিস্মৃতি ও অত্যন্ত সংসারাভিনিবেশ যেন সিদ্ধান্তসম্মত বলিয়া মনে হয় না। শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভু সন্দর্ভে এই সন্দেহের সমাধান করিয়াছেন,—

"অতো যদত্র তৃতীয়ে (ভাঃ ৩।৩১।১২-২১) গর্ভস্থস্য জীবস্য ভগবতঃ স্তুতিঃ শ্রূয়তে, তস্যৈব চ সংসারোঽপি বর্ণ্যতে, তত্রোচ্যতে,—জাত্যৈকত্বেন তদ্বর্ণনমিতি; বস্তুতস্তু **কশ্চিদেব জীবো ভাগ্যবান্ ভগবন্তং স্তৌতি। স চ নিস্তরত্যপি; ন তু সর্ব্বস্যাপি ভগবজ্জ্ঞানং ভবতি।**"—(ভক্তিসন্দর্ভ ১৫১ সংখ্যা)

অর্থাৎ ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধে গর্ভস্থ জীবের ভগবৎ স্তুতি এবং তাহারই পুনরায় যে সংসার বর্ণিত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে সিদ্ধান্ত এই যে, ভগবৎস্তুতিকারী ও সংসারদশাগ্রস্ত জীব ব্যক্তিগতরূপে এক নহে, পরন্তু তাহারা ভিন্ন ভিন্ন। ঐ স্থলে জীবত্বজাতি অনুসারে উভয়ের ঐক্যনিবন্ধনই একরূপে বর্ণিত হইয়াছে। **বস্তুতঃ গর্ভদশায় কোন ভাগ্যবান্ জীবই ভগবান্‌কে স্তুতি করেন এবং উক্ত ভগবদ্ভক্তি-বলে সংসার হইতে উত্তীর্ণও হইয়া থাকেন; পরন্তু সকল গর্ভস্থ জীবেরই ভগবজ্জ্ঞান হয় না।**

এস্থলে সংশয় হইতে পারে, তাহা হইলে কি সপ্তম মাসে জ্ঞানোদয়ের পরে একমাত্র ভাগ্যবান্ জীব-ব্যতীত অপরের কোন প্রকার শুভ স্মৃতির উদয় হয় না, বা তাহারা তাহাদের **পূর্ব্ব জন্মের বিষয়ও স্মরণ** করিতে পারে না? শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত এই যে, সকল জীবেরই সপ্তম মাসের পরে স্মৃতির উদয় হয়, এবং সকল জীবই স্মৃতিযুক্ত হয় বলিয়াই একসঙ্গে ঐরূপ ভগবৎস্তুতিকারি জীবের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

গর্ভস্থ জীবের **তিন প্রকার** অবস্থা দেখা যায়। (১) এক প্রকার জীবগণ পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্ম মাত্র স্মরণ করিয়া থাকে, (২) অন্যপ্রকার জীবগণ সাংখ্যযোগাদির অভ্যাস করে এবং (৩) অপর জীবগণ **পরম পুরুষের অনুশীলন** করিয়া থাকেন। ভগবজ্জ্ঞান অতি সৌভাগ্যবান্ জীবেরই হইয়া থাকে। **যে সকল জীব একান্ত ভগবদ্‌বিস্মৃতি ও অত্যন্ত সংসারদশা প্রাপ্ত হয়, তাহাদের পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্ম মাত্র স্মরণ হয়, গর্ভবাসকালে তাহাদের ভগবজ্জ্ঞান হয় না।**

"একে পূর্ব্ব-পূর্ব্ব-জন্মমাত্রং স্মরন্তি; একে সাংখ্যযোগাদিকমভ্যস্যন্তি; একে তু পরমপুরুষমিতি। যথোক্তং তত্রৈব তৈঃ—"নবমে সর্ব্বাঙ্গ-সম্পূর্ণো ভবতি" ইতি পঠিত্বা, "মৃতশ্চাহং পুনর্জাতো জাতশ্চাহং পুনর্মৃতঃ" ইত্যাদিতদ্ভাবনা-পাঠানন্তরম্,—

"অবাঙ মুখঃ পীড্যমানো জন্তুভিশ্চ সমন্বিতঃ।
সাংখ্যযোগং সমভ্যসেৎ পুরুষং বা পঞ্চবিংশকম্।
ততশ্চ দশমে মাসি প্রজায়তে" ইত্যাদি।

অত্র "পুরুষং বা" ইতি বা-শব্দাৎ কস্যচিদেব ভগবজ জ্ঞানমিতি গম্যতে।"—(ভক্তিসন্দর্ভ ১৫১ সংখ্যা)

এক প্রকার জীবগণ পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মমাত্র স্মরণ করিয়া থাকেন, অন্য প্রকার জীবগণ সাংখ্যযোগাদির অভ্যাস করেন এবং অপর জীবগণ পরমপুরুষের অনুশীলন করেন। অতএব উক্ত শাস্ত্রকারগণ উক্ত শাস্ত্রেই ''জীবের নবম মাসে সর্ব্বাঙ্গ সম্পূর্ণ হয়''—এইরূপ বলিয়া তৎপর ''আমি মৃত হইয়া পুনরায় জাত এবং জাত হইয়া পুনরায় মৃত হইতেছি''—এইরূপে তাহার পূর্ব্বস্মৃতির কথা উল্লেখপূর্ব্বক অবশেষে—''উক্ত জীব তৎকালে গর্ভাশয়ে নিম্নমুখে অবস্থিত, পীড়িত এবং কৃমি প্রভৃতি জন্তুগণে সমন্বিত হইয়া সাংখ্যযোগের অভ্যাস বা পঞ্চবিংশতিতত্ত্বস্বরূপ পুরুষের অনুশীলন করেন; অনন্তর দশম মাসে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন'' ইত্যাদি বর্ণন করিয়াছেন। এস্থলে—''পঞ্চবিংশতিতত্ত্বস্বরূপ পুরুষের অনুশীলন''—এইবাক্যে 'বা'—এই বিকল্প-বাচক পদের দ্বারা কোন একটি জীবের মাত্র ভগবজ্জ্ঞান অবগত হওয়া যায়।

অতএব যে সকল গর্ভস্থ জীব জ্ঞানলাভের পরে ভগবৎস্তুতি করিয়া থাকেন, তাঁহারা সাধারণ জীবের ন্যায় সংসার-গ্রস্ত বা পাপ-পুণ্যাদির অধীন হন না, তাঁহারা জন্মগ্রহণ করিয়া সাধুসঙ্গ লাভ ও গুরুপাদাশ্রয় পূর্ব্বক হরিভজন করিয়া থাকেন। ভূমিষ্ঠ হইবার পর তাঁহাদের ভগবৎস্মৃতি বিলুপ্ত হয় না,—

''কশ্চিদেবান্যো জীবঃ স্তৌত্যন্যঃ সংসরতীত্যেব মন্তব্যম্।''

—(ভক্তিসন্দর্ভ ১৫১ সংখ্যা)

অর্থাৎ শ্রীমদ্ভাগবতে যে গর্ভস্থ জীবের ভগবৎস্তুতির কথা বলা হইয়াছে, তদ্বিষয়ে সিদ্ধান্ত এই যে, কোন জীব ভগবানের স্তুতি করিতেছেন এবং অপর জীব সংসারগ্রস্ত হইতেছে,—এইরূপই জানিতে হইবে।

আরাধ্যবস্তু কি 'ঘুষখোর'?

সংস্কৃত 'ঘুষ' ধাতু হইতে দেশজ 'ঘুষ'-শব্দ নিষ্পন্ন। 'ঘুষ্'-ধাতুর এক অর্থ বধ করা; যাহা সত্য ও ন্যায়কে বধ করিয়া প্রতিবন্ধকতা নাশ করে, তাহাই 'ঘুষ'। অথবা 'ঘুষ্'-ধাতুর অপর অর্থ শব্দ করা। যাহা প্রতিকূল শব্দ করিতে দেয় না অর্থাৎ সত্যবক্তার মুখ বন্ধ করিয়া দেয়, তাহাই 'ঘুষ'। 'ঘুষ'-ধাতুর অন্য এক অর্থ—প্রতিজ্ঞা করা, যাহার প্রভাবে বা প্রাপ্তিতে অপরের স্বার্থ-সাধনের প্রতিজ্ঞা করা হয়।

'ঘুষ' অনেক প্রকারের হইতে পারে,—অনেক প্রকারের হইলেও তাহা এই তিনটি প্রধান শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হয়;— (১) কনক-ঘুষ, (২) কামিনী ঘুষ ও (৩) প্রতিষ্ঠা ঘুষ। জগতের হরিবিমুখ জীবমাত্রই স্বভাবতঃ অসদ্বিষয়ে লোভী বলিয়া ঐ তিন প্রকার ঘুষের যে কোন একটিতে বা তিনটিতেই অতি সহজে লুব্ধ লইয়া পড়ে। হরিবিমুখ লোক যতই মুখে তাঁহার সাধুতা খ্যাপন করুন না কেন এবং যত বড় নীতিধর ও নির্লোভ বলিয়া জগতে সুবিখ্যাত থাকুন না কেন, জ্ঞানে বা অজ্ঞানে তিনি ঐ তিনপ্রকার ঘুষের কোন না কোন একটির অবশ্যই দাসত্ব করিয়া থাকেন। পশ্চিমদিকে সূর্য্যের উদয় কদাপি সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু হরিবিমুখতা

থাকা-কালে কেহ অন্তরে ও বাহিরে ঘুষখোর নহেন, একথা অসম্ভব। এক মহাভাগবত বৈষ্ণব ও তাঁহার অকপট অনুগ-সম্প্রদায় ব্যতীত সকলেই ন্যূনাধিক ঘুষখোর। অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী, ব্রতী, তপস্বী, সেশ্বর বা নিরীশ্বর নীতিবাদী—সকলেই ন্যূনাধিক ঘুষখোর।

অপস্বার্থ-সাধনের সহজতম কৌশল এই ঘুষ দেওয়ার প্রবৃত্তিকে দৈবীমায়া পরমেশ্বর পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত করিবার জন্য তিনিই আমাদিগকে পরামর্শ দিতেছে। পরমেশ্বরের মুখ বন্ধ-কর, পরমেশ্বরের সেবক-সম্প্রদায়ের মুখ বন্ধ কর, তাহা হইলে অতি সহজে অনায়াসে তোমাদের ইন্দ্রিয়তর্পণ-যজ্ঞ উদ্‌যাপন করিতে পারিবে। দেবতাদিগকে এই ঘুষ দেওয়ার প্রবৃত্তি মানবের চিন্তাস্রোতে আবহমানকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে এবং তাহা 'ধর্ম্ম-কর্ম্ম' নামে প্রচারিত রহিয়াছে। ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ প্রভৃতি দেবতাকে ঘুষ দেওয়ার কথা বৈদিক সাহিত্যের মধ্যেও দেখিতে পাওয়া যায় এবং তাহা কেবল না কোন আকারে সকল ধর্ম্ম সম্প্রদায়েই ন্যূনাধিক প্রচলিত আছে। শীতল্য, ষষ্ঠী, শনি, রক্ষাকালী, এমন কি, লক্ষ্মী, সরস্বতী প্রভৃতিকে ঘুষ দিয়া তাঁহাদের নিকট হইতে অপস্বার্থ দোহন করিবার প্রবৃত্তি কোন না কোন আকারে বা প্রকারে বহির্ম্মুখমানবজাতি মাত্রেই রহিয়াছে। অতি শিশুও তাহার জ্ঞানের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে এই ঘুষ দেওয়ার প্রবৃত্তি সহজেই আয়ত্ত করিয়া লইতেছে। পঞ্চদেবতা, যথা—সূর্য্য, গণেশ, শক্তি, রুদ্র ও কল্পিত বিষ্ণু (?) ইঁহাদিগকে ঘুষ দেওয়ার প্রবৃত্তি হইতে এবং ইহাদের নিকট হইতে যথাক্রমে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ ও মিছাভক্তি দোহনের চেষ্টায় জগতে পঞ্চোপাসনা সৃষ্ট হইয়াছে। অনেকে বলেন, এই পঞ্চোপাসনার কথা বৈদিক সাহিত্যেও দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? বৈদিক সাহিত্য মানবের নিসর্গের কথাই ব্যক্তি করিয়াছেন, আবার তৎসঙ্গে বেদের শিরোভাগ উপনিষদে ইহাও জানাইয়াছেন যে, ঐরূপ প্রেয়ঃপথ আত্যন্তিক শ্রেয়ের পথ নহে।

কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতাঃ।;
তং তং নিয়মমাস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া।।
যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চ্চিতুমিচ্ছতি।
তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্।।
স তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তস্তস্যারাধনমীহতে।
লভতে চ ততঃ কামান্ ময়ৈব বিহিতান্ হি তান্।।
অন্তবত্তু ফলং তেষাং তদ্ভবত্যল্পমেধসাম্
দেব দেবযজো যান্তি মদ্ভক্তা যান্তি মামপি।।

(গীঃ ৭।২-২৩)

কামাত্মানঃ স্বর্গপরাঃ জন্মকর্ম্মফলপ্রদাম্।
ক্রিয়াবিশেষবহুলং ভোগৈশ্বর্য্যগতিং প্রতি।।
ভোগৈশ্বর্য্যপ্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাম্।
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে।।
ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন।
নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বস্থো নিযোগক্ষেম আত্মবান্।।
যাবানর্থ উদপানে সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে"।
তাবান্ সর্ব্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ।।

(গীঃ ২।৪৩-৪৬)

ঘুষখোর দেবতা না হইলে বহির্ম্মুখ মানব-জাতির তাঁহাকে আরাধ্য-বস্তু(?) বলিয়া স্বীকার করিতে প্রবৃত্তি হয় না। যে দেবতাকে সহজে বশীভূত করা যায়, তাঁহারই প্রতি আমাদের স্বাভাবিক পক্ষপাতিত্ব বা রুচি হইয়া থাকে। ইষ্টদেবতার নির্ব্বাচনে ঐ রুচি দেবতার ব্যক্তিত্বের প্রতি নহে, রুচি আমাদের ইন্দ্রিয়-তর্পণ ও তাহার সুলভতার তারতম্যের প্রতি। অধোক্ষজ-বিষ্ণু ঘুষখোর নহেন বলিয়া তৎপ্রতি অনেকেই বিরাগী। আবার অনেকে অধোক্ষজ বিষ্ণুবস্তুকে অন্যান্য ঘুষখোর দেবতাগণের পংক্তিতে টানিয়া আনিবার জন্য নানাপ্রকার যুক্তি-জাল বিস্তার করিতেও পশ্চাৎপদ হন না। তাঁহারা বলেন,—"বিষ্ণুর কেন অদ্বিতীয় আসন থাকিবে? বিষ্ণুও যেই, সূর্য্যও সেই, গণেশও সেই, মহামায়াও সেই, রুদ্রও সেই! এক বস্তুকেই আমরা ভিন্ন ভিন্ন নাম দিয়াছি এবং **আমাদের রুচি** অনুযায়ী (?) যে মূর্ত্তি আমাদের নিকট যেরূপভাবে ঘুষ খাইয়া আমাদের অভিলাষ পূরণ করিতে পারেন, আমরা সেইরূপ ভাবেই তাঁহাকে ভজনা (?) করিয়া (ঘুষ দিয়া) আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধি করিয়া লইব! এই ঘুষ দেওয়ার বিভিন্ন প্রণালী লইয়া মারামারি করা উচিত নহে, সকলই যখন মূলতঃ এক ঘুষ, তখন যিনি যে ভাবেই ঘুষ দিন না কেন, সবই সমান; বাহ্য আকার মাত্র ভেদ। আর সকল দেবতাই যখন 'ঘুষখোর', তখন সকলেই এক!" অধোক্ষজ-বিষ্ণু যে ঘুষখোর নহেন, কেবলমাত্র সকলের সর্ব্বস্বহরণকারী, বলীর ছলনাকারী, ইহা যাঁহারা জানেন না, তাঁহারাই বিষ্ণুকে মানবের রুচির ছাঁচে সৃষ্ট বা কল্পিত দেবতার সঙ্গে সমান করিবার চেষ্টা করেন; এজন্য ব্যাসদেব বলিয়াছেন,—

'বিষ্ণৌ সর্ব্বেশ্বরেশে তদিতরসমধীর্যস্য বা নারকী সঃ'

যাঁহারা বিষ্ণুর শ্রীচরণে তুলসী (?) ঘুষ বা তাঁহাকে মিষ্টান্ন ঘুষ কিংবা তাঁহার নামাক্ষর গ্রহণ করিবার অভিনয় ঘুষ প্রদান করাকে অন্যায় (অপরাধ) বলিয়া শুনিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে আবার কেহ কেহ, অন্ততঃ আমি, বিষ্ণুর প্রিয়তম সেবক বা বিষ্ণুর প্রিয় ভক্ত-সম্প্রদায়কে ঘুষ দেওয়া, বিষ্ণুকে ঘুষ দেওয়া অপেক্ষা ও স্বার্থসিদ্ধির অধিকতর সহজপথ বলিয়া বাছিয়া লইয়াছি। অসদ্‌গুরু, ব্যবসায়ী গুরু (?) যে ঘুষ গ্রহণ করেন,

ইহা ত' ন্যূনাধিক সকলেই জানেন; কিন্তু যে অধোক্ষজ বিষ্ণুর প্রিয়তম সেবক কোন প্রকারে ঘুষ গ্রহণ করেন না, তাঁহাকে যদি কোন কলে-কৌশলে একবার ঘুষের নেশা ধরাইতে পারা যায় (?), তাহা হইলে আমি সকলের উপর বাজী জিতিলাম মনে করি; তাই তাঁহার মুখ বন্ধ করিবার জন্য কখনও তাঁহার স্তুতিগান, কখনও কপট আনন্দ প্রকাশ, কখনও কপট 'কাঁদুনি', কখনও তাঁহার সম্মুখে আমার অমানুষী কার্য্য ক্ষমতার প্রদর্শনী উন্মোচন, কখনও তাঁহার হরিকীর্ত্তন প্রচারে সহায়তা করিবার ছলনায় দ্রবিণাদি ঘুষ প্রদান করিয়া থাকি। যখনই তিনি আমাদের প্রতি বিরূপ হইতে পারেন মনে করি, তখনই বা তাহার পূর্ব্বাহ্ণেই কিছু কিছু ঘুষ দিয়া তাঁহার মুখ বন্ধ করিবার চেষ্টা করি। অন্তরে অন্তরে বলি, "দোহাই প্রভু মুখ খুলিও না, আমার ইন্দ্রিয়-তর্পণে বাধা দিও না, আচ্ছা তোমাকে বিভিন্ন প্রকারের কিছু কিছু দ্রবিণ ঘুষ দিতেছি। তুমি অন্ততঃ মৌখিক প্রসন্ন থাক, তাহা হইলে লোকের কাছে আমার ইন্দ্রিয়তর্পণগুলি তোমা দ্বারাই সমর্থিত, ইহা প্রমাণ করিয়া দিতে পারিব। তুমি হরিকীর্ত্তন-যজ্ঞ, জীবের চরমকল্যাণ সাধন-ব্রত আরম্ভ করিয়াছ, বেশ; কিন্তু আমি অন্ততঃ সময় সময় তোমাকে ঘুষ দিয়া তোমার মুখ বন্ধ করিয়া রাখিব, যেন তুমি অন্ততঃ আমাকে তোমার হরিসেবাময় ইন্দ্রিয়তর্পণ-যজ্ঞের ইন্ধনরূপে আহ্বান না কর, আমার রুচির পথেই আমাকে চলিতে দাও, আমার ইন্দ্রিয় তর্পণকেই সমর্থন করিয়া যাও, অন্ততঃ ভাল না বল, মন্দ বলিও না, মুখ খুলিও না হাটে হাঁড়ি ভাঙ্গিয়া দিও না; তুমি তোমার অন্তরে আমার প্রতি যাহাই পোষণ কর না কেন, আমার বিরাট স্তাবক-সম্প্রদায় যেন বুঝিতে না পারে, তুমি আমার প্রতি কিরূপ, আমার রুচির নির্ব্বাচিত কার্য্য তোমার ইন্দ্রিয়তর্পণকর নহে, তোমার অনুমোদিত নহে।" অন্ততঃ এইজন্য আমি অধোক্ষজবিষ্ণুর প্রিয়তম বস্তুকে ঘুষ দিতে উদ্যত হই! এক প্রবন্ধলেখক তাঁহার প্রবন্ধে আচার্য্যের ও গৌড়ীয় মঠের খুব প্রশংসা করিতেন, প্রসাদের খুব মাহাত্ম্য ব্যাখ্যা করিতেন স্তুতি-ঘুষ প্রদান করিয়া কিছু অপস্বার্থ দোহন করাই যে তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল, তাহা অনতিবিলম্বেই প্রকাশিত হইয়া পড়িল। তাঁহার ইন্দ্রিয়ের ইন্ধন যোগাইতে না পারায় তিনি অসন্তুষ্ট হইয়া পড়িলেন। এরূপ অনেক দৃষ্টান্তই পাওয়া যায়।

অনেকবারই শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে শ্রবণ করিয়াছি যে, আমার সম্ভোগের জন্য কৃষ্ণ বা বিষ্ণুকে আহ্বান—যাহা 'একবার হৃদয়ে এসে দাঁড়িয়ে বাজাও বাঁশরী' প্রভৃতি সম্ভোগবাদীর গীতির মধ্যে প্রকাশিত, তাহা আমার কাম বা ভোগমাত্র, তাহা ভক্তি বা 'সেবা' নহে। আমার কার্য্যের জন্য তাঁহাকে আহ্বান, ইহা আমার ইন্দ্রিয়-তর্পণ, আর তাঁহার কার্য্যের জন্য তাঁহার আহ্বানে আমার অভিগমন বা অভিসার তাঁহার ইন্দ্রিয়তর্পণ। গোপীগণ কৃষ্ণের আহ্বানে, কৃষ্ণের কাম চরিতার্থ করিবার জন্য অভিসার করিয়া থাকেন, —ইহার নাম প্রেম; আর আমার কাম কৃষ্ণকে দিয়া চরিতার্থ করাইবার জন্য যে তাঁহাকে আহ্বান ও তজ্জন্য ঘুষ-প্রদান, তাহাই আমার ইন্দ্রিয়তর্পন বা ভোগ।

আমি গুরুদেবের অপ্রাকৃত কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণময় আহ্বানে অভিগমন করিতে পারিতেছি না, এ দুঃখের কথা বলিয়া শেষ করা যায় না। কোথায় সেই জন্য দিবারাত্র তাঁহার কাছে আমার হৃদয়ের বেদনা জানাইব,

আমার দুর্দ্দৈবকে শত-শত ধিক্কার দিয়া অকপটে ক্রন্দন করিব, গুরুদেবের হরিসেবাময় ইন্দ্রিয়তর্পণে ও আহ্বানে যাঁহারা সর্ব্বস্ব ডালি দিয়াছেন, সেই আদর্শ বরণ করিব, তাঁহার কার্য্যের জন্য যখন তিনি আমাকে আহ্বান করিবেন, তখন কোথায় "নাচিতে নাচিতে তাঁহার কাছে যাইব", কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে তিনি যেন তাঁহার কার্য্যের জন্য আমাকে আহ্বান না করেন, তিনি যেন তাঁহার সেই নিত্য আহ্বানের মুখ বন্ধ করিয়া রাখেন, আমার মঙ্গলের কথা কীর্ত্তন না করেন, অর্থাৎ আমাকে চির-গৃহব্রত ও আবৃত থাকিতেই প্রশ্রয় দেন, সে জন্য আমি নানা প্রকার ঘুষ আবিষ্কার করিয়াছি। কীর্ত্তনকারী গুরুদেবের কীর্ত্তনের মুখ বন্ধ করাই আমার উদ্দেশ্য। তিনি কীর্ত্তন করিলে পাছে আমার ভোগে বাধা পড়ে! আমি আমার কার্য্যের জন্য তাঁহাকে (?) আহ্বান করিতেছি! 'হৃৎকমলে বামে হেলে দাঁড়িয়ে বাজাও বাঁশরী' মিছাভক্ত-সম্প্রদায়ের এই কামের পথ অনুসরণ করিতেছি! আমার কার্য্যের জন্য তুমি এস, তোমাকে ঘুষ দিব!

কপটতা করিয়া, লোকের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া বা নিজের শুদ্ধ বিবেকের চক্ষে যবনিকা টানিয়া হয়ত' বলিতে পারি, "আমি ত তাঁহার কার্য্যের জন্যই সব করিতেছি। তিনি যে কার্য্য ভালবাসেন, সেই কার্য্যই আমি তাঁহার হইয়া করিয়া দিতেছি, অতএব ইহা তাঁহার ইন্দ্রিয়তর্পণ নহে কেন" কিন্তু আমার এই কপট কূটবুদ্ধির মধ্যে যে মায়া প্রবেশ করিয়াছে, তাহা আমি ধরিতে পারিতেছি না। আমার প্রেয়ঃকে তাঁহার প্রেয়ঃ বলিয়া চালাইবার কপটতা কখনও তাঁহার (আরাধ্যের) প্রকৃত প্রেয়ঃ নহে। আমি অনর্থযুক্ত, অনর্থযুক্তের প্রেয়ঃ কৃষ্ণের প্রেয়ঃ বা আমার শ্রেয় নহে। কিন্তু আমার শ্রীগুরুপাদপদ্মের প্রেয়ঃ—কৃষ্ণের প্রেয়ঃ এবং তাহা সমগ্র বিশ্বের শ্রেয়ঃ। তাঁহার অনুকরণ করিয়া আমার প্রেয়ঃকে তাঁহার (গুরুদেব বা কৃষ্ণের) প্রেয়ঃ বলিলে কামারকে ইস্পাত ফাঁকি দেওয়া হইবে। আমার যেটি ভাল লাগে, যাহাতে আমার কনক, কামিনী ও প্রতিষ্ঠা-প্রাপ্তি আছে, সেই কার্য্যটি পছন্দ করিয়া লইয়া তাহাকে কৃষ্ণের প্রেয়ঃ বলিয়া চালাইবার চেষ্টা শরণাগতভক্তের আদর্শ নহে। সর্ব্বতোভাবে আত্মসমর্পণকারী অহৈতুক ভগবদ্ভক্ত নিজের প্রেয়ঃকে কৃষ্ণের দ্বারা অনুমোদন করাইয়া লইতে চাহেন না। সর্ব্বাগ্রে কৃষ্ণপ্রেষ্ঠে সর্ব্বাত্মসমর্পণ করিয়া তাঁহারই অকপট মনোঽভীষ্ট বা ইন্দ্রিয় তৃপ্তিকে (নিজের আপাতসুখকর না হইলেও) সর্ব্বাত্ম-দ্বারা সেবা করিয়া থাকেন।

অনেক সময় আমরা শ্রীগুরুদেবের নিকট অনেক কিছুর জন্য অনুমতি প্রার্থনা করিয়া থাকি; কিন্তু সেইগুলি শ্রীগুরুদেবের ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকর কার্য্য, না আমার ইন্দ্রিয় তৃপ্তির কার্য্যের জন্য তাঁহার মৌখিক অনুমোদন লাভের স্পৃহা, ইহা বিশেষভাবে বিচার করিতে হইবে। আমি কৃষ্ণসেবা ছাড়িয়া বাড়ী যাইতে চাহি, আমি শ্রীগুরুদেবের সেবা পরিত্যাগ করিয়া, বহির্ম্মুখ সংসারের চাকুরী করিতে ইচ্ছা করি, আমি বিবাহ করিতে ইচ্ছা করিয়াছি, তজ্জন্য শ্রীগুরুদেবের অনুমোদন প্রার্থনা করায় অর্থাৎ আমার পূর্ব্বনির্দ্ধারিত প্রবল-ইন্দ্রিয়-তর্পণেচ্ছাকে তাঁহার অনুমতি (?) দ্বারা সমর্থন বা শুদ্ধ করিয়া লইবার চেষ্টা এবং তজ্জন্য তাঁহাকে নানা-আকারে ঘুষ-প্রদান কি গুরুদেবের সেবা, না আত্মবঞ্চনা? এরূপ আত্মবঞ্চনা আর কতদিন চালাইব? আত্মবঞ্চনা করিয়া ত' জন্মজন্মান্তর কাটাইলাম, নিজের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য জন্মজন্মান্তরে বিভিন্ন মাতা,

পিতা, পরিবার, পরিজন, দেবতা সকলকে ত' কত প্রকারের ঘুষ দিয়াছি, মনুষ্য-জন্ম পাইয়াও যখন কর্ম্মকাণ্ডের বহির্ম্মুখ জীবন যাপন করিয়াছি, তখনও ত' প্রত্যহ পঞ্চসূনা যজ্ঞ করিতে গিয়া দেবতাকে ঘুষ, ঋষিকে ঘুষ পিতৃপিতামহগণকে ঘুষ, প্রাণিগণকে ঘুষ ও নরগণকে ঘুষ দিয়াছি। আবার পরার্থী সাজিয়া সমাজের সঙ্গে পরস্পর ঘুষের আদান-প্রদান কত প্রকারেই না করিয়াছি! প্রচ্ছন্ন ঘুষখোর আমার চরিত্র বোকা লোকেরা ধরিতে পারেন নাই বটে, তাঁহারা আমাকে 'পরার্থী' বা 'পরোপকারী বলিয়া সম্মান করিয়াছেন, কিন্তু আমি বঞ্চিত হইয়াছি ও তাঁহাদিগকে বঞ্চনা করিয়াছি।

সাধারণের ধারণা যে, কেবল স্তোকবাক্যই ঘুষ, কিন্তু অনেক সময় স্তুতির পরিবর্ত্তে অনুরূপ উপকরণও ঘুষরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে। যেখানে কোন ছিদ্রযুক্ত দুর্ব্বল পক্ষ অপর পক্ষের ছিদ্র প্রদর্শন করিতে উদ্যত হয়, সেখানে ছিদ্রযুক্ত প্রবলতর পক্ষ অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল ও ছিদ্রযুক্ত পক্ষকে 'হাটে হাঁড়ি ভাঙ্গিয়া দিবা'র ভয় দেখাইয়া 'তুমভি চুপ্ হাম্‌ভি চুপ' নীতির ঘুষ প্রদান অর্থাৎ মুখবন্ধ করিয়া দিতে পারে। পার্থিব-জগতে এজাতীয় ঘুষপ্রদান প্রথা খুব প্রচলিত রহিয়াছে, আবার যাঁহারা ধর্ম্মাভিনয়ের রঙ্গমঞ্চে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যেও এই জাতীয় ঘুষ-প্রথা দেখিতে পাওয়া যায়। দুর্ব্বলপক্ষকে শাসাইয়া অনেক সময় সত্যকথা আচ্ছাদন করা হয়।

'নিরপেক্ষ নহিলে ধর্ম্ম না যায় রক্ষণে'—এই সত্য নীতি বিপর্য্যয় করিবার জন্যই ঘুষ-প্রথার সৃষ্টি। শ্রৌতবাণীর কষ্টিপাথরে প্রত্যেক বিষয়ের নিরপেক্ষ সমালোচনা করাই যাঁহাদের আত্ম ও পর-শ্রেয়ঃসাধনের শিক্ষা দীক্ষা, সেইরূপ সম্পাদকসঙ্ঘের প্রতি ঘুষের প্রলোভন ও বিপদ্ সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। সাময়িক পত্রের দ্বারা 'হাটে যতটা হাঁড়ি ভাঙ্গে' এতটা আর কিছুতেই নহে; এজন্য সাময়িক-পত্রকে হস্তগত করিবার জন্য নানাপ্রকার ঘুষ আবিষ্কৃত হয়। যাঁহাদের গুরুপাদপদ্মের নিরপেক্ষতায় ঐকান্তিকতা আসে নাই, যাঁহারা শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের 'অবিরত অবিকল, তুয়া গুণ কলকল, গাই যেন সতের সমাজে'—এই বাণীকে বর্ণে বর্ণে পালন করিয়া অনুক্ষণ অটুটভাবে সজ্জন-সমাজে শ্রীগুরুপাদপদ্মের বাণী অনলস হইয়া কীর্ত্তন না করেন, তাঁহারাও কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠার ঘুষে কোন না কোন ভাবে প্রলুব্ধ হইতে পারেন। এই বিপদে বলদেবাভিন্ন শ্রীগুরুপাদপদ্মই একমাত্র বল। তাঁহার বাণী-বল ও আচার্য্যের আদর্শ-আচারানুসরণ-বল হইতে বিন্দুমাত্র ভ্রষ্ট হইলেই নানাপ্রকার ঘুষের প্রলোভন নিরপেক্ষ ভক্তিসিদ্ধান্তবাণীর অনুকীর্ত্তন হইতে জীবকে ভ্রষ্ট করিয়া থাকে।

তবে যেখানে শ্রীগুরুপাদপদ্মই সর্ব্বতোভাবে নিয়ামক, সেখানে ঐরূপ ভয় নাই। তিনি সর্ব্বদাই নিরপেক্ষ ও নির্ভীকভাবে বাস্তব-সত্যকথা-প্রচারে উৎসাহিত করেন এবং সকল অসম্পূর্ণতাকে সংশোধিত ও সম্পূর্ণ করিয়া দেন। শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন লিখিয়াছেন,—

"ইথে একজনের হইয়া পক্ষ যেই।
অন্যজনে নিন্দা করে, ক্ষয় যায় সেই।।"

(চৈঃ ভাঃ মঃ ২৪।৯৬)

"ইথে যেই এক বৈষ্ণবের পক্ষ হয়।
অন্য বৈষ্ণবের নিন্দে, সেই যায় ক্ষয়।।"

(চৈঃ ভাঃ আঃ ৪।৩৯১)

শ্রীমদ্ গুরুপাদপদ্মের নিষ্কপট ভৃত্য বৈষ্ণবগণের যাঁহার মধ্যে গুরুসেবা-বৃত্তি যতটুকা আছে, সেই বৃত্তিটুকুকে "শ্রীমতীর কৃপাবৃত্তি" জানিয়া তৎপ্রতি অকপট নমস্কার বিধান করিলে এবং নিজে অকপট-সেবা-দৈন্যে বিভূষিত হইয়া সর্ব্বদা শ্রীগুরুপাদপদ্মের বাণী ও আদর্শ-আচরণের সেবায় লক্ষ্য স্থির রাখিলে কোন পক্ষ-বিশেষের ঘুষে প্রলুব্ধ হইয়া অন্যপক্ষের নিন্দা বা ছিদ্রানুসরণে সময় ব্যয় ও নিজের অমঙ্গলের চেষ্টা হয় না।

অপ্রাকৃত প্রেমদাতা মুকুন্দ বা মুকুন্দ-প্রেম হইতে কেহ যদি ধর্ম্ম, অর্থ, কাম বা মোক্ষ কামনা করেন বা প্রাপ্ত হন, তাহা দেখিয়া আমার যদি ঐ সকল অকিঞ্চিৎকর ফল-লাভের জন্য অসহিষ্ণুতা ও আকাঙ্ক্ষা উপস্থিত হয় এবং সেই অন্যাভিলাষ-পূরণের জন্য মুকুন্দ বা মুকুন্দপ্রেষ্ঠকে ঘুষঘোর-সম্প্রদায়ের জাতি-সামান্যে দর্শন করি, তাহা হইলে আমি অনেক চেষ্টা করিয়া হয় ত' ঐরূপ কিছু কাচমণি লাভ করিতে পারি, কিন্তু অপ্রাকৃত প্রেম-মহামণির সন্ধান হইতে অনেক দূরে পতিত হই। তাই আরাধ্যবস্তুকে ঘুষখোর মনে করিলে জীবের পতন অবশ্যম্ভাবী। মুকুন্দ ও মুকুন্দপ্রেষ্ঠ কখনও ঘুষখোর হন না, মায়াই সেখানে আবরণরূপে উপস্থিত হইয়া ঘুষের আদান-প্রদান করিয়া থাকে।

গৃহস্বার্থ ও মঠস্বার্থ

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁহার 'তত্ত্ববিবেক' গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—"নিঃস্বার্থপরতা আকাশ-কুসুমের ন্যায় একটি নিরর্থক বাক্যবিশেষ। নিঃস্বার্থপরতার প্রয়োজন এই যে, ইহাদ্বারা অক্লেশে নিজসুখ সাধিত হয়। 'নিঃস্বার্থ' শব্দ শুনিয়া অন্য স্বার্থপ্রিয় লোক তাহাতে শ্রদ্ধা করিলে আমার প্রিয়-সাধন সহজ হইয়া উঠিবে। মাতৃস্নেহ, ভ্রাতৃভাব, বন্ধুতা ও স্ত্রীপুরুষের প্রীতি কি নিঃস্বার্থপর? যদি এই সকল কার্য্যে নিজানন্দ না থাকিত, তাহা হইলে কেহই তাহা করিত না। কোন কোন ব্যক্তি আত্মানন্দ-লাভের জন্য নিজ জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করে। সমস্ত ধর্ম্মসুখই স্বার্থ। ভগবৎপ্রীতিও--স্বার্থ। যাহা স্বভাবিক, তাহাই স্বার্থ; যেহেতু 'স্বভাব'শব্দে স্বীয় অর্থকে বুঝায়। স্বার্থই স্বভাব, নিঃস্বার্থ অত্যন্ত অস্বাভাবিক।"

উক্ত বিচার অনুধাবন করিলে আমরা বুঝিতে পারি যে, স্বার্থই যখন আমাদের নিত্যস্বভাব,তখন আমরা হয় নিজের দেহ ও দেহসম্পর্কিত বস্তুসমূহের যথা স্ত্রী, পুত্র, অর্থ,গৃহ প্রভৃতিভোগ্যবস্তুর ক্ষণভঙ্গুর স্বার্থের অনুসন্ধান করিব, না হয় পরম নিত্যবস্তু বা তৎসম্পর্কিত বস্তু ও ব্যাপারসমূহের যথা অধোক্ষজ ভগবান্ ও তদনুগত সেবকবৃন্দের স্বার্থের চেষ্টায় নিযুক্ত থাকিব।

গৃহস্বার্থ ও মঠস্বার্থ

যাঁহারা কৃষ্ণৈকশরণ ও কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ সাধুর সঙ্গ লাভ করেন নাই বা তাঁহার নিকট হইতে কৃষ্ণের স্বার্থসাধন-ব্রতে দীক্ষিত হন নাই, তাঁহারা স্বস্ব দেহগেহাদির স্বার্থকেই বহুমানন করেন। যে স্থানে ভগবান্ বাস করেন, যেখানে ভগবানের সেবার অনুশীলন হয়, যথায় ভগবৎসেবকগণ নিরন্তর হরি-গুরু-বৈষ্ণবের সেবা করেন ও অপরকে নানাপ্রকার সেবার সুযোগ দিয়া থাকেন, যেস্থান হরিকীর্ত্তনকারীগণের সঙ্ঘারাম, সেই ভগবৎগৃহ বা মঠাদির সর্ব্বপ্রকার স্বার্থের জন্য একমাত্র পরমসৌভাগ্যবস্তু দীক্ষিত ব্যক্তিগণের অকৃত্রিম ও অপ্রতিহতা চেষ্টা দেখিতে পাওয়া যায়।

সদ্‌গুরুর পাদপদ্মের নিকট হইতে দীক্ষা-গ্রহণের অভিনয় করিয়াও যদি আমাদের গৃহস্বার্থই মুখ্য এবং মঠস্বার্থ গৌণ বা লোক দেখাই বার মত ব্যাপারবিশেষই হয়, তাহা হইলে আমরা মঙ্গলের পথে এখনও প্রবিষ্ট হই নাই জানিতে হইবে। কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যে, সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী ও বানপ্রস্থগণই মঠের স্বার্থ দেখিবেন, আমরা গৃহস্থ, গৃহের স্বার্থ দেখাই আমাদের কার্য্য, সময় সময় গৌণভাবে মঠের জন্য কিছু সেবা (?) করিয়া দেওয়া কিম্বা কোন অন্যাভিলাষ চরিতার্থ বা প্রতিষ্ঠাদি লাভের জন্য মঠের সেবার অভিনয় করাই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট, ইহা অপেক্ষা বেশি কিছু আন্তরিক চেষ্টা দেখাইলে আমাদের ও গৃহস্থ-পরিজনের স্বার্থের বিশেষ ক্ষতি হয়। এইরূপ বিচার তাঁহাদেরই হৃদয়ে প্রবল—যাঁহারা কেবল শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিকট আসিবার অভিনয় করিয়াছেন, বস্তুতঃ গুরুপাদপদ্মের নিকট উপনিত হন নাই এবং তাঁহার চিত্তবৃত্তির অনুসরণের পথ হইতে বহু দুরে বিক্ষিপ্ত আছেন।

আমরা গৃহী হই,আর সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারীই হই, মঠস্বার্থই আমাদের ধ্যান, ধারণা, ধ্রুবানুস্মৃতি ও যথাসর্ব্বস্ব না হইলে কিছুতেই আমাদিগকে মায়ার সংসার পরিত্যাগ করিবে না এবং কৃষ্ণপাদপদ্মেও আমাদের প্রীতি হইবে না। যিনি যতটা অকৃত্রিম মঠস্বার্থপর, তিনিই ততটা হরি-গুরুবৈষ্ণবে প্রীতিবিশিষ্ট। যাঁহার মঠস্বার্থপরতা নাই অথচ তাঁহার গুরুভক্তি বা কৃষ্ণভক্তি আছে,—ইহা বলিতে যাওয়া আত্মবঞ্চনা ও পরবঞ্চনা মাত্র।

'সন্ন্যাসী', 'ব্রহ্মচারী' ও 'বানপ্রস্থ', এমন কি, 'মঠবাসী'নাম ধারণ করিয়াও বা মঠের বিবিধ কার্য্যে বিপুল আড়ম্বরপূর্ণ চেষ্টা ও তৎপরতা দেখাইয়াও আমরা আন্তরিকভাবে মঠস্বার্থকে গৌণ ও দেহ-গেহ-স্বার্থকেই মুখ্য করিয়া ফেলিতে পারি, অথবা লোক-দৃষ্টিতে মঠ-স্বার্থপরতার অভিনয়কে বাহন করিয়া স্ব-স্ব অপস্বার্থ পূরণ করিয়া লইতে পারি। অতএব ঐরূপ 'ভাবের ঘরে চুরি' থাকিলে আমাদের মঙ্গলের পথ চিররুদ্ধই থাকিল। 'মঠস্বার্থ বলিতে ইহাই বুঝায় যে, সমস্ত অন্যাভিলাষ হইতে মুক্ত হইয়া বা মুক্ত হইবার আন্তরিক চেষ্টা করিয়া একান্ত শরণাগতিমূলা প্রবৃত্তির সহিত শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের প্রীতি-সাধন। সাংসারিক কার্য্য হইতে বিরাম লাভের পর একবার করিয়া মঠে হাজিরা দিয়া গেলাম, অথবা মনে করিলাম,—"আমি মঠের একজন শিষ্যের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছি, ইহাই ত' যথেষ্ট, কিংবা আমি নিজের গৃহে থাকিয়া সদাচারাদি পালন করিতেছি, তাহাতেই ত' মঠের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতেছে, অথবা আমি মাসিক কিছু চাঁদা প্রদান করিতেছি, না হয়, কিছু কিছু কার্য্য করিয়া দিতেছি, ইহাতেই ত' মঠের স্বার্থ রক্ষিত হইতেছে"

প্রভৃতি আচার ও বিচারগুলি প্রকৃত মঠস্বার্থ ব্যক্তির আদর্শ নহে। গৃহব্রত ব্যক্তি যেরূপ সমস্ত প্রাণ ঢালিয়া চিরদাসখত লিখিয়া দিয়া অত্যন্ত আসক্তি ও স্বাভাবিক রুচির সহিত গৃহের সর্ব্বপ্রকার স্বার্থ অনুক্ষণ অনুসন্ধান করে, তদপেক্ষাও অধিকতর স্বাভাবিক আসক্তি ও রুচি লইয়া মঠের স্বার্থানুসন্ধানই মঠের সত্য সত্য সেবা। মঠের জন্য 'আঠা' না জন্মিলে, স্বাভাবিক মমতা না জন্মিলে এবং তাহাই প্রধানরূপে সমগ্র জীবন ও আন্তরিকতাকে আত্মসাৎ না করিলে কেবল মঠসেবার বাহ্য অভিনয় গুরু—বৈষ্ণবকে ফাঁকি দিবার বা কামারকে ইস্পাত ফাঁকি দিবার চেষ্টার ন্যায় আত্মবঞ্চনা মাত্র।

অকপট ও একান্ত পূর্ণ মঠস্বার্থপর ব্যক্তিকেই আমরা 'মুক্ত' বলিব, আর গৃহস্বার্থপর ব্যক্তিকেই 'বদ্ধ' বলিব। খুব বেশী সৌভাগ্য না থাকিলে জীবের এই মঠস্বার্থৈকপরতা জীবনের ব্রত হইতে পারে না। যাঁহারা প্রকৃত বৈষ্ণব ও ভগবান্‌কে ফাঁকি দিয়া চালাকি করিয়া 'ভগবানের সেবক'-নাম আদায় করিতে চাহেন, তাঁহাদের নিকট শুদ্ধকীর্ত্তন সঙ্ঘারাম মঠের সেবকগণ হয় ত' মঠসেবার কিছু আনুকূল্য চাহিলে তাঁহারা অনেক সময় বলিয়া থাকেন,—"আমাদের গৃহেই গৌরাঙ্গের সেবা, নারায়ণের সেবা প্রতিষ্ঠিত আছেন, আমরা তোমাদিগকে ভিক্ষা দিব কেন?" যদিও তাঁহারা কোন কোন সময়ে কিছু কিছু দ্রবিণাদি প্রদান করিয়া মঠসেবকগণকে বিদায় দেন, তাঁহাদের সেই দান (?) মঠস্বার্থের চতুঃসীমানার মধ্যেও প্রবেশ করে না; তাঁহারা কেবল চক্ষুলজ্জায় বা হাঙ্গামা এড়াইবার জন্য মঠসেবকগণকে কিছু প্রদান করিয়া তাঁহাদিগকে বিদায় দান পূর্ব্বক গৃহের স্বার্থে অভিনিবিষ্ট হইতে পারিলেই যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচেন! নরকভাক্ ব্যক্তিগণেরই গৃহস্বার্থের প্রতি আকর্ষণ এবং বৈকুণ্ঠযাত্রিগণের মঠে স্বার্থের প্রতি স্বাভাবিক অকৃত্রিম রুচি হয়।

আমরা অর্চ্চনকারী গৃহস্থের অভিনয় করিয়া যদি আমাদের গৃহদেবতার সেবার নামে মঠের শ্রীগুরুপাদপদ্ম-মনোহভীষ্ট-সেবাকে সঙ্কুচিত করিয়া ফেলি, তাহা হইলে গৃহে অর্চ্চনের অভিনয় করিবার নামে আমাদের কার্য্যতঃ গৃহসেবা বা গৃহস্বার্থপোষণই হইয়া যায়, মঠস্বার্থ অর্থাৎ গুরুবৈষ্ণবসেবা-স্বার্থত বহু দূরে পড়িয়া থাকে; আমরা গৃহেই বদ্ধ হইয়া পড়ি, মুক্ত বৈকুণ্ঠপথের পথিক হইতে পারি না। গৃহস্থের অর্চ্চন একান্ত আবশ্যক সন্দেহ নাই, কিন্তু গৃহে অর্চ্চনের আড়ম্বর বাড়াইয়া গৃহভোগের প্রচ্ছন্ন প্রবৃত্তি বা গৃহস্বার্থপরতা প্রবল করিয়া ফেলিলে অনর্থ মুক্তির উপায় ও উপেয়স্বরূপ মঠস্বার্থপরতায় শৈথিল্য আসিয়া যায়। গৃহস্থ অর্চ্চন পরিত্যাগ করিবেন না, কিম্বা গৃহস্থের সন্তান-সন্ততিগণ অর্চ্চনবিমুখ হইয়া সদাচারহীন হইবেন না; কিন্তু তাঁহাদের সকলেরই মনে রাখিতে হবে ও প্রতি কার্য্যের মধ্যে কার্য্যতঃ ইহাই অনুশীলন করিতে হইবে যে, মঠস্বার্থের আনুকূল্য করিবার জন্যই তাঁহাদের অর্চ্চনাদি কার্য্য। যে অর্চ্চন, যে ভজন, যে হরিনাম-গ্রহণ ও যে-সকল তৎপরতা গৃহস্বার্থপরতাকে সঙ্কুচিত করিয়া মঠস্বার্থপরতায় অধিকতর উৎসাহী করিয়া না দিবে, সেরূপ অর্চ্চন, ভজন, তৎপরতা বা হরিনাম গ্রহণাদি অভিনয়ে নিশ্চয়ই অপরাধ প্রবেশ করিয়াছে।

গৃহস্থই হই, আর সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারীই হই, শ্রীগুরুপাদপদ্মের কীর্ত্তনস্থলী, শ্রীগুরুপাদপদ্মাশ্রিত বৈষ্ণবগণের হরি-গুরু-বৈষ্ণব-নিকেতন শ্রীমঠে অকৃত্রিম আপনবুদ্ধিই আমাদের পরম মঙ্গলের সেতু। মঠে আপনার

বুদ্ধি স্বাভাবিক না হইলে বলিয়া কহিয়া, মারিয়া ধরিয়া কাহাকেও তৎপ্রতি প্রেম শিক্ষা দেওয়া যায় না; কেন না, প্রেমজিনিষটি—স্বাভাবিক, স্বার্থও—স্বাভাবিক। স্বার্থকে প্ররোচনা-দ্বারা শিক্ষা দেওয়া যায় না, স্বার্থ স্বয়ং প্রকাশিত ও বিকসিত হয়।

পরলোকগত শ্রীপাদ সঙ্কল্পসুহৃৎ প্রভুর সেবা অনেকের নিকট অপরিজ্ঞাত এবং তিনি নিজেও তাঁহার প্রকটকালে আপনাকে এরূপভবে প্রদর্শন করিতেন যে, যেন তিনি একজন নগণ্য মঠসেবকও হইতে পারেন নাই; কিন্তু তাঁহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সেবা-কার্য্যের মধ্যে মঠ-স্বার্থপরতার প্রতি এরূপ প্রবল অনুরাগ দেখা যাইত যে, তাহা দেখিয়া আমাদের জীবনে এখন ধিক্কার আসিতেছে। তিনি তাঁহার গৃহের বিষয়-সম্পত্তির হিসাব-নিকাশ একদিনের জন্যই দেখেন নাই; কিম্বা সম্পত্তির আয়ের এক কপর্দ্দকও বৃদ্ধি হউক, এরূপ চেষ্টা করেন নাই, অথচ সেই ব্যক্তিই মঠের চাঁদা ও ভিক্ষা বৃদ্ধির জন্য কিরূপ আন্তরিক চেষ্টাই না দেখাইয়াছেন! কেহ তাঁহাকে আদেশ না করিলেও বা কোনরূপে প্ররোচনা না দিলেও তিনি যেন পাকাগৃহকর্ত্তার ন্যায় মঠের বিভিন্ন দ্রব্যাদি স্বেচ্ছায় গুছাইয়া রাখিতেন, মঠের একটা না একটা স্বার্থের জন্য সর্ব্বদাই তাঁহাকে ব্যতিব্যস্ত দেখা যাইত, অথচ একদিনও তিনি সে সকল সেবা-কার্য্য ঘুণাক্ষরেও লোককে জানাইয়া করেন নাই। আমরা কেহ কেহ মঠের প্রচারের আনুকূল্যে কিছু অর্থাদি সাহায্য বা শারীরিক পরিশ্রমাদি করিয়া পারমার্থিক সংবাদপত্রের স্তম্ভে, অথবা ধামপ্রচারিণী সভায়, কিংবা শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণের প্রশংসাসূচকে বাক্যের মধ্যে আমাদের কথার উল্লেখ দেখিতে না পাইলে "মঠের সেবা করিয়া কোন লাভ নাই, মঠ নিরপেক্ষ বিচারক নহেন, আমাদের জয় গান করেন না, সুতরাং কোমর বাঁধিয়া গৃহের স্বার্থই দেখিব, আর মঠের স্বার্থে সময়, অর্থ ও জীবন নষ্ট করিব না"—এইরূপ দৃঢ়সঙ্কল্প করিয়া থাকি। কিন্তু যে মহাত্মার কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি, তিনি 'জয়শ্রী'র সেবা-কার্য্যে কত প্রকারে যে অর্থ দিয়াছেন, মুটে-মজুরের ন্যায় নিরন্তর কত যে খাটিয়াছেন, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। কিন্তু সংবাদপত্রের স্তম্ভে তাঁহার প্রশংসা দেখিবার জন্য, এমন কি, মঠসেবকের তালিকার মধ্যে তাঁহার নামটি উঠাইবার জন্য তিনি ঘুণাক্ষরেও কোন কথা বলেন নাই, অথচ আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি,—মঠের স্বার্থ দেখিবার চেষ্টা ক্রমশঃই তাঁহার বাড়িয়া যাইতেছিল।

অনেক সময় আমরা কেহ কেহ মঠের নানা গুরুভার, কার্য্যের জটিলতা, কিংবা নানালোকের নানাপ্রকার গঞ্জনা ও কানাকানি শুনিয়া মঠের সংস্রব পরিত্যাগ করাকেই সমীচীন মনে করি; কিন্তু আমাদের হৃদয়ে অকৃত্রিম মঠ স্বার্থপরতা থাকিলে আমরা জীবনে-মরণে মঠসেবা ছাড়িয়া অন্য কোন অবস্থানে অবস্থিত হইবার স্বপ্নকেও ক্লেশকর মনে করিব। মঠ ছাড়া আমার আর একটি অবস্থান আছে, আমার গৃহ আছে, আমার আশ্রয়-স্থান আছে, আমার দ্বিতীয় অবলম্বন আছে, এরূপ বুদ্ধির আভাসও বহির্ম্মুখতা হইতেই উদিত হয়। মঠসেবাসর্ব্বস্ব ব্যক্তির হৃদয়ে কখনও ঐরূপ দুর্ব্বুদ্ধির উদয় হইতে পারে না।

বাহিরের সাধারণ লোক অর্থাৎ যাঁহারা ভক্তিরাজ্যে প্রবিষ্ট হন নাই, তাঁহারা গৃহস্বার্থ না দেখিয়া মঠস্বার্থ দেখিবার আদর্শকে নৈতিক অন্যায় বলিয়া মনে করিতে পারেন,–কিংবা হয় ত' ঐজাতীয় বহির্ম্মুখ লোক

বলিতে পারেন,—"স্বাবলম্বনবৃত্তি, আত্মনির্ভরতা, পরার্থিতা প্রভৃতির অনুশীলন পরিত্যাগ করিয়া বৈষ্ণবদের পিত্ত বৃদ্ধি করিবার বা পিত্ত দমন করিবার 'আড্ডা'স্বরূপ মঠাদির প্রতি আসক্তিদ্বারা কি শুভফল হইবে?" যাঁহারা হরিসেবার স্বরূপ বুঝেন নাই, যাঁহারা গ্রাম্য পশুর ন্যায় ভোগ ও ত্যাগবৃত্তিবিশিষ্ট, মায়াদেবীর লগুড়ই যাঁহাদের প্রাপ্য বস্তু, সেইরূপ ব্যক্তিগণের ন্যায় বুদ্ধি ও বিচার সদ্‌গুরুপাদপদ্মে দীক্ষিত ব্যক্তিগণের চরিত্রে কিছুতেই বহুমানিত হইতে পারে না। শ্রীগুরুপাদপদ্মের পীঠস্বরূপ তাঁহারই কীর্ত্তনস্থলী, সৎসঙ্গের দুর্গস্বরূপ মঠের সেবা যদি 'বাস্তব সত্য' বলিয়া উপলব্ধি হইয়া থাকে, তাহা হইলে সমস্ত প্রাণ ঢালিয়া তাঁহারই স্বার্থের জন্য আমাদিগকে চিরব্রত গ্রহণ করিতে হইবে। ইহাই গৃহস্থ, বানপ্রস্থ, ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসী—সকলেরই গুরুসেবা।

প্রত্যক্ষই দেখিতে পাওয়া যায়,—যাঁহারা মঠস্বার্থপর নহেন, মঠের সহিত যাঁহাদের সংযোগ দৃঢ় হয় নাই বা নাই, শ্রীগুরুপাদপদ্মের সহিতও তাঁহাদের সংযোগ নাই। শ্রীগুরুপাদপদ্মের চিত্তবৃত্তি কোন্ দিকে চলিয়াছে, তাঁহার সিদ্ধান্ত কি, তাঁহার প্রকৃত আচার-প্রচার কি, তাঁহার মনোঽভীষ্ট কি, তাঁহার আদর্শ কি, মঠস্বার্থে উদাসীন ব্যক্তি তাহা কিছুই ধরিতে পারেন না। সেইরূপ ব্যক্তি যেন বাহিরের লোকের মত, পরের মত, চোরের মত—সময় সময় মঠে বেড়াইতে আসেন বা গৃহের কোন স্বার্থ-সাধনোদ্দেশ্যে সময় সময় মঠে আসিয়া চকিত-দর্শন দেন এবং মঠস্বার্থপর গুরু-বৈষ্ণব-বৃন্দের ক্রিয়া-কলাপের মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া অপরাধী হইয়া পড়েন ও সামান্য পূর্ব্বসুকৃতিটুকুও একেবারে হারাইয়া ফেলেন। মঠস্বার্থপর ব্যক্তিগণ অনেক সময় গৃহস্বার্থপরব্যক্তিগণকে সেরূপ আদর অভ্যর্থনা করিয়া বঞ্চনা করিতে পারেন না বলিয়া গৃহস্বার্থপর ব্যক্তিগণ দুঃখিত ও হতশ্রদ্ধ হইয়া পড়েন। অল্প কথায় বলিতে গেলে মঠস্বার্থপর না হইতে পারিলে কোনদিনই আমরা শ্রীগুরুপাদপদ্মের সুপ্রসন্নতা লাভ করিতে পারিব না। শ্রীগুরুপাদপদ্মের সুপ্রসন্নতা লাভ না হইলে আমাদের মঙ্গলোদয়ও হইবে না।

মঠস্বার্থপরতা যাহার যতটা কম, তাহার ততবড় অনর্থের ছিদ্রে মায়াদেবী নানাপ্রকার তাণ্ডব রচনা করিবে। কখনও হয় ত' হৃদয়দৌর্ব্বল্য আনিয়া অসৎসঙ্গে আসক্তি ও সদাচারভ্রষ্ট করাইবে, কখনও হয় ত' অধিকতর কপট করিয়া তুলিয়া গুরু-বৈষ্ণবের চ'ক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিবার কুবিদ্যা শিক্ষা দিবে, কখনও হয় ত' পঞ্চায়িতী ভক্তি ও পাঁচমিশালি ধর্ম্মের সুবিধাবাদে প্রলুব্ধ করিয়া তুলিবে এবং ক্রমে ক্রমে নারকী গৃহব্রত, না হয় 'পাষণ্ড'-ত্যাগিব্যক্তিগণেরই অন্যতম করিয়া তুলিবে।

যাহারা মঠস্বার্থ অপেক্ষা নিজের স্বতন্ত্র স্বার্থ অধিক পোষণের জন্য দীক্ষার অভিনয়, ত্যাগের অভিনয় বা সেবার অভিনয় করিয়া থাকে, তাহারা অচিরেই পতিত হইয়া স্ব-স্ব লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠার জন্য পৃথগ্‌ভাবে অপরাধের তাণ্ডবনৃত্য আরম্ভ করে।

মঠের কোন-না-কোন-প্রকার সুযোগ লইয়া নিজের দেহ-গেহের সুবিধা করিয়া লইব,—এরূপ বুদ্ধিযুক্ত ব্যক্তিই গৃহস্বার্থপর। এরূপ ব্যক্তি অন্যাভিলাষী,—হরি-গুরু বৈষ্ণবসেবাভিলাষী নহেন। হৃদয়ে ঐরূপ

অপস্বার্থপর প্রবৃত্তি দেখা যাইবা-মাত্রই সাধকের সতর্ক হওয়া উচিত, তজ্জন্য শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের চরণে প্রতিনিয়ত অকপট আর্ত্তির সহিত বিজ্ঞপ্তি করিয়া নিজের মঙ্গল বাঞ্ছা করা কর্ত্তব্য। মঠসর্ব্বস্বতা—মঠস্বার্থ-পরতাই আমাদের প্রকৃত পারমার্থিক জীবন, আর গৃহসর্ব্বস্বতা বা গৃহস্বার্থপরতার দিকে একটি মাত্র পদবিক্ষেপও মৃত্যুর দিকে অভিযান।

তদ্বন

সামবেদীয় জৈমিনীয় ব্রাহ্মণের ৯ম অধ্যায়কে তলবকার ব্রাহ্মণোপনিষৎ বলিয়া কথিত হয়।

এই তলবকার উপনিষদের প্রথম শব্দ কেন-উপনিষদের সংজ্ঞা-বিশেষ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। তজ্জন্যই এই উপনিষৎটি কেনোপনিষৎ বলিয়া প্রসিদ্ধ। কেন-শব্দে—'কাহার দ্বারা', সুতরাং প্রশ্নোত্তরমুখে প্রতিপাদ্য বিষয়টি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, জানা যায়।

এই উপনিষদে 'তদ্বন' শব্দ উদ্দিষ্ট হইয়াছে। বন-শব্দে 'অরণ্য', 'নীর' ও 'আশ্রয়' বুঝায়। 'বননীয়' শব্দ 'ভজনীয়' বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছে। বন-শব্দে ভজন মুখ্যভাবে ক্ষত হয়। 'তদ্বন' শব্দের ন্যায় ছান্দোগ্যোপনিষদে তৃতীয় অধ্যায় চতুর্দ্দশ খণ্ডের ১ম মন্ত্রে তজ্জল-শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, যথা—"সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম, তজ্জলানিতি শান্ত উপাসীত"। তলবকার-উপনিষদের চতুর্থ খণ্ডের চতুর্থ মন্ত্রে "যদ্ এতদ্ বিদ্যুতো ব্যদ্যুতদ্ আ ৩ ইতি ইতি ন্যমীমিষদ্ আ ৩"। 'আ' প্লুত স্বরে ব্যবহৃত হওয়ায় শব্দগতির পূর্ণতাকে লক্ষ্য করে এবং তাহার অর্থ-চমৎকারিতা উৎপন্ন করে।

এতৎপ্রসঙ্গে রস-সংজ্ঞা-নির্দ্দেশে শ্রীচৈতন্যদেবের উপদিষ্ট কথা আলোচ্য। শ্রীচৈতন্যদেবের নিকট হইতে শ্রীরূপগোস্বামী প্রভু তাহা শ্রবণ করিয়া ভক্তি-রসামৃতসিন্ধু গ্রন্থের-রস-সংজ্ঞা-নিরূপণে "যশ্চমৎকারভারভূঃ" বলিয়াছেন। "তদ্বন" শব্দের 'তৎ'-শব্দটি তন্ ধাতুর বিস্তারার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। অর্থ-ভেদে তন্ শব্দের উপকারার্থে, শ্রদ্ধা-প্রদর্শনে, আঘাতের উদ্দেশে, শব্দপরিণতিতে এবং উপসর্গ-যোগে দীর্ঘতাকে লক্ষ্য করে। "আততত্বাচ্চ মাতৃত্বাৎ আত্মা হি পরমো হরিঃ" প্রভৃতি প্রামাণিক ব্যাখ্যায়ও তৎ-শব্দের সর্ব্বব্যাপকতা ও আ এই উপসর্গীয় ক্রিয়া-বিশেষণ পূর্ণতাকে লক্ষ্য করে।

"তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি" মন্ত্র "একদেশস্থিতস্যাগ্নের্জ্যোৎস্না বিস্তারিণী যথা" শ্লোকের সহিত একযোগে পাঠ করিলে আমরা জানিতে পারি যে, তদ্বন-বস্তু হইতে যে আলোক নিঃসৃত হয়, তাহা "ব্যদ্যুতদ্ আ" মন্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে। এজন্যই শ্রীদামোদর স্বরূপ গোস্বামী বস্তুনির্দ্দেশকালে "যদদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষদি তদপ্যস্য তনুভা" শ্লোকটি তলবকারের চতুর্থ খণ্ডের মন্ত্রকে উদ্দেশ করিয়াই লিখিয়াছেন। শ্রীদামোদরস্বরূপ গোস্বামী মহাপ্রভুর দ্বিতীয়-স্বরূপ হওয়ায় ও বারাণসীতে বহু দিবস বেদান্ত অধ্যয়ন করায় এই নিগূঢ় রহস্য

লাভ করিয়াছেন। শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুও এতদনুরূপ ''যস্য ব্রহ্মেতি সংজ্ঞা'' প্রমুখ একটি শ্লোক রচনা করিয়াছেন। তদ্বন-শব্দে তৃতীয় পুরুষাবতার ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণুকে লক্ষ্য করে।

পুরুষোত্তম বিষ্ণু দ্বিতীয় পুরুষাবতার গর্ভোদকশায়ী সমষ্টি-বিষ্ণু বা প্রদ্যুম্ন হইতে পৃথক্ লীলা পরিচয়ে শব্দব্রহ্মের দ্বারা পরিচিত হন অর্থাৎ পুরুষোত্তম বস্তুই ভজনীয় বস্তু। ''তদ্বনমিত্যুপাসিতব্যম্'' এই কামদেবের উপাসনা করিলেই জীবের ইতর বাসনা হইতে অবসর লাভ হয়। তখনই তাঁহার দৃশ্য বিশ্বের বদ্ধানুভূতি হইতে প্রস্থান করিবার যোগ্যতা-লাভ ঘটে। পুরুষোত্তমের সেবাই বিশ্বদর্শন হইতে মুক্ত হইবার একমাত্র সোপান। তজ্জন্যই শাস্ত্র বলিয়াছেন—''আদ্যন্তু মহতঃ স্রষ্টৃ দ্বিতীয়ং ত্বণ্ডসংস্থিতম্। তৃতীয়ং সর্ব্ব ভূতস্থং যানি জ্ঞাত্বা বিমুচ্যতে।।'' ক্লীব-দৃষ্ট সর্ব্বনামে যে তৎ-শব্দের প্রয়োগ থাকে, তাহাতে পুরুষোত্তমেতর বাদ অভিব্যক্ত হয়, উহা বদ্ধজীবেরই চমৎকারিতা উৎপন্ন করায় এবং রস-চমৎকারভূমির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সাধন করিয়া সত্ত্বোজ্জ্বল হৃদয়কে আবৃত ও বিক্ষিপ্ত করিয়া শূন্যবাদে উপনীত করায়।

সঙ্কর্ষণ প্রভু বিস্তৃতিক্রমে তদ্রূপ-বৈভবার্ণব হইয়া স্বয়ংপ্রকাশ-তত্ত্বের স্বরূপ প্রদর্শন করেন। তদ্রূপ-বৈভবশব্দ অপর ভাষায় বৃন্দাবন বা গোলোক শব্দে অভিহিত হয়। বৃন্দাবনীয় দ্বাদশ বন—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর এবং হাস্য, অদ্ভুত, বীর, করুণ, রৌদ্র, ভয়ানক ও বীভৎস—এই দ্বাদশ রসের পূর্ণবিকাশ-বৈভবাধার মাথুর বনসমূহে নিত্যকাল প্রকাশিত। চিজ্জগতের আস্বাদনীয় দ্বাদশ বন বদ্ধজীবভূমিকায় আংশিক দর্শনে পরিদৃষ্ট হয় মাত্র। বদ্ধভাব অপসারিত হইলে আমাদের প্রাপঞ্চিক বিচারগত জড়াশ্রিত জ্ঞান অপসৃত হইয়া বিজ্ঞানে পরিণত হয়। তখনই তদঙ্গ ও রহস্যের বিজ্ঞান-সমন্বিত হইয়া অদ্বয়জ্ঞান স্বয়ংরূপ ব্রজেন্দ্রনন্দনের উপাসনায় আস্বাদ্য, আস্বাদক ও আস্বাদন—এই ত্রিবিধ বিচিত্রতা কেবল-চেতন-ধর্ম্মে প্রস্ফুটিত আছে, দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা ভাবনাবর্ত্মের অতীত লীলাস্বাদন-মুখে অভিব্যক্ত হয়।

বাস্তব বস্তু

শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—বাস্তব-বস্তুর বিজ্ঞানই পরমধর্ম্ম, নতুবা বস্তু-বিষয়ের আলোচনায় নানা ভ্রম প্রবেশ করিবে। বাস্তব-বস্তুর দুইপ্রকার শক্তি—চিচ্ছক্তি ও মায়া। মায়াশক্তিকে আশ্রয় করিয়া যাঁহারা বৈকুণ্ঠশক্তির পরিচয়-গ্রহণে অসমর্থ, তাঁহারা জড়নির্ব্বিশেষবাদকেই বাস্তববস্তু বলিয়া ভ্রম করেন। তাঁহাদের বেদ্য-বস্তু অবাস্তব-বস্তু মাত্র। বস্তুধর্ম্ম ও বস্তুর শক্তিধর্ম্মে যে ভেদ আছে, সেই ভেদের আলোচনার অভাবে চিচ্ছক্তির সহিত মায়াশক্তিকে অভেদ বলিয়া বিচার করিয়া থাকেন। শক্তিকর্ত্তৃকই পরিমিতি হয়; শক্তিপরিণত-ব্যাপার-সমূহই প্রমেয়। বস্তু প্রমিত হইবার অযোগ্য—এই প্রকার ধারণা অচিচ্ছক্তি পরিণতিবিচারে জড়তারই অন্তর্গত। উহাতে চিচ্ছক্তি অবিমিশ্রভাবে ক্রিয়াবতী নহে।

খণ্ডিত পদার্থ খণ্ডজ্ঞানের আরাধ্য, কিন্তু অদ্বয়জ্ঞানে যে বস্তুবৈচিত্র্য লক্ষিত হয়, তাহা চিচ্ছক্তিপরিণতি হইতে হইয়া থাকে,—একথা জড়প্রমেয়বাদীর বোধগম্য বিষয় নহে। তাঁহার অভিজ্ঞতার জাড্য উপস্থিত হওয়ায় জড়তাধর্ম্মবশে শক্তিবিজ্ঞানে তাঁহার দারিদ্র্য আসিয়া উপস্থিত হয়। এজন্য মায়াবাদী ভগবজ্ জ্ঞানস্বরূপ বস্তুর শক্তি পরিণত বিবিধ প্রকাশভেদকে সমপর্য্যায়ে গণনা করেন। চিচ্ছক্তিপরিণাম ও অচিচ্ছক্তিপরিণামের মধ্যে অভেদ বিচার স্থাপন করিতে গিয়া মায়াবাদী অবাস্তববস্তুর পরিচয়গুলিকে 'মিথ্যা' প্রভৃতি সংজ্ঞায় গণনা করেন।

শক্তিস্বরূপ ও বস্তুস্বরূপে বৈচিত্র্যদর্শনে সমর্থ হইলেই বিজ্ঞানসমন্বিত ভগবজ্জ্ঞান রহস্য ও অঙ্গের পরিচয় দিতে সমর্থ হয়। নতুবা নিরঙ্গ ও বহিঃপ্রজ্ঞা উক্ত রহস্যভেদে অথবা বিজ্ঞানবোধে স্বীয় দৌর্ব্বল্য প্রকাশ করে। এই দুর্ব্বলতার ফলে জীব মৎসরধর্ম্মে অবস্থিত হয়!

মৎসরধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য এই যে, তাহাতে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ ও মদ স্ব-স্ব বিক্রম প্রদর্শন করিয়া মৎসররাজের পূজায় যাজ্ঞিকের সজ্জা প্রদর্শন করে। সেইকালে অবাস্তব বস্তুকে বিকারবাদ বা আরম্ভবাদের সমশ্রেণীস্থ করিবার যত্ন করে। তৎফলে স্বীয় বদ্ধাভিমান মুমুক্ষুতা ধর্ম্মে আত্মপ্রকাশ করে এবং তদ্বিপরীত ধর্ম্মে আত্মপ্রকাশ করে এবং তদ্বিপরীত ধর্ম্মকেই ধর্ম্ম, অর্থ ও কামরূপ ভোগে আবৃত করায়। সেইকালে পরমধর্ম্ম তাঁহার নিকট দুর্জ্ঞেয় হয় বলিয়াই বিজ্ঞানসমন্বিত সরহস্য সাঙ্গের পরিচয়-রহিত নির্ব্বিশিষ্ট বিচার তাঁহার চেতনধর্ম্মকে বিরাম লাভ করায়। তিনি ভাগবতধর্ম্ম হইতেই মনোধর্ম্মী হইয়া নানাপ্রকার কল্পনার জড়তায় আত্মবোধ-রহিত হইয়া পড়েন। আত্মবোধ-রাহিত্যেই তাঁহাকে স্থূল ও সূক্ষ্ম নিগড়দ্বয় উহাদের স্ব-স্ব শক্তিদ্বারা আবরণ করিয়া ফেলে। অবরধর্ম্ম গ্রহণ করায় তাঁহার নিত্য পরমধর্ম্মের প্রতি ঔদাসীন্য আসিলেই তাহা চতুর্ব্বর্গাভিলাষকেই মুমুক্ষা ও বুভুক্ষা-বৃত্তিতে স্থাপন করে।

বদ্ধজীবের জ্ঞাতৃত্বাভিমান জ্ঞেয়-সাপেক্ষ ও জ্ঞানাধীন। তজ্জন্যই তিনি মুমুক্ষাকে নৈসর্গিক বৃত্তি বলিয়া স্থির করেন। মুমুক্ষু আত্ম-পরিচয়ে ন্যূনাধিক বিস্মৃত হইলেই বুভুক্ষা আসিয়া তাঁহার স্বধর্ম্মের বিপর্য্যয় করায়।

জড়নির্ব্বিশেষবাদে বিজ্ঞানের অভাবে অনুদ্ঘাটিতরহস্য-জন্য নিরঙ্গত্বের কল্পনাই অঙ্গি-পুরুষোত্তমকে জড়চিন্তায় স্থাপন করে। তখন তিনি চিচ্ছক্তি ও অচিচ্ছক্তির বৈশিষ্ট্যের অভাব আছে ঐরূপ ভ্রান্তধারণায় কবলিত হ'ন। ভগবদনুশীলনের অভাবে প্রতিকুল অনুশীলনে গা ভাসাইয়া জড়স্রোতে স্বীয় জাড্যকেই নির্ব্বিশেষভাবে চরম পরিণতি বলিয়া বিশ্বাস করেন। তাদৃশ বিশ্বাস-ফল আত্মবিনাশ করে; সুতরাং তিনি তমোগুমের বশীভূত হইয়া মায়াবাদী হইয়া পড়েন।

ভগবজ্জ্ঞানই বাস্তববস্তুবিজ্ঞান ও রহস্য ভেদ করিয়া শক্তিপরিণামগত অঙ্গের পরিচয় দিয়া থাকে। সেইকালে ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি ও ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তি অর্থাৎ অচিৎ ও চিচ্ছক্তির বৈশিষ্ট্য উপলব্ধির বিষয় হয়।

চিচ্ছক্তির প্রাবল্যে রজস্তমঃসত্ত্ব-গুণত্রয়ের হস্ত হইতে নির্গুণতা লাভ করিলেই সচ্চিদানন্দবস্তু জ্ঞেয়রূপে প্রকাশিত হন। হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সম্বিৎ-শক্তিত্রয়, ভগবৎপ্রকাশসমূহ ও তদেকাত্মতার বিচিত্রতা মুক্ত জ্ঞানের জ্ঞেয়-পদার্থরূপে বাস্তববস্তুবিজ্ঞান সাঙ্গরহস্যের সহিত জড় নির্ব্বিশেষ বা প্রমিতিকরণরূপ জড়োন্মুখী বাচালতা জীবের ভক্তি-ধর্ম্মের ব্যাঘাতকারিণী হয়। চিচ্ছক্তিপরিণতিতে যে সচ্চিদানন্দ-শক্তিত্রয়ের বিকাশ আছে, তাহাতে অনিত্য গুণত্রয়ের দ্বারা স্বরূপ আবৃত হয়। অবিদ্বৎপ্রতীতি সেই কালে বিদ্বান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়নের রচিত সাত্বত-সংহিতার অনুশীলনে বাধা দেয়।

অনিত্য একের উপর অপরে প্রভুত্ব করিয়া অংশীদারগণকে বিদায় দেওয়া-রূপ অবরতা সচ্চিদানন্দ বাস্তববস্তুর শক্তিকে প্রকাশত্রয়কে বাধা দিতে পারে না। গুণজাত জগতে অভিজ্ঞতার একগুণ অপর গুণদ্বয়ের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া অল্পকালের জন্যই বিক্রম প্রকাশ করে। বিক্রমের আয়ুর অল্পতা-নিবন্ধন অপরগুণের প্রাধান্য স্বীকার করিতে গেলেই কালক্ষোভ্যধর্ম্মের অবরতা অনুভূত হয়। হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সম্বিৎ-শক্তিত্রয়ের পূর্ণতাহেতু প্রকৃতির বিভাগত্রয়ের হেয়তা বা অপ্রয়োজনীয়তা অনর্থ উৎপাদন করায়।

অর্থের ত্রিবিধ প্রকাশ পরস্পর প্রতিযোগী নহে। কিন্তু গুণত্রয় প্রতিযোগিতা-ধর্ম্মে আবদ্ধ থাকায় দমন, বিনাশ, আঘাত, নিহনন প্রভৃতি ক্রিয়াগুলির তাৎকালিকতা উৎপাদন করায়। সচ্চিদানন্দের প্রাকট্যে গুণত্রয়ের অন্ধকারস্থ স্থান পরিত্যাগ করিয়া নিজ নিজ অস্তিত্ব গোপন করে। বাস্তববস্তু-বিজ্ঞানের দ্বারাই পূর্ণ প্রজ্ঞতা জীবকে বুভুক্ষা ও মুমুক্ষা-ধর্ম্ম হইতে অবসর দেয়। এই জন্যই কৈতব-পরিহার সর্ব্বতোভাবে অনুষ্ঠিত না হইলে পরমধর্ম্মতবিষয়ের ধারণা অবিমিশ্র মুক্তপুরুষের প্রাপ্য বিষয় হয় না। নতুবা অপস্মৃতি আসিয়া বাস্তব-বস্তু-বিজ্ঞানের দ্বার অর্থাৎ স্থূল সূক্ষ্ম দেহদ্বয় জ্ঞেয়-পদার্থের স্থান অধিকার করে। বাস্তবদেহের স্মরণ-শূন্য অবস্থাই অপস্মৃতি।

মৃত্যকালে হরিনাম-গ্রহণ

সনাতনধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিমাত্রেই মৃত্যকালে বা তাহার অব্যবহিত পূর্ব্বে হরিনাম গ্রহণেব অশেষ ফলের প্রতি লৌকিক ও শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধা পোষণ করিয়া থাকেন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এই প্রসিদ্ধ শ্লোকটিও অনেকে অবগত আছেন,—

যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্‌ভাবভাবিতঃ।। (গীঃ ৮।৬)

হে অর্জ্জুন, মানব মৃত্যকালে যেরূপভাবের স্মরণ করিয়া দেহ ত্যাগ করেন, তিনি সেইভাব-ভাবিত তত্ত্বকেই লাভ করিয়া থাকেন।

মৃত্যকালে হরিনাম-গ্রহণ

অতএব মরণকালে যে কোন রূপেই হউক, একবার হরিনাম বা ভগবদ্ভজন করিবার আকাঙ্খা অনেকেই পোষণ করিয়া থাকেন। এমন কি, যাহারা সারাজীবন বিষয়াসক্ত বা দুষ্কার্য্যাদিতে রত থাকেন, তাঁহারাও ভাবিয়া রাখেন যে, শেষের দিনে কোনমতে গীতার একটি শ্লোক, কিংবা কাহারও মুখে হরিনাম শ্রবণ, অথবা নিজেই হরিনাম কীর্ত্তন করিয়া সমস্ত জীবনের পাপরাশিকে দগ্ধ করিবেন এবং ঐরূপ চালাকির দ্বারা ভবসাগর উত্তীর্ণ হইয়া যাইতে পারিবেন।

বস্তুতঃ ইহাও নাম-বলে পাপপ্রবৃত্তিরই প্রকার বিশেষ। যদিও ইহাতে 'পুনঃ পুনঃ পাপ করিব ও পুনঃ পুনঃ হরিনামাক্ষর উচ্চারণের দ্বারা পাপের বিনাশ করাইব',—ঠিক এইরূপ বাহ্য আদর্শ নাই, তথাপি 'এখন খুব পাপ করিয়া যাই, বিষয়ভোগ বা অন্যায় কার্য্য করিয়া যাই, ঐ সকল পাপ ও দুষ্কর্ম্ম বিনাশের জন্য ভবিষ্যতে হরিনামরূপ অস্ত্রই ত' রহিয়াছে',—এইরূপ মনোভাবের সহিত হরিনামবলে বর্ত্তমানে পাপপ্রবৃত্তির আকাঙ্খাই দৃষ্ট হয়। অতএব এইরূপ ব্যক্তি অন্তিমকালে হরিনাম গ্রহণ করিতে পারেন না বা হরিনাম শ্রবণাদির অভিনয় করিয়াও সিদ্ধি লাভ করিতে পারেন না।

অন্তিমকালে একবারমাত্রও ভগবানের নাম-গ্রহণ বা শ্রবণে সিদ্ধিলাভ হয়,—ইহাই শাস্ত্র সিদ্ধান্ত। কিন্তু শাস্ত্র বলেন, যদি অপরাধের অভাব থাকে, তবেই অপরাধনাশের জন্য আর আবৃত্তির অপেক্ষা করে না। কিন্তু অপরাধ থাকিলে অন্তিমকালে একবারমাত্র হরিনাম শ্রবণ বা হরিনাম গ্রহণের অভিনয় করিলে তদ্দ্বারা সিদ্ধিলাভ হয় না। এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভু ভক্তিসন্দর্ভের ১৫৯ সংখ্যায় বলিয়াছেন, —ততোঽপরাধাভাবাৎ তৎক্ষয়ার্থং ন তত্রাবৃত্ত্যপেক্ষা। যথাজামিলস্য,

ন তথা কৃত-তন্নামশ্রবণাদিনামপি যমদূতানাম। যথাহ (ভাঃ ৬।২।৩২)—

অথাপি মে দুর্ভগস্য বিবুধোত্তম-দর্শনে।
ভবিতব্যং মঙ্গলেন যেনাত্মা মে প্রসীদতি।।
''পূর্ব্বেণ মঙ্গলেন মহতা পুণ্যেন" ইতি টিকা চ।

অপরাধের অভাব-হেতুই অপরাধ নাশের জন্য আর হরিনাম-আবৃত্তির অপেক্ষা করে না অর্থাৎ একবার মাত্র হরিনামের উচ্চারণেই জীবের সিদ্ধিলাভ হয়, অজামিলের যেরূপ সিদ্ধিলাভ হইয়াছিল, কিন্তু তৎকালে ভগবানের নাম শ্রবণাদি করিয়াও যমদূতগণের তাহা হই নাই। তাই অজামিল বলিয়াছেন,—আমি দুশ্চরিত্র হইলেও অদ্য যাঁহাদ্বারা আমার চিত্ত প্রসন্ন হইয়াছে,সেই উত্তম ভাগবতগণের (বিষ্ণুদূতগণের) দর্শন-বিষয়ে পূর্ব্ব মহাসুকৃতি নিশ্চয়ই কারণরূপে বর্ত্তমান আছে। ব্যতিরেকেণাহ (ভাঃ ৬।২।৩১)—

অন্যথা ম্রিয়মাণস্য নাশুচের্বৃষলীপতেঃ।
বৈকুণ্ঠনামগ্রহণং জিহ্বা বক্তুমিহার্হতি।।

(ভক্তিসন্দর্ভ ১৬০ সংখ্যা)

অজামিল বিপরীতক্রমে বলিতেছেন,—যদি আমার পূর্ব্ব সুকৃতি বর্ত্তমান না থাকিত, তাহা হইলে নীচজাতি ও বেশ্যার আসক্তিযুক্ত এই মরণোন্মুখ দুরাচারের জিহ্বা কখনও হরিনাম-গ্রহণে সমর্থ হইত না।

যাহার পূর্ব্ব সুকৃতি নাই, সেইরূপ ব্যক্তির কখনও অন্তিমে ভগবৎস্মৃতির উদয় হইতে পারে না। 'সারাজীবন পাপ করিব এবং মৃত্যুসময়ে হরিনাম-গ্রহণের ছলনা করিয়া অতি সহজেই সিদ্ধি লাভ করিয়া যাইব',—এরূপ বিচার অজামিলের বিকৃত অনুকরণ ও তাঁহার চরণে অপরাধহেতুই উদিত হয়। আমরা অজামিলের যে পাপময় সাময়িক জীবনটি দেখিতে পাই, তৎপূর্ব্বে অজামিলের যে বহু সুকৃতিপূর্ণ জীবন ছিল, তাহার আলোচনা করি না। তাঁহার পূর্ব্বসুকৃতি সঞ্চিত ছিল বলিয়াই সাময়িক ও আগন্তুক পরবর্ত্তী পাপজীবনের পাপবাসনাসমূহ একবারমাত্র নামাভাসেই দগ্ধীভূত হইয়া গিয়াছিল।

কেহ কেহ বলিতে পারেন,—'আমরাও বর্ত্তমানে দুষ্কার্য্যাদি করিয়া যাইব, হয়ত' আমাদেরও পূর্ব্বজীবনের কোন সুকৃতি আমাদের অজ্ঞাতসারে লুক্কায়িত থাকিতে পারে। সেই সুকৃতিই মৃত্যুকালে আমাদিগকে হরিনাম স্মরণ করাইয়া দিবে।' প্রথম কথা এই যে, সেইরূপ সুকৃতি আছে, কি নাই, তদ্বিষয়ে সন্দেহ আছে। দ্বিতীয়তঃ যখনই ঐরূপ কার্য্য স্বাভাবিক আকস্মিক না হইয়া কৃত্রিম ও আনুকরণিক হইয়াছে, তখনই অজামিলাদি বৈষ্ণবগণের চরণে অপরাধের উদয় করাইয়াছে এবং নাম-বলে পাপপ্রবৃত্তির স্পৃহাও হৃদয়ে গুপ্ত রহিয়াছে। সেরূপ অপরাধস্থলে অন্তিমে নারায়ণ-স্মৃতি বা নিরপরাধে ভগবন্নাম অর্থাৎ নামাভাসাদির উদয় হইবে না। সম্বন্ধজ্ঞানরহিত হইয়া অপরাধশূন্য নামের গ্রহণই 'নামাভাস'। শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভুও ভক্তিসন্দর্ভে বলিয়াছেন,—"তদেবং যঃ সকৃদ্ভজনাদিনৈব ফলোদয় উক্তস্তদ্‌যথাবদেব, যদি প্রাচীনোহর্ব্বাচীনো বাপোরাধ ন স্যাৎ।* * তত্র হি তসৈবসকৃদপি ভগবান্নামগ্রহনাদিকং জায়তে, যস্য পূর্ব্বত্র বাত্র বা জন্মনি সিদ্ধেন ভগবদারাধনাধিনা তদানীং স্বীয়প্রভাবং প্রকটয়তানন্তরমেব ভগবৎসাক্ষাৎকারো ভাব্যতে।"(ভক্তিসন্দর্ভ ১৫৯ সংখ্যা)

তাৎপর্য্য—অতএব একবার মাত্র ভজনেই যে সিদ্ধি উক্ত হইয়াছে, তাহা প্রাচীন বা নূতন যে কোন অপরাধের অভাবস্থলেই সঙ্গত হয়। * * যাঁহার পূর্ব্ব বা বর্ত্তমান জন্মের সিদ্ধ ভগবদুপাসনাদি মৃত্যুকালে স্বীয়প্রভাব প্রকাশদ্বারা মরণের অনন্তরই ভগবৎসাক্ষাৎকার উৎপাদন করিয়া থাকে, সেইরূপ পুরুষেরই মৃত্যুকালে শ্রীগীতোক্ত (৮।৬) ভগবৎস্মৃতির উদয় হইয়া থাকে।

ভরতরাজা মৃগশরীর পরিত্যাগ করিবার সময় হরিনাম গ্রহণ করিয়া পুনরায় যে দেহ লাভ করিয়াছিলেন, সেই সময় তাঁহার সাক্ষাৎ ভগবৎপ্রাপ্তি হইয়াছিল। ভরত মৃগশিশুর প্রতি পরার্থিতা প্রদর্শন করিতে করিতে মৃগেতে অসক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং মৃত্যুকালে মৃগের চিন্তা লইয়াই দেহ ত্যাগ করায় মৃগদেহ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন (ভাঃ ৫।৮।২৭)। কিন্তু তিনি মগজন্মেও পূর্ব্বজন্মজাত ভগবদ্ আরাধনার অনুষ্ঠান-প্রভাবে তাঁহার হরিবিমুখতাকে স্মরণ করিয়া পুনঃ পুনঃ অনুতাপ করিয়াছিলেন,—

"অহো কষ্টং ভ্রষ্টোঽহমাত্মবতামনুপথাদ্দ্বিমুক্তসমস্তসঙ্গস্য বিবিক্তপুণ্যারণ্যশরণস্যাত্মবত আত্মনি সর্ব্বেষামাত্মনাং ভগবতি বাসুদেবে তদনুশ্রবণ-মনন-সঙ্কীর্ত্তনারাধনানুস্মরণাভিযোগেনাশূন্যসকলযামেন কালেন সমাবেশিতং সমাহিতং কাৎস্ন্যেন মনস্তৎ তু পুনর্মমাবুধস্যারান্মৃগতমনু সুস্রাব।"—(ভাঃ ৫।৮।২৯)

হায়, কি কষ্ট! আমি ধীরজনের পথ হইতে বিচ্যুত হইয়াছি। কারণ, আমি স্ত্রী-পুত্রাদির সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া নির্জ্জন পুণ্যারণ্যে আশ্রয় গ্রহণ-পূর্ব্বক জিতেন্দ্রিয় হইয়াছিলাম এবং সর্ব্বজীবের আত্মস্বরূপ ভগবান্ বাসুদেবের বিষয় শ্রবণ, মনন, সঙ্কীর্ত্তন, আরাধন ও অনুস্মরণাদি ভক্ত্যঙ্গে অভিনিবেশদ্বারা যামসকলের সফলতা সম্পাদনপূর্ব্বক বহুদিন অতিবাহিত করিয়া চিত্তকে তাঁহাতেই সম্যগ্রূপে স্থাপিত ও সুস্থির করিয়াছিলাম; কিন্তু পুনরায় সেই মনই মৃগবালকে অভিনিবিষ্ট হওয়ায় তাঁহা হইতে অতি দূরে নিঃসৃত হইয়া পড়িয়াছি।

এই মৃগশরীর পরিত্যাগ-কালে তিনি হরিনাম গ্রহণ করিয়াও দেহান্তর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই দেহের তিনি 'জড়ভরত'-নামে খ্যাত হন। কিন্তু তাঁহার এই দেহ—পারমহংস্যদেহ এবং এই দেহেই তাঁহার সাক্ষাৎ ভগবৎপ্রাপ্তি হইয়াছিল। এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—"যত্তু শ্রীভরতস্য মৃগশরীরং ত্যজতো নামানি গৃহীত্বাপি শরীরান্তরপ্রাপ্তিস্তত্রাপি সাক্ষাদ্ভগবৎ প্রাপ্তিরেব; তাদৃশানাং হৃদি সদাবির্ভাবাৎ। ততো মরণ সময়ে সকৃদ্ভজনস্যানন্তরমেব কৃতার্থত্বপ্রাপণে ব্যভিচারো ন স্যাৎ অতএবাহ (ভাঃ ২।১।৬),—

"জন্মলাভঃ পরঃ পুংসামন্তে নারায়ণ-স্মৃতি।" (ভক্তিসন্দর্ভ ১৬১)

তাৎপর্য্য—শ্রীভরতের মৃগশরীর পরিত্যাগ-কালে হরিনাম গ্রহণ করিয়াও পুনরায় যে দেহপ্রাপ্তি হইয়াছিল, সে-স্থলেও তাঁহার সাক্ষাৎ ভগবৎপ্রাপ্তিই ঘটিয়াছিল; যেহেতু সেইরূপ পুরুষগণের চিত্তে ভগবান্ সর্ব্বদা আবির্ভূত হইয়াছেন। অতএব **মরণকালে একবারমাত্র ভজনেই যে মৃত্যুর পরেই কৃতার্থতা উৎপাদন করে, —এবিষয়ে কোন ব্যতিক্রম হয় না**। অতএব শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে,—অন্তিমকালে যে নারায়ণের স্মরণ হইয়া থাকে, ইহাই পুরুষগণের জন্মের পরম লাভস্বরূপ।

অন্তিমকালে শ্রীহরির স্মরণই মুখ্য বিষয়। হয়ত এমনও দেখা যাইতে পারে যে, কোন কোন মহাপুরুষের অপ্রকটের কএকদিবস পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার বাহ্যসংজ্ঞা লোপ ও বাক্শক্তি নিরোধ হইয়া গিয়াছে; সেরূপ স্থলে বুঝিতে হইবে না যে, সেইরূপ মহাপুরুষ অন্তিমে হরিনাম কীর্ত্তন বা শ্রবণ করিতে না পারায় অধোগতি লাভ করিয়াছেন। যদি সেরূপ ব্যক্তির পূর্ব্বকৃত যথেষ্ট সেবা-স্মৃতি অন্তরে বিরাজিত থাকে, তাহা হইলে অন্তিমে নারায়ণ-স্মৃতিরই উদয় হইবে। বাহ্যচক্ষে অপর লোকে তাঁহাকে অন্যরূপ দেখিলেও তিনি নারায়ণ-স্মৃতিতেই উদ্দীপ্ত থাকেন। আর হয়ত' কাহারাও মরণের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বাহ্যসংজ্ঞা আছে, তাঁহাকে হরিনামও শ্রবণ করান' হইতেছে, অথচ সে ব্যক্তি অপরাধী বা তাহার কোন সেবা-সুকৃতি নাই, তাঁহার কর্ণে

হরিনাম-কীর্ত্তন প্রবিষ্ট হইতেছে না অর্থাৎ নামাক্ষর মাত্র তাঁহার কর্ণে প্রবিষ্ট হইলেও সঙ্কেতাদি নামাভাসের দ্বারা তাঁহার নারায়ণস্মৃতির উদয় হইতেছে না, সেরূপ স্থলে মঙ্গলের সম্ভাবনা নাই। যাঁহাদের পূর্ব্ব ও বর্ত্তমান জন্মের সিদ্ধ ভগবদুপাসনাদি মৃত্যুকালে স্বীয় প্রভাব প্রকাশের দ্বারা মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই ভগবৎসাক্ষাৎকার উৎপাদন করিয়া থাকে, তাঁহাদেরই পক্ষে অন্তে নারায়ণ-স্মৃতি সম্ভব।

কেবল যে বাহ্যে 'ভগবানের ভক্ত' বলিয়া লোকে প্রচারিত বা বিখ্যাত থাকিলেই অন্তিকালে তাঁহার সুবিধা হইয়াছে জানিতে হইবে, তাহা নহে। ঐরূপ ব্যক্তির যদি প্রকৃত শুদ্ধবৈষ্ণবের চরণে অপরাধ থাকে, অথচ বাহ্যে তিনি ভগবানের একনিষ্ঠ পূজকও হন, তাহা হইলে মৃত্যুর পরে ঐ ব্যক্তির নীচযোনিই লাভ হইবে। শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভু ভক্তিসন্দর্ভের ১৫৩ সংখ্যায় শ্রীবিষ্ণুপুরাণের শতধনু-নামক রাজার দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া দেখাইয়াছেন যে, শতধনু সর্ব্বক্ষণ বিষ্ণুর পূজায় তৎপর থাকিলেও তিনি বেদ ও বৈষ্ণব নিন্দককে অতি অল্পকাল সম্ভাষণ অর্থাৎ আদর করিয়াছিলেন, এইজন্য সেই অপরাধে তাঁহার মৃত্যুর পর কুক্কুরাদি যোনি লাভ হইয়াছিল,—

"এবং বহুন্যেবাপরাধান্তরাণ্যপি" দৃশ্যন্তে। এবমেব শ্রীবিষ্ণুপুরাণে শতধনুর্নাম্নো রাজ্ঞো ভগবদারাধন-তৎপরস্যাপি বেদবৈষ্ণবনিন্দকাল্পসম্ভাষয়ৈব কুক্কুরাদিযোনিপ্রাপ্তিরুক্তা।"

শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভু আরও জানাইয়াছেন,—

"**সিদ্ধানামাবৃত্তিস্তু প্রতিপদমেব সুখবিশেষো দয়ার্থা। অসিদ্ধানামাবৃত্তিনিয়মঃ ফলপর্য্যাপ্তিপর্য্যন্তঃ।** তদন্তরায়েহপরাধাবস্থিতিবিতর্কাৎ। যতঃ কৌটিল্যম্ অশ্রদ্ধা ভগবন্নিষ্ঠাচ্যাবকবস্ত্বন্তরাভিনিবেশো ভক্তিশৈথিল্যং স্বভক্ত্যাদিকৃতমানিত্বমিত্যেবমাদীনি **মহৎসঙ্গাদি লক্ষণ-ভক্ত্যাপি নিবর্ত্তয়িতুং দুষ্করাণি চেত্তহিতস্যাপরাধস্যৈব কার্য্যাণি তান্যেব চ প্রাচীনস্য তস্য লিঙ্গানি।** অতএব কুটিলাত্মনামুত্তমমপি নানোপচারাদিকং নাঙ্গীকরোতি ভগবান্ যথা দূত্যগতো দুর্য্যোধনস্য। আধুনিকানাঞ্চ **শ্রুতশাস্ত্রানাম-প্যপরাধদোষেণ শ্রীভগবতি শ্রীগুরৌ তদ্ভক্তাদিষু চান্তরানাদরাদাবপি সতি বহিস্তদর্চ্চনাদ্যারম্ভকৌটিল্যম্।** অতএবাকুটিলমূঢ়ানাং ভজনাভাসাদিনাপি কৃতার্থত্বমুক্তম্। কুটিলানান্তু ভক্ত্যনুবৃত্তিরপি ন ভবতীতি স্কান্দে শ্রীপরাশর বাক্যে দৃশ্যতে,—

"ন হ্যপুন্যবতাং লোকে মূঢ়ানাং কুটিলাত্মনাম্।
ভক্তির্ভবতি গোবিন্দে কীর্ত্তনং স্মরণং তথা।।" ইতি

এতদপেক্ষয়োক্তং বিষ্ণুধর্ম্মে—

"সত্যং শতেন বিঘ্নানাং সহস্রেণ তথা তপঃ।
বিঘ্নাযুতেন গোবিন্দে নৃণাং ভক্তিনিবার্য্যতে।।" ইতি।

অর্থাৎ মুক্ত পুরুষগণ যে হরিনামের আবৃত্তি করেন, তাহা প্রতিপদেই অপ্রাকৃত সুখবিশেষ উদয়ের জন্য। আর অসিদ্ধ ব্যক্তিগণের যে হরিনাম আবৃত্তির নিয়ম, তাহা ফলপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত। ফলপ্রাপ্তির অন্তরায় দৃষ্ট হইলে সেস্থলে আবৃত্তিকারীর অপরাধ আছে—এইরূপ বিতর্ক বা সংশয় উপস্থিত হয়। **যেহেতু কুটিলতা, অশ্রদ্ধা, ভগবানে নিষ্ঠার চ্যুতিকারক কৃষ্ণেতর বস্তুর প্রতি অভিনিবেশ, ভজনশৈথিল্য, সেবাকার্য্যাদির জন্য অহঙ্কারিত্ব প্রভৃতি দোষগুলি যদি মহৎ অর্থাৎ মহাভাগবত বৈষ্ণব বা সাধুর সঙ্গ প্রভৃতি লক্ষণময়ী ভক্তির দ্বারাও নিবারণ করা দুঃসাধ্য হয় অর্থাৎ বিদূরিত না হয়, তাহা হইলে ঐসকল দোষ অপরাধেরই কার্য্য** এবং পূর্ব্ব অপরাধের সূচক বা কারণ বলিয়া বুঝিতে হইবে। এতএব দুর্য্যোধনের নিকট পাণ্ডবগণের দূতরূপে প্রেরিত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যেরূপ দুর্য্যোধন-প্রদত্ত নানা বিলাসোপচারযুক্ত পূজা গ্রহণ করেন নাই, তদ্রূপ কুটিলচিত্ত জনগণের পূজার বিবিধ উপচারাদি অতি উত্তম হইলেও ভগবান্ তাহা স্বীকার করেন না। শাস্ত্র শ্রবণ করিয়াও আধুনিক কোন কোন লোকের অপরাধ-দোষে শ্রীভগবান্, শ্রীগুরুদেব ও ভগবদ্ভক্তগণের প্রতিঅন্তরে অনাদর সত্ত্বেও বাহিরে তাঁহাদের প্রতি যে পূজনাদি প্রযত্ন, তাহা সমস্তই কুটিলতা মাত্র। অতএব বাহ্যদৃষ্টিতে মূর্খ হইলেও অকুটিল অর্থাৎ সরলচিত্ত ব্যক্তিগণ ভক্ত্যাভাসাদির দ্বারা কৃতার্থ হইয়াছেন, কিন্তু কপট বক্তিগণ বাহ্যে হরিসেবার নানা চেষ্টা দেখাইলেও তাঁহাদের আদৌ ভক্তির অনুবর্ত্তনই হয় না, ইহা স্কন্দপুরাণে পরাশর-বাক্যে দৃষ্ট হয়,—“এজগতে মূঢ় কুটিলচিত্ত পাপী জনগণেরই শ্রীগোবিন্দের প্রতি ভক্তি বা তাঁহার কীর্ত্তন ও স্মরণ-চেষ্টা হয় না।” বিষ্ণু-ধর্ম্মোত্তরেও এইজন্য কথিত হইয়াছে,—“শতবিঘ্নের দ্বারা সত্য, সহস্র বিঘ্নের দ্বারা তপস্যা এবং অযুত অসংখ্য বিঘ্নের দ্বারা শ্রীগোবিন্দের প্রতি লোকের ভক্তি বাধা প্রাপ্ত হয়।”

প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায়ে বা বিভিন্ন মনোধর্ম্মিগণের মধ্যে হরিসেবা ও হরিনাম-গ্রহণের আজীবন কপট অভিনয় দেখিতে পাওয়া যায়, অথচ শুদ্ধবৈষ্ণবের প্রতি তাহাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা নাই, বরং অপরাধই পূর্ণমাত্রায় বিরাজিত, সেইরূপ কপট ব্যক্তিগণ যে হরিনামের (?) আবৃত্তি বা হরিসেবায় (?) অভিনয় করে, তদ্দ্বারা তাহাদের অন্তে হরিস্মৃতি-লাভ সম্ভব নহে। ইহারা বৈষ্ণব-নিন্দা বা বৈষ্ণব নিন্দকের সহিত সম্ভাষণাদি-দোষে ভগবদারাধনাতৎপর শতধনু রাজা অপেক্ষাও অধোগতি অর্থাৎ কুক্কুরাদি-যোনি হইতেও নিকৃষ্ট যোনি লাভ করিবে।

এস্থলে আর একটি জ্ঞাতব্য বিষয় এই যে, সাধারণ প্রারব্ধ কর্ম্ম দুর্ব্বলতাবশতঃ ভগবদ্ভক্তির বিঘ্ন উৎপাদনে সমর্থতত হইতে পারে না; কিন্তু পূর্ব্বজন্মের প্রবল অপরাধই বিঘ্নজনক হয়। যেমন ইন্দ্রদ্যুম্নাদি তাহার উদাহরণ—

“অত্রৈবং চিন্ত্যং—ভগবদ্ভক্ত্যন্তরায়কং সামান্যমারব্ধকর্ম্ম ন ভবিতুমর্হতি দুর্ব্বলত্বাৎ। ততঃ প্রাচীনাপরাধাত্মকমেব তল্লভ্যত ইন্দ্রদ্যুম্নাদীনামিবেতি।” (ভক্তিসন্দর্ভ ১৫৭ সংখ্যা)

কেহ কেহ বলেন,—ভক্তগণের সম্বন্ধে কখনও কখনও যে বিঘ্ন দেখা যায়, তাহার বিচার অন্যরূপ। ভগবদ্বিষয়ে ভক্তগণের উৎকণ্ঠা বৃদ্ধির জন্যই ভগবানের ইচ্ছানুসারে সেইরূপ ভক্তগণের সম্বন্ধে সামান্য আরব্ধ কর্ম্মই প্রবল বিঘ্নজনক হয়। যেরূপ মৃগদেহ প্রাপ্ত ভরতের হইয়াছিল। এইরূপ অভিপ্রায়েই শ্রীনারদের পূর্ব্ব জন্মে ভগবদ্বিষয়ে রতি প্রকাশসত্ত্বেও কামাদি চিত্তমলের অস্তিত্ব উক্ত হইয়াছে। (ভক্তিসন্দর্ভ ১৫৮ সংখ্যা) যথা—

হন্তাস্মিন্ জন্মনি ভবান্ মা মাং দ্রষ্ট মিহার্হতি।
অবিপক্ককষায়াণাং দুর্দ্দর্শোঽহং কুযোগিনাম্।।

(ভাঃ ১।৬।২২)

ভগবান্ শ্রীনারদকে বলিয়াছিলেন,—হে বৎস, তুমি ইহজন্মে আমার সাক্ষাৎকার লাভে সমর্থ নহ; যেহেতু যাঁহাদের যোগ নিষ্পন্ন এবং কামাদি চিত্তমল দগ্ধ হয় নাই, তাঁহারা আমাকে দর্শন করিতে পারেন না।